ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি

(সন্তান গঠনের ইসলামী সিলেবাস)

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার

www.ahsanpublication.com

ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

ISBN : 978-984-8808-01-6

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
জুন, ২০১০
জৈষ্ঠ্য, ১৪১৭
জমাদিউস সানি, ১৪৩১

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : দুইশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

Islame Santan Gathan Paddati (How to Buitd-up your child in Islam) Publised by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar Dhaka-1100 First Edition June-2010 Price **Tk. 275.00** only

AP-70

ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি

সূচিপত্র

তৃতীয় ভাগ

ভূমিকা

মহানবী (সা) বলেন, 'সন্তানের জন্য পিতার পক্ষ থেকে ভালো আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দান অপেক্ষা উত্তম কোন উপহার নেই।' (তিরমিযী)

এক আরব কবি বলেছেন, সন্তান যেন এমন না হয় :

"সে এমন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় কারো উপকারে আসেনি,

আর মারা গেলে তার জন্য কোন আত্মীয় কাঁদবে না।"

বরং অন্য কবির ভাষায় সন্তানকে এমন হতে হবে:

'প্রথম যেদিন এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি আর হেসেছিল সবে,

এমন জীবন হবে করিতে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।'

সন্তানকে ফুলের সাথে তুলনা করা যায়। ফুলের মন মাতানো সৌন্দর্য ও হৃদয়গ্রাহী সুবাসের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। ফুল মৌমাছির ভীড় ও সুস্বাদু মধু আহরণের উৎস। সন্তান ভালোভাবে গড়ে উঠলে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ এবং মধুর স্বাদ-আস্বাদন করা যায়।

কিন্তু সন্তান হয় ফুলের মতো সৌরভ বিলায়, না হয় বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার দুর্গন্ধ ছড়ায়। এজন্য পরিবার, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, অনৈতিকতা, সাথী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক কিছু দায়ী। সন্তান ভালো হলে অভিভাবক খুশি। আর খারাপ হলে অভিভাবককে হতে হয় হতাশ পেরেশান।

সন্তান গঠনের দায়িত্ব পালন করেন– মা, বাবা, শিক্ষক ও সংশোধনকারীরা। ভালো সন্তান গঠন করা ফরজ। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 'হে মোমেনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হলো মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরীম-৬)

সন্তানের ফুলের মতো ফোঁটা ও ভালোভাবে গড়ে ওঠার জন্য চাই বিজ্ঞানসম্মত সমন্বিত কারিকুলাম ও সিলেবাস। তা না হয়, ফোঁটা ও ওঠার প্রত্যাশিত আনন্দ পাওয়া যাবে না। সন্তান গঠনের ক্ষেত্রে আশা ও হতাশার মধ্যে অবস্থানকারীদের জন্য এই বইটি অন্ধকারের অবসান ঘোষণাকারী সোবহে সাদেক। এটা একাধারে

এক বিরল কারিকুলাম ও বিজ্ঞোচিত সিলেবাস। এতে শৈশব থেকে তারুণ্যের পর্যায় পর্যন্ত সন্তান গঠন পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বাতলানো হয়েছে, যেন তারা যৌবনে পদার্পণ করে আল্লাহর উপযুক্ত খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হয়।

আমার এই বই ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক এবং জেদ্দা'স্থ বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ নাসেহ আলওয়ান-এর রচিত ও আরব বিশ্বে বিরাট সাড়া জাগানো تَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ فِي الْإِسْلَامِ (তারবিয়াতুল আওলাদি ফিল ইসলাম) বই অবলম্বনে লিখিত। এটি সাধারণভাবে সকল মুসলমান এবং বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত উপকারী।

কোরআন মাজীদ এবং হাদিসের কিতাবগুলোতে সন্তানের শিক্ষার ওপর জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। বোখারী শরীফের প্রায় ৮/১০টা পরিচ্ছেদের শিরোনামও সেরূপ।

কোরআন মাজীদ মুমিনদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে : يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّالَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ 'হে মোমেনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।' (সূরা তাগাবুন-১৪)

অপরদিকে দয়াবান আল্লাহর বান্দারা তাঁর কাছে নেক সন্তানের জন্য এই দোয়া করে : رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ 'হে আল্লাহ, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতার কারণ বানিয়ে দাও।' (সূরা ফোরকান-৭৪)

এই দুটো আয়াতে হতাশা ও আশাবাদের উৎস ব্যক্ত হয়েছে।

মূলত, ইসলাম এমন এক প্রশিক্ষণ সিলেবাস যা মানবতার সংস্কার-সংশোধন, ভবিষ্যৎ বংশধর তৈরী, জাতি ও সভ্যতা গঠন এবং বিপন্ন মানবতার অজ্ঞতা গোমরাহী ও শিরকের অন্ধকার থেকে আল্লাহর একত্ববাদ ও হেদায়াতের আলো দেখায়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং একথা কোরআন মাজীদে বলেছেন : قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ يَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর নূর ও একটি বিস্তৃত বর্ণনাকারী কিতাব। এর দ্বারা আল্লাহ, যারা

তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজ নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর তাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন।' (সূরা মায়েদাহ : ১৫-১৬)

হতাশার কারণ ও প্রতিকার

শিক্ষাই বিজয়ের মাপকাঠি। মিসরের ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) বলেন, যেদিন মোহাম্মদ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে গঠন বা তৈরী করেছেন, সেদিনই তিনি বিজয় লাভ করেছেন। কেননা তাঁরা ছিলেন ঈমানের জীবন্ত ছবি। যদিও তারা খাবার খেতেন এবং বাজারে যেতেন, অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে জড়িত হতেন। যেদিন তাদেরকে যমীনে চলাচলকারী জীবন্ত কোরআনের প্রতিচ্ছবি ও ইসলামের আদর্শ প্রতিকৃতি হিসেবে গঠন করেন; যাদেরকে দেখে লোকেরা ইসলামকে বুঝতো, বিজয় সেদিনই এসেছিলো।

এ কারণে মহানবী (সা) সর্বপ্রথম লোক গঠনের টার্গেট নেন। তিনি বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা দার্শনিক আলোচনাকে প্রথমে টার্গেট বানাননি বরং তিনি কোরআনের অর্থকে বাস্তবে রূপ দেন এবং এমন ধরনের লোক তৈরী করেন, যাদেরকে হাত দিয়ে ধরা যায় এবং চোখ দিয়ে দেখা যায়।

মূলত, তিনি যেদিন ঈমানকে তাদের মধ্যে ইসলামের আকারে বাস্তব রূপ দেন এবং কাগজে নয় বরং মানব হৃদয়ে কোরআনের হাজার হাজার কপি অঙ্কন করেন, সেদিনই তিনি বিজয়ী হন। মানুষ তাদের সাথে লেন-দেন করে। ইসলাম কী, তারা কথা ও কাজে দেখিয়ে দেন।

دِرَاسَاتٌ إِسْلَامِيَّةٌ – فَصْلٌ : اِنْتِصَارُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - لِلسَّيِّدْ قُطُبْ رَحْ

যারা ইসলামের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান তারা সাহাবায়ে কেরামের জীবন-ইতিহাস পাঠ করলে তাদের আরো বহু মহান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, দয়া-গুণ এবং এলেম ও আমল সম্পর্কে জানতে পারবেন। এদের ব্যাপারে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।' (সূরা আল ফাতহ-২৯)

আল্লাহ আরো বলেন, 'যারা মুহাজিরদের আগমনের আগে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে

যা দেয়া হয়েছে, সেজন্য তারা মনে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল।' (সূরা হাশর-৯)

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, কেউ যদি কাউকে অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের অনুসরণ করে। কেননা, তারা এই উম্মাহর খুব বেশি দরদী লোক, গভীর এলেম জ্ঞানের অধিকারী, অকৃত্রিম, অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম অবস্থার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নবীর সাথী ও দ্বীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন। তাই তাদের মর্যাদা জানা ও পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিৎ। বিগত শতাব্দীগুলোতে মুসলিম উম্মাহ যোগ্য পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র, মর্যাদা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের ঝরনা ধারায় অবগাহন করে শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তোলেন।

ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, স্বার্থের লড়াই এবং বিজাতীয় মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদেরকে নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে উৎসাহ যোগায় এবং মুসলিম ঐক্য নষ্ট করে তাদেরকে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোতে পরিণত করে। ফলে মুসলিম সংস্কারক ও দাঈদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। তাঁরা মনে করেন, এই উম্মাহর সংশোধন অসম্ভব। তারা ঘরের কোণে বাস করাকে অগ্রাধিকার দেন এবং শেষ যমানার অজুহাত দেখিয়ে সংস্কার ও সংশোধনকে অসম্ভব বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

তাদের হতাশার পেছনে তিনটি কারণ কাজ করেছে।

ক. এ দ্বীনের মেজাজ তারা বুঝেনি।

খ. দুনিয়াপ্রীতির শিকার ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা

গ. মুসলমানদের সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা

– এখন আমরা উপরিউক্ত তিনটি সমস্যার সমাধানের পথ বাতলাবো।

ক. এ দ্বীনের মেজাজ তারা বুঝেনি : তাদের জানা উচিৎ, ইসলামে হতাশা ও নৈরাশ্য হারাম। আল্লাহ বলেন, اِنَّهُ لاَ يَايْئَاسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ 'আল্লাহর রহমত থেকে কাফেররাই নিরাশ হয়।' (সূরা ইউসুফ-৮৭)

তাদের বুঝা দরকার যে, ইসলাম হচ্ছে শক্তি অর্জনের নাম। শক্তি ছাড়া

ইসলামকে টিকিয়ে রাখা যায় না। আল্লাহ বলেন, وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ 'তোমরা অমুসলিমদের মোকাবিলায় সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় করো।" (সূরা আনফাল-৬০)

তারা যদি বুঝতো যে, ইসলাম হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এলেম ও জ্ঞান হাসিলের নাম! তারা বরং প্রার্থনা জানাতো :

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا "হে প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" (সূরা ত্বাহা-১১৪)

তারা যদি বুঝতো যে ইসলাম মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বিবেচনা করে, তখন তারাই যমীনের হাল ধরতো এবং এর ভেতরের সম্পদ বের করতো!

যদি তারা বুঝতো যে, ইসলাম সকল মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে! এখন তাকে নিজ দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি..... এবং আরো বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

তারা যদি বুঝতো যে, মানুষকে তার বিবেক বুদ্ধি এবং ইন্দ্রীয় শক্তির জবাবদিহী করতে হবে, তাহলে কখনো অলসতা ও অবহেলা করতো না! আল্লাহ বলেন, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا 'নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরকে জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)

তারা যদি বুঝতো যে, এই বিশ্বজগতকে মানুষের সেবার লক্ষ্যে তাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে! আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সেসবকে তোমাদের অনুগত করে দেয়া হয়েছে।' (সূরা আল জাসিয়া-১২)

আফসোস! তারা যদি বুঝতো যে, ইসলাম হচ্ছে কাজ, তৎপরতা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের নাম, তাহলে তাদের চিন্তা হতো এরূপ : 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। সুতরাং তোমরা এর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক খাও। তাঁরই কাছে পুনরুত্থান হবে।' (সূরা মুলক-১৫)

আজ তাদেরকে শির উঁচু করে দাঁড়াতে হবে এবং ইসলামের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করতে হবে। তাদের শ্লোগান হবে :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ 'ইজ্জত সম্মান কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মোমেনদের জন্য।' (সূরা মোনাফিকুন-৮)

দাঈ ইলাল্লাহ, আলেম সমাজ এবং মুসলিম চিন্তাবিদরা যদি ইসলামকে এভাবে

বোঝে, তাহলে হতাশার কাছে তারা মাথা নত করবে না। তারা দ্বীনের দাওয়াত, সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ অব্যাহত রাখবে।

খ. দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা : মুসলিম ওলামা, দাঈ এবং চিন্তাবিদরা যদি দুনিয়াপ্রীতি ও ভোগ লালসা থেকে মুক্ত হন, মানুষের হেদায়াত, সমাজ সংস্কার ও যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের সর্বোত্তম দায়িত্ব কর্তব্য, এলেমের লক্ষ্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাহলে এ সমস্যা থেকে বাঁচা যায়।

তারা কাপুরুষতা-ভীরুতা এবং মৃত্যু ভয়কে জয় করবেন। তারা ভাববেন যে, রিযক আল্লাহর হাতে। তিনিই মানুষের উপকার ও ক্ষতি করতে পারেন। কোন ক্ষুদ্র একটি প্রাণী কিংবা পাখিও না খেয়ে নেই। সৃষ্টির সাথে সাথে রিযিকও তৈরী করা হয়েছে। সকল মানুষ ও জ্বীন মিলেও আল্লাহ না চাইলে কারো ক্ষতি করতে পারে না কিংবা উপকারও করতে পারে না। তারা যেদিন হীনমন্যতা ও কাপুরুষতার বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে আসবে, সেদিন তারা দ্বীনের দাওয়াত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং সংশোধন ও সংস্কার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এজন্যে তারা না কাউকে ভয় করবে, না সংকোচ করবে। আল্লাহর বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা ঠিক নয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যমীনের ক্ষমতা দান করবেন, ভীতির পর নিরাপত্তা দেবেন, অসম্মান ও অনৈক্যের পর সম্মান ও ঐক্য দান করবেন। আর এটা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন বিষয় নয়।

গ. মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য : যেদিন মুসলমানরা বুঝবে যে, তাদেরকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিন তারা সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি মানুষ ও জ্বীনকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা জারিয়াত-৫৬)

প্রশ্ন হলো, ইবাদত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আল্লাহর মনোনীত পদ্ধতি এবং সহজ সরল পথের আনুগত্য করাই হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত দ্বারা বান্দাহ মানুষের ইবাদত বা গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পাবে এবং বিভিন্ন ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মোমেনদের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ফলে সে শরীয়ত থেকে উৎসারিত নয়– এমন

সব চিন্তা-চেতনা ও নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করবে। এটাই মোমিনের জীবনের লক্ষ্য। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টায় তৎপর থাকবে।

এখন এক বিরাট প্রশ্ন সামনে এসে যাচ্ছে। সেটি হলো, সংশোধন ও সংস্কারের পদ্ধতি কী হবে?

পিতা-মাতা, শিক্ষক, চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, তারা তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করে উন্নত সমাজ গঠন, শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ সৃষ্টি, মহান চরিত্র ও তাদের মজবুত শরীর গঠন এবং উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান ও মন-মানসিকতা তৈরী করে দ্রুত বিজয় ছিনিয়ে আনবে। ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্য সৃষ্টি করে উম্মাহর শৌর্য-বীর্য ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

আবারও প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কাজের প্রক্রিয়া, কৌশল ও প্রক্রিয়াগুলো কী? –এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মানবতার উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সন্তান গঠনের সাথে আদর্শ বিয়ের সম্পর্ক

সন্তান গঠনের বিষয়ে আলোচনার আগে আমরা সংক্ষেপে বিয়ের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

১. বিয়ে করা মানব স্বভাবজাত কাজ।

২. বিয়ে হচ্ছে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার কাজ।

৩. বিয়ের যাচাই-বাছাই নীতিমালা।

এবার আমরা এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত করবো।

১. বিয়ে করা মানব স্বভাবজাত কাজ

ইসলামী শরীয়াহ বৈরাগ্যবাদকে অস্বীকার করে। কেননা তা মানব স্বভাব বিরোধী এবং তার ঝোঁক প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ও চাহিদারও পরিপন্থী। এ মর্মে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ 'আল্লাহ আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে প্রশস্ত ও যথার্থ পথ দেখিয়েছেন।' (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَنْ يَنْكَحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكَحْ فَلَيْسَ مِنِّ 'যে ব্যক্তি এ পরিমাণ সচ্ছল যে বিয়ে করতে পারে, অথচ বিয়ে করেনি, সে আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।' (বায়হাকী, তাবারানী)

এ হাদিসগুলো দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামী শরীয়াহ বিয়ে থেকে বিরত থাকাকে নিষিদ্ধ করেছে। কেউ যেন নিরিবিলি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বৈরাগী না হয়। সামর্থ্যবান মুসলমানকে অবশ্যেই বিয়ে করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতি হলো, আমরা যেন স্বভাব প্রকৃতির সীমালঙ্ঘন না করি এবং সহজ-সরল পথে চলি। এ মর্মে আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ, ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاس لاَ يَعْلَمُوْنَ 'আল্লাহ তাঁর প্রকৃতির নিয়মে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা রূম-৩০)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিন ব্যক্তি নবী করিম (সা) এর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চান। স্ত্রীরা নবী (সা) এর ইবাদত সম্পর্কে তথ্য দেয়ার পর তিন ব্যক্তি এটাকে কম মনে করেন। তারা আরও বলেন, নবী করিম (সা) এর সাথে আমাদের কীভাবে তুলনা হয়? আল্লাহতো তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। একজন বলল, আমি রাতভর ইবাদত করি। দ্বিতীয়জন বলল, আমি সর্বদা রোজা রাখি। তৃতীয়জন বলল, আমি নারী থেকে দূরে অবস্থান করি এবং কখনো বিয়ে করবো না। এসময় নবী (সা) এসে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছো? জেনে রাখো, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অধিক মেনে চলি। তাসত্ত্বেও আমি (নফল) রোজা রাখি, আবার রাখি না, নামাজ পড়ি ও ঘুমাই এবং স্ত্রীলোকদের বিয়ে করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিরত থাকে সে আমার উম্মত নয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

মোটকথা বিয়ে করা স্বভাবজাত কাজ এবং যুক্তিপূর্ণ বিষয়। তাই বিয়ে করা উচিৎ।

২. বিয়ে হচ্ছে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার কাজ

বিয়ের উপকারিতা সার্বজনীন এবং তা একটি সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণ।

ক. এর মাধ্যমে মানব বংশের হেফাজত ও মানব সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং যমীনের শাসনভার ও খেলাফত অর্জিত হয়। আর এই মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তাদেরকে নৈতিক ও শারীরিক দিক থেকে গড়ে তোলা হবে। বিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَ 'আল্লাহ তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তিনি তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা নাহল-৭২)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً 'হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (সূরা নিসা-১)

বিয়ের মাধ্যমে বংশের ধারা অক্ষুণ্ন থাকে এবং সন্তান নিজ পিতার বংশের গৌরববোধ করে। বিয়ে ছাড়া অবৈধ পন্থায় যে সকল জারজ জন্ম গ্রহণ করে, তাদের না আছে আত্ম ও বংশ পরিচয়, আর না আছে উন্নত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বরং তারাই সমাজে বিপর্যয় ও বেহায়াপনার প্রতীক।

খ. বিয়ের মাধ্যমে সমাজ চারিত্রিক ধ্বস থেকে রক্ষা পায়। এর মাধ্যমে যৌন প্রয়োজন পূরণ হলে সমাজের লোকেরা উত্তম আদব শিষ্টাচারের অধিকারী হয় এবং মোমিন হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনে সক্ষম হয়। নবী করিম (সা) বিয়ের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, 'হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা তা চোখ অবনত রাখা এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাজতের জন্য সহায়ক। আর যে সক্ষম নয়, সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য যৌন নিয়ন্ত্রক।' (অধিকাংশ হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।)

গ. বিয়ে দ্বারা সমাজ মারাত্মক সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। যেনা ব্যভিচারের ফলে এইডস, সিফিলিস ও গনোরিয়াসহ বহু রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বহু রোগী মারা যায় এবং তা মানব বংশ ধ্বংসের কারণ হয়।

ঘ. বিয়ে হলো আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির কারণ– বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা ও দয়া-স্নেহ বৃদ্ধি পায়। দিন শেষে স্বামী কাজকর্ম সেরে ঘরে আসে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে মিলিত হয়। ফলে, সারা দিনের পেরেশানী ভুলে যায় ও ক্লান্তি দূর হয়। অনুরূপভাবে স্ত্রীও নিজ জীবন সঙ্গীর সাথে সাক্ষাতের পর তৃপ্ত হয়। এভাবে একে অপরের মানসিক ও আত্মিক শান্তির নিবিড় ছায়ায় পরিণত হয় এবং দাম্পত্য জীবনের সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথাই নিম্নোক্ত আয়াতে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ "আর তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম–২১)

ঙ. পরিবার গঠন ও সন্তানের শিক্ষাদানে স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতা : স্বামী-স্ত্রী পরিবার গঠন ও পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করে। ফলে একে

অপরের পরিপূরক হয়ে যায়। স্ত্রী তার নারীসুলভ কর্মক্ষেত্রে নিজ কর্তব্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে এবং সংসার পরিচালনা, সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

কবি বলেন, اَلْاُمُّ مَدْرَسَةٌ اِذَا اَعْدَدْتَهَا - اَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْاَعْرَاقِ 'মাকে তৈরী করা হলে তিনি একটা স্কুলের ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে মূলত আপনি একটা সম্ভ্রান্ত জাতি তৈরী করলেন।'

অনুরূপভাবে স্বামীও তার পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যের আওতায় আয়-রোজগার করেন, কঠিন পরিশ্রম করেন এবং কঠিন দিনে পরিবার রক্ষার জন্য কাজ করেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি হয়। তারা নেক সন্তান তৈরী করেন এবং তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দেন। ফলে সন্তান অন্তরে ঈমানের উজ্জ্বল শিখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বিয়ের মাধ্যমে যে স্নেহ-ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে তা মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের গুণের কারণে সন্তানের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। এখানেই আমরা সন্তানের শিক্ষার সাথে বিয়ের নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাই।

বিয়ের এ সকল উপকারিতাকে সামনে রেখেই নবী করিম (সা) বলেন, مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ - اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِه 'কোন মোমিন তাকওয়া অর্জনের পর নেক স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস দ্বারা অধিক উপকৃত হতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে কোন আদেশ করলে নেক স্ত্রী তা মানে, স্বামী তার প্রতি নজর করলে আনন্দ পায়, তার ওপর কোন বিষয়ের কসম করলে সে তা পূরণ করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার জান ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে।" (ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ, আর নেক স্ত্রী হচ্ছে উত্তম সম্পদ।' (মুসলিম)

৩. বিয়ের যাচাই-বাছাই নীতিমালা

পাত্র-পাত্রীর বিয়ের লক্ষ্যে ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা। এগুলোকে সামনে রেখে বিয়ে-শাদী সম্পন্ন হলে সে বিয়েতে সমঝোতা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান-আমল উন্নত হয়। এখন আমরা সে নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ক. দ্বীনদারীর ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা : দ্বীনদারী বলতে বোঝায়, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি, আচরণে ইসলামের মহান গুণাবলির বাস্তবায়ন এবং ইসলামী শরীয়াহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন।

পাত্র-পাত্রী উভয়েরই যদি দ্বীন সম্পর্কে এই স্তরের উপলব্ধি থাকে এবং তারা আনুগত্য ও আমল করে, তাহলে আমরা তাদেরকে দ্বীনদার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী মনে করবো। আর যদি তাদের দু'জনের একজনও ঐ পর্যায়ের না হয়, তাহলে আমরা তাদেরকে বিচ্যুত আচরণ, চারিত্রিক ধ্বংস এবং ইসলাম থেকে দূরে অবস্থানকারী হিসেবে বিবেচনা করবো। বাহ্যিকভাবে তার যোগ্যতা ও আমল থাকলেও আসলে সে সত্যিকার অর্থে ভালো মুসলিম নয়।

ব্যক্তিকে চেনার জন্য ইসলামের ন্যায়পরায়ণ দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা) যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন এবং ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা জানার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা আমাদের জন্য মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। তিনি তাঁর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারীকে প্রশ্ন করেন :

ওমর : আপনি কি তাকে চেনেন?

সাক্ষী: জ্বি।

ওমর : আপনি কি তার এমন প্রতিবেশী যে তার ঘরের প্রবেশ ও প্রস্থানের স্থান চেনেন?

সাক্ষী : জ্বি।

ওমর : আপনি কি সফরসঙ্গী হিসেবে তার গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করেছেন?

সাক্ষী : না।

ওমর : আপনি কি দীনার দেরহাম দ্বারা আর্থিক লেন-দেন করে তার তাকওয়া-পরহেজগারী সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন?

সাক্ষী : না।

ওমর : সম্ভবত আপনি তাকে মসজিদে দাঁড়িয়ে ও বসে নামাজ পড়তে এবং মাথা উঁচু, নিচু করতে দেখেছেন?

সাক্ষী : জ্বি।

ওমর : আপনি যান, আপনি তাকে চেনেন না।

তারপর তিনি যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনাকে চেনে এমন এক ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

ওমর (রা) ব্যক্তির বাহ্যিক বেশভূষা ও চেহারা-সুরত দেখে ধোঁকা খাননি। বরং তিনি ব্যক্তির সঠিক অবস্থা এবং চরিত্র ও দ্বীনদারী সম্পর্কে জানার সঠিক মাপকাঠি প্রয়োগ করেন।

মূলত, আবু হোরায়রা (রা) থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসের তাৎপর্যও তাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ لَايَنْظُرُ إِلى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا يَنْظُرُ اِلى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরত ও সম্পদের প্রতি তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।'

তাই নবী করিম (সা) বিয়ের জন্য আগ্রহীদেরকে দ্বীনদার স্ত্রী গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 'চারটি বিষয় বিচেনায় রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। সেগুলো হলো, সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী। তবে দ্বীনদার স্ত্রী অগ্রাধিকার যোগ্য। অন্যগুলো অগ্রাধিকার যোগ্য নয়। তোমার হাত ধূলায় মলিন হোক।' (বোখারী, মুসলিম)

এ হাদিসে মেয়ের দ্বীনদারীর অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

এ মর্মে আনাস (রা) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلاَّ دِنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا اِلاَّ اَنْ يَّغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন নারীর সম্মান ও গৌরব দেখে বিয়ে করে আল্লাহ যেন তার অসম্মান ও বেইজ্জত বৃদ্ধি করেন; যে ব্যক্তি স্ত্রীর সম্পদ দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ যেন তার অভাব ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি করেন; যে ব্যক্তি স্ত্রীর বংশ গৌরব দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ যেন তার নীচতা ও হীনতা বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি নিজ চোখ অবনত রাখা, লজ্জাস্থানের হিফাজত করা কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, সে বিয়েতে আল্লাহ বরকত দান করুন এবং তার জন্য তার স্ত্রীর মধ্যেও বরকত দিন।' (আওসাত-তাবারানী)

এতো গেল দ্বীনদার পাত্রীর কথা। কিন্তু ইসলাম দ্বীনদার পাত্রের ব্যাপারেও জোর দিয়েছে। যাতে করে সে দায়িত্বশীলতার সাথে পরিবারের দায়িত্ব পালন, দাম্পত্য অধিকার পূরণ, সন্তান প্রতিপালন, ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে সম্ভ্রমবোধ রক্ষা এবং

ঘরের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে পারে। কোন পাত্রী যদি চরিত্রহীন পাত্রের হাতে পড়ে কিংবা এমন স্বামীর কাছে পড়ে যে কোন দায়-দায়িত্ব পালন করবে না এবং ইজ্জত-সম্মান ও মান মর্যাদার মূল্য রক্ষা করবে না, তাহলে এটা তার জন্য বিরাট দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসবে। যে স্বামী পাপী ও যৌন উশৃঙ্খলায় বিশ্বাসী, যে নিজ স্ত্রীর জন্য অবাধ মেলামেশা ও পর্দাহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়, কিংবা মদ পান, অন্যদের সাথে নাচ-গান এবং দ্বীন বিরোধী কাজে উৎসাহ যোগায় সে স্বামী দ্বীনদার পাত্রীর জন্য বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেক মেয়ে নিজ দ্বীনদার পরিবারে খুবই নেককার ও পরহেজগার ছিল। কিন্তু পাপী স্বামীর সাহচর্যে গিয়ে বিকৃত হয়ে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার শিকার হয়ে পড়েছে। তখন তার কাছে দ্বীনদারীর কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকেনি। এ ঘরে যে সন্তান জন্ম নেবে তারাও সেরূপ অন্যায় ও গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়বে।

তাই পাত্র-পাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীর গুণ দেখা জরুরী।

(খ) বংশের মৌলিক গুণ ও মর্যাদা দেখে বিয়ে করা : বিয়ের ব্যাপারে পাত্র পাত্রীর জন্য ইসলাম যে নীতি নির্ধারণ করেছে, তা হলো জীবন সঙ্গীকে যোগ্যতা, সুনাম, নৈতিক চরিত্র, বংশ গৌরব ও মর্যাদা দেখে নির্বাচন করা। মানুষকে খনির সাথে তুলনা করা যায়। মূল্যবান জিনিসের খনি থেকে দামী জিনিস, আর নিকৃষ্ট খনি থেকে নিকৃষ্ট জিনিস পাওয়া যায়। স্বয়ং নবী করিম (সা)ও খনির ভালো মন্দ জিনিসের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا 'মানুষ ভালো ও মন্দের খনি। জাহেলিয়াতে যারা ভালো, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা ভালো হতে পারে, যদি তারা বুঝে।' (তায়ালেসী, আসকারী)

আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ قَالُوْا : وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِى الْمَنْبَتِ السُّوْءِ 'তোমরা অবশ্যই 'খাদারাউদ্ দিমান' থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, খাদরাউদ দিমান মানে কী? তিনি বলেন, খারাপ বংশের সুন্দরী নারী।' (যেমন আবর্জনার স্তূপের সুন্দর ঘাস) (দারু কুতনী, আসকারী, ইবনু আদী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوْا الْأَكْفَاءَ 'তোমরা নিজেদের বীর্যের জন্য উত্তম নারী নির্বাচন করো এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন নারী বিয়ে কর।' (ইবনে মাজাহ, দারু কুতনী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ اَشْبَاهَ اِخْوَانِهِنَّ وَاَخَوَاتِهِنَّ 'তোমরা নিজেদের বীর্যের জন্য যোগ্য নারী নির্বাচন কর। কেননা নারীরা নিজ ভাই ও বোনের সদৃশ্য সন্তান প্রসব করে।' (ইবনে আদী, ইবনে আসাকের)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, اُطْلُبُوْا مَوَاضِعَ الْاَكْفَاءِ لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا اَشْبَهُ اَخْوَالِهِ 'তোমরা নিজেদের বীর্যের জন্য উপযুক্ত নারী তালাশ কর। কেননা ব্যক্তি কোন কোন সময় তার মামাদের মতো হয়।' এ হাদিসে বংশের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।

ভালো বংশের নারী নির্বাচন সংক্রান্ত হাদিসগুলো পৃথকভাবে দুর্বল। তবে সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন সূত্র পরিক্রমার কারণে ভালো।

এ সকল হাদিস বিয়ের জন্য আগ্রহীদেরকে ভালো বংশ ও নেক পরিবেশে লালিত-পালিত সম্ভ্রান্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করে। কেননা, ভালো বংশের বীজ থেকে নির্গত চারার ফল-ফসলও ভালো হবে। তারা উন্নত মন-মানসিকতা, উত্তম চরিত্র-অভ্যাস এবং মহান গুণাবলির ধারক বাহক হবে।

বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বিষয়ে নবী করিম (সা) এর নির্দেশনা বিরাট বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বর্তমান যুগের শিক্ষা মতবাদে পরিণত হয়েছে। বংশগতি বিজ্ঞানের মতে, শিশু জন্মের পর থেকে মা-বাবার চারিত্রিক, দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক গুণাবলি অর্জন করে। তাই যদি মা-বাবা ভালো বংশ, মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে সন্তানও সেরূপ ভালো ও পূত-পবিত্র হবে। সন্তানের মধ্যে যদি ভালো বংশগতি এবং শিক্ষার ভালো উপাদান একত্রিত হয়, তাহলে সে দ্বীন ও চরিত্রের শীর্ষে, তাকওয়া ফজিলতের উদাহরণ এবং আদর্শ কাজ-কারবার ও চরিত্রের অধিকারী হবে। তাই বিয়ের জন্য আগ্রহীদেরকে উত্তম এবং ভালো বংশীয় জীবন সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচন করা দরকার।

(গ) অনাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করা : ইসলাম বংশ ও আত্মীয়তার বাইরের মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে বংশের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, বংশীয় রোগ-শোক ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পঙ্গুত্ব থেকে হেফাজত, পারিবারিক পরিচিতির সম্প্রসারণ এবং সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। শুধু তাই নয়, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য অনেক সামাজিক উপকার হয়। এ কারণেই নবী করিম (সা) আত্মীয়তা ও বংশের মধ্যে বিয়ে না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাতে করে দুর্বল ও পঙ্গু সন্তান এবং বংশগতির ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিস্বরূপ

পারিবারিক রোগ শোক প্রভাব বিস্তার না করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا 'তোমরা আত্মীয় বিয়ে করো না, কেননা এর ফলে সন্তান দুর্বলদেহী এবং কম বুদ্ধিমান হয়।'

তিনি আরও বলেন, اِغْتَرِبُوْا وَلَا تَضْوُوْا 'তোমরা অনাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করো এবং দুর্বল সন্তান জন্ম দিওনা।'

কেউ কেউ এটাকে ওমর বিন খাত্তাবের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সায়েব পরিবারকে লক্ষ্য করে বলেন, قَدْ اَضْوَيْتُمْ فَانْكِحُوْا النَّوَابِغَ 'তোমরা দুর্বল হয়ে গেছো, অনাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে শাদী কর।'

বংশ বিজ্ঞানের মতে, আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে শাদী হলে পরবর্তী বংশধর শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয় এবং কম বুদ্ধি-প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। অনেক সময় মন্দ ও নিকৃষ্ট আচার অভ্যাসের ধারক হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যের ১৪শ বছর আগে, মহানবী (সা) আমাদেরকে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে গেছেন। এটা তাঁর অন্য মোজেযার একটি।

(ঘ) কুমারী মেয়েকে অগ্রাধিকার দান করা : অনেক উপকারিতা ও বিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ইসলাম বিয়ের জন্য কুমারী মেয়েকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য উৎসাহিত করেছে।

উপকারিতা : সুখী পারিবারিক জীবনের সূচনা করা এবং সমস্যা ও বিপদ-আপদ থেকে শান্তির নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করা। দাম্পত্য ভালোবাসাকে মজবুত করা এবং প্রথম যে মানুষটিকে জীবন সঙ্গিনী করা হচ্ছে, সে যেন স্বামীর স্নেহ ভালোবাসার আধার হতে পারে। অকুমারী স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা উজাড় নাও করে দিতে পারে। কেননা তার আগের দাম্পত্য জীবনের কষ্ট-ক্লেশ বা দুঃখ-বেদনা কিংবা তিক্ত অভিজ্ঞতা সে পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

একথাটিই উম্মুল মোমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) নবী করিম (সা)কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করেন, যে উপত্যকার গাছ-ঘাস খাওয়া হয়েছে এবং যেটির গাছ-ঘাস খাওয়া হয়নি, আপনি এর মধ্যে কোনটিতে উট চরাবেন?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে উপত্যকার গাছ-ঘাস খাওয়া হয়নি সে উপত্যকায়। আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, 'আমি-ই সেটি।'

তিনি এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নবী (সা) এর অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই কুমারী হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ।

কুমারী মেয়ে বিয়ের উপকারিতার ব্যাপারে নবী করিম (সা) আরও বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَقَلُّ خِبًّا وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ 'তোমরা কুমারী মেয়ে বিয়ে কর। কেননা তারা মিষ্টিভাষী, অধিক সন্তান ধারণকারিণী, কম ধোঁকাপ্রবণ ও অল্পে তুষ্ট।' (ইবনু মাজাহ, বায়হাকী)

নবী করিম (সা) জাবের (রা)কে ইঙ্গিত দেন যে, কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে ভালোবাসা সৃষ্টি এবং পবিত্রতা ও সাধুতা নিশ্চিত হয়। 'জাতুর রেকা' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে জাবেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে জাবের, তুমি কি বিয়ে করেছো? জাবের জানান, জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আবারও প্রশ্ন করেন, স্ত্রী কী কুমারী না অকুমারী? তিনি বলেন, অকুমারী। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন, যাতে করে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে হাস্য-রস করতো? জাবের বলেন, হে আল্লাহর রাসূল 'আমার আব্বা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং আমার সাতটি বোন রেখে যান। তাই আমি এমন মহিলা বিয়ে করেছি, যে তাদেরকে দেখাশোনা করবে এবং তাদের যত্ন নেবে।' নবী করিম (সা) বলেন, 'তুমি ঠিক কাজই করেছো।' (বোখারী, মুসলিম)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ক্ষেত্র বিশেষে অকুমারী মেয়ে কুমারী মেয়ে অপেক্ষা উত্তম। বর্ণিত হাদিসে ইয়াতীম সন্তানের দেখাশোনা, যত্ন এবং সেবা করার দরকারকে ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা তা আল্লাহর এই নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, গুনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না।' (সূরা আল মায়েদা-২)

(৬) সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারী বিয়ে করা : ইসলাম স্ত্রী নির্বাচনের জন্য সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করে। স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা দুইভাবে বোঝা যাবে :

১. গর্ভরোধকারী শারীরিক রোগ-শোক মুক্ত হওয়া।

২. স্ত্রীর মা ও বিবাহিত বোনদেরকে দেখা যে তারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম কিনা। সাধারণত স্ত্রীও সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, স্ত্রী ভালো স্বাস্থ্যবতী হলে এবং নিরোগ ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী হলে সন্তান জন্মদানে সক্ষম হয়। যার মধ্যে সুস্থতা বিরাজ করে সে স্ত্রী উত্তমভাবে ঘরের কাজ, সন্তান প্রতিপালন এবং স্বামীর অধিকার পূরণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নারী বিয়ে করে এবং অধিক সন্তান-সন্ততি লাভ করতে চায়, তার ওপর পরিবারের ব্যয়ভার বহন

এবং শিক্ষা ও লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাকে আল্লাহর কাছে নিজ দায়িত্বে কম বেশি কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، حَفِظَ امْ ضَيَّعَ، حَتَّى يُسْئَالَ الرَّجُلُ عَنْ اهْلِ بَيْتِه 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন যে, তিনি তা হেফাজত করেছেন, না নষ্ট করেছেন। এমনকি পরিবার প্রধানকেও তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' (ইবনে হিব্বান)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যিনি বিয়ে করতে চান তিনি যেন অধিক সন্তান জন্মদানকারী বংশে বিয়ে করেন। এর ফলে উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যা বাড়বে, যাদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করছি, কিন্তু সে সন্তান জন্মদানে সক্ষম নয়। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিষেধ করেন। তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে অনুরূপ প্রশ্ন করায় তিনি তাকেও নিষেধ করেন। তৃতীয় আরেক ব্যক্তিও অনুরূপ প্রশ্ন করায় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, تَزَوَّجُوْا الولوْدَ الوَدُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ তোমরা সন্তান জন্মদান ও ভালোবাসতে সক্ষম নারী বিয়ে কর। আমি অন্যান্য জাতিসমূহের ওপর তোমাদের আধিক্যের দ্বারা গর্ব করবো।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম)

এই হচ্ছে ইসলামের বিয়ের নীতিমালা যা সরাসরি সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। স্বামী স্ত্রীর পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে সন্তানের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।

নবজাতক সন্তানের প্রতি করণীয়

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দিতে হবে। তার মুখের তালুতে মিষ্টি লাগিয়ে মিষ্টিমুখ করানো উত্তম। মাথার চুল মুণ্ডন করে চুলের সমপরিমাণ রূপা বা মূল্য দান করতে হবে। সন্তানের উত্তম নাম রাখতে হবে। ছেলে হলে দু'টি এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল জবেহ করতে হবে। এটি সুন্নাত।

সন্তানের খাতনা করাতে হবে। এটি সুন্নাত ও স্বাস্থ্যসম্মত। খতনা না করালে বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তানের প্রতি মাতা পিতার মানসিক অনুভূতি

১. মা-বাবা সন্তানের ভালোবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত

মাতা পিতার মনে সন্তানের ভালোবাসা গভীর। আর সে জন্যই তারা সন্তানকে রক্ষা করে, দয়া করে এবং তার সকল বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। এটা না থাকলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতো। মা- বাবা সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং তাদের সার্বক্ষণিক কল্যাণে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। কোরআন অত্যন্ত সুন্দর ও উত্তমভাবে সন্তানের এ সকল অবস্থা বর্ণনা করেছে। কোরআন সন্তানকে একবার জীবনের সৌন্দর্য আখ্যা দেয়। আল্লাহ বলেন, اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'সন্তান ও সম্পদ দুনিয়ার জিন্দেগীর সৌন্দর্য।' (সূরা কাহাফ-৪৬)

আরেকবার সন্তানকে মহান নেয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করে যা নেয়ামত দানকারী আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন, وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا 'আর আমি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক থেকে এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।' (সূরা বনি ইসরাঈল-৭)

আবার কোরআন নেক সন্তানকে নয়নাভিরাম আখ্যায়িত করে, আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا 'আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা বানাও।' (সূরা ফোরকান-৭৪)

এ সকল আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সন্তান মা বাবার কলিজার টুকরা ও ফল-ফসল। সন্তানকে ভালোবাসা আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টিকৌশল। আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ 'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম-৩০)

২. সন্তানের প্রতি বান্দার দয়া-মায়া আল্লাহর দান

মা-বাবার অন্তরের প্রকোষ্ঠে সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার মহান অনুভূতি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভালো করে গঠন করার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এর

বিপরীত, মাতা পিতার অন্তর কঠিন এবং রূঢ় হলে সন্তানের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং তারা বিকৃত মানসিকতা ও ক্ষতিকর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী হবে।

নবী করিম (সা) দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমর বিন শোয়াইব নিজ পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا 'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার জানে না।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এক ব্যক্তি নিজ শিশুকে নিয়ে আসে এবং জড়িয়ে ধরে। নবী করিম (সা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে স্নেহ কর? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ তোমার চাইতে আরও বেশি দয়াবান। তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা আরও বেশি দয়াবান।' (আল আদাবুল মোফরাদ-বোখারী)

শুধু তাই নয়, মহানবী (সা) যখন কাউকে দেখতেন যে সে নিজ সন্তানদেরকে স্নেহ করে না, তখন তাকে তিরস্কার করতেন এবং এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যাতে ঘর, পরিবার ও সন্তানের মঙ্গল হয়।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক গ্রামবাসী বেদুঈন নবী (সা) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি নিজ সন্তানদেরকে চুমু খান? আমরা কিন্তু তাদেরকে চুমু খাইনা। তার উত্তরে নবী (সা) বলেন, اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ 'আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নেন তাহলে আমি কি এর জিম্মাদার হতে পারি?' অর্থাৎ আমার করার কিছুই নেই।' (আল আদাবুল মোফরাদ-বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) হাসান বিন আলীকে চুমু খান। তখন তার কাছে আকরা' বিন হাবেস তামীমি বসা ছিলেন। আকরা' বলেন, আমার দশ জন সন্তান আছে যাদেরকে আমি কখনও চুমু খাইনি। নবী (সা) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ 'যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।' (বোখারী)

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা) এর কাছে আসে। আয়েশা (রা) তাকে তিনটি খেজুর দান করেন। মহিলাটি নিজের জন্য একটি খেজুর রেখে দু'সন্তানকে দু'টো খেজুর দেয়। সন্তান দু'টো নিজেদের ভাগের

খেজুর খেয়ে মায়ের দিকে তাকায়। মা নিজের খেজুরটি দু'ভাগ করে দু'জনকে দিয়ে দেন। নবী করিম (সা) আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে ঘটনাটি বলেন। নবী (সা) বলেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আল্লাহ্ সন্তানের কারণে মহিলাটির উপর দয়া করেছেন।' (আদব আল মোফরাদ-বোখারী)

নবী (সা) এক মৃত্যু আসন্ন শিশুকে দেখে ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতার কারণে দুঃখ বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে দয়া ও মেহেরবানীর শিক্ষা দেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী কন্যা তাঁর পিতার কাছে খবর পাঠান যে, তাঁর ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তিনি যেন আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে সালাম পাঠিয়ে বলেন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে হায়াত দান করেন। আল্লাহর কাছে সকল জিনিসের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত। তাই ধৈর্য ধরো ও সওয়াব লাভের নিয়ত কর। নবী কন্যা পুনরায় তাঁর ঘরে নবী (সা)কে আসার জন্য কসম দিয়ে পাঠান। তিনি রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিলেন সাদ বিন ওবাদা, মোআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবেত প্রমূখ। নবী কন্যা ছেলেটিকে নবী (সা) এর হাতে তুলে দেন। তিনি তাকে কোলে নেন। তখন তার দেহ ছটফট করছিল। তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হলো। সা'দ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি? নবী (সা) বলেন, এটা সেই রহম ও দয়া যা আল্লাহ বান্দার অন্তরে দান করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ যে বান্দার অন্তরে ইচ্ছা এই দয়া সৃষ্টি করেন। আল্লাহর নিজ বান্দার মধ্যে যারা দয়ালু, তাদের উপর দয়া ও রহম করেন।'

৩. মেয়ে সন্তানকে ঘৃণা করা নিকৃষ্ট জাহেলিয়াত

ইসলাম সাম্য ও ব্যাপক ন্যায় বিচারের আহ্বান জানায়। সে জন্য তা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কিংবা পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করে না। আল্লাহ্ বলেন, إِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى 'তোমরা ইনসাফ কর। কেননা তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।' (সূরা মায়েদা-৮)

নোমান বিন বশির থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ، إِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ، إِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর, তোমরা তোমাদের

সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর।' (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, আহমদ)

এই নির্দেশ যুগে যুগে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ইনসাফ, সমান ভালোবাসা, স্নেহ-দয়ার নীতি বাস্তবায়ন করেছে এবং এর ফলে উভয় লিঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

যদি কোন সমাজে ছেলে মেয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর পক্ষে আল্লাহর কোন নির্দেশ নেই। বরং সেটা হচ্ছে জাহেলিয়াত এবং সামাজিক কুসংস্কার।

আল্লাহ বলেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং রাগে ক্ষুব্ধ হয়। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সহ্য করে কি তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট।' (সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

এটা মূলত ঈমানী দুর্বলতা, যার ফলে তারা আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আল্লাহ বলেন, لِلّهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْض يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانً وَّإِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ 'আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান ও যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানান। তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী ও শক্তিশালী।' (সূরা শূরা : ৪৯-৫০)

রাসূলুল্লাহ (সা) জাহেলিয়াতের চিন্তাপুষ্ট দুর্বল আত্মার অধিকারীদের মন থেকে কন্যা সন্তানের প্রতি কুসংস্কার দূর করার জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের লালন-পালন ও উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উৎসাহিত করে এগুলোকে জান্নাতে প্রবেশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ْنَ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ – وَضَمَّ اصَابِعَهُ 'যে ব্যক্তি দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করে, সে এবং আমি হাশরের দিন এভাবে এক সাথে উঠবো। একথা বলে তিনি নিজ আঙ্গুলগুলোকে একত্রে মিলান।' (মুসলিম)

ওকবা বিন আমের আল জোহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

(সা) কে বলতে শুনেছি, 'যার তিনটি মেয়ে সন্তান আছে এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে তাদেরকে নিজ সম্পদ থেকে পান করায় ও কাপড় পরিধান করায়, তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার উসিলা হবে।' (আহমদ)

৪. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণের ফজীলত

কোন মুসলিম যখন ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও ইয়াকীনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং তাকদীর ও ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করে, তখন তার চোখে বিভিন্ন ঘটনা ছোট মনে হবে। সে বিপদ-মুসীবত তুচ্ছ জ্ঞান করবে, সকল দুঃখ-কষ্টে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে, বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যধারণের জন্য স্বস্তিবোধ করবে, তাকদীরে সন্তোষ লাভ করবে এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি অধিক বিনয়ী হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করিম (সা) সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন বান্দার সন্তান মারা গেলে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রূহ হরণ করেছো? তারা জবাবে বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ফলকে কবজ করেছো? ফেরেশতারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা জবাবে বলেন, সে আপনার হামদ ও প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ..... বলেছে। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী কর এবং এর নাম রাখ 'বায়তুল হামদ।' (তিরমিযী, ইবনু হিব্বান)

হাদিস অনুযায়ী এ সবরের বেশ কিছু সুফল আছে। সেগুলো হলো, ১. বেহেশতে যাবার পথ খোলা হয়। ২. দোজখ থেকে আড়াল হবে।

এ মর্মে নারীদের উদ্দেশ্যে একটি হাদিস আছে। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন নারীর তিনটি সন্তান মারা গেলে তারা তার জন্য দোজখ থেকে বাঁচার উসিলা হবে। এক মহিলা প্রশ্ন করেন, দুই সন্তান মারা গেলে? তিনি বলেন, দুই সন্তান মারা গেলেও। (বোখারী ও মুসলিম)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তির তিন সন্তান মারা যায় এবং সে এর জন্য সওয়াবের নিয়ত করে সে জান্নাতে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লার রাসূল, যদি দু'জন মারা যায়? তিনি উত্তরে বলেন, দু'জন মারা গেলেও জান্নাতে

প্রবেশ করবে।' একজন বর্ণনাকারী জাবেরকে বলেন, আমার মনে হয় যদি আপনারা একজনের মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে তিনি একজনের ব্যাপারেও ওই সুসংবাদ দিতেন! জাবের বলেন, আমার ধারণাও তাই।' (আহমদ, ইবনে হিব্বান)

সবরের আরও সুফল হলো, ছোট শিশু মারা গেলে সে কিয়ামতের দিন নিজ মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে।

হাবীবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় নবী করীম (সা) তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। তিনি বলেন, 'যে দু'জন মুসলিম মা-বাবার তিনজন নাবালেগ সন্তান মারা যায় সে সন্তানগুলোকে বেহেশতের দরজায় দাঁড় করানো হবে। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য বলা হলে তারা বলবে, আমাদের মা-বাবা প্রবেশের আগ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের মা-বাবা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ কর।' (তাবারানী ভালো সনদসহকারে হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

আবু হাসসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'টো ছেলে মারা গেছে। আমি আবু হোরায়রার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এমন কোন হাদিস শুনেছেন যা বললে আমরা খুশী হবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। মুসলমানদের ছোট শিশুরা জান্নাতের অবিচ্ছিন্ন অংশ- যারা নিজেদের পিতা কিংবা পিতা-মাতাকে ধরে রাখবে, যেমন করে কাপড়ের আঁচল কিংবা হাত ধরে থাকে। যেমন তোমার কাপড়ের এক পাশ ধরে আছে। তারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে এবং ওকে জান্নাতে প্রবেশ করান। (মুসলিম)

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষায় মহিলা সাহাবীরা ঈমানের বীরত্বপূর্ণ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে উম্মে সোলাইমের উদাহরণ অন্যতম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহার এক ছেলে অসুস্থ ছিলো। আবু তালহা বাড়ি থেকে সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা মারা গেলো। আবু তালহা সফর থেকে ফিরে এসে ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ছেলের মা উম্মে সোলাইম বলেন, সে শান্তিতেই আছে। তিনি আবু তালহার সামনে নৈশভোজ পেশ করেন। তিনি রাতের খাবার খান। উম্মে সোলাইম আগের অপেক্ষা অধিকতর সাজ-সজ্জা করেন। আবু তালহা তার সাথে সহবাস করেন। উম্মে সোলাইম দেখলেন যে, আবু তালহা এখন পরিতৃপ্ত। তিনি প্রশ্ন করেন, হে আবু তালহা, কোন সম্প্রদায়

যদি কাউকে কোন কিছু ধার দিয়ে তা ফেরত চায়, তাহলে তাদেরকে কি নিষেধ করা যাবে? তিনি জবাব দেন, না। তখন তিনি বলেন, আপনার ছেলে মারা গেছে। তাই আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে সওয়াব লাভের নিয়ত করুন। আবু তালহা রাগ করে বললেন, আমি নাপাক হওয়ার পর তুমি এখন আমাকে আমার পুত্র বিয়োগের খবর দিচ্ছো? তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করেন।

নবী (সা) উম্মে সোলাইমের কৃত আচরণ সমর্থন করে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাত্রি যাপনে বরকত দিন।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন।' তারপর তাদের একটি ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করে। নবী (সা) তার নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ'। এক আনসারী সাহাবী বলেন, 'আমি পরে আব্দুল্লাহর ঘরে জন্মপ্রাপ্ত নয় জন সন্তানকে কোরআনের হাফেজ হিসেবে দেখতে পেয়েছি। এটি ছিলো তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দো'আর বরকত।' (বোখারী, মুসলিম)

৫. সন্তানের ভালোবাসার উপর ইসলামী স্বার্থের অগ্রাধিকার

মা-বাবার মনে বিদ্যমান সন্তানের উল্লেখিত স্নেহ ভালোবাসা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম বা জেহাদ এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের উপর প্রাধান্য লাভ না করে। কেননা, ইসলামের স্বার্থ সকল কিছুর উর্ধ্বে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা মোমেনের জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য। বিভ্রান্ত মানবতার পথ প্রদর্শন বা হেদায়াত একজন মুসলিমের চরম ও পরম কাজ।

ইসলামের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী উত্তরসূরীরা ইসলামকে এভাবেই বুঝেছেন। তারা জেহাদ ছাড়া কোন কার্যক্রম, দাওয়াত ছাড়া কোন তাবলীগ এবং ইসলাম ছাড়া কোন লক্ষ্য বুঝতেন না। এজন্য তারা নিজেদের সকল মূল্যবান সম্পদ উৎসর্গ করে শাহাদতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

প্রখ্যাত সাহাবী ওবাদাহ বিন সামেত (রা) মিসরের শাসক মুকাওকাসকে বিশাল রোম বাহিনী সমবেত করার হুমকি এবং অর্থ-কড়ির লোভ দেখানোর বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী জবাব দেন। তা হলো : হে শাসক, আপনি ও আপনার সাথীদের বিভ্রান্তিতে থাকা উচিৎ নয়। আপনি বিশাল রোম বাহিনী জড়ো করার যে ভয় দেখাচ্ছেন, আমরা যদিও তাদের মতো শক্তিশালী নই। আপনার কথা ঠিক হলে জেনে রাখবেন, আমরা যুদ্ধে দু'টোর মধ্যে যে কোন একটি কল্যাণ লাভ করবো।

আমরা আপনাদের উপর বিজয়ী হলে দুনিয়ার বিরাট গনিমতের মাল লাভ করবো। আর আপনারা বিজয়ী হলে, আমরা পরকালের গনিমত লাভ করে ধন্য হবো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন মাজীদে বলেন, كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'এমন বহু ছোট দল আছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বহু বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা-২৪৯)

আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে শাহাদাৎ কামনা করে না কিংবা নিজ দেশ ও ভূখণ্ডে অথবা নিজ পরিবার ও সন্তানের কাছে ফিরে যেতে চায়। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ফেলে আসা পরিবার ও সন্তানের দুশ্চিন্তায় পেরেশান। বরং প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে নিজ নিজ পরিবার ও সন্তানকে সোপর্দ করে এসেছে। আমাদের একমাত্র কামনা-বাসনা হলো, জেহাদ করা এবং আল্লাহর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করা। আর আপনি আমাদের প্রতি অর্থনৈতিক দৈন্যদশার ইঙ্গিত করে বলেছেন, আমরা খুব কষ্টে আছি। জেনে রাখুন আমরা খুব প্রশস্ততার মধ্যে আছি। গোটা দুনিয়া আমাদের কব্জায় আসলেও আমরা তা থেকে নিজেদের বর্তমান অবস্থার চাইতে বেশী কিছু পেতে চাই না।'

ওবাদা বিন সামেতের এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের পূর্বসূরীদের অগণিত ভূমিকার একটিমাত্র। তাঁরা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ঘর-বাড়ি ও আপনজনদের উপর জেহাদ ও দাওয়াতে দ্বীনের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের কাছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ، فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ 'হে নবী, আপনি তাদেরকে বলুন : তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বন্ধের ভয় এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান– আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর আযাবের হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক তথা গুনাহগার সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।' (সূরা তওবা-২৪)

এই আয়াতে দুনিয়াবী আটটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা কমিয়ে তিনটি বিষয়ে ভালোবাসা বৃদ্ধির নির্দেশ রয়েছে।

এরকম ত্যাগ-তিতিক্ষা আমরা সাম্প্রতিককালেও দেখতে পেয়েছি। মিসরের ইমাম হাসানুল বান্না (র) প্রত্যেক ঈদে বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী কর্মীদেরকে দেখার জন্য সফরে যেতেন। একবার তিনি সফরে রওয়ানা হলেন। তখন তাঁর ছেলে সাইফুল ইসলাম এত বেশি অসুস্থ যে মৃতপ্রায়। তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি এই ঈদে আমাদের সাথে থাকলে আমরা স্বস্তিবোধ করতাম এবং অসুস্থ ছেলের খোঁজ নিতে পারতেন। তিনি সফরের ব্যাগ হাতে করে স্ত্রীকে উত্তর দেন, আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তাঁর দয়া-কৃপা। আর যদি তিনি তার ভাগ্যে মৃত্যু লিখে থাকেন, তাহলে তার দাদা কবরের পথ উত্তমভাবে চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতটি পড়তে পড়তে বেরিয়ে যান।

আল্লাহু আকবর! আল্লাহর দ্বীনের বাণীকে বুলন্দ করার জন্য এটা কত বড় ত্যাগ! আল্লাহর দাঈদের এরকম ত্যাগই কাম্য। তাঁদের এ জাতীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা উত্তরসূরীদের জন্য জীবন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে। সকল মাতা-পিতার মনোভাব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এরকমই হওয়া দরকার।

যারা ঈমানকে পরিপূর্ণ, অন্তরে এর মজা এবং আবেগের মধ্যে এর স্বাদ উপলব্ধি করতে চায়, তাদের জন্য নবী করিম (সা) এর এ হাদিসটি উল্লেখযোগ্য :

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 'যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যায় সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পায়। ১. সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার কাছে প্রিয় হবে। ২. কাউকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসবে। ৩. কুফরীতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।' (বোখারী)

এ মর্মে আরেকটি হাদিস আছে। ওমার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সকল কিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। নবী (সা) বলেন, তোমাদের কেউ সেই পর্যন্ত সত্যিকার মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার জান অপেক্ষা অধিক প্রিয়

হবো। তখন ওমার (রা) বলেন, আপনার উপর কোরআন নাযিলকারী আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। নবী (সা) বলেন, হে ওমার, এখন ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ এখন তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ 'আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি মন অনুগত হওয়া ব্যতিরেকে তোমাদের কেউ মোমেন হতে পারবে না।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার সম্পদ, সন্তান ও অন্যান্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।' (বোখারী)

৬. শিক্ষার উদ্দেশ্যে সন্তানকে শাস্তিদান ও বয়কট করা

সন্তান ছোট হলে এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের পর্যায়ে অবস্থান করলে, মাতা-পিতা ও শিক্ষকের উচিৎ তার উপর সংশোধনের সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং তার চরিত্র ও আচরণকে বিশুদ্ধ করার সকল প্রক্রিয়া ব্যবহার করা। যেন সে পূর্ণ ইসলামী চরিত্র ও সামাজিক আদব-শিষ্টাচারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

সন্তানের সংশোধন ও শিক্ষার বিশেষ কিছু পদ্ধতি আছে।

সেগুলো হলো, যদি তাকে স্নেহ ও উপদেশের মাধ্যমে সংশাধন করা সম্ভব হয় তাহলে বয়কটের পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। যদি বয়কট কিংবা শাসনের পদ্ধতি সফল হয়, তাহলে মারের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। যদি উপদেশ, স্নেহ ও বয়কটসহ সকল সংশোধন পদ্ধতি ব্যর্থ হয়, তাহলে হালকা মার দেয়া যাবে। হতে পারে এই সর্বশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

আমরা এ সকল পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের গৃহীত নীতি উল্লেখ করবো।

আদর স্নেহের মাধ্যমে সন্তানক শিক্ষা দেয়া

ওমার বিন আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সেবা-যত্নের অধীন লালিত-পালিত এক বালক ছিলাম। খাবারের পেয়ালায় আমার হাত এদিক ওদিক যেতো। ফলে তিনি বলেন, 'হে বালক, বিস্‌মিল্লাহ

বলো, তোমার ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও। (বোখারী, মুসলিম)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করেন। তাঁর ডানে ছিলো এক বালক এবং বাঁয়ে ছিলো বয়োবৃদ্ধ লোকেরা। রাসূলুল্লাহ (সা) বালকটাকে বললেন, 'হে বালক, তুমি কি আমাকে অনুমতি দাও যে আমি অবশিষ্ট পানীয় ওই সমস্ত লোকদেরকে দেই? বালকটা বললো, আল্লাহর কসম, আপনার যে জিনিস আমার প্রাপ্য তার ব্যাপারে অন্যকে অগ্রাধিকার দেবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) পান পাত্রটা বালকের হাতে দিলেন। (বোখারী, মুসলিম) ওই বালকটি ছিলো আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)।

সন্তানকে বয়কট করার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তা শিকারকে হত্যা কিংবা দুশমনকে ঘায়েল করে না, তবে চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়। (বোখারী, মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনে মোগাফফালের এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক আত্মীয় কংকর নিক্ষেপ করে। তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দ্বারা শিকার করা যায় না। তারপর বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) এর হাদিস বলছি, এটা না করার জন্য। আর তুমি তা পুনরায় করলে? আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না।

সন্তানকে মারার বিষয়ে হাদিস

আমর বিন শোয়া'ইব নিজ পিতা ও দাদার সূত্র পরম্পরায় বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বলেন, مُرُوْا اوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ ابْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابْنَاءُ عَشْرَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِ 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজ পড়ার আদেশ দাও। ১০ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে মার এবং শয়নগাহ আলাদা করে দাও।' (আবু দাউদ, হাকেম)

সন্তান ছোট বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের সাথে এই আচরণ করতে হবে। কিন্তু, বালেগ বা আরও বড় হলে তাদের সংশোধন প্রক্রিয়া ভিন্ন হবে। যদি তাদেরকে

ওয়াজ-নসিহত এবং উপদেশ দ্বারা সংশোধন না করা যায়, তাহলে তাদেরকে গুনাহ্ ও অপরাধের জন্য স্থায়ীভাবে বয়কট করতে হবে।

এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ : الْمُوَالَاةُ فِى اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِى اللهِ، وَالْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ 'ঈমানের মজবুত বন্ধন হলো– আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।' (তাবারানী)

বোখারী শরীফে 'গুনাহগারের প্রতি বৈধ বয়কট' অধ্যায়ে বর্ণিত। তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়া কা'ব বলেন, নবী করিম (সা) আমাদের সাথে কথা না বলার জন্য লোকদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এভাবে ৫০ রাত কেটে গেল। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসলো। তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। কোন লোকই তাদের সাথে কথা বলে না। সালাম দেয় না ও উঠা বসা করে না। পরে আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করে কোরআনের আয়াত নাযিল করেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে শিক্ষা ও তিরস্কারের জন্য এক মাস বয়কট করেছিলেন।

আল্লামা সুয়ুতী বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমার নিজের এক সন্তানকে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বয়কট করেছিলেন। ছেলেটা তাঁর বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটা হাদিস আমল করেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বামীদেরকে নিষেধ করেছিলেন তারা যেন নিজ স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা না দেয়।

সন্তান যদি ঈমান ও ইসলামের উপর টিকে থেকে গুনাহর কাজ করে, তাহলে এ প্রক্রিয়া তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর যদি কুফরী করে এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে বয়কট করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ 'যারা আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।' (সূরা মোজাদালা-২২)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নূহ (আ) এর জবানীতে বলেন, 'হে আমার রব, আমার পুত্রতো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে

সত্য, আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ, নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়, নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তাই আমার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' (সূরা হূদ : ৪৫-৪৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইবরাহীম (আ) এর জবানীতে বলেন, 'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করবো। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।' (সূরা বাকারা-১২৪)

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর পিতার প্রতি ইবরাহীমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেন, 'আর ইবরাহীম কর্তৃক নিজ পিতার মাগফেরাত কামনা ছিলো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তাঁর সাথে করেছিলেন। তারপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।' (সূরা তওবা-১১৪)

এ সকল আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, কুফরীর ওপর অটল থাকলে সন্তান ও আত্মীয়তাকে বয়কট করা হয়। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রক্ত ও বংশের সম্পর্ক অপেক্ষা আরও বেশী শক্তিশালী।

ইসলামের নীতি হলো–

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'মোমেনরা পরস্পর ভাই।' (সূরা হুজুরাত-১০)

(২) إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেজগার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।' (আল হুজুরাত-১৩)

মূলকথা, সন্তানের শিক্ষাদানকারী মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকদের উচিৎ সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

তৃতীয় অধ্যায়

সন্তান গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব

১. শিক্ষা কি?

মানুষ গড়ার সর্বোত্তম উপায় হলো শিক্ষা। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধ্যাপক হোয়াইট হেড শিক্ষার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। 'Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge.' 'জ্ঞানের ব্যবহারের কৌশল অর্জনের নাম শিক্ষা।'

আমেরিকার শিক্ষাবিদ John Dewe-এর মতে, শিক্ষা হলো- প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়া।'

Dr.Jhon Park বলেন, শিক্ষা বলতে বোঝায় নির্দেশনা ও অধ্যয়ন। এর মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলা-কৌশল আয়ত্ত করা হয়।

সক্রেটিসের মতে, 'নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Herman H.Horne বলেছেন, শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। যেমনটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছা শক্তির পরিবেশে বিরাজমান।

শিক্ষার এই সংজ্ঞায় আমরা ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ধারণা পাই।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'আসলে মানুষের 'খুদী' বা আত্মার উন্নয়নই প্রকৃত শিক্ষা।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর The Religious Man বইতে লিখেছেন, 'মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Education is a process of teaching, training and learning to improve knowledge and develop skills. 'জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা হলো, শিক্ষা দান, প্রশিক্ষণ ও জানার প্রক্রিয়া।'

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেছেন, "যে মানুষগুলো জন্ম নিলো,তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা অপরিপক্ক ও অপরিণত অবস্থায় রয়েছে,

সেগুলোকে সর্বোত্তম পন্থায় লালন-পালন ও পরিপোষণ করে, যে সমাজে তারা জন্মগ্রহণ করেছে, সে সমাজের উপযোগী করে সার্থক বানানো এবং ঐ সমাজের বিকাশ ও উন্নয়ন সহায়কে পরিণত করার নামই শিক্ষা।"

২. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার লক্ষ্যে শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও মানব সভ্যতার বিকাশের জন্যই শিক্ষা দান পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। মহানবী (সা) এর উপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয়, তাও ছিলো পড়া ও শেখা। আল্লাহ বলেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক-১)

রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞান শিক্ষার উপর খুব জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সম্মানে ফেরেশতারা রাস্তায় নিজ ডানা বিছিয়ে দেয়।'

অন্য আরেক হাদিসে এসেছে, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি পদার্থ, সাগরের মাছ এবং স্থলভাগের সকল প্রাণী ও পশু-পাখি দোয়া করে।

আল্লাহ বলেন, هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ 'যারা জানে তারা কি যারা জানে না তাদের সমান?' (সূরা যুমার-৯)

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চীনে একটি প্রবাদ আছে : 'তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে শস্যদানা রোপন কর, যদি ১০ বছরের পরিকল্পনা কর তাহলে গাছ রোপন কর। আর যদি শত সহস্র বছরের পরিকল্পনা কর তাহলে মানুষ রোপন কর। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ রোপন করা হয়, যা শত-সহস্র বছরের সভ্যতার সূচনা করে।'

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতি সত্তার কাঠামো। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণ হলো শিক্ষা। জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য।

নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন, 'আমাকে আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি উপহার দেবো।'

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য

অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুব Concept of Islamic Education প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো মানসিক উৎকর্ষ সাধন।

মহাকবি মিল্টন বলেন, Education is the harmonious development of body, soul and mind. অর্থাৎ 'শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন।'

তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি চেতনা এবং সঠিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় মতের সৃষ্টি করা।'

দার্শনিক প্লেটোর মতে 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।'

এরিস্টেটল বলেছেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো, ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।

শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ এবং তার নৈতিক চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত প্রকাশ।'

স্যার পার্সীনান বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা।'

আল্লামা ইকবালের মতে, 'পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরী করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।'

ইমাম গাজালীর মতে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও মানসিক বিকাশ।'

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নৈতিক আচরণ, আত্মপরিচয় এবং দায়িত্বানুভূতির বিকাশে সাহায্য করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৪. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

মুসলিম দেশগুলোর অনেকেই এখন পর্যন্ত স্বাধীন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। অধিকাংশ দেশ ছিলো উপনিবেশবাদীদের করতলে। উপনিবেশবাদীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে গেলেও আদর্শিক গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে গেছে। ফলে, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের আদর্শ ও প্রয়োজন পূরণে বিন্দুমাত্র অবদান রাখতে পারেনি। বরং তারা অভিন্ন শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় দুনিয়াদার লোক আর মাদরাসা শিক্ষায় দ্বীনদার লোক তৈরীর হীন ষড়যন্ত্র করে গেছে। পরে স্কুলে ইসলামিয়াত বিষয়টি যোগ করে ধর্মীয় শিক্ষার নামে আংশিক ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা আংশিক ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় না। ফলে লোকেরা ইসলামী

শিক্ষা ব্যবস্থার সুফলও লাভ করতে পারে না। অথচ আল্লামা ইকবাল বলেছেন, স্রষ্টা সম্পর্কে জানা আমার নৈতিক ও জন্মগত অধিকার। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় সে অধিকার পূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হওয়ায় আমাদের শিশুরা পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও বস্তুবাদী চিন্তার আলোকে গড়ে ওঠছে। অথচ সেটিকে আবার আধুনিক শিক্ষাও বলা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিক্ষক ড. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী বলেন, 'তথাকথিত মানবিক বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন দেশে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা মানবিক বিষয় নয়, বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়বস্তু ও উপকরণ; যেগুলোর সাথে মুসলমানদের চিন্তাকর্ম, পরিবেশের সঙ্গতি ও সম্পর্ক নেই।

পক্ষান্তরে, সৌদি আরবে স্কুল পর্যায়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সাধারণ বিষয়গুলোর সাথে সাথে কোরআন, হাদিস, ফেকাহ, আকীদা ও তাওহীদ–এ পাঁচটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

আর, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যারা লেখা পড়া করে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়টি পড়তে হয়। ফলে সৌদি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন ছাত্রের কাছে দ্বীন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা পরিষ্কার। ইসলামী বিষয়ে যারা পড়ে, তারা ইসলাম সম্পর্কে একজন ইসলামী শিক্ষাবিদ হিসেবে তৈরী হন। নিঃসন্দেহে এটি মুসলিম দেশ হিসেবে এক বিরাট পুঁজি। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ছেলে মেয়ে এক সাথে লেখা-পড়া করে। এটা পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু ধারা। সামাজিক বিপর্যয়ের বিরাট কারণ। পক্ষান্তরে, সৌদি আরবে সহ-শিক্ষা নেই। এখানে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা। ছেলে ও মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি রয়েছে।

সৌদি আরবে শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এক ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের মতো মোল্লা ও মিস্টার নামক দু'টি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরীর ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

আল্লামা ইকবাল পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতদেরকে লক্ষ্য করে কাব্যের সুরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

'তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করেছো

নিজের চেহারায় মেকআপ করেছো অন্যের কাছ থেকে ধার করা রোজ নিয়ে।

আমি জানি না তুমি কি আসলে 'তুমি' না 'অন্য কেউ'।

তোমার গভীরের নিঃশ্বাসটুকুও আসছে অন্যের সূত্র থেকে।

ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে, ধার করা আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ের গভীরে।

তুমিতো একটা সূর্য। একবার চেয়ে দেখো আপন সত্তার পানে।

অপরের তারকার আলো তুমি চেয়োনা কোনক্ষণে।

সবার মোমবাতির আলোকে তুমি আর কতদিন নাচবে?

তোমার হৃদয়ের অনুভূতি যদি থাকে তাহলে, জ্বালো

অনতিবিলম্বে আপন আলো।'

৫. শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি

কোন শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শিক ভিত্তি ছাড়া সফল হতে পারে না। পাক-ভারত উপমহাদেশে শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। এর ফলে ওই শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা গড়ে ওঠে তারা একপেশে ও অর্ধেক যোগ্যতার অধিকারী। ফলে তাদেরকে দিয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাজ আদায় করা যায় না।

ইবনে খালদুন বলেছেন, 'সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে জুলুম। তিনি বলেন, আমি পৃথিবীর বালুকণা, গাছ-পালাসহ সকল সৃষ্টিকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ কী? সেগুলো জবাব দিয়েছিলো 'জুলুম'। জুলুমের উৎপাদন হয় চরিত্রহীনতা থেকে। আর চরিত্র সৃষ্টি হয় সঠিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে।

Stanly Hull বলেছেন, 'তুমি যদি তোমার সন্তানকে তিনটি 'R' মানে পড়া, লেখা এবং অংক শিক্ষা দান কর আর চতুর্থ 'R' (Religion) অর্থাৎ ধর্মকে বাদ রাখ, তাহলে পঞ্চম 'R' (Rascal) বর্বরতাই পাবে।'

গোটা বিশ্বের অবস্থা Stantly Hull'র মন্তব্যের সার্থক রূপ বলে মনে হয়। ধর্মহীন শিক্ষায় তৈরী লোকেরা আজ গোটা পৃথিবীকে নরক বানিয়ে দিয়েছে। এজন্যই আল্লামা ইকবাল বলেছেন, শিক্ষা বা রাজনীতি থেকে তুমি যদি ধর্মকে বাদ দাও, তাহলে চেঙ্গিস খানের অবিচার-অনাচারের মতো অবস্থাই বিরাজ করবে।

লর্ড ম্যাক্লে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরীর যে লক্ষ্য বর্ণনা করেন, তা হলো, 'আমরা এখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই, সে ব্যবস্থায় যারা লেখা পড়া করবে তারা গায়ের রং, ভাষা ও চেহারায় হবে ভারতীয়,

কিন্তু চিন্তা-চেতনায় এবং ভাবনা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে বৃটিশদের মানস সন্তান ।'

আজ পর্যন্ত সেখানে বৃটিশদের তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার সিংহভাগ অবশিষ্ট রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই ছাত্ররা মাস্তানী, সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী, মারামারী, কাটাকাটি ও হানাহানী করছে।

উইলিয়াম হান্টার এক বড় জনসভায় বলেছিলেন, 'মুসল্লিদের সাথে বৃটিশদের এত বিবাদের কোন প্রয়োজন নেই। একটু ধৈর্যের সাথে বিচক্ষণভাবে তাদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে পারলে, তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

যুগে যুগে ইসলামী শিক্ষার এই ধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস লক্ষণীয়। যেমন, মক্কার মসজিদে হারাম, মদিনার মসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের মসজিদে আকসা ছিলো শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। আব্বাসীয় শাসন আমলে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮৩০ খৃস্টাব্দে খলীফা মামুনুর রশিদ বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৬৫-১০৬৭ খৃস্টাব্দে খলীফা নিজামুল মুলক বাগদাদে বিখ্যাত নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৭৮ খৃস্টাব্দে খলীফা দ্বিতীয় হাকাম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফা মোয়েয মিসরের রাজধানী কায়রোতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর ধারাবাহিকতায় ভারতের আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ভারতের দেওবন্দে গড়ে ওঠে দরসে নিজামীর পদ্ধতিতে আরেকটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষাগার। এই মাদরাসা থেকে পরবর্তীতে পাক-ভারত উপমহাদেশে কওমী মাদরাসার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। এরপর আলীয়া নেসাবের মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উত্থানে বড় ধরনের অবদান রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ মালয়েশিয়া, নাইজার এমনকি আমেরিকা ইউরোপেও মুসলমানদের উদ্যোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা বর্তমানে অগ্রসরমান।

সন্তানের শিক্ষা মূলত ব্যক্তি শিক্ষার অংশ বিশেষ। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজের যোগ্য ও উপকারী সদস্যে পরিণত করতে চায় যেন সে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হয় ।

ইসলামী শিক্ষার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সুনির্ধারিত। শিক্ষক ওই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিলে উম্মাহর স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সৌভাগ্য নিশ্চিত হবে এবং সমাজ থেকে অরাজকতা, ভয়-ভীতি ও দুর্ভোগ কমে যাবে। ইসলাম হলো জীবন ব্যবস্থা, মানবতার দ্বীন, শিক্ষা ও জ্ঞান দান এবং সংস্কারের নাম। মানবতা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলে এবং এর মূলনীতি ও আইন-কানুন গ্রহণ করলে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে, সম্মানজনক সমাজ গঠিত হবে।

আমরা এখন ইসলামের সন্তান গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো, যাতে করে তাদেরকে উপযুক্ত জীবন ধারণে সক্ষম, ইসলামের শক্তিশালী সৈনিক এবং সম্মান, বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উন্নত আদর্শ বহনকারী মুসলিম হিসেবে দেখা যায়।

ইসলাম সন্তান লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাই বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যাদের উপর কারো প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা যদি তাদের প্রতিপালন না করে তাহলে সেটা গুনাহর কাজ।' (মুসলিম)

সন্তানকে আত্মিক, দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্তানের চারিত্রিক বিকৃতি ও এর সমাধান

সন্তানের চারিত্রিক বিকৃতি, নষ্টামী ও বিভ্রান্তির পেছনে অনেক কারণ আছে। সমাজের খারাপ পরিবেশ, তিক্ত বাস্তবতা এবং পঙ্কিল জীবন পদ্ধতিই এর প্রধান কারণ।

সন্তান গঠনকারীরা যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও আমানত পালন না করে, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কারণ না জানে এবং এগুলোর সমাধান প্রক্রিয়া না বুঝে, তাহলে সন্তানরা সমাজে হারিয়ে যাবে এবং দুর্ভাগ্য ও হতাশার মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

এখন আমরা বিভ্রান্তি ও বিকৃতির প্রধান কারণগুলো আলোচনা করবো।

১. দারিদ্র্যের কষাঘাত : ঘরে অভাব থাকলে, প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক না পেলে, কাউকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে না দেখলে, সন্তান হতাশা, বঞ্চনা ও কষ্টের অনুভূতি নিয়ে জীবন কাটাবে। তারপর সে এগুলোর সমাধান এবং রিযকের অন্বেষণে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। খারাপ লোকেরা তার প্রতি হাত বাড়াবে। অপরাধী চক্র তার সাথে বন্ধুত্ব পাতবে। মন্দ জিনিস চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলবে। ফলে এতদিনকার নিষ্কলুষ সন্তানটি দুষ্ট ও অপরাধী হয়ে গড়ে উঠবে এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামের ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার মূল কাঠামোতে দারিদ্র্য বিমোচনের যে ব্যবস্থা আছে, এতে সকল মানুষের সম্মানজনক জীবন যাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভাত-কাপড় ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা আছে এবং সমাজ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য নির্মূলের ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। যেমন প্রত্যেক লোকের কর্মসংস্থান, রাষ্ট্রের বাইতুল মাল থেকে প্রতিটি অক্ষম ব্যক্তির জন্য মাসিক ভাতা, প্রত্যেক পরিবারের জন্য ভাতা নির্ধারণ, ইয়াতীমদের সাহায্য, বিধবা ও বৃদ্ধ কল্যাণ ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তাদের মানবিক মর্যাদা এবং উত্তমভাবে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এসকল ব্যবস্থা কার্যকর হলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য পুরোদমে বিদায় নেবে।

২. মাতা-পিতার মধ্যে ঝগড়া ও মনোমালিন্য : সন্তানের আচরণ বিকৃতির জন্য মাতা-পিতার মধ্যে অধিকাংশ সময় ঝগড়া-বিবাদ ও মানোমালিন্য অন্যতম

কারণ। সন্তান তা দেখলে ঘরের নিরানন্দ পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য অন্যত্র পালিয়ে বেড়াবে এবং তার অধিকাংশ সময় হরণকারী বন্ধু-বান্ধবের সাথে অবসর সময় কাটাবে। খারাপ বন্ধু-বান্ধব হলে তাকেও খারাপ বানাবে এবং নিকৃষ্ট আচার-অভ্যাসের দাসত্বে বন্দী করবে। ফলে সে দেশ ও দশের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামের বিজ্ঞ ও স্থায়ী বিয়ে পদ্ধতিতে উপযুক্ত স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। অপর দিকে, পাত্রীর অভিভাবককেও উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। দু'পক্ষ উপযুক্ত ও দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করলে তাদের দাম্পত্য জীবনে স্নেহ-ভালোবাসা, সমঝোতা ও সহযোগিতা বিরাজ করবে। তখন আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেবে না। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত পরিবারের সন্তানও আদর্শ হবে।

৩. তালাকের কুফল

তালাকের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সন্তানের বিকৃতির অন্যতম কারণ। যে বিষয়ে কোন দু'জন ব্যক্তিও মতভেদ পোষণ করবে না সেটি হলো, সন্তান দুনিয়ায় এসে চোখ খোলার পর যদি দেখে যে, তাকে স্নেহ দানকারিণী মা নেই অথবা যত্নকারী পিতা নেই, তখন সে অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং বিকৃতি ও নষ্টামীর আবর্জনায় অবগাহন করবে। যারা জঠর জ্বালা ও ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাবার, সতর ঢাকার জন্য কাপড় এবং স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য বাসস্থান না পায়, তাদের কাছ থেকে আমরা কী আশা করতে পারি? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাছে আমরা কেবল হারিয়ে যাওয়া এবং অপরাধ ও বিকৃতি ছাড়া আর কোন কিছু আশা করতে পারি না। তবে এর ব্যতিক্রম হয় শুধু গুটিকতেক সন্তান যাদেরকে আল্লাহ রহম করে থাকেন।

ইসলামী আদর্শে স্বামী-স্ত্রীর কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে, যা পূরণ হলে দাম্পত্য জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশুভ পরিণতি দেখা যাবে না।

অধিকারগুলো হলো :

ক. নেক কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে :

বাজ্জার ও তাবারানীতে বর্ণিত আছে। নবী করিম (সা) এর কাছে কিছু মহিলা হাজির হয়ে একজনকে তাঁর কাছে প্রতিনিধি পাঠালো। প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশ্ন করছি, আল্লাহ

পুরুষদের উপর জেহাদ ফরজ করেছেন। তারা আহত হলে সওয়াব পাবেন এবং নিহত হলে আল্লাহর কাছে চিরঞ্জীব এবং রিযকপ্রাপ্ত হবেন। আমরা মহিলারা তাদের সেবা করে থাকি। আমাদের জন্য কি কোন বিনিময় আছে? নবী (সা) বলেন, অন্যান্য মহিলাদের বলে দাও, 'স্বামীর আনুগত্য ও তার অধিকারের স্বীকৃতির সওয়াবও একই সমান। (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় মোজাহিদদের মতো সমান সওয়াব, কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম নারীই তা করে থাকে।'

খ. স্ত্রী নিজের জান ও স্বামীর মাল সম্পদের হেফাজত করবে :

নবী করিম (সা) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الرَّجُلُ؟ اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ بِمَالِهِ وَنَفْسِهَا 'আমি কি তোমাদেরকে ব্যক্তির উত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করবো না? সেটি হলো, নেক স্ত্রী। তার দিকে তাকালে আনন্দিত হবে, হুকুম দিলে আনুগত্য করবে এবং অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পদ ও (স্ত্রীর) নিজ জীবনের হেফাজত করবে।' (ইবনু মাজাহ)

গ. স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে তা থেকে বিরত না থাকা :

নবী করিম (সা) বলেছেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَ إِلَيْهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ 'স্বামী স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকলে স্ত্রী যদি আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।' (বোখারী, মুসলিম)

ঘ. স্ত্রী ও সন্তানের খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য :

আল্লাহ বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'সন্তান ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ ভালোভাবে দিতে হবে।' (সূরা বাকারা-২৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত ও জিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বাণী দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো, তোমাদের উপর ভালোভাবে তাদের ভরণ-পোষণের ভার অর্পিত হয়েছে।'

ঙ. ঘরের কাজে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِمرُوا النِّسَاءَ فِيْ بَنَاتِهِنَّ 'কন্যা সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর।' (আহমদ, আবু দাউদ)

চ. স্ত্রীর কোন কোন ত্রুটিকে উপেক্ষা করা। বিশেষ করে যদি তার মধ্যে সে ত্রুটির ক্ষতিপূরণকারী অন্যান্য ভালো গুণাবলি থাকে :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ 'কোন মোমেন পুরুষ যেন কোন মোমেন স্ত্রীর উপর গোস্‌সা না করে। তার কোন আচরণে ত্রুটি থাকলে অন্য ভালো আচরণ দ্বারা খুশী হয়ে যাবে। (মুসলিম)

ছ. স্ত্রীর সাথে সদ্ভাব, ভালো ব্যবহার এবং সোহাগ ও হাসি ঠাট্টা করা :

আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ও ভদ্র ব্যবহার কর। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে তোমাদের অনেক অপছন্দনীয় জিনিস আছে, যার মধ্যে বহু কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে।' (সূরা নিসা-১৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।' (ইবনু মাজাহ, হাকেম)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীর আঙিনায় আয়েশা (রা)কে খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি দরজার ওপর এক হাতের কবজি দিয়ে ধরে অন্য হাত লম্বা করে দেন এবং আয়েশার (রা) মুখকে তাঁর কাঁধের ওপর রাখেন। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি নিজ স্ত্রীর সাথে কত মধুর আচরণ করতেন।

নবী (সা) আরো বলেন, اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَّاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ 'তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মোমেন সে, যার চরিত্র উত্তম এবং নিজ স্ত্রীর প্রতি মধুর ও স্নেহময়।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত। 'নবী করিম (সা) একবার আয়েশা (রা) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে, আরেক দৌড় প্রতিযোগিতায় আয়েশা (রা) নবী (সা)কে হারিয়ে দেন। তারপর নবী বলেন, এটা সেটার বদলা।'

আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপোষহীন ব্যক্তিত্ব ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেন, 'ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রী ও পরিবারের কাছে শিশুর মতো হতে হবে। (অর্থাৎ ভালোবাসা এবং নমনীয়তা ও কমনীয়তার দিক থেকে শিশু সুলভ) আর কওমের কাছে হবে পুরুষের মতো। তাঁর বক্তব্যটি হলো :

يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْ اَهْلِهِ كَالصَّبِيِّ فَاِذَا كَانَ فِى الْقَوْمِ كَانَ رَجُلًا

জ. রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণে ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা :

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا لَمَّا سُئِلَتْ مَا كَانَ يَصْنَعُ الرَّسُوْلُ فِى الْبَيْتِ، قَالَتْ : كَمَا يَصْنَعُ اَحَدُكُمْ يَشِيْلُ هَذَا وَيَحُطُّ هَذَا وَيَخْدِمُ فِى مِهْنَةِ اَهْلِهِ وَيَقْطَعُ لَهُنَّ اللَّحْمَ وَيَقُمُّ الْبَيْتَ وَيُعِيْنُ الْخَادِمَ فِيْ خِدْمَتِهِ

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাজ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি তোমাদের মতোই ঘরে কাজ করতেন। কোন সময় এটা সরাতেন, ওইটা রাখতেন, স্ত্রীদের গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতা করতেন, তাদেরকে গোশত কেটে দিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং চাকরের কাজে সাহায্য করতেন। (তাবারানী প্রমুখ)

এগুলো হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর উপর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এ অধিকারগুলো বাস্তব ও ইনসাফপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই এ অধিকারগুলো পূরণ করলে তাদের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিভেদ-বিচ্ছেদ দূর হবে, ঘৃণার স্থান দখল করবে ভালোবাসা, পরিবারে পরম সুখ শান্তি ও সৌভাগ্য বিরাজ করবে, সমঝোতা ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকবে এবং পারিবারিক সুখ-শান্তি নষ্ট হবে না ও পরিবেশ ঘোলাটে হবে না।

দাম্পত্য বিরোধ মীমাংসার ইসলামী পদ্ধতি

স্ত্রী বা স্বামীর মন্দ চরিত্রের কারণে যদি দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তালাকের আগে স্বামীকে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

১. উপদেশ ও নসিহত করা : আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'উপদেশ দাও। উপদেশ মোমেনদের জন্য উপকারী।' (সূরা আল জারিয়াত-৫৫)

২. বিছানা আলাদা করা : এটা হলো মানসিক শাস্তি। সম্ভবত স্ত্রী সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

৩. হালকা করে মার দেয়া : যদি ধারণা হয় যে, মার দিলে উপকার হতে পারে, তাহলে হালকা করে মার দিতে হবে। তবে এজন্য শর্ত হলো, মার কঠিন ও কঠোর হতে পারবে না এবং এর ফলে শরীরে কোন দাগ পড়তে পারবে না। এছাড়া মুখ, বুক ও পেটে মার দেয়া যাবে না। এ সকল শর্তের ভিত্তিতে মার দিলে হুমকি-ধামকির কাছাকাছি হবে, সত্যিকারভাবে মার দেয়া হবে না। জেনে রাখা ভালো, আমাদের উত্তম আদর্শ মহানবী (সা) কখনো নিজ স্ত্রীদেরকে মারেননি। ইবনে সাদ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ وَلاَ خَادِمًا وَلَا ضَرَبَ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ 'রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে কখনো কোন মেয়েলোক, চাকর কিংবা কাউকে মারেননি, একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া।' ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে তাকে মারধোর করার অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলার স্বামীকে বলেন, يَظِلُّ اَحَدُكُمْ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ العَبْدِ، ثُمَّ يَظِلُّ يُعَانِقُهُ وَلاَ يَسْتَحِيْ؟ 'তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীকে দাসের মতো মারবে, তারপর তার সাথে আলিঙ্গন করতে শরম করবে না?'

৪. সালিশ করা : স্বামী-স্ত্রীর দু'পক্ষের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী দ্বারা সালিশ করানো। তারা সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখবে এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে। তালাকের আগে এ জাতীয় সমঝোতা কাজেও লাগতে পারে। এ সকল সতর্কতা জরুরী। এ মর্মে আল্লাহ্ কোরআন মাজিদে বলেন, 'আর যে স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা অনুগত হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হবার মতো পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তারা উভয়ের সংশোধন ও মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী ও সবকিছু অবহিত।' (সূরা নিসা : ৩৪-৩৫)

আর যদি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, তাহলে যে তুহুরে অর্থাৎ ঋতুবিহীন মাসে সঙ্গম হয়নি, সে মাসে এক তালাক দেবে। এর ফলে হয়তো তারা পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসতেও পারে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন, 'তারপর যদি স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি তাদের আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছে থাকে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যারা বুঝে তাদের জন্য এসকল বর্ণনা করা হয়।' (সূরা বাকারা– ২৩০)

এই আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, তালাককে প্রতিহত করার জন্য কিছু জরুরী ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের উপর এর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর এজন্যেই নবী করিম (সা) বলেন, اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ الطَّلَاقُ 'তালাক হচ্ছে নিকৃষ্টতম হালাল জিনিস।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তালাক হয়ে গেলে ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য ভরণ পোষণ এবং সন্তানের খোরাক দানের নির্দেশ দিয়েছে যাতে তাদের কোন কষ্ট না হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। (সূরা বাকারা-২৩৬)

স্বামী ভরণ পোষণ দিতে অক্ষম হলে রাষ্ট্র ছোট সন্তানদের লালন পালনের ভার বহন করবে এবং তাদের শিক্ষার যাবতীয় খরচ যোগাবে, যে পর্যন্ত না তারা বড় হয়। এর ফলে তারা হতভাগ্য হবে না। নবী (সা) বলেন, 'যার কাছে সওয়ারী আছে , সে যেন যার সওয়ারী নেই তাকে সওয়ারী দিয়ে সাহায্য করে। আর যাদের সম্বল আছে তারা যেন যাদের সম্বল নেই তাদেরকে সম্বল দিয়ে সাহায্য করে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ 'সম্পদে যাকাত ছাড়াও অধিকার আছে।' (ইবনে মাজাহ, তাবারানী)

তাবারানী বর্ণনা করেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ ধনীদের সম্পদে গরীবদের প্রয়োজন পূরণ করাকে ফরজ করেছেন। গরীবরা নগ্ন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদের কাছে আসলে তাদেরকে ধনীদের চলার মতো করে সাহায্য করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তাদের কঠোর হিসাব নেবেন এবং তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব দেবেন। (বাজ্জার-তাবারানী) বাজ্জার ও তাবারানী রাসূলুল্লাহর (সা) আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছে। নবী (সা) বলেন, مَا اٰمَنَ بِىْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ 'সে ব্যক্তি মোমেন নয়, যে পেট পুরে খায় এবং জানে যে, তার প্রতিবেশী উপোষ।'

৪. অবসর সময় ও তা কাটানোর ইসলামী পদ্ধতি

শিশু, কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়টাই তাদেরকে ভুল পথে পরিচালনার প্রধান কারণ। তারা অবসর সময়কে কাজে লাগাতে পারে না। জন্মের পর

থেকেই শিশু খেলা-ধুলার প্রতি আকর্ষণবোধ করে, দীর্ঘ বিরতি ও অবসর কামনা করে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আগ্রহবোধ করে। এজন্যে সে সর্বদা তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলা-ধুলা করে, নাচানাচি করে। এমনকি গাছেও ওঠে। কোন সময় ব্যায়াম করে এবং ফুটবল খেলে।

সন্তান প্রতিপালনকারীদের উচিৎ, শিশুর এ সকল প্রবণতা কাজে লাগানো এবং তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী কাজে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা যেন তাদের মাংসপেশী শক্তিশালী হয় এবং শরীরে কর্মক্ষমতা ও স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। শিশুরা যদি নির্দোষ খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত জায়গা না পায়, ব্যায়ামের উপযোগী ক্লাব না পায়, শক্তি সংগ্রহের সুযোগ, সাঁতার শেখা, কাজ-কর্ম ও কর্মচঞ্চলতার সুযোগ না পায় তাহলে তারা খারাপ, মন্দ বন্ধু-বান্ধব ও সাথীর সাথে গিয়ে মিশবে। যা তাদেরকে দুর্ভাগ্য ও বিকৃতির নোংরাভূমিতে নিক্ষেপ করবে।

ইসলাম শিশু-কিশোরদের অবসর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য বাস্তব কিছু উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের শরীরে শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলো হলো, শিশুদেরকে ইবাদত, বিশেষ করে নামাযের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। নামায ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। এর রয়েছে শারীরিক, আত্মিক ও নৈতিক ভালো প্রভাব।

আমরা এখন নামাযের শারীরিক উপকারিতাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এর ফলে লোকেরা নামাজের গুরুত্ব এবং তা ফরজ হবার মর্ম বুঝতে পারবে।

১. বাধ্যতামূলক শারীরিক হালকা ব্যায়াম। একজন মুসলমান নামাজে নিজের সকল অঙ্গ ও জোড়াগুলো নাড়াচাড়া করে। এর ফলে মাংসপেশী, রক্ত চলাচলকারী ধমনী এবং শরীরের সকল অঙ্গ সক্রিয় হয়।

২. নামাযের আগে বাধ্যতামূলক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন। অজু করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সেজন্য বাহ্যিক অঙ্গ চুল, মুখ, নাক ও দাঁত পরিষ্কার হলো অজুর মূল লক্ষ্য। নামাযের জায়গা, শরীর ও কাপড় পাক-পবিত্র হতে হয়। গোসল ফরজ হলে তা করতে হয়। মোটকথা ব্যাপকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল করার মাধ্যমে নামায একটি স্বাস্থ্যকর ইবাদত।

৩. হাঁটার প্রশিক্ষণ। দিন ও রাতে কমপক্ষে পাঁচবার নামাযের জন্য মসজিদে যেতে হয়। হাঁটাহাঁটি করলে শরীরে কর্মচাঞ্চল্য বাড়ে এবং অলসতা ও অবসাদ

দূর হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী, খাওয়ার পর কেউ হাঁটাহাঁটি কিংবা ব্যায়াম করলে পেটের অসুখ কিংবা বদহজমী হয় না। এছাড়া অন্যান্য রোগ থেকেও বাঁচা যায়।

এজন্য নবী করিম (সা) সন্তান প্রতিপালনকারীদেরকে সাত বছর বয়সে তাদেরকে নামায পড়ার জন্য অভ্যস্ত করার উপদেশ এবং অবসর সময়ে নামাজের প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা সন্তানকে সাত বছর বয়সের সময় নামাজ পড়ার জন্য আদেশ দাও এবং ১০ বছর বয়সে নামায না পড়লে মার ও শয়নের বিছানা আলাদা করে দাও। (আবু দাউদ, হাকেম)

নামায অবসর সময় কাজে লাগানোর বিরাট মাধ্যম। নামাজ শিখতে হলে ঘরে কিংবা মসজিদে শিক্ষকের কাছে কেরাত, মাসলা-মাসায়েল ও নিয়ম-কানুন শিখতে হয় এবং নফল, সুন্নাত ও ফরজ নামায ঘরে কিংবা মসজিদে আদায় করতে হয়। ফলে শিশুর অবসর সময় বেশি থাকে না।

এছাড়াও ইসলাম অবসর সময়ে যুদ্ধ বিদ্যা, ঘোড়দৌড়, সাঁতার কাটা, দৌড়ঝাপ এবং কুস্তির নির্দেশ দিয়েছে।

সন্তানকে অবসর সময়ে গঠনমূলক বই পড়া, নির্দোষ বিনোদন এবং বিভিন্ন রকম খেলাধুলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য অবশ্য খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার, সাঁতার শেখার জায়গা ও বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন থাকতে হবে। সেগুলোর কর্মসূচি ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার পরিপন্থী হতে পারবে না।

উপরিউক্ত উপকরণ তৈরীর লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশগুলো হচ্ছে :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّكُمْ 'প্রস্তুত কর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর ও তোমাদের দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে পার।' (সূরা আনফাল-৬০)

আল্লাহ আরো বলেন, 'যারা জানে বা জ্ঞানী, তারা কি যারা জানে না বা অজ্ঞ, তাদের সমান?' (সূরা যুমার-৯)

খলীফা ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেন, عَلِّمُوْا اَوْلَادَكُمُ الرِّمَايَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَمُرُوْهُمْ اَنْ يَّثِبُوْا عَلَى الْخَيْلِ وَثْبًا 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে তীর নিক্ষেপ ও সাঁতার শেখাও এবং তাদেরকে ঘোড়দৌড় শিখতে বল।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ 'পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসের সদ্ব্যবহার কর। মৃত্যু আসার আগে জীবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসর সময়কে, বার্ধক্যের আগে যৌবনকে এবং অভাবের আগে সম্পদকে।' (হাকেম, বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِرْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا 'তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও (ঘোড়ায়) সওয়ার হও। তবে তীর নিক্ষেপ করা সওয়ার অপেক্ষা উত্তম।' (নাসাঈ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ اَوْ لَهْوٌ اَوْ سَهْوٌ اِلَّا اَرْبَعُ خِصَالٍ : مَشْىُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ وَتَادِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَةُ اَهْلِهِ وَتَعَلُّمُهُ السِّبَاحَةَ 'আল্লাহর যিকর ছাড়া সকল জিনিসই বেহুদা কাজ, খেল-তামাশা ও ভুল-ভ্রান্তি। তবে চার জিনিস এর ব্যতিক্রম। সেগুলো হলো, ১. দু'টো লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে ব্যক্তির হাঁটা ২. ঘোড়ায় আরোহণ শেখা ৩. স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা ও ৪. সাঁতার শেখা।' (তাবারানী, হাকেম)

ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। رَحِمَ اللهُ امْرَأً اَرَاهُمْ مِّنْ نَفْسِهِ قُوَّةً 'আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর রহম করুন, যাদেরকে আমি শক্তিশালী দেখি।'

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীতে কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্রের মহড়াকে লক্ষ্য করে বলেন, دُوْنَكُمْ يَابَنِيْ اَرْفِدَةَ لِتَعْلَمَ الْيَهُوْدُ اَنَّ فِيْ دِيْنِنَا فُسْحَةً 'হে বনি আরফেদা, তোমরা মহড়া প্রদর্শন কর যেন ইহুদীরা জানে যে, আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা ও অবকাশ যাপনের সুযোগ আছে।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلَىَ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ.......... فَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ "শক্তিশালী মোমেন দুর্বল মোমেন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সকল কিছুতেই কল্যাণ আছে। তোমরা উপকারী জিনিসের ব্যাপারে আগ্রহী হও, আল্লাহর সাহায্য চাও, অপারগ হয়ো না। যদি কোন খারাপ বিষয় তোমার নসীব হয়, তাহলে একথা বলো না যে, 'যদি আমি এরূপ করতাম,

তাহলে এরূপ হতো।' তবে এরূপ বলো, ,'আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছেন এবং তিনি যা চান তাই হয়।' 'যদি' শব্দটি শয়তানের জন্য রাস্তা খুলে দেয়।'' (মুসলিম)

সন্তানের প্রতিপালনকারী অভিভাবকেরা এই নির্দেশনাগুলোকে সামনে রেখে কাজ করলে সন্তান সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হবে এবং এগুলো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির পথে বাধা হিসেবে কাজ করবে। তাদের অবসর সময় দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারী জিনিস অর্জনে সহায়ক হবে। তারাই ইসলামের ভবিষ্যৎ যোগ্য উত্তরসূরী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সৈনিক এবং সঠিক দাঈ' ইলাল্লাহ হতে পারবে।

৫. খারাপ সাথী ও বন্ধু

খারাপ বন্ধু ও সাথী সন্তানের বিকৃত চরিত্র ও আচরণের অন্যতম কারণ। দুর্বল স্মরণশক্তি ও আকীদার কারণে এবং দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী না হওয়ায় সন্তান খারাপ সাথীদের দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। তাদের কাছ থেকে খারাপ অভ্যাস ও চরিত্র শিখে এবং তাদের সাথে খারাপ পথে পা বাড়ায়। ফলে দেখা যায়, অপরাধ তাদের গুণ এবং বিকৃতি তাদের চরিত্র হয়ে যায়। তখন তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, গোমরাহী থেকে রক্ষা করা ও মন্দ থেকে উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলাম সন্তানের প্রতিপালনকারী অভিভাবককে সন্তানকে ভালোভাবে নজরে রাখার নির্দেশ দেয়। বিশেষ করে যখন তারা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়স কিংবা কৈশোরে পৌঁছে, তখন দেখা দরকার, তারা কাদের সাথে মেশে এবং সকাল সন্ধ্যায় কোথায় যায়।

অনুরূপভাবে ইসলাম এটাও নির্দেশ দেয় যে, তার জন্য ভালো সাথী ও বন্ধুও ঠিক করে দেয়া এবং ভালো বন্ধুদেরকে আদর করে সন্তানের ঘনিষ্ঠ করে দেয়া, যেন তারা তাদের কাছ থেকে ভালো চারিত্রিক গুণ, আদব-কায়দা ও আচার-অভ্যাস শেখে। অপরদিকে, খারাপ সাথী ও বন্ধুর সাথে মেশার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে হবে যেন তারা বিকৃতির অতল গহ্বরে ডুবে না যায়।

খারাপ সাথী ও বন্ধুর বিরুদ্ধে :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ اِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلاً، يَا وَيْلَتَى لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلً 'যালেম ব্যক্তি সেদিন নিজের

দু'হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে সে পথ অনুসরণ করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ ও নসীহত আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।' (সূরা ফোরকান : ২৭-২৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ 'তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের রব, আমি তাকে অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে লিপ্ত করিনি। মূলত সে নিজেই ছিলো সুদূর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।' (সূরা ক্বাফ–২৭)

মহান আল্লাহ বলেন, اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ 'বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহ ভীরুরা নয়।' (সূরা যোখরুফ-৬৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপর অধিষ্ঠিত হয়। তাই তোমাদের দেখা দরকার, কাকে বন্ধু বানাচ্ছো।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ভালো ও খারাপ সাথীর উদাহরণ হলো মেশক ও কস্তুরীর বাহক এবং কামারের হাঁপরের মতো। মেশক ও কস্তুরীর বাহকের কাছে গেলে সে আপনাকে তা দান করতে পারে কিংবা আপনি তার কাছ থেকে কিনতে পারেন। কমপক্ষে, আপনি তার সুঘ্রাণ হলেও উপভোগ করে আসবেন। কিন্তু কামারের কাছে গেলে, হাঁপরের আগুন লেগে আপনার কাপড় পুড়ে যেতে পারে অথবা কমপক্ষে এর দুর্গন্ধ হলেও আপনাকে ভোগ করতে হবে।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَلَهُ مَااكْتَسَبَ 'যে যাকে ভালোবাসে, হাশরের দিন সে তার সাথেই থাকবে এবং সে তাই পাবে যা সে উপার্জন করে।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِيَّاكَ وَقَرِيْنَ السُّوْءِ فَاِنَّكَ بِهٖ تُعْرَفُ 'খারাপ বন্ধু-বান্ধব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তাদের মাধ্যমেই তোমার পরিচয়।' (ইবনে আসাকের)

৬. সন্তানের সাথে মাতা-পিতার খারাপ আচরণ

সন্তানের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, মা-বাবা বা অভিভাবক যদি সন্তানের সাথে কঠোর ব্যবহার করে, মার-পিটের মাধ্যমে শাস্তি দেয়, শক্ত বকাঝকা করে,

সর্বদা তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করে তোলে, তাহলে শীঘ্রই তার আচরণে এর কুপ্রভাব পড়বে। তার চাল-চলনে ভয়-ভীতির সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যাবে। কোন সময় তা তাকে আত্মহত্যা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে কিংবা মা-বাবার সাথে লড়াই-ঝগড়া অথবা চিরতরে ঘর থেকে পালিয়ে অত্যাচার ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে বাঁচতে চাইবে। এতে আমরা সমাজে আরেকজন অপরাধী ও বিকৃত আচরণের অধিকারী লোকের সংখ্যা বাড়ালাম।

ইসলাম তার মহান নীতির কাঠামোর আওতায় মা-বাবাসহ যে সকল অভিভাবকের উপর সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদেরকে উন্নত চরিত্র, স্নেহ-সোহাগ, আদর-ভালোবাসা, দয়া ও মায়া-মমতার সাথে গড়ে তোলা ও শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে, যেন তারা সত্য ও সঠিক পথের ওপর টিকে থাকতে পারে। ব্যক্তিত্ব ও হিম্মতের অধিকারী হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস জন্মে যে, তারাও ইজ্জত সম্মানের পাত্র।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى 'আল্লাহ তোমাদেরকে ইনসাফ ও দয়া প্রদর্শন এবং নিকটাত্মীয়কে দান করার নির্দেশ দেন।' (সূরা নাহল-৯০)

তিনি আরও বলেন, وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 'তোমরা লোকদেরকে উত্তম কথা বলো।' (সূরা বাকারা-৪৩)

আল্লাহ আরও বলেন, لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'হে নবী, আপনি যদি শক্ত ও কঠিন হৃদয়ের হন, তাহলে লোকেরা আপনার কাছ থেকে সরে পড়বে।' (সূরা আল ইমরান-১৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّه 'আল্লাহ সকল কাজে কোমলতা ও নমনীয়তা পছন্দ করেন।' (বোখারী)

তিনি আরও বলেন, إِنْ اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى بِاَهْلِ الْبَيْتِ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ وَإِنَّ الرِّفْقَ لَوْ كَانَ خَلْقًا لَمَا رَاٰى النَّاسُ خَلْقًا اَحْسَنَ مِنْهُ وَإِنَّ الْعُنْفَ لَوْ كَانَ خَلْقًا لَمَا رَاٰى النَّاسُ خَلْقًا اَقْبَحُ مِنْه 'আল্লাহ কোন ঘরে কল্যাণ দিতে চাইলে সে ঘরে নম্রতা প্রবেশ করান। যদি নম্রতা স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টি হতো, তাহলে মানুষ এর চাইতে উত্তম সৃষ্টি দেখতে পেত না। অপরদিকে, সহিংসতা যদি কোন সৃষ্টি হতো তাহলে, মানুষ এর চাইতে নিকৃষ্ট কোন সৃষ্টি দেখতে পেত না।' (আহমদ, বায়হাকী)

আবুশ শেখ তাঁর 'আস সাওয়াব' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) এই হাদিসটি বর্ণনা করেন : رَحِمَ اللهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ 'আল্লাহ সেই পিতাকে রহম করুন, যে নিজ সন্তানকে তার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য সাহায্য করে।'

অর্থাৎ নমনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে সন্তানকে অনুকূল মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে, যেন সে নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ اللهُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'দয়ালু লোকদের উপর দয়ালু আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তোমরা যমীনের লোকদের উপর রহম কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর রহম করবেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সকল মাতা-পিতা ও অভিভাবককে সন্তানের সাথে নরম ব্যবহারের লক্ষ্যে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশগুলো যথাযথভাবে মেনে নিতে হবে। তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলে তারা বিকৃতির দিকে আরও বেশি এগিয়ে যাবে ও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

এক ব্যক্তি ওমার বিন খাত্তাব (রা) এর কাছে নিজ সন্তানের অবাধ্যতার অভিযোগ করলো। ওমার (রা) ছেলেকে হাজির করে তাকে তার বাবার নাফরমানীর বিরুদ্ধে হুমকি দিলেন ও তিরস্কার করলেন। ছেলেটি প্রশ্ন করলো, হে আমীরুল মোমেনীন, বাবার ওপর সন্তানের কি কোন অধিকার আছে? তিনি জবাব দেন, অবশ্যই আছে। ছেলেটি বললো সে অধিকারগুলো কি কি? ওমার (রা) বলেন, সেগুলো হচ্ছে (১) ভালো দেখে স্ত্রী গ্রহণ করা যেন সে দ্বীনদার, ভালো বংশ ও চরিত্রের মেয়ে হয়। (২) সন্তানের ভালো নাম রাখা। (৩) তাকে কোরআন শিক্ষা দেয়া। ছেলেটি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আমার বাবা এগুলোর কোনটিই করেনি। আমার মা ছিলো এক অগ্নিপূজারীর কৃষ্ণাঙ্গ কন্যা। তিনি আমার নাম রেখেছেন جُعْلٌ 'দুর্গন্ধযুক্ত পোকা বা 'কৃষ্ণাঙ্গ' এবং তিনি আমাকে কোরআনের একটি অক্ষরও শিক্ষা দেননি। এবার ওমার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে নিজ সন্তানের নাফরমানী ও সম্পর্ক ছিন্নের অভিযোগ করছো, অথচ সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমিই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছো।

ওমার (রা) এভাবে সন্তানের শিক্ষাকে অবহেলা করার জন্য তার বাবাকে দায়ী করেছেন।

একবার সাহাবী মুআবিয়া (রা) নিজ পুত্র ইয়াজীদের উপর রাগ হন। তিনি ছেলেদের ব্যাপারে মতামত জানার জন্য আহনাফ বিন কায়েসের কাছে লোক পাঠান। আহনাফ বলেন, 'তারা আমাদের অন্তরের ফল ও পিঠের মেরুদণ্ড। আর আমরা হলাম তাদের জন্য নরম ভূমি এবং ছায়াদার আকাশ। তারা কিছু চাইলে দেবে, রাগ করলে খুশী করবে, তাহলে তারা তোমাকে ভালোবাসবে এবং তোমার চেষ্টাকে মর্যাদা দেবে। তুমি তাদের উপর বোঝা হয়ো না ও তাদের জীবনকে বিরক্তিকর করে তোল না যেন তারা তোমার মৃত্যু কামনা না করে।'

এই দু'টো ঘটনা অভিভাবকদের জন্য সন্তানের প্রতি নরম ও ভালো ব্যবহারের উত্তম নমুনা।

৭. অপরাধমূলক ও যৌন বিষয়ক ফিল্ম দেখা

সন্তানের বিপথগামিতা, দুর্ভাগ্য, অপরাধপ্রবণতা ও যৌন বিকৃতির বড় কারণ হলো, সিনেমা ও টেলিভিশনের মন্দ নাটক ও ছায়াছবি, পুলিশী গল্প কাহিনী, যৌন ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন এবং উত্তেজক গল্প ইত্যাদি। এগুলো যৌন আবেদন সৃষ্টি করে। অপরাধপ্রবণতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং বড়দের চরিত্র পর্যন্ত ধ্বংস করে, তাহলে ছোট ও কিশোর যুবকদের চরিত্রের অবস্থা কী হবে?

শিশুর বুদ্ধি হলে তার মনে ওই সকল খারাপ জিনিস উঁকি মারে ও বিবেকের মধ্যে সেগুলো গেঁথে যায়। পরবর্তীতে সেগুলো অনুকরণ করে। ফলে সেগুলো তাকে অপরাধের জন্য উৎসাহিত করে এবং নোংরামী ও নষ্টামীর দিকে ধাবিত করে।

যদি সন্তান লাগামমুক্ত হয় এবং তার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী না থাকে, তাহলে সে ষোল কলায় বিকৃত হয়।

এমন নষ্ট ও গুনাহর পরিস্থিতি শিশু-কিশোরের মনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। তখন মাতা-পিতা কিংবা অভিভাবক ও শিক্ষকের উপদেশ কোন কাজে আসে না।

ইসলাম মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদেরকে সন্তান গঠনের জন্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে যথার্থ ও সরল পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানায়। ওই পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত নীতিমালা উল্লেখ আছে :

(ক) যে সকল জিনিস তাদের ও সন্তানের জন্য আল্লাহর গজব ও দোযখে প্রবেশের কারণ হবে, সেগুলো থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।' (সূরা তাহরীম-৬)

(খ) সন্তানের প্রতিপালন ও গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা। যাতে তারা নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপরি পালন করে রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত নির্দেশের সার্থক বাস্তবায়ন ঘটায় :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'পুরুষ নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' (বোখারী, মুসলিম)

(গ) আকীদা বিশ্বাস ও চরিত্রের জন্য ক্ষতিকর জিনিস দূর করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং কারো ক্ষতিও করা যাবে না।' (ইবনে মাজাহ ও মোয়াত্তা মালিক)

ইসলামের এসব নীতি ও শিক্ষা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক বাবা, অভিভাবক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির উচিৎ, সন্তানকে যৌন ও অপরাধমূলক ফিল্ম দেখা থেকে বিরত রাখা এবং তারা যেন পর্ণ-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং কুফরীর সংক্রান্ত লেখা বই না কেনে ও পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮. সমাজে বেকারত্বের প্রসার

সন্তানের আচরণ বিকৃতির জন্য বেকারত্বের প্রসার অনেকাংশে দায়ী। বাবা যদি বেকার হয়, তাহলে তিনি সন্তান ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, ক্ষুধা নিবারণ এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবেন না। তখন গোটা পরিবারই ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সন্তানেরা অপরাধপ্রবণতা ও বিকৃতির পথে পা বাড়াবে। বিচিত্র নয়, তখন পরিবার প্রধান চিন্তা করবেন, কেউ যদি তার পরিবারকে রক্ষা করতো! সেজন্য যদি অবৈধ পন্থায়ও অর্থ উপার্জন করে, তাতে তার আপত্তি নেই। চুরি-ডাকাতি, লুঠ-পাট, সুদ-ঘুষ হলেও না। এর অপর অর্থ দাঁড়ায়, তখন সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

ইসলামের সামাজিক ন্যায়-বিচারের আওতায় ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বেকারত্ব দু'প্রকার।

১. নিরূপায় বেকারত্ব : অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেকারত্ব দেখা দেয় এবং কোন কাজ পায় না। এ জাতীয় বেকারত্ব দুইভাবে দূর করা যায়।

(ক) রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্ম সংস্থান করা। রাষ্ট্রীয়ভাবে বেকারত্ব দূর করার প্রমাণ হলো–

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে সাহায্য চাইলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন তোমার ঘরে কী আছে? সাহাবী বলল, একটি মোটা চাদর আছে। এর একাংশ আমরা পরি ও একাংশ বিছাই। আর আছে একটি পান পাত্র। তিনি বলেন, ওই দু'টো আমার কাছে নিয়ে এসো। আনসার সাহাবী দু'টো জিনিস নিয়ে আসলেন। নবী (সা) নিজ হাতে ওই দু'টো জিনিস তুলে ধরে বলেন, কে আছো যে এ দু'টো জিনিস কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনবো। তিনি তাকে জিনিস দু'টো দিয়ে দেন। আনসার সাহাবীকে দুই দিরহাম দিয়ে বলেন, এক দিরহাম দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার কিনে নিয়ে আস। আর এক দিরহাম দিয়ে কুড়াল কিনে নিয়ে এসো। সাহাবী কুড়াল কিনে আনলেন, নবী (সা) নিজ হাত মোবারক দিয়ে বাঁট লাগিয়ে দেন এবং বলেন, যাও কাঠ কাটো ও বিক্রি করো। আমি তোমাকে ১৫ দিনের মধ্যে যেন আর না দেখি। সাহাবী তাই করলো। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন। ইতোমধ্যে তিনি ১০ দিরহাম আয় করেছেন। এর এক অংশ দিয়ে কাপড় এবং অন্য অংশ দিয়ে খাদ্য কিনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْاَلَةُ نكتَه فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এটা তোমার ভিক্ষা করা এবং কিয়ামতের দিন চেহারায় ভিক্ষার দাগ পড়া অপেক্ষা উত্তম।' (বোখারী)

(খ) কাজ পাবার আগ পর্যন্ত সমাজের লোকদের দায়িত্ব হলো তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা। এ মর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন সওয়ারীবিহীন ব্যক্তিকে সওয়ারী দিয়ে সেবা দান করে। আর যার অতিরিক্ত সম্বল আছে, সে যেন সম্বলহীন লোককে তা থেকে সেবা দেয়।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমার ওপর ঈমান আনেনি, যে নিজে পেট পুরে খায় ও তার প্রতিবেশী উপোস বলে সে জানে।' (বাজ্জার, তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضِيَاعًا بَيْنَ اَقْوَامٍ اَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ 'কোন ব্যক্তি ধনী লোকদের মাঝে অভাবের কারণে মারা গেলে তাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন জিম্মাদারী থাকে না।'

তবে اَلْاِخْتِيَارُ لِتَعْلِيْلِ الْمُخْتَارِ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, অভাবী ব্যক্তিকে কেউ খাওয়ালে কিংবা সাহায্য দিলে সমাজের অন্যদের উপর থেকে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

২. অলসতাজনিত বেকারত্ব : যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজ পেয়ে কাজকে অপছন্দ করে বেকার থাকে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, কাজ পেয়েও কাজ না করার

বিষয়টি প্রমাণিত হলে, তাকে উপদেশ দেয়া এবং না বুঝলে তাকে জোর করে কাজে লাগানো।

ইবনুল জাওযী ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি, কাজ করে না এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের পরিচয় কী? তারা উত্তর দেয়, 'তাওয়াক্কুলকারী'। অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসাকারী। তিনি বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। কেননা তাওয়াক্কুলকারীতো তাদেরকে বলা হয়, যারা মাটিতে শস্যদানা বপন করার পর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে। এরপর তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন বসে রিযক তালাশ না করে এবং হে আল্লাহ, রিযক দাও– একথা না বলে। অথচ সে জানে যে, আসমান থেকে সোনা রূপা বর্ষিত হয় না।'

খলীফা ওমার (রা) ফকিরদেরকে উপদেশ দেন, তারা যেন দান সদকার ওপর নির্ভর করে কাজ থেকে বিরত না থাকে। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اِسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلاَ تَكُونُوا عِيَالاً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ 'হে গরীব লোকেরা, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর এবং মুসলমানদের ওপর বোঝা হয়ো না।

ওমার (রা) এর কথা থেকে বুঝা যায়, যাকাত দেয়ার লক্ষ্য হলো প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থান করা, অলসতা সৃষ্টি কিংবা বসে থাকা ও তাওয়াক্কুলের ভান করার জন্য নয়।

তবে বার্ধক্য কিংবা রোগজনিত কারণে অক্ষম হলে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের উত্তম জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা। চাই তারা অক্ষম বয়োবৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ হোক এবং মুসলিম অমুসলিম যেই হোক না কেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন, ওমার বিন খাত্তাব (রা) এক সম্প্রদায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় দরজায় এক ভিক্ষুককে দেখতে পান। ভিক্ষুকটি ছিলো অন্ধ ও বয়োবৃদ্ধ। তিনি পেছনে হাত দিয়ে থাপ্পড় লাগান এবং বলেন, তুমি কোন আহলে কিতাব? ভিক্ষুকটি বলে, ইহুদি। ওমার জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই অবস্থা কেন? সে বলল, আমি জিযিয়া কর পরিশোধ, প্রয়োজন পূরণ এবং বয়স্ক হবার কারণে হাত পাততে বাধ্য হয়েছি। ওমার (রা) তাঁকে নিজ ঘরে নিয়ে যান এবং ঘর থেকে কিছু দান করেন। তারপর রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের কর্মকর্তার কাছে তাকে পাঠিয়ে বলেন, এই লোকটিসহ অনুরূপ অন্যান্য লোকদের প্রতি খেয়াল রাখবে। আল্লাহর কসম, আমরা তাদের

প্রতি ইনসাফ করিনি। আমরা তাদের যৌবনকে ব্যবহার করেছি, এখন কি বৃদ্ধকালে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবো? নিশ্চয় যাকাত ফকীর-মিসকীনের হক। আর এই ব্যক্তি হলো আহলে কিতাবের মিসকীন।

ওমার (রা) কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। এটা দেখে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে অর্থ সাহায্য দেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং মান সম্ভ্রম হেফাজত করেন।

ইসলাম এভাবে বেকারত্ব দূর করে থাকে।

৯. মাতা-পিতার সন্তান গঠনের দায়িত্ব ত্যাগ

সন্তানের বিকৃতি, চরিত্র নষ্ট ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো, মা-বাবা যদি সন্তানের সংশোধন প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে গঠন করার চিন্তা না করে। আমাদেরকে ভুললে চলবে না যে, সন্তান গঠনের ব্যাপারে মায়ের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। এজন্য কবি বলেন,

'মা হচ্ছে এমন বিদ্যালয়, যদি তাকে ঠিক মতো গঠন করো, তাহলে সম্ভ্রান্ত এক জাতি তৈরী করতে পারবে।' বাবা অপেক্ষা মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। কেননা জন্মের পর থেকেই শিশু মায়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে, যে পর্যন্ত না বড় হয়।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাকে পৃথকভাবে দায়িত্বশীল করে বলেন, وَالْأُمُّ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا 'মা তার স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং ঘরের অধীনস্থদের দায়িত্বশীল।'

মাকে সন্তানের বাবার সাথে মিলে ভবিষ্যৎ বংশধর তৈরীর কাজ করতে হবে। মা যদি নিজ সন্তান গঠনে ত্রুটি করে, বান্ধবীদের সাথে আড্ডা মারে, আতিথেয়তা ও ঘরের বাইরের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকে, বাবাও যদি অনুরূপ কাজ করে নিজ সন্তান গঠনে অবহেলা করে এবং অবসর সময়ে খেলা-ধুলা-বিনোদন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে কাটিয়ে দেয়, তাহলে তাদের সন্তান অবশ্যই ইয়াতীমের মতো অভিভাবকহীন অবস্থায় বেড়ে উঠবে। রাস্তায় ভবঘুরে হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে এবং বিভিন্ন রকম অপরাধ ও অসামাজিক কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়বে।

কবি যথার্থই বলেছেন,

لَيْسَ الْيَتِيْمُ مَنْ اِنْتَهَى اَبَوَاهُ مِنْ - هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيْلاً

اِنَّ الْيَتِيْمَ هُوَالَّذِىْ تَلْقَى لَهُ — اُمًّا تَخَلَّتْ اَوْ اَبًا مَشْغُوْلاً

'সে ইয়াতীম নয়, যার বাবা-মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে এবং তাকে হীন ও ঘৃর্ণিত অবস্থায় রেখে গেছে, বরং সে ইয়াতীম, যার মা তাকে ত্যাগ করেছে এবং বাবা ব্যস্ত রয়েছে।'

যে মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি অবহেলা করে, সে সন্তান থেকে ভালো কিছু কীভাবে আশা করা যায়?

আর মা-বাবা যদি অধিকাংশ সময় গোনাহের কাজ ও গোমারাহীতে কাটায়, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে এবং চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে, তা সন্তানের জন্য বিশাল বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং সে ভয়ঙ্কর জীব হিসেবে গড়ে উঠবে। সে ক্রমান্বয়ে বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়বে। ইসলাম শিশুর গঠনের ব্যাপারে মা-বাবার বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা মহান আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন।' (সূরা তাহরীম-৬)

সন্তান গঠন ও শিক্ষার ব্যাপারে মহানবী (সা)ও যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, اَلرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا 'ব্যক্তি নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক ও অধীনস্থদের দায়িত্বশীল। স্ত্রী নিজ স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ও অধীনস্থদের দায়িত্বশীলা। (বোখারী, মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে আদব-কায়দা এবং উত্তম শিষ্টাচার শেখাও।' (ইবনে মাজাহ)

নবী করিম (সা) বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তাদেরকে তিনটি গুণ শিক্ষা দাও, তোমাদের নবীর ভালোবাসা, তাঁর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও কোরআন তেলাওয়াত। কোরআনের বাহকরা আল্লাহর আরশের নীচে অবস্থান করবে, যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না।' (তাবারানী)

১০. ইয়াতীম শিশুর সমস্যা

সন্তানের বিকৃত চরিত্রের জন্য ইয়াতীম হওয়া অন্যতম কারণ। ইয়াতীমের পিতা তার বাল্যকালে মারা যাওয়ায় কেউ তাকে যদি স্নেহের পরশ না বুলায়, কোন দয়ালু ব্যক্তির আত্মা যদি তার উপর দয়া বর্ষণ না করে, কোন উপদেশকারীর

যদি নমনীয় ও কোমল ভাষায় তার সাথে ভালো ব্যবহার না করে, তার নিত্যকার প্রয়োজন যদি পূরণ করার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে জানা কথা যে, ইয়াতীম শিশুটি খারাপ হবে এবং বিকৃত চরিত্রের অধিকারী হবে। সে ক্রমান্বয়ে অপরাধের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। ভবিষ্যতে সে মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস ও নষ্টের কারণ হবে। অন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটাবে।

ইসলাম ইয়াতীমের যত্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ 'আর তারা আপনার কাছে ইয়াতীমদের সম্পর্কে মাসলা জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে, তারা তোমাদের ভাই।' (সূরা বাকারা-২২০)

আল্লাহ বলেন, 'ইয়াতীমকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করো না।' (সূরা আদ-দোহা-৯)

আমাদের মহান রব বলেন, فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? সে সেই ব্যক্তিই ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।' (সূরা মাউন : ১-২)

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا 'যারা ইয়াতীমদের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং তারা শীঘ্রই আগুনে প্রবেশ করবে।' (সূরা নিসা-১০)

নবী (সা) বলেন, مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيْمٍ رَحْمَةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَى يَدِهِ حَسَنَةً 'যে ব্যক্তি স্নেহ ও দয়ার সাথে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, তার হাতে যতগুলো চুল স্পর্শ করেছে, আল্লাহ তার জন্য ততগুলো নেকী লিখে দেন।' (আহমদ, ইবনে হিব্বান)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিম ও ইয়াতীমদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পানাহার করায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন, যদি না ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ করে।' (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 'আমি ও ইয়াতীমের জিম্মাদার ব্যক্তি জান্নাতে একসাথে থাকবো। এই বলে তিনি নিজ তর্জনী ও শাহাদত অঙ্গুলীকে এক সাথে মিলিয়ে দেখান।' (তিরমিযী)

দ্বিতীয় ভাগ

সন্তান গঠনকারীদের দায়িত্ব

সন্তানের ঈমানী শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানত তার অভিভাবক ও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হয়। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তানের চরিত্র গঠনের বিরাট আমানত অর্পণ করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা কোরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক হাদিস উল্লেখ করেছি। এখনও আরও কয়েকটি হাদিস ও আয়াত আলোচনা করবো। আল্লাহ্ কোরআন মাজিদে বলেন, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন।' (সূরা তোয়াহা-১৩২)

আল্লাহ্ বলেন, يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন।' (সূরা নিসা-১১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَاَنْ يُّؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِصَاعٍ 'সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া ব্যক্তির জন্য এক সা' পরিমাণ জিনিস দান করা অপেক্ষা উত্তম।' (তিরমিযী)

তিনি (সা) আরও বলেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ 'সন্তানকে ভালো আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দান অপেক্ষা পিতার পক্ষ থেকে তাদের জন্য উত্তম কোন উপহার নেই।' (তিরমিযী)

আমাদের পূর্বসূরীরা সন্তান গঠনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক জাহেজ বর্ণনা করেন, ওকবা বিন আবু সুফিয়ান তাঁর ছেলেকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে বলেন, আমার ছেলের সংশোধনের জন্য প্রথমে আপনি নিজে সংশোধন শুরু করুন। কেননা তার মতো শিশুদের চোখ আপনার মতো শিক্ষকের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আপনি যা কিছু ভালো ও মন্দ ভাববেন, তারাও তাই ভাববে। আপনি তাদেরকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের চরিত্র শিক্ষা দিন, চরিত্রবান ব্যক্তির উত্তম গুণাবলি বাতলান; তাদেরকে আমার ভয় দেখালেও আমাকে ছাড়াই তাদেরকে আদব-কায়দা ও জ্ঞান শিক্ষা দিন। আপনি তাদের জন্য এমন চিকিৎসক হোন, যিনি রোগ জানার আগ পর্যন্ত ঔষধ দেয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না। আমার ভয় যেন তাদের সংশোধনের পথে বাধা না হয়। আমি কিন্তু আপনার যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে আছি।'

ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকদ্দমা' গ্রন্থে লিখেছেন, খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর ছেলে আমীনকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, হে শিক্ষক, আহমার, খলীফা তার কলিজার টুকরো ও মনের ফসলকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনি তার ওপর নিজ হাত মজবুত করুন, আপনার আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করুন; আপনিও তার জন্য সেই মর্যাদায় অবতীর্ণ হোন, খলীফা যে মর্যাদা আপনাকে দিয়েছে। তাকে কোরআন পড়ান, বিভিন্ন খবরা খবর অবহিত করুন; কবিতা শেখান, হাদিসের জ্ঞান দিন, কথা বলার পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং হাসির অবস্থা ছাড়া যেন এমনি না হাসে। তার সময়গুলো যেন উপকারী কাজে লাগে এবং এমন কাজে যেন না লাগে, যার ফলে তার অন্তর মরে যায়। তাকে এত অবকাশ দেবেন না, যেন সে অবসর সময়কে ভালোবাসে, তাকে নৈকট্য ও কোমলতা দিয়ে সাধ্যমতো ঠিক করুন। সে এগুলোকে অস্বীকার করলে তার প্রতি কঠিন ও কঠোর হোন।'

খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান নিজ ছেলের শিক্ষককে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন : 'তাদেরকে সত্যবাদিতা এমনভাবে শেখান যেমন করে কোরআন শেখান; সুন্দর চরিত্র ও ভালো কবিতা শেখান যা তাদের উৎসাহিত করবে; তাদেরকে ভদ্র ও জ্ঞানী-গুণী মানুষের সাথে উঠা-বসা করান, তাদেরকে ইতর ও অভদ্র এবং চাকরদের থেকে দূরে রাখুন। কেননা, তাদের আদব-শিষ্টাচার খুবই কম। তাদেরকে প্রকাশ্যে ইজ্জত দান করুন এবং অপ্রকাশ্যে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করুন। তাদেরকে মিথ্যার জন্য মার দিন। মিথ্যা মানুষকে গুনাহ এবং গুনাহ মানুষকে দোযখের দিকে ধাবিত করে।'

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজ ছেলের শিক্ষককে বলেন, তাদেরকে লেখা শেখার আগে সাঁতার শিক্ষা দিন। কেননা তাদের পক্ষ থেকে লেখার লোক পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের পক্ষে সাঁতার শেখার লোক পাওয়া যায় না।

খলীফা ওমার বিন খাত্তাব (রা) সিরিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা সন্তানদেরকে সাঁতার, তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা দিন।'

সন্তান গঠনের ব্যাপারে ইবনে সিনার উপদেশ হলো : 'সন্তানের সাথে বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের রাখা দরকার, যাদের আদব-কায়দা ভালো ও আচার-অভ্যাস সন্তোষজনক। এক শিশু আরেক শিশু থেকে বেশী শেখে এবং তাকে ভালোবাসে।'

হিশাম বিন আব্দুল মালেক নিজ ছেলের শিক্ষক সোলায়মান কালবীকে বলেন, 'আমার এই ছেলেটি আমার নয়নমণি। আপনাকে তার শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করেছি। আপনি তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জন করুন এবং আমানত আদায় করুন। আপনার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ হলো, আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরুন, ছেলেকে উত্তম ও সুন্দর কবিতা শিক্ষা দিন। জীবিত মহান আরব কবিদের কাছে তাকে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, তাদের ভালো কবিতাগুলো গ্রহণ করুন, তাকে হালাল-হারাম জানান এবং বক্তৃতা ও যুদ্ধ কাহিনী শিক্ষা দিন।'

সন্তানের গঠন ও শিক্ষার ব্যাপারে এই হলো সামান্য দৃষ্টান্ত।

প্রথম অধ্যায়

ঈমানী শিক্ষা দান করা

ঈমানী শিক্ষার লক্ষ্য হলো, সন্তানকে ঈমানের মূলনীতিসমূহ বোঝানো এবং বোঝার পর সেগুলো বাস্তাবায়নের জন্য অভ্যস্ত করে তোলা।

ঈমানের মূলনীতি বলতে বোঝায়, ঈমানের সত্যাসত্য ও অদৃশ্য বিষয়গুলো। যেমন, আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূলদের উপর ঈমান, কবরে দুই ফেরেশতার প্রশ্ন, কবর আজাব, পুনরুত্থান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামসহ অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়সমূহ।

ইসলামের রোকন বলতে বোঝায়, শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইবাদত। যেমন, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব।

শরীয়তের মূলনীতি বলতে বোঝায়, সকল খোদায়ী পদ্ধতি। যেমন, আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত চরিত্র, আইন তৈরী, জীবন পদ্ধতি এবং মাসলা ইত্যাদি।

শিক্ষক ও অভিভাবকের কর্তব্য হলো, শুরু থেকেই সন্তানকে ঈমানী শিক্ষায় দীক্ষিত করে তোলা, ইসলামের ভিত্তি ও শিক্ষা রপ্ত করানো, যেন ইসলামকে তার আকীদা ও ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এবং একে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দৃঢ়মূল করা যায়। এই শিক্ষা লাভের পর সে যেন দ্বীন বা সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছু না বোঝে, কোরআন ছাড়া কোন ইমাম এবং রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে নেতা না মানে।

এ মর্মে এখন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীগুলো তুলে ধরবো।

১. সন্তানকে প্রথমে কালেমা তাওহীদ শিক্ষা দেয়া। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِفْتَحُوْا عَلَى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ 'তোমরা প্রথমে সন্তানকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিক্ষা দাও।' (হাকেম)

এই নির্দেশের রহস্য হলো, শিশুর কানে যেন সর্বপ্রথম তাওহীদের কালেমা ও ইসলামে প্রবেশের নিদর্শনের শব্দ উচ্চারিত হয় এবং প্রথমেই যেন তার মুখে আল্লাহর বাণী ধ্বনিত হয়। সন্তান প্রসবের পরও সন্তানের কানে আজান ও ইকামত উচ্চারণ করতে হয়।

২. শিশুর মধ্যে বিবেক বুদ্ধি সৃষ্টির পর প্রথমেই তাকে হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে।

ইবনু জারীর ও ইবনু মোনজের আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِعْمَلُوْا بِطَاعَةِ اللهِ وَاتَّقُوْا مَعَاصِىَ اللهِ وَمُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِاِمْتِثَالِ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِى فَذَالِكَ وِقَايَةٌ لَهُمْ وَلَكُمْ مِّنَ النَّارِ 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আল্লাহর নাফরমানীকে ভয় করে তা থেকে বেঁচে থাকো, তোমাদের সন্তানদেরকে আদিষ্ট কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দাও। এটা দোযখ থেকে তাদের ও তোমাদের বাঁচার উপায় ।'

এর ভেদ হলো, সন্তান বড় হওয়ার মুহূর্তে চোখ খুলেই যেন আল্লাহর আদেশ দেখে তা মানার এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। চিন্তা -চেতনা ও বিবেক বুদ্ধিও সূচনালগ্নে হালাল-হারাম বুঝতে পারলে এবং শৈশবে শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারলে, পরবর্তীতে ইসলামী জীবন বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে না।

৩. সাত বছর বয়সে শিশুকে ইবাদত পালনের আদেশ দিতে হবে। আমর বিন আস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

'সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজ পড়ার আদেশ দাও, দশ বছর বয়স হলে মার দাও এবং শোয়ার বিছানা আলাদা করে দাও।' (হাকেম, আবু দাউদ)

নামাজের উপর কেয়াস বা ধারণা করে রোজা রাখতে সক্ষম হলে তাদেরকে রোজার জন্য অভ্যস্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে, পিতার সামর্থ্য থাকলে সন্তানকে হজ্বের অভ্যাস করানোও ভালো।

এর রহস্য হলো, সন্তান প্রথম জীবনেই যেন এসকল ইবাদতের হুকুম জানতে পারে, অভ্যাস করতে শেখে, আল্লাহর আনুগত্যের উপর গড়ে ওঠে, তাঁর অধিকার পূরণ করে, শুকরিয়া আদায় করে, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আস্থা রাখে ও ভরসা করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর মাধ্যমে সে আত্মার পবিত্রতা, শারীরিক সুস্বাস্থ্য, আদব-শিষ্টাচার এবং কথা ও কাজের সংশোধন করতে পারে।

১. রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবারকে ভালোবাসা এবং কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেয়া : আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَدِّبُوْا اَوْلاَدَكُمْ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ : حُبُّ نَبِيِّكُمْ وَحُبُّ آلِ بَيْتِهِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ, فَاِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْاٰنِ فِىْ

ظِلِّ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ 'তোমরা নিজ নিজ সন্তানদেরকে তিনটি অভ্যাস শিক্ষা দাও : ১. তোমাদের নবী ও ২. তাঁর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং ৩. কোরআন তেলাওয়াত। কোরআন শিক্ষাকারীরা সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় নবী ও নেক লোকদের সাথে থাকবে, যে দিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না।' (তাবারানী)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ, সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র, মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনী এবং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এগুলো সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে।

এর কারণ হলো, সন্তান যেন পূর্বসূরীদের জেহাদ ও বীরত্ব গাঁথাকে আত্মস্থ করতে পারে। ইতিহাসের ইজ্জত-সম্মান ও গর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং কোরআন কারীমকে যেন আত্মার খোরাক ও জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

সন্তানকে কোরআন তেলাওয়াত, রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-জেহাদ এবং আমাদের পূর্বসূরীদের বীরত্ব গাঁথা শিক্ষাদানের কর্তব্যের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ এবং কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতাম।

২. ইমাম গাজালী (র) এহইয়াউল উলুম বইতে শিশুদেরকে কোরআন মাজিদ, বিভিন্ন ঘটনার খবরা খবর, নেক লোকদের কাহিনী এবং কিছু দ্বীনি হুকুম ও মাসলা শিক্ষা দেবার উপদেশ দিয়েছেন।

৩. ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকাদ্দমা' বইতে শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বিষয় হিসেবে থাকা উচিৎ। কেননা তা দ্বীনের অন্যতম নিদর্শন যা ঈমান ও আকীদাকে মজবুত করে।

৪. ইবনে সিনা তাঁর 'আসসিয়াসাহ' বইতে লিখেছেন, শিশু শারীরিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে উপযুক্ত হবার সাথে সাথেই তাকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে সে মৌলিক ভাষার সুধা পান করবে এবং নিজ অন্তরে ঈমানের বিষয়গুলো মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

৫. ইতিহাস ও সাহিত্য পুস্তকে বর্ণিত আছে। একবার ফদল বিন যায়েদ এক

গ্রামীণ আরব মহিলার ছেলেকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তিনি মহিলাটির কাছে ছেলের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চান। মহিলাটি বলেন, বয়স পাঁচ হলে শিশুটিকে শিক্ষকের কাছে পাঠাই। সে কোরআন হেফজ করে। শিক্ষক তাকে কবিতা শিক্ষা দেন। পরে সে কবিতা আবৃত্তি করে। তাকে নিজ কওমের শৌর্য-বীর্য শিক্ষা দেয় এবং তার পূর্ব পুরুষদের বীরত্ব গাঁথার তালিম দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে আমি তাকে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করাই। সে ঘোড়দৌড় শিখে ভালো ঘোড় সওয়ারী হয়। তারপর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহল্লায় টহল দেয় এবং কোন ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ এলে তা শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কোরআন দিয়েই শুরু করতে হবে। কোরআন তেলাওয়াত, বিশুদ্ধ ও সুন্দর সুরে কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে সন্তানের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়, বিনীত হয় এবং চোখ অশ্রুসজল হয়।

এর আগের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুর জন্মের পরই তাকে ঈমানের মূলনীতি, ইসলামের রোকন, শরীয়তের বিধান, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভালোবাসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষাবিদ ও নীতিবিদদের মতে জন্মের সময় সন্তান আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিশ্বাস এবং পবিত্রতা ও নির্দোষ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়। তাকে যদি ঘরে উপযুক্তভাবে গঠন, সমাজে নেক লোকদের সাথে সাহচর্য এবং ঈমান-বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে সে মজবুত ঈমান, উন্নত চরিত্র এবং নেক শিক্ষার ওপর গড়ে উঠবে।

কোরআন কারীম এই ঈমানী ফেতরাত বা স্বভাবকে স্বীকার করে। হাদিস একে নিশ্চিত করে এবং শিক্ষাবিদ ও নীতিবিদরা একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ মর্মে কোরআন বলে, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ 'আল্লাহ মানুষকে ঈমানী স্বভাব ও প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।' (সূরা আর রূম-৩০)

এর আরেক তাফসীর হলো, 'এই ঈমানী ফেতরাত বা স্বভাব পরিবর্তন করা উচিৎ নয়।' কেউ কেউ 'ফেতরাত' শব্দের অর্থ করেছেন, 'দ্বীন বা সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা।' এর অনুকূল ব্যাখ্যা রয়েছে নিম্নোক্ত হাদিসে। আবু হোরায়রা (রা)

থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'সকল নবজাত সন্তান 'ফেতরাত' বা ঈমানী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজারী বানায়.....। (বোখারী)

ঈমাম গাজালী (র) শিশুর ঈমানী স্বভাব ও প্রকৃতির কারণে তাদেরকে ভালো কিংবা মন্দ কাজে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যাপারে মন্তব্য করেন। তা হলো, 'শিশু মাতা-পিতার কাছে আমানত এবং তার অন্তর মূল্যবান মণি-মুক্তা। তাকে যদি ভালো কাজ শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তাকে খারাপ কাজে অভ্যস্ত করা হয় কিংবা পশুর মতো উপেক্ষা অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে সে হতভাগ্য ও ধ্বংস হবে। তার রক্ষণাবেক্ষণ হলো, তাকে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেয়া। সন্তানের নির্দোষ ও নির্মল চারিত্রিক গুণ এবং ঈমানী ফেতরাত বা স্বভাবের অস্তিত্বের কারণে আমরা জানি যে, সে যদি খারাপ ও বিকৃত ঘরে লালিত-পালিত হয়, ভ্রান্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে, নষ্ট দলের সাথে মেশে, নিঃসন্দেহে সে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির দুধ পান করবে, নিকৃষ্ট চারিত্রিক গুণ ধারণ করবে এবং কুফর ও গোমরাহীর নীতিমালার শিক্ষা গ্রহণ করবে। তারপর দ্রুত সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যে, ঈমান থেকে কুফরী এবং ইসলাম থেকে অনৈসলামের দিকে মোড় নেবে। তখন তাকে সত্য এবং ঈমান ও হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনা কষ্টকর হবে।

এখন আমরা সন্তান গঠন ও শিক্ষাদানকারীদের উদ্দেশ্যে আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং গোমরাহী ও নষ্টামীর কিছু কারণ তুলে ধরবো।

১. যে পিতা সন্তানকে বিদেশী অমুসলিমদের পরিচালিত স্কুলে কিংবা খ্রিস্টান মিশনারীদের শিক্ষা ইনস্টিটিউটে পাঠায়, সে সন্তান অসুমলিমদের দুধ পান করে বেড়ে উঠবে ও অমুসলিম শিক্ষকদের কাছে থেকে শিক্ষা ও নির্দেশনা লাভ করবে। নিঃসন্দেহে সে শিশুটির চরিত্রে নষ্টামী ও গোমরাহীর ছাপ দেখা যাবে, কুফরী ও নাস্তিকতার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা বাড়বে এবং তার মনের অগোচরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও বৈরীভাব সৃষ্টি হবে।

২. যে পিতা সন্তানকে কাফের শিক্ষকের কাছে সোপর্দ করে, তারা তাকে কুফর ও গোমরাহী শিক্ষা দেবে, মনের মণি কোঠায় নষ্টামী ও বিভ্রান্তির বীজ বপন করবে। ফলে সন্তান কুফরী ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা পোষণ করবে।

৩. পিতা যদি সন্তানকে নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের বই-পুস্তক পড়ার অনুমতি দেয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মিশনারী ও উপনিবেশবাদীদের উদ্ভট দোষ-ত্রুটি জানতে দেয়। নিঃসন্দেহে সে শিশু নিজ আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করবে, নিজ ইতিহাস ও গৌরবের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে এবং ইসলামের নীতিমালার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করবে।

৪. পিতা যদি সন্তানের লাগাম ঢিলা করে দেয় এবং খারাপ বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলার অনুমতি দেয়, তাহলে সন্তান খারাপ বন্ধু-বান্ধবের ভ্রান্ত নীতি এবং চরিত্র গ্রহণ করবে এবং আমদানীকৃত চিন্তাধারা ও মতাদর্শকে আপন করে নেবে। পিতাকে অবশ্যই সকল দ্বীনি মূল্যবোধ ও আসমানী দ্বীন ও শরীয়ার নীতি ও মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকতে হবে।

৫. পিতা যদি সন্তানকে কুফরী দল বা গোষ্ঠীর সাথে শামিল হবার সুযোগ দেয়, কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা ও সম্প্রদায়ের সাথে মিশে কাজ করার অনুমতি দেয়, অথবা ইসলাম বিরোধী কোন দলের সদস্য হতে দেয়, নিঃসন্দেহে সন্তান ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং কুফরী নীতিমালার ওপর গড়ে উঠবে। তখন সেটা হবে পবিত্র আসমানী দ্বীনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল।

পিতা-মাতার দায়িত্বের পরিধি

সন্তানকে ঈমানী শিক্ষা এবং ইসলামী নীতিমালা শেখানো মাতা-পিতাসহ সকল শিক্ষকের বিরাট দায়িত্ব। তাই আমাদের কর্তব্য, এই দায়িত্বের সীমা ও পরিধি ভালো করে জানা। এখন আমরা এই দায়িত্বের পর্যায়ক্রমিক পরিধি আলোচনা করবো।

১. সন্তানকে আল্লাহ, তাঁর শক্তি ও কুদরত এবং মহান স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত করা :

আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা :

শিশুর বয়স যখন ভাল মন্দ পার্থক্য করার, অনুভূত বিষয় থেকে যুক্তিসংগত বিষয় আলাদা করার, আংশিক বিষয় থেকে পূর্ণ বিষয় এবং সহজ থেকে ব্যাপক ও জটিল বিষয় বুঝার পর্যায়ে পৌঁছে, তখনই তাকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে ঈমানকে তার মনে বদ্ধমূল করতে হবে। শিশুকাল থেকেই শিশুর মনে ঈমানী চেতনা দৃঢ় হলে এবং তাওহীদের চিন্তা বদ্ধমূল হলে, ধ্বংসের কোদাল তার আবাদ অন্তর থেকে ঈমানকে কেড়ে নিতে এবং মন্দের আহ্বানকারীরা তার পরিপক্ক বিবেকের

উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে, এমনকি অন্য কেউ তার ঈমানী মানসিকতাকে টলটলায়মান করতে পারবে না। কেননা ইতোমধ্যেই তার ইমান স্থায়ী, মজবুত ও তৃপ্ত হয়েছে।

বাস্তব সত্যে পৌছানোর লক্ষ্যে নিচু থেকে উঁচু এবং অনুভূতি থেকে যুক্তির দিকে যাওয়ার এই পর্যায়ক্রমিক স্তর কোরআনী পদ্ধতিরই প্রতিধ্বনি। এ মর্মে কোরআনের নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো উত্তম নমুনা।

আল্লাহ বলেন : "তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন কর, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। তিনিই তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত-দিন, সূর্য এবং চাঁদকে। তারকাসমূহ তারই বিধানে কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে উপদেশ গ্রহণকারী ও বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলি। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রং-বেরঙের জিনিস সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে, তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই সমুদ্রকে অনুগত করেছেন, যেন তা থেকে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় গয়না-অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে। যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা তালাশ কর এবং তার শুকরিয়া আদায় কর। তিনি পৃথিবীর বুকে বোঝা রেখেছেন, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন যেন তোমরা পথ চলতে পার। তিনি পথনির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন। তারকা দ্বারাও মানুষ পথের দিশা পায়। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না?" (সূরা নাহল : ১০-১৭)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর মহান আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন, এর দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তারই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে- নিশ্চয় সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।' (সূরা বাকারা : ১৬৪)

আল্লাহ বলেন, “মানুষের দেখা উচিৎ, কি জিনিস থেকে সে সৃজিত হয়েছে, সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে। নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।” (সূরা আত-তারেক : ৫-১০)

আল্লাহ বলেন : “মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, এরপর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি, যেমন : আঙ্গুর, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, ঘন বাগান, ফল এবং ঘাস, তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।” (সূরা আবাসা : ২৪-৩২)

আল্লাহ আরো বলেন : “তুমি কি দেখনি আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, এরপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল বের করি? পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ, সাদা লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ, অনুরূপভাবে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদী প্রাণী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।” (সূরা ফাতের : ২৭-২৮)

আল্লাহ বলেন : তারা কি তাদের উপর অবস্থিত আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয় না- আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। আমি ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি। এটা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার।” (সূরা ক্বাফ : ৬-৮)

এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল, কুদরত ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যেন তাঁর সৃষ্টি নিয়ে সন্তানেরা শুরু থেকেই চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান গবেষণা করে।

২. তাদের অন্তরে বিনয়, আল্লাহভীতি এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের প্রতি দাসত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা। তাদের চোখকে আল্লাহর শক্তি ও অলৌকিকতা এবং প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার বিশাল কর্তৃত্ব- সে জিনিস ছোট হোক আর বড় হোক, জীবিত হোক বা স্থবির হোক- গাছপালা, রং-বেরঙের সুন্দর ফুল-ফল, লক্ষ-কোটি অদ্ভুত ধরনের সৃষ্টিসহ নূতন নূতন সৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ করাতে হবে। এগুলো দেখলে আল্লাহর মহত্ত্বের কাছে বিনীত এবং অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি না হয়ে পারে না। ফলে আল্লাহর ইবাদতে স্বাদ ও মজা পাবে।

মনের বিনয়-ভাবকে জোরদার করার কিছু উপায় আছে। সেগুলো হলো : ভাল-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে নামাযে বিনয় ভাব সৃষ্টির অভ্যাস করা এবং কোরআন শুনলে কাঁদা কিংবা কান্নার ভান করা শিক্ষা দিতে হবে। এটা হলো : আল্লাহ প্রেমিকদের গুণ, নেক বান্দাদের নিদর্শন এবং সত্যপন্থী মোমেনদের বৈশিষ্ট্য।

এখন আমরা বিনয়ীদের মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ক কিছু আয়াত তুলে ধরছি।

আল্লাহ বলেন : قَدْ افلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ "সে মোমেনরা সফল হয়েছে যারা তাদের নামাযে বিনয়ী।" (সূরা আল মোমেনুন : ১-২)

আল্লাহ বলেন : اَللهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِىْ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ "আল্লাহ উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে চামড়ার উপর তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে নরম হয়। এটাই আল্লাহর পথ প্রদর্শন, এর মাধ্যমেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা যুমার-২৩)

মহান আল্লাহ বলেন : وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُم "আর বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয়।" (সূরা হজ্ব-৩৪)

আল্লাহ বলেন : "তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং কাঁদত।" (সূরা মরিয়ম-৫৮)

তিনি আরো বলেন, اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ 'যারা মোমেন, তাদের কি আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?' (সূরা হাদীদ-১৬)

রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কেরাম এবং নেক পূর্বসূরীরা সকলেই ছিলেন বিনয়ী। বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, قْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ 'আমার কাছে কোরআন তিলাওয়াত কর।' আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে কোরআন তিলাওয়াত করবো, অথচ আপনার উপরইতো কোরআন নাযিল হয়?' জবাবে নবী (সা) বলেন, 'আমি অন্যের কাছ থেকে কোরআন শুনতে ভালোবাসি। আমি সূরা নিসা তিলাওয়াত করি, যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছি : 'যখন আমি সকল উম্মত থেকে সাক্ষী হাজির করবো এবং

তাদের উপর আপনাকে সাক্ষী বানাবো, তখন কেমন হবে? (সূরা নিসা-৪১) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার এতটুকু পর্যন্ত পড়াই যথেষ্ট। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর দু'চোখ মোবারক থেকে অশ্রু ঝরছে।

আবু সালেহ বলেন, ইয়েমেন থেকে আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর কাছে কিছু লোক আসল। তারা কোরআন পড়ে কাঁদতে লাগল। এটা দেখে তিনি বলেন : আমরাও এরূপ ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের মন কঠোর হয়ে গেছে।

আমাদের পূর্বসূরীদের নামাযে কাঁদা ও বিনয় এবং কোরআন শুনে কাঁদার বহু ঘটনা রয়েছে। জীবন চরিত ও কাহিনী গ্রন্থে সেগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিভাবক কিংবা শিক্ষক শিশুকে বিনয় ও কান্নায় অভ্যাস করাতে হয়তো যথেষ্ট বেগ পাবেন। কিন্তু প্রথমে তাদেরকে সচেতন করা, এরপর ধৈর্যসহকারে চেষ্টা করা এবং সবশেষে অনুকরণে অভ্যস্ত করা। তখন শিশু বিনয়কে মৌলিক গুণ ও তার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِقْرَءُوْا الْقُرْاٰنَ وَابْكُوا فَاِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوْا 'তোমরা কোরআন পড় ও কাঁদ, কান্না না আসলে কান্নার ভান কর।' (তাবারানী)

৩. আল্লাহ প্রত্যেকটি কাজ ও আচরণ দেখছেন- তাদের মনে এ স্পিরিট সৃষ্টি করতে হবে।

আল্লাহ মানুষের প্রতিটি কাজ দেখেন ও পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি প্রকাশ্য ও গোপন এবং চোখের খেয়ানত ও মনের গোপন কথা জানেন। সন্তানকে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ভিত্তিতে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে যেন কাজ, চিন্তা ও অনুভূতির সময় ঐভাবে চিন্তা করে।

কাজে আল্লাহর পর্যবেক্ষণের চিন্তার রূপ হলো, সে প্রত্যেকটি কাজে ও আচরণে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। কাজের আগে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করতে হবে। অন্য কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। তখনই কেবল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও সে কথা বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন,

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন বা আদর্শ।' (সূরা বাইয়্যেনা-৫)

শিক্ষক ও মাতা-পিতা সন্তানকে বুঝাবেন যে, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন আমল কবুল হবে না। এ মর্মে রাসূল (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ عز وجل لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ خَالِصًا وَّابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ 'আল্লাহ একনিষ্ঠ ও খালেস নিয়ত এবং তার সন্তোষের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন আমল কবুল করেন না।' (আবু দাউদ, নাসাঈ)

নবী করিম (সা) আরো বলেন, إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَّا نَوَى....... 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে।' (বোখারী ও মুসলিম)

সন্তানের চিন্তায় আল্লাহর পর্যবেক্ষণের অভ্যাসের ধরন এমন হতে হবে, যা স্রষ্টার নৈকট্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

তার চিন্তায় এ ধারণা ঢুকাতে হবে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা প্রয়োজন। বরং তার মন-মগজ ও অন্তরকে মহানবী (সা) এর আদর্শে অনুসারী করে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানকে খারাপ চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে আত্মসমালোচনা শিক্ষা দিতে হবে এবং তাকে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো মুখস্থ করাতে হবে। সেগুলোতে উপদেশ, দো'আ, আত্মসমালোচনা, আল্লাহর পর্যবেক্ষণ এবং তার কাছে আশ্রয় গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে। তার মধ্যে পবিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা থাকবে না, থাকবে না খারাপ জিনিস লাভের কামনা-বাসনা। যখনই শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দেবে কিংবা নিজ কুপ্রবৃত্তি প্ররোচনা দেবে, তখনই সে স্মরণ করবে যে আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখছেন ও তার কথা শুনছেন। মুসলমানের প্রথম শিক্ষক মহানবী (সা) ইহসান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি ইবাদতের সময় একথা মনে করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি আল্লাহকে দেখছ এরূপ ধারণা না করতে পার, তাহলে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, 'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে তাড়িত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। যাদের মনে আল্লাহভীতি আছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।' (সূরা আরাফ : ২০০-২০১)

আমাদের নেক পূর্বসূরীরা সন্তানদেরকে এভাবেই গড়ে তুলেছেন। ইমাম গাযালী তার এহইয়াউল উলুম বইতে লিখেছেন, আমাদের পূর্বসূরী সহল বিন আব্দুল্লাহ তাসাত্তুরি বলেন, 'আমি তিন বছর বয়সে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জাগতাম এবং আমার মামা মোহাম্মদ বিন সেওয়ারের নামায দেখতাম। তিনি একদিন আমাকে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহকে কি স্মরণ করবে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে স্মরণ করবো? তিনি বলেন, তুমি বিছানায় শোয়া অবস্থায় জিহ্বা নাড়াচাড়া করা ছাড়া মনে মনে বলবে, 'আল্লাহ আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে দেখছেন এবং পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।' আমি কয়েক রাত তা বলতে থাকলাম এবং তাকে তা জানালাম। তিনি শুনে বললেন : "এটা প্রতি রাত সাতবার বল।" আমি এটা করার পর তাকে জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি প্রতি রাত এগারবার বল।' আমি এরপর তাকে বললাম যে, আমি এর স্বাদ ও মজা পেয়েছি। এক বছর পর মামা আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছি তা সংরক্ষণ কর এবং কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখ। এটা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার উপকারে আসবে।' আমি বহু বছর এর উপর আমল করায় গোপনে এর বর্ধিত মজা উপলব্ধি করতে লাগলাম। একদিন মামা আমাকে বললেন, 'হে সহল, যার সাথে আল্লাহ আছেন, তাকে দেখেন ও পর্যবেক্ষণে রাখেন, সে কি কখনও গুনাহ করতে পারে?' সহল এরপর এক নেককার লোকে পরিণত হন। তার মামা শৈশবে তার মধ্যে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং দেয়ার ফলে তিনি বুজুর্গ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

এভাবে মুসলিম প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারলে তারা মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত-সম্মান ও শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। পশ্চিমা বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার ধারক শিক্ষাবিদরাও সন্তানকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন।

পাশ্চাত্যের সেরা গল্প লেখক দস্তয়ভস্কি বলেন, আল্লাহকে ত্যাগ করলে মানুষ শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হয়। ('মাবাহেজুল ফালসাফা' ওল ডিউর‍্যান্ট-২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬)

প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভলটেয়ার নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের প্রতি উপহাস করে বলেন, "তোমরা কেন আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় পোষণ কর? তিনি না থাকলে আমার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং আমার চাকর চুরি করত।"

যুক্তরাষ্ট্রের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হেনরী লুঙ্ক তার 'বিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তন' বইতে লিখেছেন, "মাতা-পিতারা সন্তানের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। অথচ, ইতোপূর্বে যে ধর্ম তাদের চরিত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে, এখন তাদের মধ্যে সেটার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। মূলত তারা সমাধানহীন সমস্যার মোকাবিলা করছে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং চরিত্রের উপর এর প্রভাবের পূর্ণাঙ্গ কোন বিকল্প নেই।"

কম্যুনিস্ট রাশিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টালিনের কন্যা সভেতলানা নিজ দেশ ও সন্তান ত্যাগ করার পেছনে ধর্মকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। সে নাস্তিকের ঘরে জন্মগ্রহণ ও লালিত-পালিত হওয়ায় পালনকর্তা-রবকে চিনত না বলে জানায়। ভুলে কিংবা স্বেচ্ছায় কেউ কখনও আল্লাহর কথা স্মরণ করত না। কিন্তু কৈশোরে পা দেয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে জোরদার অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর উপর ঈমান ছাড়া জীবনের কোন দাম নেই। এমন কি এ ধারণা-বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সে ভাবতে লাগল, জীবনের জন্য যেমন পানি ও বাতাস প্রয়োজন তেমনি ঈমানও প্রয়োজন। আর এই মানসিকতার পেছনে বাইরের কোন চাপ ছিল না।

দার্শনিক কান্ট ঘোষণা করেন, "তিন বিষয়ের উপর বিশ্বাস ছাড়া চরিত্রের কোন দাম নেই। সেগুলো হলো : ১. আল্লাহর অস্তিত্ব, ২. আত্মার চির স্থায়িত্ব, ৩. মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ।

এই আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহর উপর ঈমান সন্তানের সংশোধনের ভিত্তি এবং মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার চাবিকাঠি।

ঈমান না থাকলে কুফরী হবে একমাত্র অবলম্বন। কাফের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ
"যারা কাফের, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো খায় ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। তাদের বাসস্থান জাহান্নামের আগুন।" (সূরা মোহাম্মদ-১২)

প্রিয় ভাই, এখন আমরা শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা) এর শিক্ষাদানের একটি নমুনা তুলে ধরছি।

তিরমিযী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, 'হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ কর, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবে। আল্লাহর

আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ করলে তুমি তাকে তোমার সামনে পাবে। কোন কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছে চাও। সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। জেনে রাখ, সকল মানুষও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে এর বেশী কিছু করতে পারবে না, যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা সকলেই তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে এর বেশী করতে পারবে না যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। লেখা শেষে কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং কাগজের কালি শুকিয়ে গেছে।'

তিরমিযীর আরেক বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহর আদেশ-নিষেধের হেফাজত করলে তাকে তোমার সামনে পাবে। ভাল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করলে খারাপ ও কঠিন অবস্থায় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। জেনে রেখ, যা তোমার ওপর দিয়ে বয়ে যায়নি, তা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কথা ছিল না। আর তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল না। জেনে রেখ, ধৈর্যের সাথেই সাহায্য, বিপদের সাথে মুক্তি এবং কঠোরতার সাথে রয়েছে প্রশস্ততা।"

দ্বিতীয় অধ্যায়
নৈতিক চরিত্র গঠন করা

নৈতিক চরিত্র গঠনের গুরুত্ব

নৈতিক চরিত্র গঠন বলতে বুঝায়, সন্তানকে একগুচ্ছ ভাল নীতিমালা, সুন্দর আচার-অভ্যাস এবং উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্য ও পছন্দনীয় ব্যবহার শিক্ষা দেয়া। সন্তান সেগুলো জেনে সেভাবে অভ্যস্ত হবে। সে ভাল-মন্দের বিবেচনা শক্তি লাভের পর থেকে যৌবনের দায়িত্বশীল স্তরে পৌঁছার আগে ঐ অনুযায়ী চলবে। সন্দেহাতীতভাবে একথা সত্য যে, নৈতিক চরিত্র, বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক অনুভূতির মহান গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো মজবুত ঈমান এবং সঠিক দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে গঠন প্রক্রিয়ার ফসল।

শৈশবের কোমল-পাপড়ির শুভ সন্ধিক্ষণ থেকে শিশুর মনে আল্লাহর উপর ঈমান, তার ভয় ও পর্যবেক্ষণের অনুভূতি, তার উপর নির্ভরতা, তার কাছে সাহায্য চাওয়া ও আত্মসমর্পণের শিক্ষার মাধ্যমে মনে সকল মর্যাদা ও সম্মান এবং ভাল জিনিসের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিশুর সাথে খারাপ গুণ, মন্দ অভ্যাস, নিকৃষ্ট আচরণ ও ঘৃণিত জাহেলী অনুসরণের মাঝে একটা আড়াল তৈরি হয়। বরং তখন মনে ভাল জিনিসকে গ্রহণ করার মানসিকতা এবং মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রতি ভালবাসা জন্মে।

আমাদের সুযোগ্য পূর্বসূরী নেক লোকেরা এবং শিক্ষক ও মাতা-পিতারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এর সুফল লাভ করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে মোহাম্মদ বিন সেওয়ার কর্তৃক তার ভাগিনা তাসাত্তুরীকে অনুরূপ শিক্ষা দানের ঘটনা উল্লেখ করেছি এবং দেখেছি যে তা ছিল এক সফল অভিজ্ঞতা।

সন্তানের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যদি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়গুলো অনুপস্থিত থাকে তাহলে, শিশু আল্লাহর নাফরমানী, গুনাহ, গোমরাহী ও কুফরীর উপর গড়ে উঠবে। তখন সে নিজ কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, নাফসের দাসত্ব এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসার অনুসরণ করবে। সে শান্ত শিশু হলে গাফেল-উদাসীন, মৃতের মতো জীবিত এবং নিখোঁজের মতো অস্তিত্বের অধিকারি হবে। কেউ তার জীবন সম্পর্কে অনুভব

করতে পারবে না এবং তার মৃত্যুর পর কোন শূন্যতা দেখা দেবে না। এক আরব কবি যথার্থই বলেছেন, فَذَاكَ الَّذِىْ اِنْ عَاشَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ – وَاِنْ مَاتَ لَا تَبْكِىْ عَلَيْهِ اَقَارِبُهُ "সে এমন ব্যক্তি, জীবিত অবস্থায় কারো উপকারে আসেনি, আর মারা গেলে তার জন্য কোন আত্মীয় কাঁদবে না।"

আর যদি তার উপর পাশবিক দিক প্রভাবশীল হয়, তাহলে সে কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি মদমত্ত হবে। যৌবনে সকল নিষিদ্ধ কাজ করবে এবং এজন্য সকল পথ চষে বেড়াবে। তার কোন লজ্জা কিংবা দংশনকারী বিবেক থাকবে না।

আর যদি সে কঠোর ও কট্টর মেজাজের অধিকারী হয়, তাহলে সে যমীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং লোকদের উপর গর্ব-অহংকার প্রকাশ করবে, মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে চাইবে, জিহ্বার অহমিকা ও কাজের মাধ্যমে বড়াই প্রকাশ করবে। সে জন্য প্রয়োজন হলে, মানুষের মাথার খুলি দিয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরি এবং নিরীহ লোকের রক্ত দিয়ে এর সৌন্দর্য ও ডেকোরেশন করতে ইতস্তত করবে না।

আর যদি তার উপর শয়তানী দিক প্রভাবশীল হয় তাহলে, সে হীন ষড়যন্ত্র করে বেড়াবে, বন্ধুদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবে, মাইন পুঁতে সে সম্পর্কের ধ্বংস করবে, হত্যার উদ্দেশ্যে কূপের পানিতে বিষ মিশাবে, সহজ শিকারের জন্য পানি ঘোলা করবে, গুনাহর কাজকে সুন্দর দেখবে, অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজের প্রতি ঝুঁকবে এবং লোকদের শত্রুতা ও বৈরিতা সৃষ্টি করবে।

খারাপ নাফস বা নফসে আম্মারা তাদেরকে যে নোংরা ভূমিতে নিয়ে যায়, সে ময়লা-আবর্জনায় ঘুরপাক খেতে থাকে, তার বিকৃত মেজাজ যেদিকে তাকে ঠেলে দেয়, সে দিকেই ছুটাছুটি করে এবং নিজ নাফসের কামনা-বাসনার অন্ধ দাসে পরিণত হয়। কামনা-বাসনা সর্বদাই অন্ধ থাকে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ 'আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?' (সূরা কাসাস-৫০)

আমাদের এই আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, ঈমানী শিক্ষা বিকৃত মন-মেজাজকে সংশোধন, বাঁকা-বিভ্রান্ত লোককে সরল পথের সন্ধান এবং মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। এটা ছাড়া সংশোধন, স্থিতিশীলতা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জিত হবে না।

ঈমানের সাথে চরিত্র এবং আকীদার সাথে কাজের গভীর সম্পর্কের কারণে, পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদরা বলেছেন, "দ্বীনি আদর্শ ছাড়া স্থিতিশীলতা এবং আল্লাহর উপর ঈমান ছাড়া সংশোধন ও আদর্শ চরিত্র গঠন সম্ভব নয়।

জার্মান দার্শনিক ফিখতাহ বলেন, 'দ্বীনদারী ছাড়া চরিত্র অর্থহীন।'

ভারতের নেতা গান্ধীজী বলেছেন, 'ধর্ম ও চারিত্রিক মহান গুণাবলি একই জিনিস, একটাকে অন্যটা থেকে পৃথক করা যাবে না, সেগুলো অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম চরিত্রের জন্য প্রাণস্বরূপ, আর চরিত্র আত্মার জন্য আকাশস্বরূপ। অন্য কথায়, ধর্ম চরিত্রকে খাদ্য সরবরাহ করে হৃষ্টপুষ্ট করে, যেমন করে পানি গাছকে খাদ্য সরবরাহ করে পুষ্ট করে।'

বৃটিশ বিচারপতি ডিনেংগ সাবেক এক বৃটিশ মন্ত্রীর যৌন কেলেংকারীর উপর মন্তব্য করেন, 'ধর্ম ছাড়া নৈতিক চরিত্রের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং চরিত্র ছাড়া কোন আইন যথার্থ হতে পারে না।'

ধর্ম বা দ্বীনই হচ্ছে সচ্চরিত্রকে অসচ্চরিত্র থেকে পৃথক করার একমাত্র উৎস। দ্বীন মানুষকে মহান গুণাবলির সাথে সম্পৃক্ত করে এবং মানুষ সে লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে। দ্বীনের দ্বারা মানুষ স্বার্থপরতা, কামনা-বাসনার বন্যা এবং আচার-অভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

সন্তানের চারিত্রিক ও আচরণগত গুণাবলি সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশ হলো :

আইউব বিন মূসা নিজ পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ (সা) বলেন, 'সন্তানের জন্য পিতার পক্ষ থেকে ভাল আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দান অপেক্ষা উত্তম কোন উপহার নেই।' (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) বলেন, اَكْرِمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ 'সন্তানকে মর্যাদাবান কর এবং তাদেরকে ভাল আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।' (ইবনে মাজাহ)

আবদুর রাজ্জাক এবং সাঈদ বিন মনসুর প্রমুখ আলী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, হাদীসটি হলো :

عَلِّمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ وَاَدِّبُوْهُم 'তোমরা তোমাদের সন্তান ও পরিবারকে ভাল জিনিস ও আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।'

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) বলেন, مِنْ حَقِّ الْوَلَد عَلَى الْوَالِدِ اَنْ يُحْسِنَ اَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ 'পিতার উপর সন্তানের অধিকার হলো, তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া ও ভাল নাম রাখা।' (বায়হাকী)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'জন্মের সপ্তম দিনে ছেলের আকীকা দিতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং চুলসহ ময়লা-আবর্জনা দূর করতে হবে। ছয় বছর বয়সে পৌঁছালে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে হবে। তের বছর বয়সে পৌঁছালে নামায-রোযা না করলে মার দিতে হবে। ষোল বছর বয়সে পৌঁছলে পিতা তাকে বিয়ে দেবে। এরপর তার হাত ধরে বলবে : তোমাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছি, জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি, বিয়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে দুনিয়ায় তোমার পরীক্ষা ও ফেতনা থেকে এবং পরকালে আজাব থেকে তোমার জন্য পানাহ চাই।' (ইবন হিববান)

এসকল হাদীস শিক্ষক, বিশেষ করে, মাতা-পিতার উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করে। তারা যেন সন্তানকে উত্তম আচরণ এবং নৈতিক চারিত্রিক নীতিমালা শিক্ষা দেন। সন্তানের সংশোধন, বিকৃতির পরিশুদ্ধি, অন্যের সাথে সুন্দর আচরণ, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সত্যের উপর অবিচল থাকা, ত্যাগ ও কোরবানী, বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করা, বড়দেরকে সম্মান, মেহমানের আতিথেয়তা, প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও অন্যদের প্রতি ভালবাসা শিক্ষা দিতে হবে। তাদের জিহ্বাকে গালি-গালাজ, খারাপ শব্দ উচ্চারণ ও খারাপ জিনিস, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা হানিকর এবং খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে রাখতে হবে। তাদের মধ্যে মহান মানবিক গুণাবলি, উদার মনোভাব, ইয়াতীমের প্রতি স্নেহ-দয়া, ফকির-গরীবের প্রতি করুণা এবং বিধবা ও নিঃস্ব লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর গুণাবলি শিক্ষা দিতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সর্বদা তাদেরকে তদারকী ও তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং তাদেরকে অব্যাহত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এজন্য ৪টি বিষয়ে পর্যায়ক্রমে তদারকী করতে হবে। সেগুলো হলো : ১. মিথ্যার আশ্রয় নেয় কিনা, ২. চুরির অভ্যাস আছে কিনা, ৩. গালি-গালাজ করে কিনা ও ৪. যৌন বিকৃতি আছে কিনা।

১. মিথ্যা : মিথ্যা বলা খুবই মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ। অভিভাবক ও শিক্ষকসহ স্কুলের কর্তব্য হলো, এ ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দেয়া এবং সন্তানকে মিথ্যা থেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। মিথ্যা মুনাফেকীর লক্ষণ। এ মর্মে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যার মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে সে খাঁটি মোনাফেক। যার মধ্যে চারটির একটি অভ্যাসও

থাকবে, তার মধ্যে মোনাফেকীর একটি অভ্যাস আছে, যে পর্যন্ত না সে তা ছেড়ে দেয়। সেই চারটি অভ্যাস হলো : ১. আমানতের খেয়ানত করা ২. মিথ্যা বলা ৩. ওয়াদা-অঙ্গীকার বা চুক্তি করে ভঙ্গ করা এবং ৪. বিরোধ দেখা দিলে অন্যায় ও গুনাহর আশ্রয় নেয়া।" (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি নজর দেবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো : বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যুক বাদশাহ এবং অহংকারী ফকীর।" (মুসলিম)

মিথ্যুকের জন্য এর চাইতে নিকৃষ্ট বিষয় আর কি হতে পারে? এছাড়াও সে আল্লাহর কাছে মিথ্যুক হিসেবে চিহ্নিত হয়। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা বিশেষ করে মিথ্যা থেকে দূরে থাক। মিথ্যা গুনাহ। আর গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। বান্দা অব্যাহত মিথ্যা বলতে ও চিন্তা করতে থাকলে, আল্লাহর কাছে মিথ্যুক লেখা হয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, নবী করিম (সা) এটাকে বড় খেয়ানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুফিয়ান বিন উসাইদ হাদরানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ 'এটা হচ্ছে বড় খেয়ানত, তুমি তোমার ভাইকে কথা বলছ, সে সেটাকে সত্য মনে করছে, অথচ তুমি তাকে বলছ মিথ্যা।' (আবু দাউদ)

মিথ্যার এই মারাত্মক পরিণতিকে সামনে রেখে শিক্ষক ও অভিভাবকের কর্তব্য হলো, সন্তানকে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, তা থেকে দূরে থাকা, এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং এই পিচ্ছিল পথে পা বাড়ানো থেকে বিরত রাখা। সন্তানের শিক্ষার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত বা নমুনা সর্বজন স্বীকৃত। তাই সন্তানের কাছে অভিভাবক কিংবা শিক্ষকের কখনও মিথ্যা বলতে নেই। তাদের কান্না থামানো, কোন বিষয়ে উৎসাহ দান কিংবা তাদের রাগ সামলানোর জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না। মিথ্যা বললে বা করলে, তারা সন্তানের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবেন। মিথ্যার চাইতে অধিক নিকৃষ্ট কাজ দ্বিতীয়টি নেই।

তাই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী (সা) শিশুদের কাছে মিথ্যা বলার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। যদি সেটা খেল-তামাশা, উৎসাহ-উদ্দীপনা দান কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপের আকারেও হয়।

আবদুল্লাহ বিন আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদিন আমার মা আমাকে ডাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে বসা। আমার মা বলেন : এদিকে আস, তোমাকে একটা জিনিস দেবো। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, কি দেবে? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুর দেয়ার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, তুমি তাকে কিছু না দিলে তোমার জন্য একটা মিথ্যা লেখা হবে।” (আবু দাউদ, বায়হাকী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ قَالَ لِصَبِىٍّ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِىَ كَذِبَةٌ ‘যে শিশুকে বলে যে, আস এবং জিনিস নিয়ে যাও, কিন্তু শেষে তাকে দিল না, এটা একটা মিথ্যা।’ (আহমদ)

আমাদের নেক পূর্বসূরীরা তাদের সন্তানকে সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার রক্ষার জন্য অভ্যস্ত করে গেছেন। প্রখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ) বলেন : আমি শৈশব থেকেই সত্যবাদিতাকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি এলেম অর্জনের লক্ষ্যে বাগদাদ থেকে মক্কা রওনা হই। পথের খরচের জন্য আমার মা আমাকে চল্লিশ দীনার দেন এবং সত্যের উপর অটল থাকার নির্দেশ দেন। আমি হামদানে পৌঁছালে একদল ডাকাতের সম্মুখীন হই। তারা আমাদের কাফেলাকে লুটপাট করে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে কী সম্পদ আছে? আমি তাকে আমার সাথে যা আছে তা বললাম। সে আমাকে তার সর্দারের কাছে নিয়ে যায়। সেও আমাকে একই প্রশ্ন করে এবং আমিও একই উত্তর দেই। তখন সে আমাকে সত্য কথা বলার কারণ জিজ্ঞেস করে। আমি বললাম, মা আমার কাছ থেকে সত্য বলার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করি। সর্দারের মনে ভয় ঢুকল। সে চিৎকার করে নিজের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং বলে, তুমি তোমার মায়ের অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করছ, অথচ, আমি আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করি না। তারপর সে কাফেলার লুটপাটিত জিনিস ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয় এবং বলে, আমি তোমার হাতে আল্লাহর কাছে তওবা করছি। দলের অন্য লোকেরা বলল, তুমি চুরি ডাকাতিতে এতদিন আমাদের নেতা ছিলে, আজ তুমি তওবার ক্ষেত্রেও আমাদের নেতা। তারা সকলেই সত্যবাদিতার বরকতে তওবা করে সৎপথে ফিরে এলো।

২. **চুরি** : ক্ষতির দিক থেকে চুরি মিথ্যা অপেক্ষা কম বিপদজ্জনক নয়। যে সমাজে ইসলামী চরিত্র দৃঢ়মূল নয় এবং ঈমান ও ইসলামী শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সে সমাজে চুরির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই কথা পরিষ্কার যে, যে শিশু আল্লাহর ভয় ও পর্যবেক্ষণ এবং আমানত ও অধিকার আদায়ের ভিত্তিতে গড়ে

উঠেনি, সে শিশুর মধ্যে চুরি ও খেয়ানতের প্রবণতা দেখা যাবে। সে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করবে এবং সমাজ তার উৎপীড়ন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। সে কারণে মাতা-পিতা ও শিক্ষকের উচিত, শিশুর মনে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা এবং চুরির মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সচেতন করা।

আফসোস, অনেক বাবা-মা সন্তানের কাছে মওজুদ দ্রব্য ও নগদ অর্থ সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর রাখে না।

সন্তান যদি বলে যে, সে তা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে কিংবা কোন বন্ধু তাকে উপহার দিয়েছে, তারা সেটা বিশ্বাস করে এবং মিথ্যা কথায় আশ্বস্ত হয়। তখন বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা তদন্তের প্রয়োজন অনুভব করে না। স্বভাবতই শিশু চুরির অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় মিথ্যার আশ্রয় নেবে এবং অভিভাবক তদন্ত না করলে কিংবা খতিয়ে না দেখলে সে একাজ থেকে বিরত হবে না।

আর যদি মাতা-পিতা উভয়ে কিংবা তাদের একজন সন্তানকে চুরির জন্য উৎসাহিত করে, তাহলে সেটা হবে সবচাইতে বড় দুর্যোগ।

আল্লামা সেবাঈ তার '*আখলাকুনা আল-ইজতেমাইয়া*' বইতে উল্লেখ করেছেন, এক শরীয়াহ আদালত চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কাটার রায় দেয়। হাত কাটা বাস্তবায়নের দিন ব্যক্তিটি জোরে চিৎকার দিয়ে বলে, আমার হাত কাটার আগে আমার মায়ের জিহ্বা কাট। আমি সর্বপ্রথম আমাদের এক প্রতিবেশীর একটি ডিম চুরি করি। আমার মা আমাকে ধমক দেয়নি কিংবা ফেরত দেয়ার কথা বলেনি। বরং তিনি ওলু ধ্বনি দিয়ে সেটিকে স্বাগত জানান এবং প্রশংসার স্বরে বলেন, আমার ছেলে ব্যাটা হয়ে গেছে। সেদিন আমার মা যদি আমাকে উৎসাহ না দিতেন তাহলে, আজ আমি সমাজে চোর হিসেবে গড়ে উঠতাম না।

এখন আমরা সন্তানদেরকে সঠিক পথে চালানোর জন্য আমাদের পূর্বসূরীদের কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

খলিফা ওমার (রা) দুধের সাথে পানি মেশানোকে অপরাধ ও বেআইনী ঘোষণা করেন। কিন্তু শুধুমাত্র আইন কি ভেজাল মিশানো বন্ধের জন্য যথেষ্ট? আসলে শুধু আইন এক্ষেত্রে অপারগ। বরং আল্লাহর তদারকি কিংবা তার প্রতি ঈমানই কেবল তা বন্ধ করতে পারে। এখানে আমরা মা ও মেয়ের সেই প্রসিদ্ধ কাহিনী স্মরণ করবো যাতে মা অতিরিক্ত লাভের জন্য দুধের সাথে পানি মেশানোর ইচ্ছে পোষণ

করত কিন্তু ঈমানদার মেয়ে মাকে আমীরুল মোমেনীন ওমারের নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তখন মেয়ে মাকে বলল, যদিও আমীরুল মোমেনীন আমাদেরকে দেখছে না, কিন্তু তার পালনকর্তা মহান আল্লাহতো দেখছেন।

আরেকটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ বিন দীনার বলেন, 'আমি ওমার বিন খাত্তাব (রা) এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে পাহাড়ের উপর থেকে এক রাখাল বকরীসহ নেমে আসল। ওমার (রা) তাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের কাছে একটি বকরী বিক্রি কর। রাখাল বলল, আমিতো দাস। ওমার (রা) বলেন, তুমি তোমার মনিবকে গিয়ে বলবে যে, নেকড়ে বাঘ একটি বকরী খেয়ে ফেলেছে। রাখাল বলল, আল্লাহ কোথায়? একথা শুনে ওমার (রা) কেঁদে ফেললেন এবং দাসের সাথে তার মনিবের কাছে যান। তিনি গোলামটিকে কিনে আযাদ করে দেন এবং বলেন, আমি দুনিয়ায় তোমাকে এজন্য আযাদ করলাম যে, আশা করি তুমি তোমাকে পরকালে আযাদ করবে।

৩. গালি-গালাজ করা : শিশুদের মধ্যে গালি-গালাজ একটি বাস্তব ঘটনা। বিশেষ করে কোরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থানকারী সমাজে এই অবস্থা দেখা যায়। এর দু'টো প্রধান কারণ আছে।

(ক) খারাপ উদাহরণ : মাতা-পিতার মুখ থেকে গালি-গালাজ ও অশ্লীল বাক্য প্রকাশিত হলে সন্তান তা অনুকরণের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সন্তানও মন্দভাষী হতে বাধ্য।

(খ) খারাপ সাহচর্য : সন্তানকে রাস্তাঘাটে খারাপ সাথীর সাহচর্যে ছেড়ে দিলে, সে তাদের কাছ থেকে খারাপ শব্দ ও বাক্য শিখবে এবং তার গালি-গালাজের অভ্যাস সৃষ্টি হবে। এছাড়াও তার মধ্যে খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হবে। এজন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, সন্তানের সামনে আদর্শ স্থাপন করা এবং ভাল ও সুন্দর শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করা। এছাড়া, তাদেরকে রাস্তায় খেলা-ধুলা, খারাপ সাহচর্য এবং নষ্ট বন্ধু গ্রহণের সুযোগ না দেয়া। সন্তানদেরকে গাল-মন্দ ও জিহ্বার বিপদ সৃষ্টিকারী বিষয় সম্পর্কে হাদীস শিক্ষা দেয়া।

এখন আমরা গালি-গালাজের বিরোধী কিছু হাদীস উল্লেখ করবো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر "মুসলমানকে গালি দেয়া গুনাহ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।" (বোখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ। জিজ্ঞেস করা হলো, নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ দেয়া হয়?

তিনি বলেন, একজন আরেকজনের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। তখন সে পাল্টা তার মা-বাপকে গালি দেয়।" (বোখারী ও আহমাদ)

নবী (সা) বলেন, "বান্দা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী এমন বাক্য উচ্চারণ করে যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।"

তিনি আরো বলেন, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلىَ وُجُوْهِهِم اِلاَّ حَصَائِدُ اَلسِنَتُهُمْ "জিহ্বার কথার কারণেই বান্দাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" (নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الفَاحِشِ وَلا البَذِىْ 'মোমেন কথা দ্বারা কষ্টদানকারী, অভিশাপদানকারী, অশ্লীল ও অনর্থক বাক্য ব্যবহারকারী হতে পারবে না।" (তিরমিযী)

এখন আমরা আমাদের সলফে সালেহীনের সন্তানদের কথা-বার্তার আদব কায়দা, উত্তম ভাষণ ও সুন্দর বর্ণনার উদাহরণ পেশ করবো। তা দেখে পিতা-মাতারা বুঝতে পারবে, আমাদের অতীতের নেক সন্তানেরা কিভাবে কথা বলেছে।

উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালেকের আমলে গ্রাম এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামীন গোত্রের লোকেরা হিশামের কাছে আসে এবং তার দরবারে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে চৌদ্দ বছরের বালক দারওয়াস বিন হাবীবও ছিল। কওমের লোকেরা হিশামের ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদেরকে অসহায় ও সাহসহীন মনে করতে থাকে। হিশামের নজর বালকটির উপর পড়ে। হিশাম দারোয়ানকে বলে, আমার কাছে বালকসহ যে কেউ ইচ্ছা করলে আসতে পারে। বালক দারওয়াস বুঝতে পারলো যে, হিশাম তার সাথে কথা বলতে চায়। সে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার দরবারে আমার প্রবেশ আপনার কোন ক্ষতির কারণ নয়, বরং তা আপনার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। কওমের লোকেরা একটি অসহায় বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছে। কথা বলা প্রয়োজন। চুপ করে থাকার মানে কোন কিছুকে নথিপত্রে আটকে রাখার মতো। কথা না বললে সমস্যা বোঝা যায় না। হিশাম ছেলেটির কথায় খুশী হয়ে তাকে কথা বলার অনুমতি দেন।

বালক বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আমরা আজ তিন বছর দুর্ভিক্ষের শিকার। প্রথম বছরের দুর্ভিক্ষ আমাদের শরীরের চর্বি গলিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বছরের দুর্ভিক্ষ আমাদের শরীরের গোশত খেয়ে ফেলেছে। আর তৃতীয় বছরের দুর্ভিক্ষ আমাদের হাড়-হাড্ডিকে শুষ্ক করে দিয়েছে। আপনার কাছে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ

আছে। এই সম্পদ যদি আল্লাহর হয়, তাহলে তা অভাবগ্রস্ত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বিলি করুন। আর যদি আল্লাহর বান্দাদের হয়, তাহলে কেন তাদের সম্পদ আটকে রেখেছেন? আর যদি তা আপনার হয়, তাহলে তা তাদের মধ্যে বণ্টন করুন। আল্লাহ সাদকাহ দানকারীদেরকে ভালবাসেন এবং দাতার বিনিময় নষ্ট করেন না। হে আমীরুল মোমেনীন, জেনে রাখুন, প্রজার সাথে রাজার সম্পর্ক হলো, দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক। তাই আত্মা ব্যতীত দেহের কোন অস্তিত্ব নেই।

হিশাম বলেন, বালকটি সাধারণত পেশযোগ্য তিনটি ওজরের কোনটিই বাকী রাখেনি। তিনি গ্রামবাসীদেরকে এক লাখ দেরহাম এবং কেবল দারওয়াসকে এক লাখ দেরহাম দেয়ার নির্দেশ দেন। বালক দারওয়াস বলে, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি আমার অর্থ গ্রামবাসীদেরকে দিয়ে দিলাম। আমি তাদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আমীরুল মোমেনীনের আদেশের পথে আড়াল হওয়াকে অপছন্দ করি। তখন খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর কি প্রয়োজন আছে? বালক বলল, সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজনের বাইরে আমার আলাদা কোন প্রয়োজন নেই।

৪. যৌন বিকৃতি : বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েদের এটাই হলো সবচাইতে বড় ফেতনা ও বিপদ। আমরা যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীদেরকে এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত দেখতে পাই। তারা যৌন কেলেংকারী ও ফেতনা-ফাসাদে ফেঁসে যাচ্ছে। তাদের দ্বীন ও অন্তর ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা জীবনকে ভোগ-বিলাস ও যৌন কামনা-বাসনার লাগামহীন আচরণকে বুঝে থাকে।

কেউ কেউ অশ্লীল নাচ-গানকে উন্নতি ও প্রগতির মাপকাঠি মনে করে। তারা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে পছন্দ করে এবং পরাজিত মানসিকতা সহকারে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে। প্রতিরোধের ময়দানে যাওয়ার আগেই তারা পরাজিত হয়ে আছে।

নীতিমালা ও পদ্ধতি : রাসূলুল্লাহ (সা) অভিভাবক ও শিক্ষকদেরকে সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

এখন আমরা সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনাগুলো আলোচনা করবো।

১. অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা মোশরেকদের বিরোধিতা কর, গোঁফ ছোট কর ও দাড়ি লম্বা কর।' (বোখারী)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, গোঁফ ছোট কর, দাড়ি লম্বা কর এবং অগ্নি পূজারীদের বিরোধিতা কর।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى "যে আমাদের বিরোধীদের অনুসরণ করে সে আমাদের মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ করো না।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।' (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لاَ يَكُنْ اَحَدُكُمْ اِمَّعَةً يَقُوْلُ اَنَا مَعَ النَّاسِ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنْتُ وَاِنْ اَسَاءُوْا اَسَأْتُ وَلَكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا اَنْ تَجْتَنِبُوْا اِسَاءَتَهُمْ 'তোমাদের কেউ যেন এরূপ অযৌক্তিক অনুকরণকারী না হয় এবং একথা না বলে, আমি লোকদের সাথে তাদের মতোই থাকবো। লোকেরা ভাল কাজ করলে আমিও করবো এবং তারা খারাপ কাজ করলে আমিও করবো। বরং তোমরা নিজেদেরকে এভাবে প্রস্তুত কর যে, লোকেরা ভাল কাজ করলে আমিও ভাল করবো, তবে তারা খারাপ কাজ করলে আমি তা থেকে বিরত থাকবো।' (তিরমিযী)

বিজাতির কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণের সময় আমাদেরকে দু'টো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সেগুলো হলো :

ক. জায়েয বিষয়। যেমন : উপকারী জ্ঞান ও সভ্যতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, যুদ্ধ বিদ্যা ও উপকরণ, বস্তুর সত্যাসত্য ও পরমাণুর রহস্যসহ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকারী বিষয়গুলো। এগুলো নবী করিম (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীসের আওতায় পড়ে। 'সকল মুসলমানের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।' তিনি আরো বলেন, اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ كُلِّ حَكِيْمٍ فَاِذَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হেকমত বুদ্ধিমান লোকের হারানো সম্পদ। সে যদি সেটি পায়, তাহলে সে তার অধিক যোগ্য।' (তিরমিযী, আসকারী)

তাছাড়াও তা আল্লাহর নিম্নোক্ত আদেশের আওতায় পড়ে, 'তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সংগ্রহ কর।' (সূরা আনফাল-৬১)

খ. হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় : অমুসলিমদের আচরণ, চরিত্র, অভ্যাস, রীতি-নীতি, বেশ-ভূষা ইত্যাদি যা মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী ও চরিত্রের বিপরীত সেগুলো থেকে সন্তানদেরকে বিরত রাখতে হবে। কেননা, এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে, আত্মা ও ইচ্ছের পরাজয় ঘটে এবং মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অবনতি হয়।

২. ভোগ-বিলাসে যেন ডুবে না থাকে। ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পারস্যে অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে এক চিঠিতে লেখেন, إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ اَهْلِ الشِّرْكِ 'তোমরা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকা এবং মুশরিকদের পোশাক-আশাক পরার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, ذَرُوْا التَّنَعُّمَ وَ زِيَّ اَهْلِ الْعَجَمِ 'তোমরা ভোগ-বিলাস ত্যাগ কর এবং অমুসলিমদের পোশাক পরবে না।'

ইমাম আহমদ এবং আবু নাঈম মোআজ বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ 'তোমরা ভোগ-বিলাসে ডুবে থেকো না। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা কখনও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে না।

উপরিউক্ত আলোচনা বর্ণনাগুলোতে ভোগ-বিলাস বলতে অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস বুঝানো হয়েছে। যারা এর মধ্যে ডুবে থাকে, তারা দাওয়াতে দ্বীন ও জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত থাকে, তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ বিস্তারে সহায়ক হয়।

৩. বাজনা ও অশ্লীল গান শুনা থেকে নিষেধ করা : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আহমাদ বিন মোনাই এবং হারেস বিন উসামা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : إِنَّ اللّٰه عز وجل بَعَثَنِيْ رَحْمَةً وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَمْحَقَ الْمَزَامِيْرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْخُمُوْرَ وَالْاَوْثَانَ الَّتِي تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "আল্লাহ আমাকে গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত ও হেদায়েত দানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বাদ্যযন্ত্র, মদ ও জাহেলিয়াতের পূজনীয় মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।"

ইমাম বোখারী, আহমাদ, ইবন মাজাহসহ অন্যরা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لَيَكُوْنَنَّ فِيْ اُمَّتِيْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ
"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও আসবে যারা যেনা-ব্যভিচার, সিল্ক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।"

ইবন আসাকের নিজ ইতিহাস গ্রন্থে এবং ইবনে সারসারি তাঁর اَمَالِيْ গ্রন্থে আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন গায়িকার গান শোনার জন্য বসে, কেয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে।"

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنِ اسْتَمَعَ اِلَى صَوْتِ غِنَاءٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ اَنْ يَّسْتَمِعَ اِلَى صَوْتِ الرُّوْحَانِيِّيْنَ فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি গান শোনে, বেহেশতে তাকে রুহানী গায়কদের গান শুনার অনুমতি দেয়া হবে না। (তিরমিযী)

টেলিভিশন : এখন আমরা টেলিভিশন দেখার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি তা আলোচনা করবো।

রেডিও, টেলিভিশন ও রেকর্ডার বর্তমান যুগের মানব বুদ্ধির সর্বাধিক বিকাশের পরিচায়ক ও বিজ্ঞানের বিরাট অবদান। এগুলো দু'ধার বিশিষ্ট হাতিয়ার যা ভাল ও মন্দ উভয় খাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলোকে ভাল ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করা, উন্নত চরিত্র গঠন, বর্তমান প্রজন্মকে তাদের নিজেদের বর্তমান ও অতীত ইতিহাস শিক্ষাদান এবং মুসলিম উম্মাহর দ্বীন-দুনিয়ার সংস্কার ও সংশোধন ইত্যাদি। তখন এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে যদি সেগুলোকে নষ্টামী ও বিকৃতির প্রসার, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার কাজে কিংবা বর্তমান প্রজন্মকে অনৈসলামী পদ্ধতি শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এগুলোর ব্যবহার অবশ্যই নাজায়েয ও হারাম হবে। দুঃখের বিষয়, মুসলিম বিশ্বের বহু টেলিভিশন চ্যানেল অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং পর্দাহীনতা, অবাধ মেলা-মেশা ও যৌন উশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এর ফলে, মুসলিম সমাজে নৈতিক অধঃপতনের ধ্বস নেমেছে। সেগুলো বিদ্যা-বুদ্ধি কিংবা গঠনমূলক কাজে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। আমরা এখন এ মন্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ দিচ্ছি।

(ক) সকল যুগের আলেম-ওলামা ও মুজতাহিদ ইমামগণের মতে, ইসলামী

আইনের লক্ষ্য পাঁচটি। ১. দ্বীনের হেফাযত সহ, ২. বুদ্ধি-বিবেক ৩. বংশ ৪. জান ও ৫. মালের হেফাযত করা। তাদের মতে, কোরআন ও হাদীসে ইসলামী শরীয়াহ বা আইন সম্পর্কে যা কিছু এসেছে, সেগুলোর সবের লক্ষ্য হলো, এই পাঁচটি জিনিস। টেলিভিশনের বর্তমান কর্মসূচীর অধিকাংশই হলো,অশ্লীল ও প্রেম-পিরিতের গান, যৌন আবেদনমূলক নাটক-নাটিকা ও বিজ্ঞাপন, মূল্যবোধকে ধ্বংস করা এবং ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকে উৎসাহিত করা। এ কারণে শরীয়াত এ জাতীয় জিনিসগুলোকে বংশ ও ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে হারাম বিবেচনা করে। কেননা, এ যন্ত্রগুলো পাপ ও হারাম কাজ শোনা ও দেখার মাধ্যম।

(খ) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।" (মোআত্তা, ইবনে মাজাহ ও দারু কুতনী)

এই হাদীসের আলোকে, এ জাতীয় ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবহার নাজায়েয।

(গ) টেলিভিশনে প্রচারিত অধিকাংশ বিনোদনমূলক কর্মসূচি হচ্ছে, গান-বাজনা এবং উলঙ্গ নাচ ও পর্দাহীনতা। এগুলো নিঃসন্দেহে হারাম। এগুলোর ক্ষতি থেকে আমাদের বংশধরদেরকে রক্ষা করা খুবই জরুরী।

৪. নারীর বেশ-ভূষা ধারণ করা থেকে বিরত রাখা : সাঈদ বিন মোসাইয়েব থেকে বর্ণিত। মুআওইয়া (রা) মদীনা আসেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি একটি পরচুলা বের করে তা দেখিয়ে বলেন, ইহুদীরা ছাড়া অন্য কেউ তা ব্যবহার করে বলে আমার মনে হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) পরচুলার খবর জানতে পেরে এটাকে মিথ্যার বেসাতি আখ্যা দেন। (বোখারী)

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদিন মুআওইয়া (রা) বলেন : তোমরা মন্দ বেশ-ভূষা আবিষ্কার করেছ।" নবী করিম (সা) এ জাতীয় মিথ্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ "আল্লাহ মহিলাদের বেশ-ভূষা ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ-ভূষা ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ দেন।" (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবন মাজার আরেক বর্ণনায় এসেছে, لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ 'আল্লাহ পুরুষের

বেশ ধারণকারী নারী এবং নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন।'

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ وَاُحِلَّ لِاِنَاثِهِمْ "আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য সিল্ক ও সোনা হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" (তিরমিযী)

হাসান আলী থেকে বর্ণনা করেন এবং বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ডান হাতে সিল্ক ও বাম হাতে সোনা রেখে বলতে দেখেছি, এ দু'টো আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।" (আবু দাউদ-সনদ হাসান)

এর দ্বারা বোঝা গেল, পুরুষের জন্য সোনা ও সিল্ক ব্যবহার করা এবং নারীর বেশ ধারণ করা হারাম। আর মহিলাদের জন্য পরচুলা ব্যবহার, পুরুষের বেশ ধারণ করা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা হারাম। এগুলো সবই ইতরামী, নীচুতা, সম্মান-মর্যাদার অবমাননা এবং চরিত্র ও পুরুষত্বের হনন।

৫. মুখ খোলা রাখা, বেপর্দা ও অবাধ মেলামেশা এবং হারাম জিনিসের প্রতি নজর না দেয়া : এগুলো চরিত্র ধ্বংসের জন্য দায়ী। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মোমেন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের মাথার উপর থেকে বুকের উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়। যেন সহজে তাদেরকে চেনা যায় এবং এর ফলে তাদেরকে কষ্টদান ও নির্যাতন করা হবে না। আল্লাহ অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আহযাব-৫৯)

দয়ালু আল্লাহ আরো বলেন, মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবগত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন মাথার উপর থেকে বুকের উপর চাদর ঝুলিয়ে রাখে এবং নিজেদের স্বামী, পিতা ও মুহরাম ছাড়া অন্য কারো কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (সূরা নূর : ৩০-৩১)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শরীআতে মেয়েদের মুখ ঢাকা কতটা জরুরী?

১. আমরা এ বিষয়ে কোরআনের তাফসীরকার, সাহাবায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনের বক্তব্য শুনি।

ইবনে জারীর আত তাবারী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ মোমেন মহিলাদেরকে দরকারে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ওড়নার মাধ্যমে এক চোখ খোলা রেখে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনে জারীর ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেন, আমি ওবায়দাহ বিন হারেস হাদরামীকে আল্লাহর বাণী 'বুকের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার' বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি কাপড় দিয়ে নিজ মাথা ও মুখ ঢাকেন এবং এক চোখ খুলে দেখান।

ইবনে জারীর আত তাবারী ঐ আয়াতের তফসীরে বলেন, "মুসলিম স্বাধীন মহিলারা যেন ঘর থেকে প্রয়োজনে বের হওয়ার সময় দাসীর মতো পোশাক না পরে। অর্থাৎ যেন নিজেদের চুল ও মুখ খোলা না রাখে। তারা ওড়না ঝুলিয়ে রাখলে খারাপ লোকেরা তাদেরকে স্বাধীন নারী মনে করে উত্তক্ত করবে না।

আল্লামা আবু বকর আল-জাসসাস বলেন, এ আয়াতে যুবতীদেরকে অমোহরেম থেকে নিজ চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয় এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় শালীনভাবে হিজাব পরার কথা বলে যেন খারাপ লোকেরা তাদের প্রতি লোভ না করে।

আল্লামা কাজী তার তাফসীর 'বায়দাওয়ী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মহিলারা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় ওড়না বা চাদর দিয়ে নিজেদের মুখ ও শরীর ঢেকে রাখবে।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীরা বেপর্দায় চলাফেরা করত। দাসী ও স্বাধীন নারীর মধ্যে পোশাকের কোন পার্থক্য ছিল না। ইসলামের প্রথম দিকে মুসলিম রমণীরা সেভাবেই চলত। পরে তাদেরকে মাথা ও মুখ ঢাকার লক্ষ্যে ওড়না পরার নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণে সকল মোফাসসিরে কেরাম উক্ত আয়াতের আলোকে এ বিষয়ে একমত যে, মুসলিম রমণীদেরকে ওড়না পরে অমোহরেমদের থেকে নিজ চেহারা ঢাকতে হবে।

২. এবার আমরা মুসলিম রমণীর হিজাব ও মুখ ঢাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহীহ হাদীস এবং মহিলা সাহাবীদের মতামত তুলে ধরবো।

সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী ও মোআত্তা মালেকে বর্ণিত। নবী (সা) হজ্জের এহরামকারিণী মহিলাকে মুখে নেকাব ও হাতমোজা পরতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীস এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় নারীরা মুখে নেকাব এবং হাতমোজা পরত। তাই তাদেরকে এহরামের সময় তা পরতে নিষেধ করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে এহরাম পরা অবস্থায় ছিলাম। বিভিন্ন কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। তারা কাছে আসলে আমরা চাদর বা ওড়না মাথার উপর ফেলতাম এবং চলে গেলে আবার তা সরিয়ে ফেলতাম।

মুআত্তা ইমাম মালেকে ফাতেমা বিনতে আল-মোনজের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এহরাম পরা অবস্থায় আমাদের চেহারার উপর ওড়না দিয়ে রাখতাম। আমরা আসমা বিনতে আবু বকরের সাথে ছিলাম। তিনি তা নিষেধ করেননি।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নারীরা মাথার উপর দিয়ে মুখের উপর ওড়না পরত।'

বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে, হিজাব পরা মুসলিম রমণী ইহুদী বনি কাইনুকা গোত্রের বাজারে কেনা-কাটা করতে যায়। এক ইহুদী তার হিজাবের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সে নিজের দু'হাত দিয়ে তার মুখের পর্দা সরানোর ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু রমণীটি তা অস্বীকার করে ইহুদীর বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে। তখন এক মুসলমান ঐ ইহুদীকে হত্যা করে দু'হাত দিয়ে জোর করে পর্দা সরানোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এসকল সহীহ হাদীস, নবী-পত্নী এবং মহিলা সাহাবীদের ঘটনা প্রমাণ করে যে তারা প্রয়োজনে বাইরে গেলেও মুখ ঢেকে যেতেন। তারা এটাকে ফরয মনে করতেন।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেপর্দা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,
صِنْفَان مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا : قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ البقر يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسُ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الجَنَّة وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِكَذَا وَكَذَا
'আমি দু'ধরনের দোজখী লোককে এখনও দেখিনি (অর্থাৎ তারা ভবিষ্যতে আসবে)। এক ধরনের লোক এমন হবে, যাদের হাতে গাভীর লেজের মতো লম্বা বেত থাকবে এবং এটা দ্বারা তারা লোকদেরকে মারবে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো, কাপড় পরিধানকারিণী মহিলা অথচ উলঙ্গ যারা হেলে-দুলে চলবে ও

লোকদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে, তাদের মাথায় উটের নুয়ে পড়া কুঁজের মতো খোঁপা থাকবে। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এমনকি এর সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ, এত এত দূরত্ব থেকে এর সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের প্রসঙ্গে বলেন, وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى 'তোমরা ঘরেই অবস্থান কর এবং জাহেলী যুগের মতো বেপর্দাসহকারে বের হয়ো না।' (সূরা আহযাব-৩৩)

আল্লাহ বলেন, 'বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ে-শাদীর আশা করে না, যদি তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে নিজেদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে কেন দোষ নেই। তবে এটা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা নূর-৬০)

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ 'হে নবী, আপনি মোমেন পুরুষদেরকে বলে দেন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে।'

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ 'আপনি মোমেন মহিলাদেরকে বলে দেন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জা-স্থানের হেফাযত করে।' (সূরা নূর-৩০)

নারী পুরুষ একই স্থানে অবস্থান করলে কিভাবে তারা চোখ অবনত রাখবে? এর দ্বারা অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ- তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

আল্লাহ আরো বলেন, وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ ۚ لحِجَابِ ذٰلِكَ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ 'তোমরা পুরুষরা যদি তাদের (নারীদের) কাছে কিছু চাও, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।' (সূরা আহযাব-৫৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ وَّامْرَاَةٌ اِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا 'কোন পুরুষ ও মহিলা একাকীত্বে অবস্থান করলে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় ব্যক্তি।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'তোমরা মহিলাদের কাছে প্রবেশ করো না।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, দেবরের প্রবেশের হুকুম কী? তিনি বলেন দেবরতো মৃত্যু সমতুল্য।' (বোখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ মৃত্যুর মতোই দেবর থেকে অদৃশ্য থাকতে হবে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ 'মোহরম ব্যক্তি ছাড়া কোন মেয়েলোকের কাছে কোন পুরুষ যেন একাকী অবস্থান না করে।' (বোখারী ও মুসলিম)

অমোহরম নারীর প্রতি নজর দেয়া হারাম

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, 'হে নবী, আপনি মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে।' (সূরা নূর-৩০)

তিনি আরো বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً 'নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তরকে জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল-৩৬)

জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَقَالَ إِصْرِفْ بَصَرَكَ 'আকস্মিক নজর পড়ে যাওয়ার হুকুম কী? তিনি বলেন, তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও।' (মুসলিম)

উম্মে সালমাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাইমুনাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে ছিলাম। এমন সময় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম হাজির হলো। তখন পর্দার বিধান চালু হয়েছিল। নবী (সা) আমাদেরকে বলেন, তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয় এবং সে তো আমাদেরকে দেখতে ও চিনতে পারবে না? তখন তিনি বলেন, তোমরা কি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না? (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা রাস্তায় বসো না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, রাস্তায় না বসে উপায় নেই, আমরা বসে গল্প-গুজব করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তোমরা রাস্তায় বসতেই চাও, তাহলে, রাস্তার হক বা অধিকার আদায় কর। তারা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার অধিকার কী? তিনি বলেন, চোখ অবনত রাখা, কষ্ট না দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করা।' (বোখারী ও মুসলিম)

চরিত্র গঠনের জন্য এগুলো হচ্ছে খুবই উন্নত নীতি ও পদ্ধতি। এগুলো কোন

সমাজে বাস্তবায়িত হলে সে সমাজ পবিত্র ও সুন্দর হতে বাধ্য। আর সে সমাজের সন্তান ও যুব সমাজ সঠিকভাবে গড়ে উঠবে।

যৌন বিকৃতি থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে না পারলে সে সন্তানও বিকৃত হতে বাধ্য। এর ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় চরিত্র ধ্বংস এবং বিভিন্ন রোগ-শোকের আক্রমণ ঘটে।

এ মর্মে ড. আলকস কারলাইল তার 'অজ্ঞাত মানুষ' বইতে লিখেছেন, "মানুষের মধ্যে যৌন অনুভূতির সুড়সুড়ির সময় তা রক্তে এমন এক উপাদান সরবরাহ করে যা মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং তাকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। ফলে সে সুস্থ চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।"

জর্জ পেলোসী নামক আরেক পণ্ডিত তাঁর 'যৌন বিপ্লব' বইতে লিখেছেন, "কেনেডী ১৯৬২ সালে বলেছেন, আমেরিকার ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত। কেননা, যুব সমাজ যৌনতার মধ্যে ডুবে আছে। ফলে তারা নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। রিক্রুটের সময় সাতজন দরখাস্তকারীর মধ্যে ছয়জন অযোগ্য দেখতে পাওয়া যায়। যৌন বন্যার জোয়ার তাদের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাকে কেড়ে নিয়েছে।"

অপরদিকে, লেবানন থেকে প্রকাশিত 'আল-আহাদ' পত্রিকার ৬৫০ সংখ্যায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মিসেস মার্গারেট স্মীথের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রেমাবেগ ও এর উপকরণ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি সাড়া দেয় না। ফলে দেখা যায়, ৬০% ছাত্রী পরীক্ষা পাশ করতে পারে না। এই ব্যর্থতার মূল কারণ হলো, তারা নিজেদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা কেবলমাত্র যৌন বিষয়ের প্রতিই বেশী মনোযোগী।"

অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত, সন্তানকে যৌন আবেদনমূলক বিষয় থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা।

সন্তানের আচরণ ও চারিত্রিক বিকৃতির কিছু কারণ

১. পিতা যদি সন্তানকে খারাপ বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলার অনুমতি দেয় তাহলে, সন্তান তাদের অসৎ সংসর্গে খারাপ হতে বাধ্য।

২. সন্তানকে প্রেম-ভালবাসামূলক ফিল্ম দেখতে দিলে কিংবা অপরাধমূলক ফিল্ম দেখার সুযোগ দিলে সে সন্তান লম্পট ও দুষ্ট হতে বাধ্য। এগুলো এমন বিষয় যে

এর ফলে বড়রা পর্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। ছোটরা খারাপ হবে না কেন? এমন হতে দিলে পিতা নিজ হাতেই সন্তানকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।

৩. পিতা যদি সন্তানকে টেলিভিশনে উলঙ্গ ছবি, নাটক ও গুনাহর বিজ্ঞাপন দেখার সুযোগ দেয়, তখন সন্তান ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিত্ব, দ্বীনদারী ও ইসলামী চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

৪. সন্তান খারাপ ও যৌন ম্যাগাজিন কিংবা বই-পুস্তক কিনলে সেগুলো পড়ে আরো বেশী খারাপ হতে থাকবে।

৫. পিতা-মাতা মেয়ে সন্তানের হিজাবের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তারা ক্রমান্বয়ে গোমরাহী ও গুনাহর পথ অবলম্বন এবং পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। তখন নিজেদের সম্মান-ইজ্জত ও চরিত্র হারিয়ে ফেলবে।

৬. মাতা-পিতা সন্তানের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া তদারকি না করলে এবং তারা কোথায় যায় ও থাকে তার খোঁজ-খবর না রাখলে তারা পরে পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় এবং মাতা-পিতার ইজ্জত-সম্মান ধ্বংসের কারণ হয়।

৭. যে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়ের পাঠাগারের খোঁজ-খবর রাখে না, তারা কোন খারাপ বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়ে কিনা তা দেখে না, সে সকল সন্তান খারাপ হতে বাধ্য।

চরিত্র ধ্বংসে আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার : আধুনিক মোবাইল ফোন প্রযুক্তিতে পর্নোগ্রাফী ছড়িয়ে পড়ছে একজন থেকে আরেক জনের হাতে। মোবাইল ফোন সেটের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সামান্য অর্থের বিনিময়ে এসব পর্নোগ্রাফী সরবরাহ করে যাচ্ছে। আর উঠতি বয়সীদের হাতে এসব পৌছানোর ফরে অভিভাবক মহল আতঙ্কিত হয়ে উঠছে । বিভিন্ন দিশে মোবাইল ফোন পর্নোগ্রাফীর বিরুদ্ধে আইন থাকলেও আমাদের দেশে না থাকায় এ অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। মোবাইল ফোনের বাজারে এখন স্বল্প মূল্যের মধ্যে মাল্টিমিডিয়া সেট পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রায় সব আধুনিক সুবিধাই রয়েছে। প্রযুক্তির এসব আধুনিক সুবিধার অপব্যবহার করছে এক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের কাছেও এর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। আর এর সাথে বেড়েই যাচ্ছে সৎ চরিত্রের অবক্ষয়ের মাত্রা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখানে অনেকে নিজেই বা ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার প্রাইভেট

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব ঘটনা এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ছেলে-মেয়ে নিজস্ব অশ্লীল ছবি ও ভিডিও ফুটেজ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্রীর আপত্তিকর ভিডিও বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এ অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

বাজারে চীনের তৈরী মাল্টিমিডিয়া মোবাইল সেটগুলো খুব সস্তা। কেনার জন্য উঠতি বয়সীদের আগ্রহ বেশি। আর মোবাইল ফোনের পর্নোগুলো তারা বিভিন্ন দোকান থেকে সরবরাহ পায়। সাধারণত থ্রি-জিপি ফরম্যাটে এগুলো চলে বলে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা এগুলো কনভার্ট করে বিক্রি করে থাকে। গান, মিউজিক ভিডিও ডাউনলোড করাসহ তারা এসব কাজও করে দিচ্ছে।

Facebook (সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট), Twitter, Mig[33] (মোবাইল Massenger), নোকিয়ার N সিরিজের মোবাইল, Yahoo, hotmail, Skype (E-mail service) এগুলোর নাম আমাদের কাছে হিব্রু ভাষার শব্দের মতো লাগতে পারে। কিন্তু আপনার সন্তান বা যুব সমাজের সামনে এগুলো অহরহ উচ্চারিত শব্দ। এই প্রযুক্তিগুলো আমাদের বিশ্বকে একটি ছোট গ্রামে পরিণত করেছে।

পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে Facebook একটি অনন্য ওয়েবসাইট। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ, তাদের বর্তমান অবস্থা, মতাদর্শিক যোগাযোগের বড় মাধ্যম এটি। বর্তমান তরুণ সমাজ Facebook কে ব্যবহার করছে মতাদর্শিক আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার জন্য। অন্যদিকে যৌনতা, অশ্লীলতা ছড়ানোর মাধ্যমও এটি। মোবাইল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি, ভিডিও তারা Facebook-এর মাধ্যামে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া ইসলাম বিরোধী প্রচুর সংগঠন একত্রিত হয়েছে Facebook-এ। জানা যায় Facebook-এর প্রতিষ্ঠাতা সারজি ব্রিন একজন ইয়াহুদি।

Twitter ইরানের সাম্প্রতিক (২০০৯ সালের) নির্বাচনের পর এক আলোচিত নাম। Twitter এমন একটি ওয়েবসাইট, যার দ্বারা যে কেউ তার বর্তমান অবস্থা ওয়েবসাইট বা মোবাইলের মাধ্যমে আপডেট করে থাকে। ইরানের বিপদগামী যুব সমাজ (মুসাভির সমর্থক) পুরো দুনিয়াকে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করছে। Google,Yahoo, Skype, paltalk, AOL, MSN এই ইলেকট্রনিক মেইল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আরো একটি যুগান্তকারী সার্ভিস দেয়,

যেটি হলো তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ অর্থাৎ Instant Text Massage। Instant Text Massage এর সাথে Voice Chat এবং Video Chat করা সম্ভব। এই Text Chat,Voice Chat ও Video Chat এর মাধ্যমে যোগাযোগ সহজের সাথে সাথে কিছু অপব্যবহার হচ্ছে। দেখা যায় Video Chat এর কেউ নগ্ন হয়ে অন্য ব্যবহারকারীকে নিজের নগ্ন ছবি দেখার সুযোগ দিচ্ছে। এছাড়া Text Chat ও Voice এর মাধ্যমে যৌন আলাপচারিতার (sex chat) ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা এখন একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে যার নাম Mig^{33}। স্বল্প খরচে এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে Text Massage প্রেরণ, ছবি প্রেরণ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে Chat করা যায়।

এই Mig^{33} আমাদের সন্তানদের মধ্যে একটি ছোঁয়াছে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। যা সম্পর্কে আমাদের অভিভাবকরা অবগত নয়। সন্তানের জন্য তারা স্ট্যাটাস রক্ষার্থে উন্নততর প্রযুক্তি সম্পন্ন মোবাইল কিনে দিচ্ছেন। এই মোবাইলের মাধ্যমে তারা সারা দিন রাত আলাপচারিতা ও নগ্ন ছবি প্রেরণ করছে একে অপরকে। অভিভাবকরা ভাবছেন তার সন্তান হয়তো মোবাইলে গান শুনে বা গেইম খেলে। দেখা গেছে Mig^{33} ব্যবহারকারী ছেলে-মেয়েরা sex chat, Nude ছবি ইত্যাদি আদান প্রদানে ব্যস্ত রয়েছে। যা তারা সহজে এবং কম খরছে করতে পারছে।

Facebook, Mig^{33}, Massengerগুলোর যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতকরণে প্রভূত অবদান রয়েছে, তেমনি অপকারও রয়েছে। এই অপকার থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে আমাদের অভিভাবকদের সন্তানের প্রতি নজরদারী যথেষ্ট বাড়ানো দরকার। সাথে সাথে আমাদেরকে প্রযুক্তি নির্ভর হতে হবে, যাতে আমরা এর উপকার থেকে বঞ্চিত না হই।

নেক চরিত্র সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর বাণী : সন্তানের উত্তম চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে মাতা-পিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য নিম্নোক্ত হাদীসগুলো বিবেচ্য বিষয় :

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ 'আমি উন্নত ও মহান চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছি।' (আহমদ, হাকেম, বায়হাকী)

ইবনু মারদুইয়া ভাল সনদসহকারে এক হাদীস বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করেন, উত্তম চরিত্র বলতে কি বোঝায়? তিনি তখন

কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বর্ণনা করেন। خُذِ العَفْوَ وَأمُرْ بِالعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ 'ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে থাক" (সূরা আরাফ-১৯৯)। এরপর তিনি বলেন, هُوَ انْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ 'আর তা হচ্ছে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করবে এবং যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।'

আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَثْقَلُ مَا يُوْضَعُ فِى المِيْزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُق 'কেয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় সর্বাধিক ভারী জিনিস হবে তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, 'তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর।' লোকটি বলল, আমাকে আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, 'গুনাহর কাজ করলে পরে নেক কাজ করবে- তা গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। লোকটি বলল, আমাকে আরো বলুন। তিনি বলেন, 'লোকের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

মোহাম্মদ বিন নাসার মারওয়ানী বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, 'দ্বীন' অর্থ কী? তিনি বলেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি তাঁর ডান পাশে গিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, দ্বীন অর্থ কী? তিনি বলেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি এবার তাঁর বাম পাশে এসে জিজ্ঞেস করে, দ্বীন অর্থ কী? তিনি বলেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি পুনরায় তার পেছনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, দ্বীন অর্থ কী? এবার তিনি তার দিকে তাকান এবং বলেন, তুমি বুঝনা? উত্তম চরিত্র মানে, রাগ না করা।"

উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلاَتَسْتَوِى الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ 'ভালো ও মন্দ এক সমান নয়। ভালো ও উৎকৃষ্ট জিনিস দ্বারা মন্দ ও নিকৃষ্ট জিনিসের জবাব দিন। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ-৩৪)

আল্লাহ বলেন, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاس وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা করে, আল্লাহ্ নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

সকল অভিভাবক ও শিক্ষকের উচিত, সন্তানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা এবং সাধ্যমত নিজেদের দায়-দায়িত্ব ও আমানত পালন করা। তাহলে, আপনাদের সন্তানেরা নেক সন্তান ও নয়নাভিরাম হিসেবে গড়ে উঠবে। এর ফলে, সমাজে আলোর রশ্মির প্রশান্ত পথ বিকিরণ ঘটবে এবং তারা যমীনের প্রশান্ত পথ প্রদর্শক ও দাঈ ইলাল্লাহ্ হয়ে গড়ে উঠবে।

তাই আল্লাহ বলেন, وَقُلْ اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ 'হে নবী আপনি বলুন, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ্, তার রাসূল ও মোমেনরা তোমাদের কাজ দেখবে।' (সূরা তওবা-১০৫)

তৃতীয় অধ্যায়
দৈহিক গঠন

ইসলাম মাতা-পিতা ও শিক্ষকের উপর সন্তানের দৈহিক গঠনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে যেন সন্তানের শরীরে শক্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কর্মতৎপরতা বিদ্যমান থাকে। ইসলাম সন্তানের দৈহিক গঠনের যে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা দিয়েছে তা হচ্ছে :

১. পরিবার ও সন্তানের জন্য ব্যয় করা ফরজ : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আর সন্তানেরা অধিকারী পিতার উপর। নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হবে।' (সূরা বাকারা-২৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, دِيْنَا اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ، اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ 'তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান, দাস মুক্তি, ফকীর-মিসকীনকে দান এবং পরিবারের জন্য যে দীনার ব্যয় করলে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো পরিবারের জন্য ব্যয়।' (মুসলিম)

সন্তান ও পরিবারের জন্য ব্যয় করলে যেমন সওয়াব আছে, তেমনি তাদের জন্য ব্যয় না করলে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কার্পণ্য করলে গুনাহ রয়েছে। এ মর্মে নবী (সা) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضِيْعَ مَنْ يَّقُوْتَ 'যাদেরকে খাবার দানের দায়িত্ব, তাদেরকে না খাইয়ে ধ্বংস করা গুনাহর কাজ।' (আবু দাউদ)

ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে এসেছে, كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَّمْلِكَ قُوْتَهُ 'যাদেরকে খাবার দানের কথা তাদেরকে খাদ্য দানে বিরত থাকা গুনাহ।'

সন্তান ও পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্য হলো, তাদেরকে ভাল ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং কাপড় ও বাসস্থান দেয়া যেন তারা বিভিন্ন রোগ-শোক ও সংক্রামক ব্যাধির সম্মুখীন না হয়।

২. পানাহার ও ঘুমের স্বাস্থ্যকর নীতি অনুসরণ : নিম্নোক্ত নীতিগুলো যেন শিশুদের চরিত্র ও অভ্যাসে পরিণত হয়।

(ক) খাদ্যের ব্যাপারে নবী করিম (সা) এর অভ্যাস ছিল, কম খাওয়া ও প্রয়োজনাতিরিক্ত পানাহার ও ভুড়িভোজ থেকে দূরে থাকা। এমর্মে নবী করিম (সা) বলেন, 'আদম সন্তানের পেট পুরে খাওয়া অপেক্ষা খারাপ কোন জিনিস

নেই। বরং তার জন্য শিরদাঁড়া ঠিক রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। যদি তাকে পেট ভরে খেতেই হয়, তাহলে যেন এক তৃতীয়াংশ খাদ্য ও এক তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে ভরে। আর এক তৃতীয়াংশ যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখে।' (আহমদ, তিরমিযী)

(খ) পানীয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অভ্যাস ছিল, তিনি দু'বার বা তিনবারে পানি পান করতেন। তিনি পান পাত্রে শ্বাস ছাড়া এবং দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা উটের মতো একবারে পান করো না, তবে দু'বার বা তিনবারে পান করো। পানি পান করার সময় বিসমিল্লাহ্ এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করো।' (তিরমিযী)

কাতাদাহ (রা) থেতে বর্ণিত, اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ 'নবী (সা) পান পাত্রে শ্বাস ছাড়তে নিষেধ করেছেন।' (বোখারী, মুসলিম)

তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে : নবী (সা) পান পাত্রে শ্বাস ছাড়া কিংবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। ভুলে করে ফেললে বমি করে দেবে।' (মুসলিম)

(গ) ঘুমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুন্নাত পদ্ধতি হলো, ডান কাতে শোয়া। কেননা, বাম কাতে শোয়া হৃদযন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তরায়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বারা বিনতে আযেব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ "اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ وَالْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْك، لا مَلْجَاَ وَلا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ" وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ 'তুমি যখন ঘুমুতে যাবে, নামাযের মত অজু করবে এবং ডান কাতে শুয়ে এ দু'আটি পড়বে : হে আল্লাহ, আমি আমার মুখ আপনার প্রতি সোপর্দ এবং নিজ চেহারা আপনার প্রতি নিবদ্ধ করেছি। আমার বিষয় আপনার হাতে সমর্পণ করেছি আমার পৃষ্ঠদেশ আপনার প্রতি ভয় ও আশা সহকারে বিছিয়ে দিয়েছি; আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তিকেন্দ্র নেই। আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাব এবং প্রেরিত রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।' আর এই দু'আ'ই যেন ঘুমের সর্বশেষ বাক্য হয়।

৩. সংক্রমক রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকা : জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও, আমরা তোমার বাইয়াত গ্রহণ করেছি।' (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

নবী (সা) বলেন, فِرَّ مِّنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارُكَ مِنَ الْاَسَدِ 'কুষ্ঠ রোগী থেকে তোমার ভেগে যাওয়া সিংহ থেকে ভাগার নামান্তর।' (বোখারী)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يُوْرِدَنَّ مُمَرِّضٌ عَلَى مُصِحٍّ 'অসুস্থ ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির কাছে না আসে।"

শিক্ষকসহ মাতা-পিতার কর্তব্য হল, অসুস্থ শিশুকে অন্যান্য সুস্থ শিশু থেকে দূরে রাখা, যেন রোগ সংক্রমিত না হয়। স্বাস্থ্য রক্ষায় মহানবীর এসকল অমিয় বাণী সত্যিই মনোমুগ্ধকর!

৪. ওষুধের ব্যবহার ও রোগের চিকিৎসা : রোগ-শোক ও ব্যথা-বেদনা দূর করার ক্ষেত্রে ওষুধের বিরাট প্রভাব রয়েছে। জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا اُصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَا بِإِذْنِ اللهِ عز وجل 'প্রত্যেক রোগের রয়েছে ওষুধ বা চিকিৎসা। ঠিকমত রোগের ওষুধ পড়লে আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হবে।" (মুসলিম, আহমাদ)

মুসনাদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উসামা বিন শোরাইক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা) এর কাছে ছিলাম। তখন কয়েকজন গ্রামবাসী বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করেন, يَارَسُوْلَ اللهِ اَنَتَدَاوى؟ فقال نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوُوْا فَإِنَّ اللهَ عزوجل لَمْ يَضَعْ دَوَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَّاحِدٍ، قَالُوْا مَا هُوَ؟ قَالَ الْهَرَمُ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি রোগের চিকিৎসা করবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ, ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল রোগের চিকিৎসা রেখেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। তারা জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি? তিনি বলেন, বার্ধক্য।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে ঝাড়-ফুঁক, ওষুধ ও অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা করি, তা কি

আল্লাহর ভাগ্য লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে? তিনি জবাব দেন, সেগুলোও ভাগ্যলিপি।' (আহমাদ, তিরমিযী)

এ সকল হাদীসের আলোকে মাতাপিতা ও অভিভাবকের কর্তব্য হলো, সন্তান অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা করা। কেননা, কারণ ও ফলাফল সৃষ্টির নিয়ম। এটা ইসলামী নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৫. ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না : মোআত্তা ইমাম মালেক, ইবনু মাজাহ ও দারু কুতনী আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।'

মুসলিম ফেকাহশাস্ত্র ও নীতিবিদগণ এই হাদীছটিকে ইসলামী আইন ও শরীয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম সমাজ ও ব্যক্তির হেফাজতের লক্ষ্যে বহু মাসলা ও হুকুম বের করেছেন এবং লোকদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

এই নীতির উপর ভিত্তি করে অভিভাবক, বিশেষ করে মায়ের কর্তব্য হলো, সন্তানকে স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিষেধক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা অভিভাবকের অন্যতম কর্তব্য। শিশুর শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটা খুবই জরুরী। বিভিন্ন রোগ-শোকের আক্রমণ এবং সংক্রামক ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাঁচা ফল খেলে যদি শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তাহলে অভিভাবকের উচিত শিশুকে পাকা ফল খেতে বলা।

অনুরূপভাবে, যদি ফলমূল ধুয়ে না খেলে অসুস্থ হয়, তাহলে অভিভাবকের কর্তব্য হলো, তাদেরকে তা ধুয়ে খেতে অভ্যস্ত করে তোলা।

ঠিক তেমনি যদি পুনঃপুনঃ খাওয়ার ফলে বদহজমী ও শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খানা খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। খানা খাওয়ার আগে হাত না ধুইলে যদি রোগের আশংকা থাকে, তাহলে অভিভাবকগণ তাদেরকে হাত ধুইয়ে খাওয়ার উপদেশ দেবে।

যদি খাওয়ার প্লেট ও চামচে ফুঁ দেয়ার ফলে স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সন্তানকে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলতে হবে।

এসকল বিষয়গুলো অবতারণার লক্ষ্য হলো, সন্তানের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা।

৬. খেলাধুলা ও ব্যায়ামের অভ্যাস করানো : আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন : 'তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর।' (সূরা আনফাল-৬০)

অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ 'শক্তিশালী মোমেন আল্লাহর কাছে দুর্বল মোমেন অপেক্ষা অধিক প্রিয়।' (মুসলিম)

এ কারণে, ইসলাম সাঁতার, তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়ায় আরোহণের জন্য উৎসাহিত করে। নবী (সা) বলেন, كُلُّ شَىْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ اَوْ سَهْوٌ اِلَّا اَرْبَعُ خِصَالٍ : مَشْىُءُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ وَتَأدِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَتَعْلِيْمَهُ السِّبَاحَةَ 'আল্লাহর জিকিরবিহীন সকল কিছু খেলা-তামাশা ও উদাসীনতা। তবে চারটি জিনিস এর ব্যতিক্রম। ১. দু'টো লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে টার্গেট করে ব্যক্তির চলা (তীর নিক্ষেপের জন্য), ২. ঘোড়া চালনা শিক্ষা দেওয়া, ৩. স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা এবং ৪. সাঁতার শেখা।' (তাবারানী, সনদ ভালো)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিম্নোক্ত আয়াতাটি পড়েন, وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় কর,' তখন বলেন, 'শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ; শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ; শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ।' (মুসলিম)

বাজ্জার ও তাবারানী ভাল সনদসহ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। এটা তোমাদের উত্তম খেলা।'

নবী করিম (সা) একদল তীর নিক্ষেপকারী সাহাবায়ে কেরামের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, আমি তোমাদের সকলের সাথে আছি।' (বোখারী)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) ইথিওপিয়ার নিগ্রো লোকদেরকে মসজিদে নববীতে যুদ্ধাস্ত্রের খেলা এবং নিজ স্ত্রী আয়েশা (রা) কে তাদের খেলা দেখার অনুমতি দেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে ইথিওপিয়াবাসী! তোমরা খেল।' যখন তারা নবী (সা) এর কাছে সমরাস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিল তখন ওমার (রা) আসেন এবং তাদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী (সা) বলেন, 'হে ওমার, তাদেরকে খেলতে দাও।'

মসজিদে এ জাতীয় সামরিক মহড়ার অনুমতি দিয়ে নবী (সা) প্রমাণ করলেন, ইসলাম ইবাদত ও জেহাদের প্রস্তুতির সমন্বয়।

৭. অভাব ও টানাটানির মধ্যে রাখা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে ভাসিয়ে না দেয়া : এর লক্ষ্য হলো প্রাপ্ত বয়স্ক হলে যেন, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জেহাদে উত্তমভাবে অংশ নিতে পারে। অভাব ও টানাটানির মধ্যে সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্যে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

মোআজ বিন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ 'তোমরা সুখ সম্পদের মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা, যারা আল্লাহর খাস বান্দাহ, তারা সুখ-সম্পদের মধ্যে ডুবে থাকে না।' (আহমদ, আবু নাঈম)

তাবারানী, ইবনু শাহীন ও আবু নাঈম কাকা বিন আবু হাদরাদ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

تَمَعْدَدُوْا وَاخْشَوْشَنُوْا وَانْتَضِلُوْا 'কষ্টকর জীবন যাপনের ব্যাপারে তোমাদের পূর্ব পুরুষ মোয়েদ বিন আদনানের মতো হও, টানাটানির মধ্যে জীবন যাপন কর এবং তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর।'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করিম (সা) এর জীবনী আমাদের জন্য উত্তম উদাহরণ। আল্লাহ তার হাতে সকল সম্পদের চাবি দেয়া সত্ত্বেও তিনি খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যাপারে অভাব ও কষ্টকর জীবন যাপন করেন। পরবর্তী বংশধর যেন তাকে দেখে শিখে ও সেভাবে চলে।

৮. যথার্থ জীবন যাপন, পুরুষ সুলভ গুণাবলী অর্জন এবং উদাসীনতা, যৌন উন্মত্ততা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে রাখা : নবী করিম (সা) বলেন, 'উপকারী জিনিসের প্রতি আগ্রহী হও, আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং এক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করো না।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যেনা-ব্যভিচারের সময় মোমেন মোমেন থাকে না, চুরি করার সময় মোমেন মোমেন থাকে না এবং মদ পান করার সময় মোমেন মোমেন থাকে না।' (বোখারী, মুসলিম)

নাসাঈ শরীফে আরো একটু বেশী বর্ণিত আছে, 'এগুলো যখন করে, তখন তার ঘাড় থেকে সে ঈমানের রশিকে খুলে ফেলে।'

নবী (সা) এর নির্দেশনা থেকে জানা যা, অর্থপূর্ণ ও যথার্থ জীবন যাপন এবং পুরুষোচিত গুণাবলি অর্জন করা জরুরী যা সন্তানকে যৌন নোংরামী, উন্মত্ততা, উলংগপনা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে রাখবে। এটা জানা কথা যে, সন্তান যদি

গুনাহ, অন্যায় ও অশ্লীল কাজকর্মের উপর লালিত-পালিত হয় তাহলে, তার ব্যক্তিত্ব বিধ্বস্ত হবে এবং শরীরে নানা প্রকার রোগ-শোক ও দুর্বলতা দেখা দেবে। যা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের উপযোগী কাজ করতে সক্ষম হবে না।

অভিভাবক ও মাতাপিতাকে নিম্নোক্ত ক্ষতিকর জিনিসগুলো থেকে সতর্কতার সাথে সন্তানকে দূরে রাখতে হবে যেগুলো ছোট, বড়, বালক, কিশোর এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে।

১. ধূমপান, ২. গোপন অভ্যাস, ৩. মাদকতা, ৪. ব্যভিচার ও সমকামিতা। এখন আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. ধূমপান : অন্য আর দু'চারটা খারাপ কাজ অপেক্ষা ধূমপান আজ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত। নারী-পুরুষ এবং ছোট-বড় অনেকেই এই খারাপ কাজে অভ্যস্ত। এখন এ সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে আলোচনা করবো : ১. ধূমপানের ক্ষতি, ২. শরীয়াতের হুকুম এবং ৩. এই সমস্যার সমাধান।

১. ধূমপানের ফলে স্বাস্থ্যগত ও মানসিক ক্ষতি : চিকিৎসকগণ নিশ্চয়তা সহকারে বলেছেন, ধূমপানের ফলে যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়া, খাদ্যের আগ্রহ কমে যাওয়া, দাঁত ও চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, শ্বাস কষ্ট, উত্তেজিত ভাব, শারীরিক অধঃপতন, চারিত্রিক বিকৃতি, দুর্বল ইচ্ছা এবং অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততা দেখা দেয়।

এ মর্মে এখন আমরা ডাক্তারদের রিপোর্ট তুলে ধরবো।

জার্মানীর দীর স্পিগাল পত্রিকা লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের পেসিসদা গবেষণা কেন্দ্রে অনেক ডাক্তার এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ধূমপানের নিম্নোক্ত ক্ষতিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন :

১. ধূমপায়ীদের মৃত্যুহার অধূমপায়ীদের তুলনায় ৬৮% বেশী।

২. অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের মধ্যে নিম্নোক্ত রোগগুলো বেশী। ফুসফুস ক্যান্সার ১০.৮ গুণ, শ্বাসনালীর সংক্রমণ এবং তা ফুলে যায় ৬.১ গুণ, গলার ক্যান্সার ৫.১ গুণ, মুখ গহবরের ক্যান্সার ৪.১ গুণ, পানি নালীর ক্যান্সার ৩.৪ গুণ, পেটের অসুখ ২.৪ গুণ, হৃৎযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী নালীতে চর্বি বৃদ্ধি ১.৭ গুণ এবং অন্যান্য রোগ ২.৬ গুণ।

৩. যুক্তরাষ্ট্রে হৃৎযন্ত্রের রক্তনালীতে অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের চর্বি জমে ৭০% লোক আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের অধিকাংশ লোক মৃত্যুমখে পতিত হয়।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অধুমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের শ্বাসনালীতে ৫০০% সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, আর ক্যান্সারের হার হলো ১০০% বেশী।

সিরিয়ার যক্ষ্মা প্রতিরোধ সংস্থা জানিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কেউ সিগারেট পান করলে ধোঁয়া গিলে ফেলে এবং শরীর তার ৮০%-৯০% ধরে রাখে। অন্যদিকে, শ্বাসনালীতেও এর রাসায়নিক উপাদান লেগে থাকে। সেগুলোর কোন কোন উপাদান ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এবং এর অবশিষ্ট উপাদান তাতে আঁচড়ের মতো ক্ষত বা দাগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া তা ফুসফুসকে যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টির উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের যক্ষ্মা ও ক্যান্সার বেশী হয়, ফুসফুস ফুলে যায় এবং হাঁপানী রোগ দেখা দেয়। ধূমপান হৃৎরোগের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে যে নিকোটিন আছে, তা হৃদযন্ত্রের কম্পন বাড়ায় এবং রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে, ধূমপায়ীদের নিজেদের জীবনের চরম মূল্য দিতে হয়। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী।

২. আর্থিক ক্ষতি : একথা সত্য যে, সীমিত আয়ের লোকেরা ধূমপানের পেছনে দৈনিক আয়ের এক চতুর্থাংশ বা আরো বেশি ব্যয় করে। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়, সংসার নষ্ট হয় এবং পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেননা, ধূমপায়ী নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণের টাকা থেকেই একটা অংশ নষ্ট করে। কোন সময় ধূমপানের অর্থ জোগানোর লক্ষ্যে ঘুষ, চুরিসহ অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে।

ধূমপানের ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম :

(ক) ফেকাহবিদ ও মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে একথায় ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ক্ষতিকর, তা থেকে বাঁচা ও দূরে থাকা ওয়াজিব এবং তা করা হারাম। এর প্রমাণ হলো, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।' এছাড়া আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসের দিকে হাত বাড়িও না।' (সূরা বাকারা-১৯৫)

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়াবান।' (সূরা নিসা-২৯)

ধূমপান আত্মহত্যার শামিল। যেহেতু ধূমপানের ক্ষতি বিশাল, তাই তা থেকে বাঁচা ফরজ।

(খ) ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে তা নিকৃষ্ট জিনিসের মধ্যে শামিল এবং এর ফলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। আল্লাহ মানুষের জন্য পবিত্র জিনিস হালাল এবং অপবিত্র জিনিস হারাম করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ 'তোমরা নিকৃষ্ট জিনিসকে উৎকৃষ্ট জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করো না।' (সূরা নিসা-২)

আল্লাহ আরো বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 'আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন।' (সূরা আরাফ-১৫৭)

আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ 'বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র জিনিস সমান না, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে।' (সূরা মায়েদাহ-১০০)

(গ) ধূমপান শরীর ও বিবেককে নেশাগ্রস্ত করে যা ধূমপায়ীরা অনুভব করে। এমন কি প্রাথমিক পর্যায়ে ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি কিংবা স্থায়ীভাবে অভ্যস্ত ব্যক্তি, বিশেষ করে অধিক হারে ধূমপায়ীর কাছে তা আরো বেশী পরিষ্কার বিষয়।

নবী করিম (সা) শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ 'নবী (সা) সকল নেশা সৃষ্টিকারী ও মাদকদ্রব্য নিষেধ করেছেন।' (আহমদ, আবু দাউদ)

এ প্রমাণ দ্বারা ধূমপান হারাম বলে বোঝা যায়, তাই তা থেকে বাঁচা কর্তব্য। এর অপবিত্রতা খুবই স্পষ্ট। তাছাড়া আর্থিক ক্ষতিতো আছেই, যার প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর পড়ে। বোখারী শরীফের এক হাদীসে নবী (সা) অর্থের অপচয় নিষেধ করেছেন।

অতীতে যে সকল ফেকাহবিদ ধূমপানকে মোবাহ বা মাকরূহ বলেছেন, বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধূমপানের বিরাট ক্ষতি আবিষ্কারের কারণে তাদের বক্তব্য পরিবর্তনযোগ্য এবং তা কার্যকর নয়। তাই এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কোন ওজর আপত্তির সুযোগ নেই। সে কারণে ধূমপান করা কিংবা এর অভ্যাস করা, এমনকি এর বেচাকেনাও হারাম।

ধূমপান প্রতিরোধের দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। সরকারের কর্তব্য হলো, এর বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকা ও রেডিও টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো। এ বিষয়ে বিজ্ঞজন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। রাষ্ট্রের উচিত, এর উপর

অধিক হারে করারোপ করা, দাম বৃদ্ধি করা এবং ভীড় ও সাধারণ স্থানে তা নিষিদ্ধ করা। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটাকে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এগুলো হলো পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা।

ধূমপানে অভ্যস্ত বয়স্ক লোকদের উচিত, হারাম জিনিস পান করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, নিজেদের কুপ্রবৃত্তির উপর বিবেক ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া এবং সহজ-সরল পথে চলা।

অপরদিকে, ধূমপানে অভ্যস্ত ছোটদের উপর পরিবার, অভিভাবক ও শিক্ষকদের তদারকী এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন সমাজের জন্য বিরাট ক্ষতি ডেকে আনবে। তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদেরকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। আজ যারা ধূমপানের মতো খারাপ কাজে অভ্যস্ত, তারা বড় হলে আরো মারাত্মক ক্ষতিকর কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

গোপন অভ্যাস : যুব সমাজের মধ্যে এ খারাপ অভ্যাসটা চালু আছে। এজন্য মহিলাদের আকর্ষণকারী পোশাক-আশাক, নগ্নতা এবং হাঁট-বাজার, পার্ক ও রাস্তা-ঘাটে বেপর্দা চলা-ফেরাই প্রধানত দায়ী। এছাড়া নাটক ও ফিল্ম এবং টেলিভিশনও এজন্য কম দায়ী নয়। এসকল প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো, যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি করা, নারীর ইজ্জত সম্মান ধ্বংস করা এবং মর্যাদা ও কৌলিন্যকে বিদায় করা।

বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় যৌন আবেদনমূলক বিষয় যুব স্বাস্থ্য ও মন-মানসিকতার ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

এ সকল জিনিসের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীকে ব্যভিচার, অশ্লীলতা, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং নোংরামীর দিকে নিক্ষেপ করে। যে যুবক-যুবতীর মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেজগারী থাকবে, তারাই কেবল তা থেকে মুক্ত থাকবে, অন্যরা নয়। ফলে অন্যরা যে কোন দু'টো অবস্থার একটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

১. হারাম উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ।

২. গোপন অভ্যাসের মাধ্যমে যৌন উন্মত্ততা কমিয়ে আনা।

এ অভ্যাসের ক্ষতি শরীর, বংশ, বিবেক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গিয়ে পড়ে। আমরা এখন এসম্পর্কে তিনটি বিষয় আলোচনা করবো : ১. গোপন অভ্যাসের ক্ষতি ২. এ ব্যাপরে শরীয়তের হুকুম ৩. সমাধান।

১. গোপন অভ্যাসের ক্ষতি :

নিম্নোক্ত ক্ষতিগুলো লক্ষ্য করা যায় :

(ক) শারীরিক ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গোপন অভ্যাসের ফলে বেশ কিছু রোগ-শোক দেখা দেয়। যেমন,শক্তি ক্ষয়, হাত-পা কম্পন, হৃদকম্পন, দৃষ্টি শক্তি ও স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা, বদহজমী, দুই ফুসফুসে সংক্রমণ-যার ফলে অধিকাংশ সময়ে যক্ষ্মা দেখা দেয়। এছাড়াও তা রক্ত প্রবাহের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার এবং রক্ত স্বল্পতা এবং রক্তশূন্যতা সৃষ্টি করে।

(খ) যৌন ক্ষতি : সর্বাধিক ক্ষতি হলো যৌন অক্ষমতা। যার ফলে একজন যুবক বিয়ের শক্তি হারিয়ে ফেলে। নিঃসন্দেহে তখন স্বামী থেকে স্ত্রী দূরে সরে যাওয়ার চিন্তা করে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পুরুষ এই গোপন অভ্যাসের মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি লাভ করায় বিপরীত লিঙ্গ তার প্রতি হতাশ হয় এবং স্ত্রী ভাবতে থাকে এই অসুস্থ স্বামীর সাথে বিয়ের মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ সময় এ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রী যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গোপন বন্ধু ও পরকীয়া প্রেমের আশ্রয় নেয়।

(গ) মানসিক ও বিবেকজনিত ক্ষতি : মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই গোপন অভ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাত্মক মানসিক ও বিবেকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। তার ভুল-ভ্রান্তি বাড়ে, ইচ্ছা ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, একঘরে হয়ে থাকার মানসিকতা সৃষ্টি, অহেতুক লজ্জা-শরম অনুভূত হয়, অলসতা ও ভয়-ভীতির আশংকা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী এবং অপরাধ সংঘটন কিংবা আত্মহত্যার চিন্তা করে। তখন ব্যক্তির চিন্তা ও ইচ্ছা শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা পর্যাপ্ত গবেষণা চালিয়েছেন।

২. এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম :

(ক) গোপন অভ্যাস হারাম ও গুনাহ। এমর্মে আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, ‘এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে এছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।’ (সূরা আল মোমেনুন : ৬-৭)

এ আয়াত অনুযায়ী, যারাই বিয়ে ও দাসী ছাড়া যৌন চাহিদা পূরণ করবে, তারাই গুনাহগার হবে। যেমন, ব্যভিচার, সমকামিতা ও হস্তমৈথুন করলে গুনাহ হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথী তাবেঈ আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি, হাশরের ময়দানে কিছু লোকের হাত গর্ভবতী হবে। আমার ধারণা যে, তারা হবে হস্তমৈথুনকারী।'

সাঈদ বিন যোবায়ের একজন তাবেঈ। তিনি বলেন, আল্লাহ্ সেই উম্মতকে আজাব দেবেন যারা নিজেদের বীর্যের অসৎ ব্যবহার করে।'

'সাত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তাকাবেন না, তাদের মধ্যে হস্তমৈথুনকারী একজন।' (শেখ মোহাম্মদ হামেদের রচিত رُدُوْدٌ عَلَى الْأَبَاطِيْلِ : পৃষ্ঠা-৪০)

এ সকল বক্তব্য প্রমাণ করে যে গোপন অভ্যাস হারাম।

(খ) ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকা ফরজ এবং তা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ক্ষতি করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।' (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা ক্ষতির দিকে হাত বাড়িয়োনা।' (সূরা বাকারা-১৯৫)

একটি প্রশ্ন : যেহেতু হস্তমৈথুন হারাম, সেহেতু কোন ব্যক্তির যৌন চাহিদা বেড়ে গেলে এবং কোন উপায়ে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা দেখা দেয়, তখন সে কী করবে?

উত্তর : ব্যক্তিকে ফেতনাদ্বয়ের মধ্যে তুলনা করে দেখতে হবে যে, কোন ফেতনাটি কম ক্ষতিকর। তখন সে অপেক্ষাকৃত কম মন্দকে গ্রহণ করবে। এটাই ফেকাহর নীতি।

উল্লেখ্য যে, হস্তমৈথুন মন্দ কাজ হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার ও সমকামিতা আরও বেশী মন্দ। কেননা, এগুলোর ফলে সম্মান ও পবিত্রতা নষ্ট, সমাজ ধ্বংস এবং বংশের সর্বনাশ ঘটে। তাছাড়া হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিসহ শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম মন্দ কাজ হস্তমৈথুনকে গ্রহণ করে বৃহত্তর ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে।

তবে ফিকাহবিদগণ বলেন, যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে হস্তমৈথুন করা হারাম। যদি স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত উত্তেজনা কমাতে অপারগতার কারণে এই ঘৃণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তখন সীমিত পরিমাণে তা করতে পারবে।

৩. সমাধান :

১) দ্রুত বিয়ে করা। এটিই সমস্যার মৌলিক ও স্বাভাবিক সমাধান। এছাড়া বিয়ের রয়েছে নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও মানসিক উপকারিতা।

২. নফল রোজা : দ্রুত বিয়ে করতে না পারলে ইসলাম নফল রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রোজা শরীরের পাশবিকতা, যৌন উন্মাদনা ও তীব্রতা কমায় এবং আল্লাহর ভয় ও পর্যবেক্ষণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ মর্মে কয়েকটি হাদিস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণিত আছে : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ يَسْتَطِعْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুব সমাজ, তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য (শারীরিক ও আর্থিক) আছে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা তা দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থানের সূচিতা ও পবিত্রতার জন্য সহায়ক। আর যার সামর্থ্য নেই রোযা তার জন্য ঢালস্বরূপ।' অর্থাৎ উত্তেজনা প্রশমনকারী।

সর্বাধিক হারে রোযার ব্যাপারে ইসলাম দাউদ (আ) এর রোযার কথা বলে। তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এছাড়াও প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং প্রত্যেক আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা উত্তম। শাওয়ালের ছয় রোযা এবং আশুরার রোজাও মর্যাদাবান, এর ফলে যৌন উত্তেজনা হ্রাস পায়।

৩. যৌন উত্তেজনাকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা : আমরা আজ সে সমাজে বাস করি তা নষ্টামী ও উত্তেজক জিনিস, মন্দ ও গুনাহ এবং উলঙ্গপনা ও নগ্নতার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। যুব সমাজ এ সকল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জিনিসের পেছনে ধাবিত হলে সে নৈতিক অধঃপতনের শিকার হতে বাধ্য যা তাকে পাশবিক যৌনতার স্রোতে ভাসিয়ে দেবে।

তাই অভিভাবক ও শিক্ষকের উচিৎ, সন্তানদেরকে নগ্ন-উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ কিংবা আঁটসাট পোশাক পরিধানকারিণী মহিলার দিকে তাকাতে নিষেধ করা, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার ওপর লেখা উপন্যাস ও যৌন উত্তেজক গান শুনতে বারণ করা। তা না করা হলে, এ সকল জিনিস মান-মর্যাদা ও চরিত্রকে ধ্বংস করে, শরীর-মন ও স্মৃতি শক্তিকে দুর্বল করে, যৌন উন্মত্ততা সৃষ্টি করে, ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে এবং মানবতা, ইজ্জত ও নৈতিকতাকে কবর দেয়। তাই যুব সমাজের উচিত, এসকল উপদেশ গ্রহণ করা।

৪. উপকারী জিনিস দ্বারা অবসর সময় কাটানো : মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অবসর সময় সন্তানের মগজে কল্পনা, অলীক চিন্তা-ভাবনা ও যৌন ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে। যুবক হলে তা তার যৌন-শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় এবং তখন সে গোপন অভ্যাসের আশ্রয় নেয়। সেজন্য যুবক-যুবতীদের অবসর সময় কাটানোর জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি দিতে হবে।

শারীরিক ব্যায়াম উত্তম কর্মসূচি। এর মাধ্যমে শরীরে শক্তি অর্জিত হয়। ভাল ও সৎ সাথীর সাথে বিনোদন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা ভাল। উপকারী বই-পুস্তক পড়া ও জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হস্তশিল্প অন্য আরেকটি উত্তম বিকল্প। এছাড়া দ্বীনি কোন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, তীর নিক্ষেপ এবং জেহাদের অন্য কোন উপকরণ দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা যায়। গঠনমূলক বিকল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৫. সৎ সাথী : অভিভাবক ও শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানের সৎ সঙ্গী নির্বাচন করা। সে ভুলে গেলে তারা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, বিভ্রান্ত হলে উপদেশ দানের মাধ্যমে সঠিক পথে আনবে, সৎপথে চলতে চাইলে সাহায্য করবে এবং বিপদ-মুসীবতে তার প্রতি সহানুভূতি জানাবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, বর্তমান যুগে সৎ সঙ্গী খুবই কম। আমরা ধরে নিলাম যে, সৎসঙ্গী কম। তা সত্ত্বেও সকল স্থানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের চরিত্র ও আচরণ দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। এ জাতীয় যুবকদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ও তাদের সংস্পর্শে থাকতে হবে। তাহলে, প্রয়োজনে তাদের দ্বারস্থ হওয়া যাবে এবং ফেতনা-ফাসাদের মোকাবিলায় তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। ভাল সাহচর্য কতই না উত্তম!

ব্যক্তি নিজ বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পরিচয় তার বন্ধু দ্বারা বোঝা যায় যে সে কি ধরনের লোক। তাই নবী (সা) বলেন, اَلْمَرْءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهٖ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلْ "ব্যক্তি বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। তোমাদের দেখা দরকার, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ।" (তিরমিযী)

যার খারাপ ও গুনাহগার বন্ধু রয়েছে, তারা তাকে গোমরাহী এবং গুনাহর পথে নিয়ে যাবে। সেজন্য ভাল বন্ধু ও সাথী নির্বাচন করতে হবে। এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করা যাবে।

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ "মোত্তাকী-পরহেযগার ছাড়া অন্য বন্ধুরা হাশরের দিন একে অপরের শত্রু হবে।" (সূরা যোখরোফ-৬৭)

৬. চিকিৎসা বিষয়ক নির্দেশনা পালন করা :

ডাক্তাররা যৌনতার তীব্রতা কমানের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়ে থাকেন :

* গ্রীষ্মকালে বেশী করে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা, আর অন্য মওসুমে লিঙ্গের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি ঢালা।

* অধিক হারে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা।

* মশলাযুক্ত খাবার না খাওয়া। কেননা, তাতে যৌন উত্তেজনা বাড়ে।

* চা ও কফি জাতীয় আবেগ উদ্দীপক পানীয় কম পান করা।

* ডিম ও গরু-ছাগলের গোশত কম খাওয়া।

* পিঠ বা পেটের উপর না শোয়া। বরং কেবলামুখী হয়ে ডান কাতে শোয়া।

৭. অন্তরে আল্লাহর ভয় অনুভব করা : কোন যুবক যখন অনুভব করে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তিনি তার প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন, তিনি মানুষের অন্তর্যামী, তিনি ছোট-বড় সকল কিছুর হিসেব নেবেন, বিভ্রান্ত হলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন, তখন সে গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে। ওয়াজ ও জিকিরের মজলিসে শরীক হলে, ফরজ ও নফল নামায নিয়মিত পড়লে, যথারীতি কোরআন তেলাওয়াত করলে, রাত্রে যখন সকল মানুষ ঘুমায় তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়লে, অব্যাহত নফল রোজা রাখলে, সাহাবায়ে কেরাম ও নেক লোকদের কাহিনী শুনলে, সৎ সঙ্গী নির্বাচন করলে এবং ভাল দলের সাথে চললে, মৃত্যুকে নিয়মিত স্মরণ করলে, তখন আল্লাহর প্রতি মোমেনের ভয়, পর্যবেক্ষণ ও মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত হবে। যুব সমাজ এর মাধ্যমে নিজ ঈমান-আকীদাকে মজবুত করবে, দুনিয়ার অন্যান্য কোন লোভাতুর জিনিস তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না, কোন সৌন্দর্য ও সম্পদ তাকে পদচ্যুত করতে পারবে না, তারা কোন হারাম কাজে পা রাখবে না এবং সর্বদা আল্লাহর নিম্নোক্ত অমিয় বাণীকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করবে। আল্লাহ বলেন, "তখন যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা নাযিআত : ৩৭-৪১)

নেশা ও মাদকদ্রব্য : এটা এক মারাত্মক বিষয়। যে সমাজে উন্নত ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী শিক্ষার অভাব, সে সমাজে তা বিস্তার লাভ করে। অভিভাবকহীন ও যত্নহীন শিশুরাই এ বিপদের বেশী শিকার। কেননা, তাদেরকে পথ দেখানো ও তদারকীর কেউ নেই। এছাড়া মাতাপিতার তদারকীবিহীন

সন্তানেরাও এ পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায়। অসৎ বন্ধু ও সাথী সঙ্গীরাও এর জন্য দায়ী। এ বিষয়ের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা দরকার। ১. এর ক্ষতি ২. এ ব্যাপারে ইসলামের হুকুম ও ৩. তা প্রতিহত করার উপায়।

১. মাদকদ্রব্য ও নেশাকারী জিনিসের ক্ষতিগুলো হচ্ছে :

ক. স্বাস্থ্য ও বিবেকের ক্ষতি : সকল চিকিৎসক এ কথায় একমত যে, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করলে উন্মাদনা, স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা, স্নায়ু ও পেটের রোগ দেখা দেয়, চিন্তা ও স্মৃতিশক্তির তীব্রতাকে অচল করে দেয়, হজম যন্ত্রের বিপাক ঘটায়, খাদ্যের চাহিদা ও রুচি কমে যায়, বদ হজমী দেখা দেয়, অবসাদ ও যৌন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, রক্তনালী শক্ত হয়ে যায় এবং আরো অনেক মারাত্মক রোগ দেখা দেয়।

ফরাসী জাতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট তার এক রিপোর্টে বলেছে, ফ্রান্সে যক্ষ্মায় যত লোক মারা যায়, তার চাইতে মদপানের ফলে আরো বেশী লোক মারা যায়। ১৯৫৫ সালে, মদের কারণে ১৭ হাজার লোক মারা গেছে। পক্ষান্তরে ঐ বছর যক্ষ্মায় মারা গেছে মাত্র ১২ হাজার লোক।

(খ) অর্থনৈতিক ক্ষতি : মাদকদ্রব্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে অর্থ ধ্বংস হয়, সংসার নষ্ট হয়, দারিদ্র্য এবং শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি দেখা দেয়। ৩/৫/১৯৬৫ সালে মিশরের আল-আহরাম পত্রিকা লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রে ৭২ মিলিয়ন লোক মদ পান করে। তাদের মধ্যে ২০ মিলিয়ন লোক অফিসে অনুপস্থিত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ২ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়।

(গ) মানসিক, চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতি : মদখোর ও মাদকদ্রব্য সেবী ব্যক্তি বহু খারাপ কাজ করে থাকে। তারা মিথ্যা, চুরি, বেশ্যাবৃত্তি, হত্যা ও আক্রমণ করে, কাপুরুষতা ও চরিত্রহীনতার শিকার এবং কর্তব্যের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করে না।

আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো কোন জাতির কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য মাদকদ্রব্যের প্রসার ঘটায় এবং সে জাতির চরিত্র ধ্বংস করে জেহাদ ও প্রতিরোধের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। বৃটেন মিসরের ঔপনিবেশিক শাসনামলে মাদকের প্রসার ঘটায় এবং আফিমের ব্যবসা বেআইনী ঘোষণাকারী চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সে যুদ্ধকে আফিমের যুদ্ধ বলা হয়।

২. মাদকদ্রব্যের বিষয়ে শরীআতের হুকুম :

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন, "হে মোমেনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। এগুলো থেকে

বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তানতো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। তোমরা কি তা থেকে নিবৃত্ত হবে? (সূরা মায়েদাহ : ৯০-৯১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ 'আল্লাহ মদ,মদ পানকারী, পান করানোকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতা, তা প্রস্তুতকারী ও প্রস্তুত কাজে সাহায্যকারী, বহনকারী ও যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর অভিশাপ দিয়েছেন।' (আবু দাউদ)

মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। যেমন :

(ক) আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন।' (সূরা আরাফ-১৫৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ক্ষতি করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।' (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

(খ) নবী পত্নী উম্মে সালমাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) সকল নেশা ও মাদকদ্রব্য নিষেধ করেছেন।' (আহমদ, আবু দাউদ)

(গ) এটা মদ হারাম হওয়ার বিষয়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। কেননা, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। ওমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বরের উপর ঘোষণা করেন, اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "সে সকল জিনিসই মদের শামিল যা বিবেক লোপ করে।"

বিবেক লোপকারী জিনিসই হারাম, চাই তা মদ হোক আর মাদকদ্রব্য হোক। এর আওতায় হাসিস, হিরোইন, কোকেন এবং আফিমও শামিল। এগুলো ব্যবহারকারী ব্যক্তি দূরবর্তী ব্যক্তিকে নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী, এমন কি অবাস্তব জিনিসকে বাস্তব মনে করে। তারা স্বপ্ন ও কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে এবং দ্বীন-দুনিয়াকে ভুলে যায়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং কোরাফী হাসীস হারাম হওয়ার বিষয়ে ইজমার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, যে এটাকে হালাল মনে করে, সে কুফরী করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মদকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন,

তা হারাম। লোকটি বলল, আমি এটাকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করি। তখন তিনি বলেন, إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ 'এটা ওষুধ নয়, বরং রোগ।' (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ انْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ 'আল্লাহ রোগ ও ওষুধ উভয়ই পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ বা চিকিৎসাও পাঠিয়েছেন। তাই তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, তবে হারাম জিনিস দিয়ে নয়।' (আবু দাউদ)

বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি নেশা জাতীয় জিনিসের ব্যাপারে বলেন, إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 'আল্লাহ হারাম জিনিসের মধ্যে তোমাদের চিকিৎসা রাখেননি।'

ওষুধের হিফাজতের জন্য যদি তাতে সামান্য মদ মিশানো হয় এবং তাতে আরোগ্যের সম্ভবনা থাকে, তাহলে তা জায়েয আছে। তবে, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়কারী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অবশ্যই জরুরী। ইসলামী শরীআতের নীতিমালা হচ্ছে সহজীকরণ, কষ্ট দূর এবং জনস্বার্থের হেফাজত। এক্ষেত্রে কোরআনের মূলনীতি হলো, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ "তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমা লংঘনকারী না হয়, তার কোন গুনাহ নেই।" (সূরা বাকারা-১৭৩)

৩. তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার উপায় :

ক. ভাল ও উপযুক্ত শিক্ষা, খ. দায়ী কারণসমূহ দূর করা, গ. শাস্তি দেয়া

ক. শৈশব থেকে ভাল ও উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া জরুরী। আল্লাহর উপর ঈমান, আল্লাহ ভীতি, প্রকাশ্য ও গোপনে তাঁকে ভয় করার শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠন, আত্মসংশোধন এবং উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে তা বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে।

আরব জনগণ যখন ইসলামে প্রবেশ করল, আল্লাহর পর্যবেক্ষণের ভয় অনুভব করল, তাঁর উপর নির্ভরতা এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাবোধ করল, তখন তারা জাহেলিয়াতের মন্দ নিয়ম নীতি ও আচার-অভ্যাস ত্যাগ করল। তারা ব্যাপক হারে মদ পান করত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তা ছেড়ে দিল। তাদের কাছে মদের ১০০ এরও বেশী নাম ছিল।

(খ) মদ পান ও মাদকদ্রব্য বন্ধের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ জরুরী। রাষ্ট্র যদি

বাজারে সকল প্রকার মদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং তা উৎখাতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন মদ্যপদের মন্দ ইচ্ছা পূরণের আর কোন ব্যবস্থা অবশিষ্ট থাকবে না।

(গ) মাদকদ্রব্য সেবী ও মদ্যপকে শাস্তি দিতে হবে। ইসলাম এই অপরাধের জন্য ৪০ থেকে ৮০ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়। তাই বলে তা ইসলামী দণ্ড বহির্ভূত জেল জরিমানা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো অন্যান্য তাযীযী শাস্তি আরোপের পথে বাধা হবে না। বিশেষ করে এগুলোর বিক্রেতা, বহনকারী ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এ সকল শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এজন্য সরকার অপরাধ গবেষণা বিভাগকে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৪. ব্যভিচার ও সমকামিতা : এটা যুব সমাজ ও শিশুদের মারাত্মক সমস্যা। অভিভাবকের তদারকীর অভাবে বহু শিশু ও যুবক এ অশ্লীল নষ্টামীতে পা দিয়ে ধ্বংস হয়। সন্তানের চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য মা-বাবাই প্রধানত দায়ী।

এখন আমরা এর ১. ক্ষতি, ২. শরীআতের হুকুম ও ৩. সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

১. ক্ষতি :

(ক) শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি : যেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতার ফলে নিম্নোক্ত রোগগুলো দেখা দেয় :

১) সিফিলিস রোগ : এ রোগের লক্ষণ হলো, লিঙ্গে ঘা হবে ও ফুলে যাবে কিংবা ঠোঁট, জিহ্বা ও চোখের পলকে ফুলা দেখা দেবে। শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগ পড়ে এবং তা মারাত্মক পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যায়, রক্তবাহী নালীকে শক্ত করে, বুকে ব্যথা, শারীরিক বিকৃতি, জিহ্বার ক্যান্সার এবং কোন কোন সময় যক্ষ্মাও দেখা দেয়। এটা সংক্রামক রোগ বিধায় স্পর্শ কিংবা মুখের লালা থেকে তা অন্যদের মধ্যে সংক্রমিক হয়।

২) গণোরিয়া রোগ : এ রোগের লক্ষণ হলো, পেশাবের সময় অধিক ব্যথা ও জ্বালা-পোড়া করা, পুরুষের পেশাব নালীতে এবং মহিলাদের জরায়ুর উপরের অংশ ও পেশাব নালী থেকে পুঁজের মতো তরল পদার্থ বের হওয়া। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দুই অণ্ডকোষ ও মূত্র থলীতে সংক্রমণ এবং পেশাব নালী সংকীর্ণ হয়ে আসে। এরোগ অনেক সময় নারী-পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়। এছাড়াও এর ফলে পুরুষের পেশাবনালীতে ঘা হয় এবং অধিকাংশ সময় পেশাব আটকে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়।

৩) সংক্রামক রোগের প্রসার : যেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতার ফলে নিকৃষ্ট সংক্রামক রোগের ধ্বংসাত্মক জীবাণু অসুস্থ লোক থেকে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে এইডস রোগ অন্যতম।

যে সমাজে অশ্লীলতা বিদ্যমান, আল্লাহ সে সমাজে দুর্ভিক্ষ ও রোগ-শোক দ্বারা শাস্তি দেন। এ মর্মে ইবনু মাজাহ, বাজ্জার ও বায়হাকীতে বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন, 'হে মোহাজিরগণ, পাঁচটি বিষয় দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য তা থেকে পানাহ চাই। তিনি পাঁচটি জিনিস উল্লেখ করে বলেন, যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা দেখা যায়, তখন আল্লাহ তাদেরকে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা শাস্তি দেন। যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে মওজুদ ছিল না।"

(খ) সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক ক্ষতি : এর ফলে বংশ ধ্বংস হবে, ইজ্জত নষ্ট হবে, ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্ব বিদায় নেবে, সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হবে, দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরবে, পারিবারিক ভাঙন দেখা দেবে এবং সমাজে নোংরামী ও নষ্টামী বিরাজ করবে। সমাজ জারজ সন্তানে ভরে যাবে এবং যৌন উশৃঙ্খলার স্রোত উম্মার যুব ও নারী সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন সমাজে চরিত্রের আর কোন মূল্য থাকবে না এবং মর্যাদা ও সম্মানের কোন ওজন থাকবে না। যে সমাজের নীতি-নৈতিকতা নেই, তার কি মূল্য আছে? যেখানে লজ্জা-শরম নেই সে সমাজের ভিত মজবুত থাকবে না। আল্লাহ বলেন, "যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি, তারপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তারপর তাদের উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই।" (সূরা বনি ইসরাইল-১৬)

২. শরীয়তের হুকুম :

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلًا 'ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (সূরা বনি ইসরাইল-৩২)

আল্লাহ আরো বলেন : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا 'এবং মোমেনদের আরো গুণাবলী হলো, তারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার শাস্তিমূলক হত্যা বৈধ

করেছেন, তাছাড়া কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। হাশরের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।' (সূরা ফোরকান : ৬৮-৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يَزْنِى الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِىْ 'যেনাকারী ব্যক্তি যেনার সময় মোমেন থাকে না...।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ الزُّنَاةَ تَشْتَعِلُ وَجُوْهُهُمْ نَارًا 'ব্যভিচারকারীদের চেহারায় আগুন জ্বলবে।' (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِذَا ظَهَرَ الزِّنىَ وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ 'কোন গ্রামে তথা জনপদে যেনা-ব্যভিচার দেখা দিলে তারা আল্লাহর আজাবকে নিজেদের জন্য হালাল করে নেয়।' (হাকেম)

নবী (সা) আরো বলেন, اَلزَّانِيْ بِحَلِيْلَةِ جَارِهِ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِ وَيَقُوْلُ اُدْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ 'যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা-ব্যভিচার করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না, তিনি বলবেন, তোমরা দোজখে প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ কর।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া এবং খারায়েতী।)

সমকামিতা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন, اَتَأْتُوْنَا لذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর এবং তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর? তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (সূরা শোআরা-১৬৫-১৬৬)

আল্লাহ আরো বলেন, 'যখন লূত তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি সমকামিতায় লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে মন্দ ও গর্হিত কাজ করছ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস।' (সূরা আনকাবূত-২৯)

নবী করিম (সা) বলেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ, مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوْطٍ... قَالَهَا ثَلَاثًا 'সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে লূতের সম্প্রদায়ের কাজ করে...। তিনি একথা তিনবার বলেন।' (হাকেম)

নবী (সা) আরো বলেন, اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِىْ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

'আমি আমার উম্মতের উপর কওমে লূতের কাজের জন্য সর্বাধিক ভীত।' (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, اَرْبَعَةٌ يُصْبِحُوْنَ فِيْ غَضَبِ اللهِ وَيُمْسُوْنَ فِيْ غَضَبِ اللهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الْمُتَشَبِّهُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالَّذِيْ يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ وَالَّذِيْ يَأْتِي الرِّجَالَ 'চার ব্যক্তি আল্লাহর গযব ও অসন্তোষের মধ্যে সকাল-বিকাল কাটায়। আবু হোরায়রা (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কারা? তিনি বলেন, নারীর বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারী, আর যে ব্যক্তি পশুর সাথে অশ্লীল কাজ করে।' (বায়হাকী, তাবারানী)

ব্যভিচার ও সমকামিতার শাস্তি :

১. যেনা-ব্যভিচারের শাস্তি দু'ধরনের : (ক) বেত্রাঘাত ও নির্বাসন, (খ) পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

ক. বেত্রাঘাত ও নির্বাসন সে ব্যভিচারীর জন্য যে অবিবাহিত। পুরুষ বা নারী যেই যেনাকারী হোক না কেন তাদেরকে ১০০ বেত্রাঘাত করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি স্বচক্ষে দেখে।" (সূরা নূর-২)

হানাফী মাজহাবের মতে, নির্বাসন দিতে হবে অতিরিক্ত শাস্তি ও সতর্কতা হিসেবে। দেশের নেতৃবৃন্দ যদি তাতে উপকার দেখেন, তাহলে নির্বাসন দিতে পারেন। অন্যান্য মাজহাবের ইমামদের মতে, বেত্রাঘাতের পর তাকে এমন দূরত্বের মধ্যে নির্বাসনে পাঠাতে হবে যে দূরত্বের মধ্যে নামায কসর করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে নির্বাসন দেয়া হত। অনেক সাহাবী নির্বাসনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

(খ) বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল- এই বলে সাক্ষ্য দেয়, তিনটি অবস্থা ছাড়া তাদেরকে হত্যা করা জায়েয় নেই। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী, ২. কাউকে হত্যাকারী এবং ৩. মোরতাদ বা মুসলিম দল ত্যাগকারী ব্যক্তি।' (বোখারী ও মুসলিম)

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করিম (সা) ব্যভিচারের দায়ে বিবাহিত মায়েয বিন মালেক এবং গামেদীয়া গোত্রের এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেন। তারা উভয়েই নিজ নিজ অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল।

২. সমকামিতার শাস্তি : ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সমকামিতা যেনার শামিল। তবে তারা এর শাস্তির হার নির্ধারণের বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন। আল্লামা বাগাওয়ী বলেন, "সমকামির শাস্তির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে। এক দলের মতে, সমকামীর হুকুম ব্যভিচারের অনুরূপ। বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড আর অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। এটা শাফেঈ মাজহাবের অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য মত। অন্য একদলের মতে, সমকামী বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। এটা ইমাম মালেক ও আহমদ বিন হাম্বলের মত। অপরদিকে, ইমাম শাফেঈর দ্বিতীয় মত হল, সমকামিতার সাথে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। হানাফী মাজহাবের মতে, সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা হত্যা ছাড়া অন্য যে কোন শাস্তিকে উপযুক্ত মনে করেন তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। তবে যদি এটা বারবার করে, তাহলে, তাযীরের আওতায় তলোয়ার দিয়ে তার ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবেন।

অধিকাংশ ফেকাহবিদ ও মুজতাহিদ ইমামের মতে, সমকামিতার সাথে জড়িত উভয়কে হত্যার বিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ بِعَمَلِ عَمَلَ قَوْمِ اَهْلِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ 'তোমরা যদি কাউকে কওমে লূতের অনুরূপ কাজের মধ্য দেখতে পাও, তাহলে, সমকামী ও সমকামকৃত উভয়কে হত্যা কর।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

ইকরামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَالَّذِىْ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ يَاْتِى الْبَهِيْمَةَ 'তোমরা সমকামী ও সমকামকৃত ব্যক্তিকে এবং পশুর সাথে ব্যভিচারীকে হত্যা কর।' (বায়হাকী)

৩. সমাধান : এর সমাধান জরুরী। গোপন অভ্যাসের সমাধানে বর্ণিত একই সমাধান এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে আমরা আরেকটি অতিরিক্ত সমাধান যোগ করছি। আর তা হলো, বর্তমান উম্মাহ তার উত্তরসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে। এ মর্মে দ্বিতীয় খলীফা ওমার (রা) এর

মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا اَعَزَّنَا اللهُ بِهِ اَذَلَّنَا اللهُ 'আমরা এমন এক জাতি আল্লাহ যাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। আমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের বাইরে অন্য কিছু দিয়ে সম্মান অর্জন করতে চাই, তাহলে আল্লাহ আমাদের অপমান করবেন।' (বায়হাকী)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসের দিকে হাত বাড়িওনা' এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'ইসলামে ক্ষতি করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।'

এই দুই নীতির আলোকে মাতা-পিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের উচিত, সন্তানকে এসকল খারাপ ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখা।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবেক-বুদ্ধির গঠন ও বিকাশ

বিবেক গঠন বলতে বোঝায়, সন্তানকে শরীয়ত, সংস্কৃতি ও আধুনিক উপকারী জ্ঞানসহ চিন্তা ও সভ্যতার জ্ঞানে সজ্জিত করা, যাতে করে সে চিন্তার ক্ষেত্রে পরিপক্ক এবং জ্ঞানী হয়।

এই গঠন অন্য তিনটি গঠন অর্থাৎ ঈমানী, নৈতিক ও দৈহিক গঠন থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূলত ঈমানী শিক্ষা হলো বুনিয়াদ দৈহিক শিক্ষা হলো গঠন ও প্রস্তুতি এবং নৈতিক শিক্ষা হলো, আত্মস্থ ও অভ্যস্ত করানোর পর্যায়। আর বিবেক-বুদ্ধির গঠন হলো, সচেতনতা সৃষ্টি ও জ্ঞান শিক্ষার পর্যায়। এই চারটি পর্যায়সহ আরো দুইটি পর্যায় মিলিয়ে মোট ছয়টি পর্যায় সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

বিবেক বুদ্ধির গঠনের জন্য তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। (ক) জরুরী শিক্ষাদান করা, (খ) চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করা (গ) সুস্থ বিবেক বুদ্ধি বা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

(ক) জরুরী শিক্ষাদান : ইসলামে এই দায়িত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে জরুরী শিক্ষা দান করা মা-বাবা ও অভিভাবকদের উপর অর্পিত এক বিরাট দায়িত্ব। তাদেরকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রস্রবণ থেকে পান করানো ও ভারসাম্যপূর্ণ বিচার-ফয়সালার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে তাদের মধ্যে পরিপক্কতা আসবে ও জ্ঞানের পুষ্পকলিগুলো প্রস্ফুটিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে লেখাপড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার নামে পড়।' (সূরা আলাক-১) এ আদেশ দ্বারা পড়া লেখার মর্যাদা ও সম্মান তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য কোরআন হাদীসে বহু বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, 'আপনি জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? (সূরা যুমার-৯)

আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।' (সূরা তোয়াহা-১১৪)

আল্লাহ বলেন, يَرفعُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اوْتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারগণ ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (সূরা মুজাদালা-১১)

তিনি আরো বলেন, "নূন, শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লেখে।" (সূরা আল কালাম : ১-২)

এবার আমরা এ বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করবো :

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলাহ (সা) বলেন, 'দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত। তবে ব্যতিক্রম হলো, আল্লাহর জিকর বা স্মরণ, যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং যে জ্ঞানী বা ছাত্র।' (তিরমিযী)

আবু ওমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, فَضْلُ العَالِمِ عَلى العَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلى اَدْنَاكُمْ ... اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّىٰ النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا لَيُصَلُّوْنَ عَلى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ 'তোমাদের নিম্নতম কোন ব্যক্তির উপর আমার যেমন মর্যাদা, ঠিক তেমনি মূর্খ ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদাও সেরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত করেন এবং ফেরেশতা, আসমান-যমীনের বাসিন্দা, এমন কি গর্তের পিঁপড়া পর্যন্ত মানুষকে ভাল কিছু শিক্ষাদানকারীর উপর রহমতের দো'আ করে।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবলমাত্র তিনটি আমল জারী থাকে। ১. সাদকাহ জারীয়াহ, ২. উপকারী জ্ঞান ও ৩. যে নেক সন্তান মা-বাবার জন্য দো'আ করে।' (মুসলিম)

কোরআন হাদীসের নির্দেশাবলির আলোকে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগসহ পরবর্তী যুগে মুসলমানরা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাকে ফরয-ওয়াজিব গণ্য করত। তারা বিশ্বের অন্যান্য জাতিসমূহের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে উপকৃত হতে লাগল। এর ফলে, তারা বিশ্ব সভ্যতার সংস্কার এবং তাকে ইসলামের রঙে রঙিন করল। গোটা বিশ্ব পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-

সংস্কৃতি থেকে উপকৃত হলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন কোন বস্তুবাদী সভ্যতা নেই যা স্পেন, সিসিলিসহ ক্রুসেড যুদ্ধের সময় মুসলিম দেশগুলো থেকে উপাদান সংগ্রহ করেনি। তখনকার মুসলিম দেশ বিভ্রান্ত বিশ্ব ও ক্লান্ত-শান্ত মানবতার শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়।

এখন আমরা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহত্ত্ব ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায়বাদী দার্শনিকদের ইনসাফপূর্ণ সাক্ষের আলোকপাত করবো।

ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দার্শনিক সিরিস্টী বলেন, ইউরোপ দীর্ঘ এক হাজার বছর ব্যাপী ইসলামী শিল্পকলার দিকে তাকিয়ে আছে যেন তা এক বিস্ময়!

হলান্ডের প্রাচ্যবিদ ডোজি বলেন, মুসলিম শাসনামলে স্পেনে একজন নিরক্ষর লোকও ছিল না। পক্ষান্তরে, গোটা ইউরোপে উঁচু স্তরের পাদ্রীরা ছাড়া আর কেউ প্রাথমিক লেখাপড়াও জানত না।

লিনপল তার 'আরব ও স্পেন' নামক বইতে লিখেছেন, যে মুহূর্তে ইউরোপ অজ্ঞতা ও বঞ্চনার মধ্যে, সে মুহূর্তে মুসলিম শাসিত স্পেন জ্ঞান ও সংস্কৃতির পতাকা বহন করছিল।

ফ্রিভোল্ট তার 'মানবতা গঠন' বইতে লিখেছেন, আরব তথা মুসলিম সভ্যতা আধুনিক বিশ্বকে জ্ঞানের মতো মহান বিষয় উপহার দিয়েছে। ইউরোপের উন্নতির এমন কোন দিক নেই যাতে ইসলামী সংস্কৃতির ছোঁয়া লাগেনি। আর সে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আধুনিক বিশ্বকে চালিকা শক্তি দান করেছে যার মাধ্যমে বিশ্বের বহু কিছুর উপর জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। আর সেটি ছিল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানের স্পিরিট। এ সত্যতা এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলামের সভ্যতা গঠনকারী আদর্শ।

ভিক্টর রবিনসন স্পেনের ইসলামী সভ্যতার সাথে মধ্য ইউরোপের সভ্যতার তুলনা করে দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে লিখেছেন, ইউরোপের সুশীল সমাজ যেখানে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতে জানত না, সেখানে কর্ডোভার মুসলিম শিশুরা স্কুল-মাদ্রাসায় পড়ালেখা করত। অন্যদিকে যেখানে ইউরোপের বৈরাগ্যবাদীরা গীর্জার ধর্ম গ্রন্থ মুখে আওড়াত, সেখানে কর্ডোভার শিক্ষকেরা এত বিরাট পাঠাগার তৈরি করে যা আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল পাঠাগারের কাছাকাছি ছিল।

এসকল উদ্ধৃতি তারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম সভ্যতার শক্তি এবং জ্ঞানের আলো বিতরণ করে।

সভ্যতার চালিকা শক্তির রহস্য : এখন প্রশ্ন হলো, সভ্যতার চালিকা শক্তি ও জ্ঞানের আলোর পেছনে কী গোপন রহস্য কাজ করেছে? এর উত্তর হলো, ইসলামের চিরন্তন নীতিমালার মধ্যেই ঐ রহস্য লুকায়িত আছে, সে নীতিমালা হচ্ছে :

১. ইসলাম হলো আত্মা ও পদার্থ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়। ইসলামের ইবাদত, কাজ-কারবার, সামাজিক বিধান ও ইহলোকিক হুকুমের মধ্যে মানব সভ্যতা গঠনের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের শ্লোগান হলো, وَابْتَغِ فِيمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا 'তুমি পরকালে তোমার অংশ তালাশ কর, তবে তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেও না।' (সূরা কাসাস-৭৭)

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ 'নামায শেষ হয়ে গেলে আল্লাহর অনুগ্রহ বা রিজিকের সন্ধানে যমীনে বেরিয়ে পড়।' (সূরা জুমআহ-১০)

২. ইসলাম সাম্য ও মানবতার আহ্বান জানায় : মানুষের বর্ণ, ভাষা ও জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম মানব সভ্যতা গঠন করে। এক্ষেত্রে তার শ্লোগান হলো, إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি বেশী সম্মানিত যে ব্যক্তি অধিক তাকওয়া-পরহেযগার।' (সূরা আল হুজুরাত-১৩)

৩. ইসলাম হচ্ছে সকল জাতি-গোষ্ঠীর কাছে উন্মুক্ত ও পরিচিতির মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, "হে লোকেরা, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।" (সূরা আল-হুজুরাত-১৩)

এই আলোচনার ভিত্তিতে, মুসলমানরা অন্যদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন জাতি সভ্যতা-তমদ্দুন থেকে উপকৃত হয়েছে এবং শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও প্রযুক্তি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

৪. এটি হচ্ছে নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে নূতনত্বকে অব্যাহতভাবে গ্রহণকারী দ্বীন। তাই তা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিনশ্বর দ্বীন হিসেবে বিবেচিত। এটি সকল স্থান ও যুগে মানুষের প্রয়োজন পূরণকল্পে উন্নত ও পরিপূর্ণ আইন দ্বারা যমীনে আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এর শ্লোগান হলো, 'মোমেন

সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চাইতে উত্তম আইনদাতা আর কে? (সূরা আল-মায়েদাহ-৫০)

পাশ্চাত্যের সেরা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা ইসলামের মহত্ত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইসলামের গৌরব স্থায়ী। ইংরেজ দার্শনিক লর্ড বার্ণাডশ বলেন, "মোহাম্মদের আনীত দ্বীন অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দাবীদার। কেননা, তাতে বিস্ময়কর কার্যকারিতা রয়েছে। বরং এটি এমন দ্বীন যা জীবনের সকল স্তর ও পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক। আমি মনে করি, মোহাম্মদকে মানবতার ত্রাণকর্তা বলা উচিত। তাঁর মতো একজন লোক যদি আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাহলে, বিশ্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব।"

ড. ইজকু আনসাপাটো বলেন, 'ইসলামী আইন বহু গবেষণায় ইউরোপীয় আইন থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম বিশ্বকে সবচাইতে মজবুত ও স্থায়ী আইন উপহার দিয়েছে।'

১৯২৭ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন শোবরোল বলেন, "বিশ্বে মোহাম্মদের অস্তিত্বের কারণে মানবতা গর্বিত। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী আগে আইন দিয়ে গেছেন, আমরা ইউরোপীয়রা দু'হাজার সালে ইউরোপীয় আইনের শীর্ষে পৌঁছে যতটুকু ভাগ্যবান হবো, তা থেকেও সেটা উত্তম।

৫. ইসলাম শিক্ষাকে বাল্যকাল থেকেই বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক করে। তাতে দ্বীনি, সাধারণ জ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে না। তবে প্রয়োজন, অপর্যাপ্ততা ও বিশেষ শিক্ষার উপর জোর দেয়।

ইসলামে জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা বাধ্যতামূলক : এ মর্মে এখন আমরা হাদীস পেশ করবো। আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ।" (ইবনু মাজাহ) হাদীসে উল্লেখিত মুসলিম শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়কে শামিল করে।

আলকামা নিজ পিতা থেকে এবং পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। "একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের ভাল প্রশংসা করেন। এরপর বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের কি হলো, তারা কেন নিজ প্রতিবেশীদেরকে বোঝায় না, শিক্ষা দেয় না, উপদেশ দেয় না এবং ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না? বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের কি হলো,

তারা কেন নিজ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখে না, বোঝে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না? আল্লাহর শপথ, কোন সম্প্রদায় যদি নিজ প্রতিবেশীকে না শেখায়, না বোঝায়, উপদেশ না দেয়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত না রাখে এবং কোন সম্প্রদায় যদি নিজ প্রতিবেশী থেকে না শেখে, না বোঝে এবং উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে, তাদের উপর দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে।" (তাবারানী আল-কাবীর গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।)

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ النَّاسَ فِى امْرِ الدِّيْنِ الْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ "কেউ যদি মানুষের উপকারী জ্ঞান লুকায়, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।" (ইবনু মাজাহ)

ইসলামে যদি সকল নারী-পুরুষের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হয়, যদি শরীয়তে শেখা ও শিক্ষাদান করা থেকে বিরত থাকার বিরুদ্ধে শাস্তির হুমকি থাকে, যদি জ্ঞান গোপনকারী ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরানোর কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, ইসলাম জ্ঞান শিখা ও শিক্ষা দান করাকে বাধ্যতামূলক করেছে?

ইসলাম শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে : নবী করিম (সা) এর বিভিন্ন ভূমিকা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে শিক্ষা বিনামূল্যে এবং কেউ মূল্য গ্রহণ করলে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয়, নবী (সা) শিক্ষা ও দাওয়াতে দ্বীনের কাজে কোন বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাঁর এই নীতি কোরআনের নির্দেশের আলোকে গৃহীত। এ মর্মে আল্লাহ নবীর জবানীতে বলেন, وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেই আমার বিনিময়।" (সূরা শোআরা-১০৯)

ইতিহাস আরো প্রমাণ করে দেয় যে, নবী করিম (সা) মোসয়াব বিন ওমাইরকে মদীনায়, মুয়াজ বিন জাবালকে ইয়েমেনে এবং জাফর বিন আবু তালেবকে ইথিওপিয়ায় এবং আরো বহু সাহাবীকে অন্যান্য জায়গায় শিক্ষক, মোবাল্লিগ ও দা'য়ী হিসেবে পাঠান। তারা কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি।

শিক্ষা ও দাওয়াতী কাজের বিনিময় গ্রহণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী রয়েছে। আবু শায়বা থেকে বর্ণিত। ওবাদাহ বিন সাবেত বলেন, "আমি আহলে সুফফার কিছু

লোককে কোরআন ও লেখা শিক্ষা দেই। তাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি মনে মনে ভাবলাম, থাক, তাতো আর অর্থ-কড়ি নয়, আমি এটাকে জেহাদ ফি সাবিলিল্লায় ব্যবহার করবো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। আমি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এক লোককে কোরআন ও লেখা শিক্ষা দেই, সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। এটা যেহেতু অর্থ-কড়ি নয়, আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করবো। নবী (সা) বলেন, তুমি যদি আগুনের বেড়ী পছন্দ কর, তাহলে, তা গ্রহণ কর।" (আবু দাউদ)

ইতিহাস একথার আরও সাক্ষী যে, মুসলমানরা মসজিদে ইমামতি এবং মাদ্রাসায় শিক্ষাদান কর্মসূচিতে বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তবে কোন কোন সময় রাষ্ট্র তাদেরকে ভাতা দিত। আমাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী আলেমরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাকে অপছন্দ করেছেন। ইমাম গাজালী (র) বলেন, আলেমদের উচিত, শরীয়তের বাহকের অনুসরণ করা। নবী (সা) জ্ঞান শিক্ষার বিনিময় কিংবা ধন্যবাদ চাইতেন না। তিনি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তা করতেন। আল্লাহ এ বিষয়টিকে এক নবীর জবানীতে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি এর উপর তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে।' (সূরা হুদ-২৯)

এখন প্রশ্ন হলো, শিক্ষক যদি শিক্ষাদান করা ছাড়া আর কোন কাজ না করেন, তার যদি আয়ের আর কোন সুযোগ না থাকে, তখন কি তিনি শিক্ষাদানের জন্য বেতন-ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন? উত্তর হলো, অবস্থা এই হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অবশ্যই তিনি জীবন ধারণ ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।

ইমাম গাজালী (র) 'এহইয়াউল উলুম' বইতে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, শিক্ষক প্রয়োজন পূরণ ও খানাপিনার জন্য বিনিময় গ্রহণ করে নিজেকে শিক্ষাদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে পারবেন এবং সওয়াব লাভ করবেন।

ফেতনা, ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদসহ আধিপত্যবাদের যুগে সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া খুবই জরুরী। তাওহীদ, আকীদা, কোরআন তেলাওয়াত এবং ইসলামী শরীআহ শিক্ষা দেয়া ফরজ। তা না হয়, তারা মূর্খতা, কুফরী, অশ্লীলতা ও কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়বে। সেজন্য অর্থের বিনিময়ে হলেও শিক্ষা চালু রাখতে হবে।

ইবনে সাহনুন সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের তিনটি জিনিস প্রয়োজন। ১. শাসক। শাসক না থাকলে মানুষ পরস্পরকে খেয়ে ফেলবে। ২. কোরআন শরীফ বেচা-কেনা করা। তা না হলে আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ৩. শিক্ষক। তিনি সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং এজন্য বিনিময় গ্রহণ করবেন। এটা না হলে লোকেরা নিরক্ষর থাকবে।

প্রয়োজন পড়লে বিনিময় গ্রহণ করার নজীর আছে। একদল সাহাবী সফরে যান এবং একটি আরব গোত্রের কাছে মেহমানদারী কামনা করেন। কিন্তু গোত্রটি মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন ওই গোত্র প্রধানকে বিচ্ছু কামড় দেয়ায় তারা বিষ নামাতে ব্যর্থ হয়ে সাহাবীদের ওই দলের কাছে এসে সাহায্য কামনা করে। এক সাহাবী বলেন, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করোনি। তার বিনিময় নির্ধারণ করা ছাড়া ঝাড়-ফুঁক করবো না। পরে এক পাল ভেড়ার বিনিময়ে ঝাড়-ফুঁকের বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহাবীটি সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দেয়ায় গোত্র প্রধান আরোগ্য লাভ করে। এক সাহাবী বলেন, বকরীর পাল আমাদের মধ্যে ভাগ করা উচিত। কিন্তু ফুঁদানকারী সাহাবীটি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তা করা যাবে না। তাঁরা নবী (সা) এর কাছে আসেন এবং ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি করে জানলে যে, সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়? তিনি আরো বলেন, তোমরা ঠিক করেছ, এখন তা ভাগ করে নাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রাখ। এই বলে তিনি হেসে দিলেন।

ইমাম বোখারী ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে এই হাদীসের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আছে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করে যথার্থ কাজ করেছ।

এই হাদীসে কিতাবুল্লাহর বিনিময় গ্রহণের বিষয়ে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় আছে। সেগুলো হলো : (১) সাহাবীদের ঐ দলটি ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং তাদের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আরব গোত্রটি চাওয়া সত্ত্বেও তাদের আতিথেয়তা করেনি। (২) এই গোত্রটি অমুসলিম ছিল। তাই তাদের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা উচিত। আরো যেহেতু তারা আতিথেয়তা করেনি। ৩. গোত্র প্রধানের চিকিৎসা বাবদ বিনিময় গ্রহণ করা হয়েছে যা আল্লাহর কিতাবের বিনিময় হিসেবে নয়। এসকল কারণে নবী (সা) বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয বলেছেন।

মূল কথা হলো, দ্বীনি শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু তা করতে বাধ্য হলে জায়েয।

৬. ইসলাম শিক্ষাকে ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া- এ দু'ভাগে বিভক্ত করে। যে শিক্ষাটুকু ব্যক্তির নিজ আত্মা, বিবেক, শরীর ও চরিত্র গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট, ততটুকু শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজে আইন। তা নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, শ্রমিক-কর্মকর্তা এবং সকল স্তরের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। তাই কোরআন তেলাওয়াত, ইবাদতের হুকুম ও মাসলা, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, হালাল-হারাম, সাধারণ স্বাস্থ্য নীতি সহ একজন মুসলমানের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য যা দরকার তা জানা ফরজে আইন।

আর যে এলেম বা জ্ঞান কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা-প্রকৌশল, বিদ্যুৎ, পরমাণু, প্রতিরক্ষার উপায়সহ উপকারী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো শেখা ফরজে কেফায়া। একজন তা শিখলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ আদায় হয়ে যায়।

আজ আমরা জ্ঞানের যে দুর্বলতা ও সভ্যতার পশ্চাদপদতা দেখতে পাই, তার কারণ হলো, মুসলিমগণ মহান ইসলামের হাকীকত জানে না, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করে না, শত্রুরা ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চায় এবং দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে একে কেবল ইবাদত, চরিত্র ও মসজিদে সীমিত রাখতে চায়। কিন্তু মুসলমানের উচিত, যেকোন মূল্যে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করা। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। তাই এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা যেন সংযত হও।' (সূরা আল আনআম-১৫৩)

মাতা-পিতাসহ অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত, সন্তানদেরকে ভাল-মন্দ বিবেচনার বয়সে কোরআন তেলাওয়াত, সীরাতুন্নবী, ইসলামী শরীয়াহ এবং ইসলামী কবিতা শিক্ষা দেয়া। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে তিনটি অভ্যাস শিক্ষা দাও। ১. নবীর প্রতি ও ২. নবীর পরিবারের প্রতি ভালবাসা এবং ৩. কোরআন তেলাওয়াত। কেননা, কোরআন বহনকারীরা হাশরের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে এবং সেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।' (তাবারানী)

এখন আমরা এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

ও'তবাহ বিন আবু সুফিয়ান তার ছেলের শিক্ষক আবদুস সামাদকে উপদেশ দেন,

যেন তিনি তাকে আল্লাহর কিতাব, ভাল আরবী কবিতা এবং সেরা হাদীস শিক্ষা দেন।

খলীফা ওমার বিন খাত্তাব (রা) গভর্নরদের কাছে এক চিঠিতে নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজ সন্তানকে সাঁতার ও ঘোড় দৌড় শিক্ষা দেন এবং তাদের কাছে উত্তম উপমা ও সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করান।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, 'যে কোরআন শেখে, তার মূল্য বিশাল, যে ফেকাহ শেখে,তার মর্যাদা অপরিসীম, যে হাদীস লেখে, তার প্রমাণ শক্তিশালী, যে ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে, তার মেযাজ নরম এবং যে অংকে পারদর্শিতা অর্জন করে, তার রায় যথার্থ হয়।'

ইমাম গাজালী (র) 'এহইয়াউল উলুম' বইতে শিশুদেরকে কোরআন, হাদীস, নেক লোকদের জীবন চরিত, কিছু দ্বীনি মাসলা এবং অবৈধ প্রেম-ভালবাসামুক্ত কবিতা শিক্ষা দেয়ার উপদেশ দেন।

ইবনে সিনা তার 'রাজনীতি' বইতে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, শারীরিক ও বুদ্ধির যোগ্যতা লাভ করার সাথে সাথে তাদেরকে কোরআন শিক্ষা, অক্ষরজ্ঞান, পড়া ও লেখা শিক্ষা দিতে হবে। তারপর দ্বীনি মাসলা ও কবিতা শিক্ষা দিতে হবে।

ইবনে খালদুন কোরআন হেফজের উপর জোর দিয়ে বলেন, সকল দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে কোরআন মৌলিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত। কেননা, তা দ্বীনের এমন নিদর্শন যা ঈমান মজবুত করে।

শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো, শৈশবের প্রথম স্তরেই তাকে শিক্ষা দিতে হবে। তখন মন পরিষ্কার ও নরম থাকে, স্মরণ শক্তি বেশী থাকে এবং শিক্ষা তৎপরতা কার্যকর হয়। তাই আবু দারদা নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। اَلعِلْمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الحَجَرِ 'শৈশবের জ্ঞান অর্জন পাথরের গায়ে খোদাইর মতো।' (বায়হাকী, তাবারানী আওসাত গ্রন্থ) বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে।

নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সকল আলেম ও ফেকাহবিদগণ একথায় ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, ফরজে আইনের জ্ঞান অর্জন পুরুষের মত নারীর জন্যও সমানভাবে জরুরী। এর দু'টো কারণ আছে : ১. নারী পুরুষের মতোই সমানভাবে শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ২. পরকালে বিনিময় লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতোই সমান।

শরীয়াতের বিধান ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতই সমান। যেমন, পুরুষের মতো নারীর জন্যও নামায, রোজা, যাকাত, হজ্জ, নেক কাজ, বিচার-ইনসাফ, দয়ামায়া, বেচা-কেনা বন্ধক, ক্ষমতা অর্পণ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রযোজ্য। তবে ক্ষেত্র বিশেষে নারীকে কিছু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যেমন, মাসিক ও সন্তান প্রসবের সময় নামায রোজা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরে রোজা কাজা আদায় করবে। কিন্তু নামাযের কাযা করা লাগবে না।

অনুরূপ, যেসব কঠিন ও কষ্টকর কাজ নারীর দেহের গঠন ও নারীত্বের সাথে খাপ খায় না, সেগুলো থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যেমন, রাজমিস্ত্রী, যুদ্ধ,কর্মকার ইত্যাদি পেশার কাজ।

এছাড়াও যে কাজ করলে নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত এবং তার সৃষ্টির লক্ষ্য ব্যাহত হয় সেগুলো থেকেও তাকে মুক্ত রাখা হয়েছে। নারীর মূল দায়িত্ব হলো, পরিবার, সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা এবং ঘরের তত্ত্বাবধান করা।

পুরুষের সাথে একসাথে চাকুরী-বাকুরীসহ অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে সমাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাজকর্ম থেকে নারীকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এসকল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান। গুণীজনদের মতে, নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে কেবল তাকে ওই সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তা না হয়, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সেবা, ঘর ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার ব্যাপারটি কোন্ স্বামী মেনে নেবে? যে কঠিন কাজ করলে স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নারীত্ব হারায় এবং পঙ্গুত্বসহ বিভিন্ন রোগ-শোক দেখা দেয়, কান্ স্বামী নিজ স্ত্রীর জন্য তা পছন্দ করবে? কোন্ পুরুষ নিজ স্ত্রীকে পুরুষের সাথে অবাধ দূষিত পরিবেশে নিজ ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করতে দিতে চাইবে? নারীর ইজ্জত-সম্মান অপেক্ষা আর অধিক মূল্যবান জিনিস কী আছে? স্ত্রী যদি নষ্টামী ও অশ্লীলতার পথে পা বাড়ায়, তাহলে সে কিভাবে সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা দান করবে?

ঘরের বাইরে নারীর কাজ করার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতামত :

ইংরেজ দার্শনিক স্যামুয়েল স্মাইলস তার 'চরিত্র' বইতে লিখেছেন, "যে পদ্ধতিতে কলকারখানা ও অফিস আদালতে নারীর কাজ করার কথা বলা হয় এবং এর ফলে যদি সম্পদের পাহাড়ও গড়ে, তার ফলাফল হবে, পারিবারিক জীবন ধ্বংস

করা। কেননা, তা পারিবারিক জীবনের কাঠামোতে আঘাত হানে, পারিবারিক ভিত্তিকে সংকুচিত করে এবং সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করে। নারীর আসল কাজ হলো, পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা। যেমন, বাসস্থান গুছানো, সন্তান লালন-পালন এবং পারিবারের প্রয়োজন পূরণ করে জীবন ধারণের উপকরণগুলোকে অমিতব্যয়ী করা। কিন্তু কলকারখানা তাকে এসব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে ঘর আর ঘর থাকেনি, সন্তানেরা আসল শিক্ষা লাভ করেনি। তারা হয়েছে উপেক্ষিত, দাম্পত্য ভালবাসা নিভে গেছে, স্ত্রী এখন আর স্বামীর প্রিয় বান্ধবী নয়, বরং স্বামীর প্রিয় বান্ধবী হলো, কর্মস্থলের মহিলা সহকর্মী। ফলে, নারী তার মহিলা সুলভ বিনয় ও চারিত্রিক কোমলতা হারিয়ে ফেলেছে।'

ইংরেজ লেখিকা মিস এ্যানি রোড লিখেছেন, 'আমাদের মেয়েরা যদি ঘরে চাকরানী কিংবা চাকরানীর মতোও কাজ করে, তথাপি তা কল-কারখানায় কাজ করা অপেক্ষা উত্তম ও সহজ। কেননা, কল-কারখানায় সে দূষিত হয়ে পড়ে এবং চির জীবনের জন্য তার সৌন্দর্য দূর হয়ে যায়। আফসোস, আমাদের দেশ যদি মুসলিম দেশগুলোর মতো হত, যেখানে নারীর ইজ্জত-সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষিত এবং সুখ-শান্তি অবারিত! পুরুষের সাথে নারীর অবাধ মেলামেশার নোংরা সুযোগ দিয়ে ইংরেজ সমাজ লজ্জিত। আমরা কেন নারীদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ দেই না? আসমানী ধর্মগুলোর নির্দেশও তো তাই। তারা যেন ঘরে থাকে, আর পুরুষের কাজ যেন পুরুষই করে। এতেই তাদের শান্তি ও স্বস্তি নিহিত।'

পারলৌকিক বিনিময় লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতোই সমান :

আমরা এ মর্মে এখন কোরআন থেকে আলোচনা করবো।

আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ "তারপর আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম নষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী।" (সূরা আলেম ইমরান-১৯৫)

মহান আল্লাহ বলেন, "যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন নেক কাজ করে এবং মোমেন হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর সামান্যও জুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা-১২৪)

আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মোমেন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত

পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা আহযাব-৩৫)

সওয়াব ও বিনিময় লাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে তফাৎ নেই, তা আমরা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আরো স্পষ্ট জানতে পারি। আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সাকান নবী করিম (সা)-এর কাছে এসে বলেন, "আমি আমার পেছনে একদল মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছি। তাদের সকলের কথা ও মতামত আমার কথা ও মতামতের অনুরূপ। হে নবী, আল্লাহ্ আপনাকে পুরুষ ও নারী সকলের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমরা সকলে আপনার উপর ঈমান এনেছি ও আপনার অনুসরণ করেছি। আমরা নারী সমাজ অন্তপুরবাসিনী এবং ঘরের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এ দিকে পুরুষরা জুমা, জানাযা ও জেহাদের মাধ্যমে আমাদের চাইতে বেশী মর্যাদার অধিকারী। তারা জেহাদে গেলে আমরা তাদের সম্পদ ও সন্তান হেফাজত করি। হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এর সওয়াবে অংশীদার হবো? নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি নিজ দ্বীনের ব্যাপারে উৎকৃষ্ট প্রশ্নকারিণী এই মহিলার প্রশ্ন শুনেছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আসমা, তোমার পাশ্চাতে অবস্থানকারিণী মহিলাদেরকে জানিয়ে দাও, স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার, তার সন্তোষ কামনা এবং তার সম্মতির অনুসরণ করলে তুমি যা যা উল্লেখ করেছ তার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আসমা নবী (সা) এর উক্ত সুসংবাদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবার বলতে বলতে চলে গেলো।" (মুসলিম এবং ইসতিয়াব-আবদুল বার)

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঘর সামলানো, স্বামীর আনুগত্য ও সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে নারী পুরুষের জেহাদসহ অন্যান্য ইবাদতের সমান সওয়াব লাভ করতে পারে।

ইসলাম মেয়ে সন্তানের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এ মর্মে হাদীস রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যার তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে, কিংবা দু'টো কন্যা সন্তান বা বোন আছে, সে যদি তাদেরকে শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে বিয়ে দেয়, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, বাক্যগুলো আবু দাউদের)

তাদের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যার দাসী আছে, সে যদি তাকে ভাল করে শিক্ষা দেয়, ভাল করে আদব-শিষ্টাচার শেখায়, এরপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে, তার দু'টো বিনিময় আছে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) নারীদের জন্য কিছু দিন নির্দিষ্ট করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। এক মহিলা নবী করিম (সা) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, পুরুষেরা আপনার হাদীস শুনে থাকে। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন, আমরা সেদিন আসবো, আপনি আমাদেরকে তাই শিক্ষা দেবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন। নবী করিম (সা) বলেন, অমুক দিন আস। আমরা সেদিন আসলাম, আল্লাহ যা তাঁকে শিখেয়েছেন তিনি তা থেকে আমাদেরকে শিখালেন।

আল্লামা বালাজুরী তাঁর فُتُوْحُ الْبُلْدَانِ বইতে লিখেছেন, জাহেলিয়াত যুগে হাফসা বিনতে ওমার (রা) শিফা আদওয়াহ নাম্নী এক লেখিকা মহিলার কাছে লেখা শিখতেন। নবী করিম (সা) হাফসাকে বিয়ে করার পর শিফার কাছে আহ্বান জানান যেন উম্মুল মোমেনীন হাফসা (রা) কে সুন্দর ও উত্তম লেখা শেখান। কেননা, হাফসা মৌলিকভাবে তার কাছেই প্রাথমিক লেখা শিখেছেন।

কোরআন হাদীসের এ সকল আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ইসলাম নারীকে উপকারী জ্ঞান দানের নির্দেশ দিয়েছে। আগে আলেমগণ নারী শিক্ষার যে বিরোধিতা করেছেন, তা ছিল অশ্লীল কাব্য, সস্তা সাহিত্য ও অপ্রয়োজনীয় গল্প এবং ক্ষতিকর জ্ঞান। বরং তাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারী জ্ঞান, সুন্দর কাব্য ও সম্মানিত কথা শিক্ষা দিলে কেউ এর বিরোধিতা করবে না।

ইতিহাসে দেখা যায়, নারীরা ইসলামের প্রথম যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। যেমন : খলীফা মাহদীর মেয়ে ওলাইয়া, খলীফা মোস্তাকফি বিল্লাহর মেয়ে ওয়াল্লাদাহ এবং আহমদ বিন কাদেমের মেয়ে আয়েশা প্রমুখ অন্যতম কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। মহিলা মোহাদ্দেছের সংখ্যা অনেক। যেমন, করীমাহ মারওয়াযিয়াহ, নাফীসা বিনতে মোহাম্মদ প্রমুখ। মোহাদ্দেস হাফেজ ইবনু আসাকের বলেছেন, "তার মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা ৮০ এর অধিক। এছাড়াও ঈমাম শাফেঈ, ইমাম বোখারী, ইবনে খাল্লিকান, ইবনু হিববানের মত ফেকাহবিদ, হাদীস বিশারদ এবং সাহিত্যিকদের বহু মহিলা শিক্ষিকা ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও বহু বিদূষী মহিলা ছিলেন ও আছেন।

নারী শিক্ষা পৃথক হতে হবে, সহশিক্ষা নয় :

দুই লিঙ্গের পৃথক শিক্ষার ব্যাপারে সম্ভবত প্রথম যে শিক্ষাবিদ কথা বলেছেন, তিনি হলেন ইমাম আল কাবেসী। তিনি তাঁর শিক্ষা বিষয়ক বইতে লিখেছেন, নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তম। ইমাম ইবনু সাহনুনকে যখন সহশিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, "আমি ছেলেদের সাথে মেয়েদের সহশিক্ষাকে অপছন্দ করি। কেননা, তা মেয়েদের জন্য ফেতনা।" মূলতঃ তাদের উভয়ের মতামত শরীয়াতের হুকুমের উপর ভিত্তিশীল। আর শরীয়াতের হুকুম সকল কিছুর উর্ধ্বে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ও তার রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে। এরূপ করলে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হয়।" (সূরা আহযাব-৩৬)

অবশ্য উক্ত দু'ইমামের মত শরীয়াতের হুকুম থেকে গৃহীত। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ 'তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও।' (সূরা আহযাব-৫৩)

যদিও এ আয়াতটি নবী পত্নীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু ফেকাহর মূলনীতি বিষয়ক মনীষীরা বলেছেন, এখানে শব্দের ব্যাপকতা বিবেচ্য বিষয়, কারণ বিবেচ্য বিষয় নয়। যদি অতি বেশী পবিত্রতার অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও উম্মুল মোমেনীনদেরকে পর্দার হুকুম দেয়া হয়, যারা সাধারণত অমোহরমদের সামনে আসেন না, তাহলে, সাধারণ মোমেন মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করা এবং অন্যদের সামনে না আসার হুকুম আরো অধিক হারে প্রযোজ্য।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা ওয়াকিফহাল আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ্যমান, এছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ এমন যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক তাদের কাছে ছাড়া অন্যদের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না

করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে না হাঁটে। মোমেনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল কাম হও।" (সূরা নূর : ৩০-৩১)

এ দু'আয়াতে চোখ অবনত রাখা, বুক ও মাথার উপর ওড়না দেয়া এবং মুহরম ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সামনে সৌন্দর্য ও ফেতনার স্থান প্রদর্শন করার নির্দেশসহ পর্দা রক্ষা ও পবিত্রতা অর্জনের দ্বারা কি পর পুরুষের সাথে মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি?

আল্লাহ আরো বলেন, 'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মোমেনদের স্ত্রীকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আহযাব-৫৯)

এ আয়াতে মুসলিম রমণীদেরকে যেখানে পর্দা ও চাদর ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা কি করে পর পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন। 'কোন নারী ও পুরুষ নির্জনে একত্রিত হলে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হবে শয়তান।' (তিরমিযী)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমরা নারীদের কাছে প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এক ব্যক্তি বলল, দেবরের হুকুম কী? তিনি বলেন, দেবর তো মৃত্যুর মতো।" অর্থাৎ মৃত্যুর মতো তার কাছে অদৃশ্য থাকা উচিত।

এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা নারী-পুরুষের এক সাথে মেলামেশা বা সহ-অবস্থান হারাম বলে প্রমাণিত হয়।

যারা নারী-পুরুষের সহ-অবস্থানকে জায়েয বলেন, এজন্য সামাজিক নিয়ম-অভ্যাসের যুক্তি দেন, আধ্যাত্মিক সমাধান এবং শরঈ দলিল উপস্থাপন করেন, তারা মূলত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে অস্বীকার এবং মানব সমাজের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেন।

তারা যদি শরীয়াতের দোহাই দেন, তাহলে উপরে উল্লেখিত কোরআন হাদীসের বহু প্রমাণ সম্পর্কে তারা কি বলবেন? তারা কি প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করবেন? তারা কেন আল্লাহ কর্তৃক নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণকে অস্বীকার করেন? আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ "আল্লাহ যে প্রকৃতির উপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার উপর দাঁড়িয়ে যান। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম-৩০)

সহ-অবস্থান ও পর্দাহীনতার প্রবক্তারা কি বিশ্ব জাহানের নিয়মনীতি, মানব স্বভাব এবং প্রাকৃতিক বিধান পরিবর্তন করতে পারবেন? নারী-পুরুষ এক স্থানে মেলামেশা বা সহ-অবস্থান করলে এক লিঙ্গের প্রতি অন্য লিঙ্গের যৌন আকর্ষণ বা যৌন ক্ষুধা সৃষ্টি হবে এবং অশ্লীল কাজ কর্মের সম্ভবনা বৃদ্ধি পাবেই।

যদি শৈশব থেকেই জীবনের সকল পর্যায়ে এক সাথে মেলামেশা চলতে থাকে, নারীর প্রতি দৃষ্টিদানে যদি স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এতে যদি যৌন কামনা-বাসনা সৃষ্টি না হয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা শত্রুতায় এবং দয়ামায়া জুলুমে পরিণত হবে এবং যৌন সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়বে। তখন একজন অন্যজনের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের ছত্র-ছায়ায় থাকতে চাইবে না। বাস্তব অবস্থা তার সাক্ষী।

নারী-পুরুষের এক সাথে মেলামেশার ফলে মানব সমাজের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে যদি তারা উপেক্ষা করেন, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজগুলোকে জিজ্ঞেস করলেই এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। এর ফলে নারী কত খারাপ ও নষ্ট হয়েছে! কত অশ্লীল ও বেহায়াপনা দেখা দিয়েছে! সে সমাজে রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালত, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, পার্কসহ সর্বত্র একত্রে মেলামেশা চলছে।

তাদের তিক্ত অভিজ্ঞার সামান্য নমুনাকে তুলে ধরা হচ্ছে।

সাইয়েদ কুতুবের লেখা 'ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমেরিকার এক শহরের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রীদের ৪৮% গর্ভধারণ করেছে।

লেবাননের *আল-আহাদ* পত্রিকার ৬৫০ সংখ্যায় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর যৌন কেলেংকারীর লোমহর্ষক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পত্রিকা লিখেছে, মার্কিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন কেলেংকারী ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শ্লোগান দেয়, আমরা যুবতীদেরকে চাই, আমরা মনের বিনোদন চাই।

ছাত্রীদের হোস্টেল কক্ষে রাত্রে ছাত্রদের আক্রমণ এবং তাদের অভ্যন্তরীণ পোশাক চুরি হয়েছে। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন বলেছেন, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যৌন ক্ষুধার শিকার। ছাত্রদের এ জাতীয় দুষ্ট আচরণের উপর আধুনিক জীবনযাত্রার বিরাট প্রভাব পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্যের পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত মে মাসে রোড আইলেন্ড-এ ছুটি কাটাতে গিয়ে ৬৬% ছাত্র-ছাত্রী আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেনি, বরং তারা জেলখানায় গেছে। তাদেরকে মাতাল ও অন্যান্য অভিযোগে আটক করা হয়েছে।

পত্রিকা সামাজিক শিক্ষাবিদ মিসেস মার্গারেট স্মীথের বরাত দিয়ে লিখেছে, ছাত্রীরা তাদের যৌন আবেগ ছাড়া আর কোন চিন্তা করে না। আর যৌন উপায়-উপকরণগুলো তাদের সেই আবেগের সহায়ক। ৬০% এর অধিক ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করেছে। এর মূল কারণ হলো, তারা তাদের লেখা-পড়া ও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা যৌনতা নিয়ে অধিক চিন্তা করে। তাদের মধ্যে ১০% এখনও রক্ষণশীলা আছে।

জর্জ প্যালসী তার 'যৌন বিপ্লব' বইতে লিখেছেন, মি. কেনেডী ১৯৬২ সালে মন্তব্য করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিপদজ্জনক। কেননা, যুব সমাজ কামনা-বাসনার সাগরে ডুবে আছে। তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। চাকুরীর জন্য রিক্রুট করতে গেলে প্রতি ৭ জনের ৬ জনই অযোগ্য প্রমাণিত হয়। যৌন কামনা-বাসনা তাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছে। ১৯৬২ সালে কেনেডীর মতো রাশিয়ার ক্রুশ্চেভও একই মন্তব্য করেন যে, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ বিপদজ্জনক। রুশ যুবকদের উপর রাশিয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তারা যৌন কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত।

ডেল ডুরান্ট তার 'দর্শন পদ্ধতি' বইতে লিখেছেন, আমরা পুনরায় সে সমস্যার সম্মুখীন যা সক্রেটিসকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অর্থাৎ আমরা কী করে স্বাভাবিক চরিত্র লাভ করবো যা মানুষের আচরণে অনুপস্থিত? আমরাতো ফেতনা ও বেহায়াপনার কারণে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য ধ্বংস করতে বসেছি।"

গর্ভ প্রতিরোধক উপকরণ আবিষ্কারের ফলে আমাদের চরিত্র ধ্বস নেমেছে। প্রাচীন নৈতিক আইনে যৌন আচরণের জন্য বিয়ে শর্ত ছিল। কেননা, বিয়ের মাধ্যমে পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যা অস্বীকার করা যায় না। আর বিয়ে ছাড়া পিতা সন্তানের দায়িত্বশীল হতে পারত না। কিন্তু আজ যৌন সম্পর্ক ও বংশ রক্ষার মধ্যে ফাটল ধরেছে। আমাদের পিতারা বর্তমান অবস্থা কখনও কামনা করেননি। আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় যে, আমরা আমেরিকার অর্ধ মিলিয়ন যুবতীকে বেহায়াপনার যুপকাষ্ঠে বলি দানের আনন্দে সন্তুষ্ট, তারা নাট্যমঞ্চে এবং সাহিত্য বইতে খোলাখুলি নিজেদেরকে পেশ করেছে যেন এর দ্বারা অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে পয়সা আয় করতে পারে।

বিলম্বে বিবাহিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ রাস্তার যুবতীদেরকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে প্রকাশ্য বেহায়ানায় লিপ্ত হয় এবং যৌন কামনা পূরণ করে বিবাহ বিলম্ব করে। মনে হয়, গোটা দুনিয়া যৌন কামনা চরিতার্থ করার সকল উপকরণ আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং তারা ডারউনের পশুবাদকে গ্রহণ করে ধর্মের উপর কুঠারাঘাত হেনেছে।

২৪/৫/১৯৬৫ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত 'আখবার-আল-ইয়াওম' পত্রিকা লিখেছে, সুইডিশ নারীরা সুইডেনের সর্বত্র অবাধ যৌন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এতে এক লাখ মহিলা অংশ নিয়েছে।

১৯৬৪ সালে এপ্রিল মাসে, সুইডেনের ১৪০ জন প্রখ্যাত ডাক্তার রাজা ও পার্লামেন্টের কাছে যৌন অরাজকতা বন্ধের লক্ষ্যে দাবীনামা পেশ করেছেন। তারা বলেছেন, এর ফলে সুইডিশ জাতির সজীবতা ও স্বাস্থ্য ধ্বংস হচ্ছে। কাজেই অচিরেই যেন যৌন স্বাধীনতা বন্ধ করা হয়।

বিচারপতি পন লিন্ডসী 'নূতন প্রজন্মের বিদ্রোহ' বইতে লিখেছেন, আমেরিকার ছোট বালিকারা সময়ের আগেই সাবালিকা হয়ে যাচ্ছে। অতি ছোট বয়সেই তাদের মধ্যে যৌন আবেদন তীব্র হচ্ছে। তিনি ৩১২ জন বালিকার উপর জরীপ চালিয়ে জানতে পারেন, ২৫৫ জন মেয়ে ১১-১৩ বছরের মধ্যে সাবালিকা হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে যৌন আবেদনের লক্ষণ ও শারীরিক গঠন এত দ্রুততর যা সাধারণত ১৮ বছর বা এর উপরের বয়সের মেয়েদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ডাক্তার আদিথ হকার 'যৌন আইন" বইতে লিখেছেন, মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়, সমাজের শিক্ষিত স্তরের ৭/৮ বছরের বালিকারা অন্য বালিকাদেরকে সঙ্গিনী বানাচ্ছে এবং কোন কোন সময় অশ্লীল কাজেও লিপ্ত হচ্ছে। তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে অনেক উদাহরণ পেশ করেন।

বৃটিশ পত্রিকাগুলো লিখেছে, ২৫ বছরের এক যুবতী শিক্ষিকা একদল যুবককে শিক্ষাদানের সময় তাদের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছে। দেখা গেছে, সে ছাত্রদের সামনে একটার পর একটা নিজ কাপড় খুলে তাদের সাথে যৌন ক্রিয়া করেছে।

১৫/৭/১৯৭৯ সালে লন্ডনভিত্তিক 'আশশারকুল আওসাত' পত্রিকা লিখেছে, ইউরোপের ৭৫% স্বামী নিজ স্ত্রীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তবে স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জানে। তা সত্ত্বেও তারা তথাকথিত দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে না।

৮০%–৮৫% বয়োপ্রাপ্ত যুবকের ১ জন করে বান্ধবী বা গার্ল ফ্রেন্ড আছে। তবে সমাজের অবিবাহিত যেনাকারীদের বান্ধবী নেই, তারা নিজেদের যৌন কামনা পূরণের জন্য এক মহিলা থেকে আরেক মহিলার কাছে যায়।

লেবাননের 'আল-আমান' পত্রিকা ৩০/১১/১৯৭৯ সালের সংখ্যায় লিখেছে, এক বিকৃত রুচিবোধসম্পন্ন আরব যুবক ডেনমার্ক যায়। সে সেখানে নাট্যমঞ্চে এক শিল্পীকে(?) একটার পর একটা কাপড় খুলতে দেখে। নাট্যমঞ্চে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং নিজ কুকুরকে তার সাথে অশ্লীল কাজ করার জন্য ডাকে। তারপর অনতিবিলম্বে সে উপস্থিত দর্শকদেরকে পরিষ্কার আলো ও কড়া মিউজিকের মধ্যে তার সাথে কুকুরের অনুরূপ অশ্লীল কাজ করার আহ্বান জানায়। তারপর এক কৃষ্ণ মাতাল রঙ্গমঞ্চের দিকে এগিয়ে যায় এবং কুকুরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

ফরাসী পার্লামেন্ট স্পীকার লত্রকীহের বয়স ৭৪ বছর। তিনি ১৪-১৮ বছরের কিছু সংখ্যক যুবতীকে প্যারিসে নিজ সরকারী বাসভবনে উলঙ্গ নাচের আমন্ত্রণ জানান। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেশ্যাবৃত্তির নোংরামী থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি।

আমেরিকার শিকাগো শহরের পুলিশের তের খণ্ড বিশিষ্ট এক গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই নষ্ট স্বাধীনতা এবং পাশবিক সভ্যতা শুধু আমেরিকার পারিবারিক জীবনকেই ধ্বংস করেনি, বরং তা আমেরিকার জন্য এমন এক সংস্কৃতি আমদানী করেছে যার ক্ষতি পুলিশ ও বিচার বিভাগ দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়।

মার্কিন হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা ২৯/৬/১৯৭৯ সালে মার্কিন সমাজে প্রসারিত এক অদ্ভুত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গবেষকদের রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশ করে বিশ্বাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সারাংশে বলা হয়েছে, মার্কিন সমাজে বোন ও কন্যার সাথে অশ্লীল কাজ করা হয়। প্রতি ১০টি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারে এরূপ,হয়ে থাকে।

এই যদি মুহরম আত্মীয়ার ব্যাপার হয়, তাহলে ক্লাশে, অফিসে ও চাকুরীতে যুবক-যুবতীরা এক সাথে হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? সেখানেতো কোন রক্ত, বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তাই সেখানে অশ্লীল কাজ আরো বেশী হবে।

এগুলো হচ্ছে, পাশ্চাত্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহ-অবস্থান, পর্দাহীনতা ও চারিত্রিক অধঃপতনের ফলাফল। যারা ছেলেমেয়েদের সহ-অবস্থানের প্রবক্তা তারা এই অশ্লীলতা কিভাবে ঠেকাবেন?

অবাধ মেলামেশার কুফল আলোচনার পর এখন আমরা অভিভাবক ও পিতাদের জন্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরবো।

উপনিবেশবাদ ও যায়নবাদ, বস্তুবাদ ও যৌন নোংরামীর লক্ষ্য হলো, মুসলিম সমাজ ও কাঠামোকে নষ্ট করে এর ভিত্তি ধ্বংস করা। সেজন্য তারা নৈতিক মূল্যবোধ এবং যুবক-যুবতীদের দ্বীনি উপলব্ধি নষ্ট করে সমাজের সকল স্তরে যৌন উশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটাতে চায়। নারী তাদের প্রথম টার্গেট। কেননা, যৌন নোংরামী ও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দুর্বল ও আবেগ প্রবণ সত্তাকে বাছাই করা জরুরী।

এক উপনিবেশবাদীর মতে, উম্মতে মোহাম্মদীকে ধ্বংস করার জন্য মদের পেয়ালা ও নারীর ব্যবহার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাদেরকে বস্তু ও কামনা-বাসনার মধ্যে ডুবিয়ে দাও।

এক উর্ধ্বতন যায়নবাদী ম্যাসনের মতে, আমাদের কর্তব্য হল নারীদেরকে হাত করা। যেদিন তারা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং যেনা-ব্যভিচার করবে, সেদিন ধর্মের বিজয়ী বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করা সম্ভব হবে।

ইহুদী পণ্ডিতদের প্রটোকলে উল্লেখ আছে, আমাদের কর্তব্য হলো, চরিত্র ধ্বংস করে দেয়া। তাহলে সকল ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। ফ্রয়েড আমাদেরই লোক। যৌন সম্পর্কে সর্বদা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তুলতে হবে যেন কোন যুবকের কাছে পবিত্র জিনিস বলতে কিছু অবশিষ্ট না থাকে। তাদের একমাত্র চিন্তা যেন যৌন কামনা-বাসনা হয়। তখনই কেবল চরিত্রের পতন সম্ভব।

মুসলিম দেশগুলোতে যারা নারী-পুরুষের মেলামেশার প্রবক্তা তারা মূলত ইসলামের দুশমন কুফরী ও যায়নাবাদী শক্তিরই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়।

তাই অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো, নারী-পুরুষের মধ্যে সহশিক্ষার বিলোপ সাধন করে নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় এগিয়ে আসা এবং সমাজকে যৌন উশৃঙ্খলা ও বেহায়াপনার হাত থেকে উদ্ধার করা। এতে করেই মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতে পারে।

(খ) চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করা :

শৈশবেই সন্তানের চিন্তা-চেতনাকে গঠন করা মাতা-পিতা ও শিক্ষকের বিরাট দায়িত্ব। শিশুরা পরিপক্ক ও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার আগেই এটা করতে হবে। শিশুর চিন্তা-চেতনার গঠন ও খোরাক বলতে বোঝায় : তাকে শেখাতে হবে যে, ইসলামে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিই রয়েছে। কোরআন ও হাদীস হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আইন। ইসলামের রয়েছে সম্মানজনক ইতিহাস। আত্মা ও চিন্তার খোরাকের জন্য রয়েছে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। তাছাড়া ইসলামী দাওয়াত ও সংশোধনের জন্য রয়েছে ইসলামী আন্দোলন।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব দাঁড়ায়, শিশু যখন ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে তখন তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া :

(ক) ইসলাম চিরন্তন– যা সকল স্থান ও কালের জন্য প্রযোজ্য। ইসলাম হচ্ছে– ব্যাপক, স্থায়ী, সৃজনশীল ও অব্যাহত দ্বীন।

(খ) আমাদের পূর্বসূরীরা যে সম্মান, শক্তি ও সভ্যতা লাভ করেছিল, সেটার পেছনে ইসলাম দ্বারা সম্মান বাড়ানো ও কোরআনের আইন ছিল অন্যতম কারণ।

(গ) সন্তানের সামনে ইসলামের শত্রুদের নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরতে হবে :

যায়নবাদী, উপনিবেশবাদী, কম্যুনিষ্ট এবং ক্রুসেডীয় পরিকল্পনা। এসকল পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামী আকীদাকে মুছে ফেলা, মুসলিম যুবকদের মধ্যে কুফরীর বীজ বপন করা এবং মুসলিম সমাজ ও পরিবারে যৌন উশৃঙ্খলার প্রচার-প্রসার ঘটানো। এসবের নিকট ও দূরের লক্ষ্য হলো, মুসলিম যুবকদের কাছ থেকে জেহাদ ও প্রতিরোধের রূহ নষ্ট করা, মুসলিম জাতির সম্পদগুলো শোষণ করে ইসলামের চিহ্নকে মুছে ফেলা।

(ঘ) ইসলামী সভ্যতার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। ইতিহাস সাক্ষী, গোটা দুনিয়া ইসলামী সভ্যতার উৎস থেকে এক সময় পিপাসা মিটিয়েছে।

(ঙ) সন্তানের জন্য দরকার যে, আমাদের এই উম্মাহ আবু জাহেল, আবু লাহাব ও উবাই বিন খালফের মতো নয়, বরং নবী মোহাম্মদ (সা), আবু বকর ও ওমারের ইতিহাসে প্রবেশ করেছে। আমরা বাসুস, দাহেস ও গাবরার যুদ্ধে জয়লাভ করিনি। আমরা জয়লাভ করেছি বদর, কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে। আমরা জাহেলিয়াতের আরবী সাহিত্য, সাত মোআল্লাকাহ দিয়ে নয় বরং কোরআন

মাজীদ দিয়ে শাসন করেছি। আমরা লোকদের কাছে লাত, মানাত ও ওজ্জা দেবতার নয়, বরং ইসলামের পয়গাম ও কোরআনের নীতিমালা পৌঁছিয়েছি।

চিন্তার এজাতীয় খোরাক দানের পেছনে নিম্নোক্ত হাদিসটি কাজ করেছে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, : اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثَ خِصَالٍ حُبُّ نَبِيِّكُمْ وَحُبُّ آلِ بَيْتِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে তিনটি অভ্যাস শিক্ষা দাও। তোমাদের নবী ও তাঁর পরিবারকে ভালোবাসা এবং কোরআন তেলাওয়াত।' (তাবারানী)

আমাদের সুযোগ্য নেক পূর্বসূরীরা শিশুদের চিন্তার বিশুদ্ধ খোরাক সরবরাহের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা শৈশবেই কোরআন শিক্ষা, রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ এবং পূর্বসূরীদের বীরত্ব গাঁথা ও ত্যাগ তিতিক্ষা শিক্ষা দেন।

এখন আমরা এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য ও বক্তব্য তুলে ধরবো :

প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমরা আমাদের শিশুদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুদ্ধ এবং কোরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতাম।

ইমাম গাজালী (র) 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, শিশুদেরকে কোরআন, হাদিস, নেক লোকদের কাহিনী এবং কিছু দ্বীনি মাসলা শিক্ষা দিতে হবে।

ইবনে খালদুন তাঁর প্রখ্যাত মোকাদ্দামাহ বইতে শিশুদের কোরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, সকল মুসলিম দেশের সমগ্র সিলেবাসে কোরআন শিক্ষাকে মৌলিক স্থান দিতে হবে। কেননা এটা হচ্ছে, দ্বীনের নিদর্শন ও পরিচিতি। এর মাধ্যমে অন্তরে ঈমান পোক্ত হয়।

খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালেক নিজ সন্তানের শিক্ষককে বলেন, তিনি যেন সন্তানটিকে কোরআন, ভালো কবিতা, বক্তৃতা, যুদ্ধের ইতিহাস, নৈতিক চরিত্র এবং লোকদের সাথে মেলা-মেশা শিক্ষা দেন।

চিন্তার খোরাক সরবরাহ করা : এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যেমন,

১. চিন্তামূলক জ্ঞান দান : সন্তান মাতা-পিতা ও শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামের যথার্থ বিষয়, নীতিমালা, আইন-কানুন, বিধি-বিধান শিখবে এবং একথা জানবে যে, ইসলামই শাশ্বত ও চিরন্তন, টিকে থাকার উপকরণের ধারক এবং ভূ-পৃষ্ঠের লোকদের উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখার নিয়ামক। পিতা ও শিক্ষককে সন্তানকে

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে জ্ঞান দানের জন্য আগ্রহী হতে হবে যে, ইসলাম ছাড়া কোন ইজ্জত-সম্মান নেই, কোরআনের শিক্ষা ছাড়া কোন সাহায্য নেই, নবী (সা) এর শরীয়ত ছাড়া কোন শক্তি অর্জন, সভ্যতা সৃষ্টি ও জাগরণ সম্ভব নয়। সন্তানকে ইহুদিদের পরিকল্পনা, সাম্রাজ্যবাদী, কমিউনিস্ট ও ক্রুসেডীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। তাদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হলো, ইসলামকে ধ্বংস করা, ইসলামের প্রকাশ্য বাস্তবতাকে বিকৃত করা এবং এর নিদর্শনকে নষ্ট করা। তারা মুসলমানের অন্তর থেকে প্রতিরোধ ও জিহাদের স্পিরিটকে উৎখাত এবং কুফরী, গোমরাহী ও যৌন উশৃঙ্খলার মধ্যে বর্তমান বংশধরদের লালন-পালন করতে চায়। সন্তানকে ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে যা শত শত বছরব্যাপী মানবতাকে সত্য, তমুদ্দন ও জ্ঞানের আলো দান করেছে। ইউরোপ যুগ যুগ ধরে ইসলামের ঐ উৎস থেকে সুপেয় পানি পান করেছে।

২. দৃষ্টান্ত স্থাপন : সন্তানকে একনিষ্ঠ, পরহেজগার এবং ইসলামের সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকের সংস্পর্শ দেয়া দরকার, যিনি ইসলামের জন্য কাজ করেন, জেহাদ করেন, ইসলামের সীমারেখা মেনে চলেন এবং কোন অভিযোগকারীর অভিযোগ পরোয়া করেন না। বিপদ হচ্ছে, ইসলাম বিরোধিরা ছাত্রদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত ধারণা দিয়ে থাকে। তাই এদের মোকাবিলায় আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শ দরকার।

এক প্রকার শিক্ষক আছে, যারা কেবল আত্মার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, শাসকদেরকে উপদেশ দেয়া ও সংশোধন করা এবং জুলুম ও জালেমের সমানে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয় না।

আরেক প্রকার শিক্ষক হলো, ইসলামের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, দাঁড়ি- টুপি ও লম্বা জামার উপর জোর দেয়, কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এবং যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সমবেত বা ঐক্যবদ্ধ হবার দিকটিকে উপেক্ষা করে।

আরেক প্রকার শিক্ষক হলো, কেবল দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেই শেষ। তারা দ্বীনের দাওয়াত, আন্দোলন ও জেহাদের দিকটিকে উপেক্ষা করেন। তিনি ইসলামের সাহায্য করছেন বলে আত্মতৃপ্ত। এধরনের আরও বিভিন্ন লোক আছে। জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যায় না। এটা হলো একটি সামগ্রীক ও অখণ্ড জিনিস। যে কোন শিক্ষক বা আলেমের পক্ষে আল্লাহর

কোন ফরজ কিংবা নিষিদ্ধ কাজ থেকে চোখ বুঁজে থাকা জায়েজ নেই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও। তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদি সংশোধন করে ও মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমিই তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।' (সূরা বাকারা : ১৫৯-১৬০)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান লুকায়-যা দ্বারা আল্লাহ মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে উপকৃত করেন, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিবসে আগুনের লাগাম পরাবেন।' (ইবনে মাজাহ)

কোন ব্যক্তি দাওয়াতে দ্বীন থেকে বিরত থাকলে অন্যরা তাকে এক্ষেত্রে অনুকরণ করতে পারে না। কেননা মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধ্বে নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো নবীরা। ইমাম মালেক (র) একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবর মুবারকের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমাদের এমন কেউ নেই যে ভুল-ক্রটির উর্ধ্বে, একমাত্র এই কবরের অধিবাসী ছাড়া।'

তুরস্কের প্রখ্যাত আলেম ও রিসালে নূর এর প্রতিষ্ঠাতা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা আমার ধ্বংসশীল সত্তার সাথে সেই আদর্শকে একাকার করবে না, যার দিকে আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা তাকে তার পবিত্র উৎস কোরআন ও হাদিসের সাথে একীভূত কর। আমি মেহেরবান আল্লাহর সওদার একজন এজেন্ট মাত্র। আমি পাপমুক্ত নই। আমারও গুনাহ বা বিভ্রান্তি হতে পারে। তখন আমার কারণে সত্যের প্রকাশও বিকৃত হয়ে যাবে। আর আমি ওই বিকৃত গুনাহর জন্য লোকদের বিকৃত অনুসরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হবো।'

অভিভাবকের উচিৎ, নিজ সন্তানকে পরহেজগার, জ্ঞানী, অনুকরণীয় লোকের সংস্পর্শে দেয়া। তিনি তাদেরকে ইসলামের ব্যাপক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেবেন। আকীদা, আইন, দ্বীন ও রাষ্ট্র, জেহাদ ও রাজনীতিসহ সকল বিষয়ে তাতে শামিল থাকবে। তার মাধ্যমে তিনি তাদের আত্মিক সংশোধন ও শিক্ষার কাজ আঞ্জাম দেবেন। এরকম আদর্শ লোকের সংস্পর্শে আসলে সন্তান তাকওয়া, জেহাদ, লড়াই, ইবাদতসহ সকল ময়দানে সক্রিয় থাকবে।

৩. চিন্তামূলক অধ্যয়ন : অভিভাবকের উচিৎ, ঘরে ছোট হলেও একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যাতে মুসলিম বীর ও নেক লোকদের কাহিনী থাকবে। আরও থাকবে চিন্তামূলক বই। সেগুলোতে ইসলামের আকীদা, নৈতিক চরিত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনা থাকবে। এছাড়া থাকবে ইহুদি যায়নবাদী মতবাদ, ফ্রি ম্যাসন, কম্যুনিজম, খৃষ্টবাদ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী মত-পথ সম্বলিত বই। লাইব্রেরীতে ইসলাম সম্পর্কিত ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা থাকবে। সেগুলোতে সংবাদ, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং আকর্ষণীয় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা থাকবে ।

অভিভাবক এগুলো থেকে যেটা সন্তানের বয়স উপযোগী, সেটা নির্বাচন করবেন। এতে করে তার উপকার বেশী হবে। এ মর্মে আলী (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ 'লোকেরা যা জানে বা জানতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা কর।' (বোখারী)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, اُمِرْتُ اَنْ اُخَاطِبَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ 'লোকদের বিবেক অনুপাতে কথা বলা বা সম্বোধন করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। (সুনাসে দাইলামী)

৪. জ্ঞানী, নেক সাথী নির্বাচন : অভিভাবকরা অবশ্যই সন্তানের জন্য নেক, নিরাপদ এবং ইসলামী জ্ঞানের পরিপক্ক সাথী নির্বাচন করে দেবেন। শিশু যখন বুঝ-জ্ঞানের অধিকারী হয় তখন হাবা-বোকাদের সাথে চললে সেও সেরূপ হাবা-বোকা হবে। তারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাথীদের সাথে চললে তাদের মতোই সে ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যাবে।

বন্ধু কেবল ভালো, বিনীত, নামাজী, শিক্ষিত ও প্রতিভাবান হলে হবে না বরং একই সময় তার মধ্যে নেক যোগ্যতা, তাকওয়া এবং বিবেকের পরিপক্কতাও থাকতে হবে।

জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, 'আমি কে, তা জিজ্ঞাসা না করে বরং আমি কোন বন্ধুর সাথে চলি তা জিজ্ঞাসা কর।' কেননা মানুষকে তার বন্ধুর মাধ্যমে চেনা যায়। এজন্য কবি বলেছেন, عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ 'তোমরা কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা না করে তার সম্পর্কে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা বন্ধু অপর বন্ধুকে অনুসরণ করে।'

ইমাম তিরমিযী এক্ষেত্রে নবী করিম (সা)-এর চিরন্তন সত্য বাণী বর্ণনা করেছেন। 'বন্ধু তার অপর বন্ধুর ধর্ম অনুসরণ করে। তাই তোমাদের দেখা উচিৎ কার সাথে বন্ধুত্ব করেছো।"

অভভাবকের উদ্দেশ্যে বলছি, সন্তান বালেগ হবার পর যদি ইসলাম যে দ্বীন ও রাষ্ট্র, কোরআন ও তরবারী, ইবাদত ও রাজনীতির নাম না জানে, আরও যদি না জানে যে, ইসলাম ব্যাপক ও স্থায়ী দ্বীন যা উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ এনে দেয়, তাহলে সেটা নিজেদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।

এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে, আমাদের সন্তানেরা স্কুলে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিবর্গ, দার্শনিক, তাদের মতবাদ ও চিন্তাধারা, ইতিহাস ও কৃতিত্ব শিখছে কিন্তু, আমাদের বীর ও মহান পুরুষ এবং বিজয়ীদের ইতিহাস জানছে না?

আমাদের জন্য কি লজ্জার বিষয় নয় যে, বিদেশী নীতি ও সংস্কৃতি আমাদের সন্তানদের মানসিকতাকে বিকৃতি করে দিয়েছে? এমনকি এর ফলে অনেকে নিজ দ্বীন, ইতিহাস ও সভ্যতার শত্রু হয়ে গেছে। আরো লজ্জার বিষয় হলো, বর্তমান প্রজন্মের হাতে কুফরী ও ফাসেকীর বই, নগ্নতা ও বেহায়াপনার ম্যাগাজিন, অশ্লীল প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী সম্বলিত বই পুস্তক রয়েছে। তারা একটুও ইসলামের নীতিমালা ও চিন্তাধারা সম্পর্কিত বইয়ের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেনা।

(গ) **সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করা :**

আল্লাহ্ মাতা-পিতা ও অভিভাবাকদের ঘাড়ে সন্তানের বিবেকের সুস্থতা রক্ষার দায়িত্বের আমানত অর্পণ করেছেন। এজন্য সাধ্যমতো এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতে হবে যেন তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা সুস্থ থাকে, স্মরণশক্তি শক্তিশালী হয় এবং বিবেক ও মন নির্মল ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য তৈরীর ক্ষেত্রে মাতা-পিতা ও শিক্ষকের দায়িত্বের পরিধি কতটুকু? এ প্রশ্নের জবাব হলো সমাজের নষ্টামী থেকে সন্তানদেরকে দূরে রাখতে হবে। কেননা, সেগুলো বিবেক, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা ইতোপূর্বে শারীরিক শিক্ষার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন পুনরায় সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করছি।

১. চিকিৎসকগণ বলেছেন, মদ ও মাদকদ্রব্য স্বাস্থ্য ধ্বংস এবং মানুষকে মাতলামীর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

২. গোপন অভ্যাসের ফলে সিফিলিস রোগ, স্মৃতিশক্তি দুর্বল, মানসিক অবসাদ ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

৩. ধূমপানের ফলে বিবেকের ক্ষতি হয়, শরীর ও ধমনী অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়, স্মৃতিশক্তির উপর প্রভাব পড়ে এবং মানসিক চিন্তাভাবনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪. যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি : যেমন, যৌন ফিল্ম ও নগ্ন নাটক এবং ছবি দেখা। এগুলো বিবেকের কাজকে বিকল করে দেয়। মানসিক শক্তি নষ্ট করে। যৌন সুড়সুড়ির ফলে গ্ল্যান্ড থেকে এক প্রকার হরমোন বের হয়ে রক্তের মাধ্যমে মগজে গিয়ে তা পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ চিন্তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া আরো অন্যান্য ক্ষতিতো আছেই।

যৌন চেতনা সৃষ্টি সম্পর্কে ডা. কার্ললাইলের মত

ডা. কার্ললাইল তাঁর 'অজ্ঞাত মানুষ' বইতে লিখেছেন, মানুষের যৌন চেতনার সুড়সুড়ি ঘটলে গ্ল্যান্ড থেকে এক প্রকার হরমোন বের হয়, যা রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়। ফলে সে সুস্থ মস্তিষ্কে কোন চিন্তা করতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়
মানসিক গঠন

মানসিক গঠনের লক্ষ্য হলো সন্তানের বুদ্ধি-বিবেক সৃষ্টির পর তাকে সাহস হিম্মত, স্পষ্টতা, বীরত্ব, পূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি, অন্যের কল্যাণ কামনা, রাগের সময় সংযমসহ সকল মানসিক ও চারিত্রিক মর্যাদা বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেয়া, যেন তার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য উত্তম ও যথার্থ উপায়ে আঞ্জাম দিতে পারে।

জন্মের পরেই শিশুর লালন-পালনকারী ও শিক্ষকের কাছে সে আমানত বিধায় চোখ খোলার পর পরই ইসলাম সন্তানের উপর মানসিক স্বাস্থ্যের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশ দেয়। অভিভাবকের উচিৎ সম্মান ও মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব বিধ্বংসী উপাদান থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখা। সন্তানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে মুক্ত রাখা কর্তব্য :

১. লজ্জা সংকোচ ২. ভয়-ভীতি ৩. ঘাটতির অনুভূতি ৪. হিংসা ৫. রাগ-ক্রোধ।

এখন আমরা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইসলামের দৃষ্টিতে তার সমাধান পেশ করবো।

১. সংকোচবোধ করা : সংকোচ লজ্জার একটি অংশ। এটি শিশুদের মধ্যে স্বভাবজাত বিষয়। চার মাস বয়সে পৌঁছলে সম্ভবত তার প্রথম লক্ষণ দেখা যায়। আর এক বছর পূর্ণ হলে তা শিশুদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিংবা চোখ বন্ধ করে অথবা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। অপরিচিত কোন ব্যক্তি কথা বললে সে এরকম আচরণ করে। তিন বছর বয়সে শিশু অপরিচিত ঘরে গেলে সংকোচবোধ করে। তখন সে মায়ের কোলে কিংবা পাশে দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে থাকে। কঠোর সংকোচের পেছনে বংশগতি কাজ করে। সংকোচের জন্য পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যে সকল শিশু অন্যদের সাথে মেশে, সে সকল শিশু যারা মেশে না– তাদের অপেক্ষা কম সংকোচবোধ করে।

সংকোচবোধ দূর করার উপায় হলো, শিশুদেরকে লোকের সাথে মেশার অভ্যাস করাতে হবে। এজন্য বন্ধু-বান্ধবকে ঘরে ডাকা যায় কিংবা পিতা-মাতা শিশুদেরকে সাথে করে বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এছাড়া

নম্রতার সাথে শিশুদেরকে আহ্বান করা, তারা যেন অন্যদের সাথে কথা বলে; চাই তারা বড় হোক বা ছোট হোক।

এভাবে অভ্যাস গড়ে তুললে, তাদের অন্তরে সংকোচবোধ কমে আসবে, নিজেদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি হবে এবং তারা সর্বদা সত্য কথা বলার জন্য এগিয়ে যাবে। এজন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।

এখন আমরা কিছু ঐতিহাসিক উদাহরণ এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদিস পেশ করবো যা আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরকে পূর্বসূরীদের মতো সন্তানের মধ্যে সাহস ও হিম্মত সৃষ্টি এবং সংকোচ দূর করার উপায়ের পথনির্দেশ পাবে।

(১) বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তখন তিনি নাবালেগ ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি গাছ এমন আছে, যার পাতা ঝরে না এবং সেটি মুসলমানের মতো। বল, সেটি কোন গাছ? লোকেরা বন-জঙ্গলের গাছ নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিলো। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মনে হলো সেটি খেজুর গাছ। আমি তখন সংকোচবোধ করছিলাম। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, সে গাছটি সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, সেটি হচ্ছে 'খেজুর গাছ।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সেটি খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লোকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম।'

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'আমি দেখলাম যে, আবু বকর ও ওমার (রা) কথা বলছেন না, তাই আমিও কথা বলা অপছন্দ করলাম। আমি রওয়ানা দিয়ে আমার পিতাকে আমার মনে যা উদিত হয়েছিলো তা ব্যক্ত করলাম। ওমার (রা) বলেন, যদি তুমি তা বলতে, তাহলে তা আমার কাছে দামী লাল উষ্ট্রী অপেক্ষা আরও বেশী মূল্যবান মনে হতো।'

(২) সাহল বিন সা'দ আস সায়েদী থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য পানি আনা হলো, তিনি কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে ছিলো একজন শিশু বাঁয়ে ছিলো বয়স্ক লোকেরা। তিনি শিশুটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আগে তাদেরকে অবশিষ্ট পানি দেয়ার অনুমতি দেবে? শিশুটি বললো, না, আল্লাহর কসম, আমি আমার উপর আপনার অংশের ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দেবো না।' (মুসলিম)

(৩) বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তখনও তিনি সাবালক হননি। তিনি বলেন, ওমার (রা) নিজ খেলাফতকালে আমাকে বদর

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক লোকদের সাথে পরামর্শ বৈঠকে প্রবেশ করাতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে একজন তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, আমাদের সন্তানদের বয়সী এই ছেলেটিকে কেন আমাদের মজলিসে প্রবেশ করানো হয়? ওমার (রা) উত্তর দেন, সেও আপনাদের জ্ঞানের উৎস স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে। (১) একদিন ওমার (রা) আমাকে ডাকেন এবং তাঁদের মজলিসে প্রবেশ করান। আমার মনে হলো তিনি তাঁদেরকে কিছু একটা দেখানোর জন্য আমাকে ডেকেছেন। ওমার (রা) প্রশ্ন করেন, আপনারা আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাপারে কী জানেন? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (সূরা নসর-১)

কেউ বলেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হলে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। ওমার (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমিও কি তাই বল? আমি জবাবে বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কী বল? আমি, বললাম, এই আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন বিজয় আসবে, সেটা আপনার মৃত্যুর লক্ষণ হবে। তখন আপনি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করবেন এবং গুনাহ মাফ চাইবেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী। ওমার (রা) বলেন, তুমি যা জান, আমিও তাই জানি।' একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য এই দোআ করেছেন, اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ 'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের বুঝ জ্ঞান দান করো এবং ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।'

(৪) একবার খলীফা ওমার (রা) মদিনার রাস্তায় চলছিলেন। শিশুরা সেখানে খেলছিলো। আব্দুল্লাহ বিন জোবায়েরও তাদের সাথে খেলছিলেন। তিনি তখন ছোট ছিলেন। ওমার (রা) এর ভয়ে শিশুরা পালিয়ে গেলো। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের ভাগলেন না, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ওমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অন্যান্য শিশুর মতো পালালে না কেন? তিনি অকুণ্ঠচিত্তে জবাব দেন, 'আমি কোন অপরাধী নই যে– পালাবো কিংবা রাস্তা এমন সংকীর্ণ নয় যে, আপনার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেবো।' এটা নিঃসন্দেহে সাহসিকতাপূর্ণ জবাব।

(৫) ওমার বিন আব্দুল আযীয ঈদের দিন নিজ সন্তানকে পুরাতন পোশাকে দেখে তাঁর দু'চোখে অশ্রু দেখা দিলো। সন্তান তা দেখে জিজ্ঞেস করে, হে আব্বু কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, আমার আশংকা হয় অন্যান্য বালকেরা তোমার এই পুরাতন পোশাক দেখলে তোমার মনটা ভেঙে যাবে। ছেলে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ যার নিজ মনে সন্তুষ্টি রাখেননি কিংবা যে সন্তান মা-বাবার

নাফরমানী করেছে, তার মনই কেবল ভাঙতে পারে। আমি আশা করি আল্লাহ আপনার সন্তুষ্টির কারণে আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

(৬) খলীফা ওমার বিন আব্দুল আযীযের খেলাফতের প্রথম দিকে চতুর্দিক থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। হেজাজের প্রতিনিধি দলের ১২ বছর বয়স্ক একজন বালক অভিনন্দন জানানোর জন্য এগিয়ে আসলে তিনি বালকটিকে বলেন, তুমি পেছনে যাও এবং তোমার অপেক্ষা বয়স্ক মুরব্বীদেরকে আগে আসতে দাও। বালকটি জবাব দিলো, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। ব্যক্তিতো দু'টো ছোট জিনিসের সমষ্টি। অন্তর ও জিহ্বা। আল্লাহ যদি কাউকে কথা বলার জন্য জিহ্বা এবং হেফাজতকারী অন্তর দেন, তাহলে সে কথা বলার অধিকারী হয়। হে আমীরুল মোমেনীন, যদি বয়সের বিষয়টাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হতো, তাহলে এই আসনে বসার জন্য উম্মাহর মধ্যে আপনার চাইতে অন্য যোগ্য লোক রয়েছে। ওমার তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

(৭) আরবী সাহিত্যে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একজন শিশু খলীফা মামুনুর রশীদের সামনে কথা বলে এবং প্রশ্নের উৎকৃষ্ট জবাব দেয়। খলীফা মামুন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কার সন্তান? শিশুটি উত্তর দেয়, 'আমি সাহিত্য-শিষ্টাচারের সন্তান।' খলীফা বলেন, তুমি কতইনা উত্তম বংশের ছেলে! তারপর খলীফা দুই পংক্তি পড়েন,

তুমি যারই সন্তান হও, সাহিত্য-শিষ্টাচার শেখো-

তাহলে এর স্তুতি তোমাকে বংশ পরিচয় থেকে নিষ্প্রয়োজন করবে।

সেইতো যুবক, যে বলে, আমি অমুক, -সে যুবক নয় যে বলে আমার পিতা অমুক।'

(৮) একবার খলীফা মামুন বাইতুদ-দেওয়ানে (লাইব্রেরীতে) ঢুকে দেখেন, একটি ছোট বালকের কানে কলম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বালকটি বললো, আমি আপনার রাষ্ট্রের একজন বালক, আপনার সুখ-সম্পদের মধ্যে ঘুরপাক খাই, আপনার সেবার আগ্রহী, আমার নাম হাসান বিন রাজা। মামুন বালকের সুন্দর উত্তরে অভিভূত হয়ে বলেন, শুরুতেই সুন্দর আচরণ বিবেকের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। তিনি বালকটির প্রশাসনিক ও আর্থিক পদোন্নতির নির্দেশ দেন।

এসকল উদাহরণ প্রমাণ করে যে, আমাদের সুযোগ্য পূর্বসূরীরা নিজ সন্তানদেরকে সংকোচমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গঠন করতেন এবং তাদের মধ্যে সাহসিকতার

অভ্যাস গড়ে তুলতেন। এছাড়াও তাঁরা তাদেরকে সাধারণ মজলিসে ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের সময় সাথে নিয়ে যেতেন এবং বড়দের সামনে কথা বলার অভ্যাস করাতেন। খলীফা ও গভর্নরদের সামনে তাদেরকে দিয়ে কথা বলাতেন, সাধারণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের আসরে শিক্ষামূলক আলোচনায় শরীক করাতেন।

এসকল কার্যক্রম ও পদক্ষেপের ফলে সন্তানদের মনে সাহিত্যিক উপস্থাপনার সাহস সৃষ্টি হতো, বুঝ-জ্ঞানের চারা অঙ্কুরিত হতো, পূর্ণতা লাভ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের চিন্তা জন্মাতো এবং চিন্তা ও সামাজিক পরিপক্কতা বৃদ্ধি পেতো।

আজকের পিতা-মাতারও সন্তানকে গঠনকারীর অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

সংকোচ ও লজ্জার মধ্যে পার্থক্য :

সংকোচ হলো অন্যের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্তানের অনাগ্রহ ও পিছুটান ভাব। অপরদিকে, লজ্জা হলো মর্যাদা ও সম্মানের পদ্ধতি এবং ইসলামের আদব ও শিষ্টাচার। আমরা সন্তানকে প্রথম থেকেই মন্দ ও গুনাহর কাজে লজ্জা-শরম শেখাবো। আমরা তাদেরকে বড়দেরকে সম্মান করা, হারাম জিনিসের প্রতি নজর না করা এবং গোপন কথা চুরি করে শোনা বা কারো গোপন বিষয়ে না জানার বিষয় শিক্ষা দেবো। এটা লজ্জার বিষয় নয় যে, আমরা তাদের জিহ্বাকে অন্যায় ও অশ্লীল কথা থেকে পবিত্র রাখবো, পেটে হারাম জিনিস ঢুকাবো না এবং আল্লাহর সন্তোষ ও মর্জি লাভের কথা শিক্ষা দেবো।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর এক হাদিছ দ্বারা লজ্জার এই অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'লজ্জার অধিকার আদায় করে আল্লাহর কাছে যথার্থভাবে লজ্জিত হও।' আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি আমাদের লজ্জাবোধ আছে। নবী (সা) বলেন, লজ্জা বলতে তা বোঝায় না। আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধের মানে হলো, মাথা ও মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি এবং পেটকে হেফাজত করা, মৃত্যু ও ধ্বংসের কথা স্মরণ করা এবং পরকালের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির দুনিয়ার সৌন্দর্যকে ত্যাগ করে আখেরাতকে ইহকালের উপর অগ্রাধিকারই আল্লাহর প্রতি যথার্থ লজ্জাবোধ।'

এক হাদিসে নবী (সা) বলেন, اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكْنِىْ زَمَانٌ لَا يُتْبَعُ فِيْهِ الْعَلِيْمُ وَلَا يَسْتَحْىَ فِيْهِ مِنَ الْحَلِيْمِ 'হে আল্লাহ, এমন যুগ যেন আমাকে না পায় যখন জ্ঞানী-গুণী লোকদেরকে সম্মান করা হবে না এবং ধৈর্যশীল লোকদেরকে মানুষ লজ্জা পাবেনা।' (আহমদ)

অপর এক হাদিসে নবী (সা) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, আর ইসলামের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো, লজ্জাশীলতা।' (মোয়াত্তা)

২. **ভয়-ভীতি** : এটি ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সকলেরই একটি মানসিক অবস্থার নাম। স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম না করলে শিশুদের জন্য এটি উত্তম ও পছন্দনীয় বিষয়। এর ফলে শিশুদেরকে দুর্ঘটনা ও বহু বিপদ থেকে হেফাজত করা সম্ভব। তবে যদি তা স্বাভাবিক গণ্ডি অতিক্রম করে, তাহলে তা শিশুদের মানসিক উৎকণ্ঠা তৈরী করে। তখন এটাকে মানসিক রোগ বিবেচনা করে চিকিৎসা করতে হয়।

শিশু মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম বছরে আকস্মিক শব্দ কিংবা হঠাৎ করে কিছু পড়ার শব্দের কারণে শিশুর মধ্যে ভয়-ভীতির লক্ষণ দেখা যায়। প্রায় ছয় মাস বয়সে শিশু অপরিচিত লোক দেখলে ভয় পায়।

তিন বছর বয়সে শিশু পশু, গাড়ী, পানি ও ঢালু জায়গা দেখলে ভয় পায়। সাধারণত মেয়ে শিশু পুরুষ শিশু অপেক্ষা বেশী ভয় পায়। বেশী ভয় পেলে বেশী লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিশুর বেশী ভয়ের কারণ ও প্রতিকার :

ক. মা সন্তানকে মৃত ব্যক্তি, অন্ধকার কিংবা অপরিচিত সৃষ্টি সম্পর্কে ভয় দেখালে।

খ. শিশুর প্রতি মায়ের অতিরিক্ত অনুভূতি ও উদ্বেগ।

গ. শিশুকে নিঃসঙ্গ লালন-পালন করা।

ঘ. জিন-ভূতের কল্পকাহিনী বলা; ইত্যাদি।

এগুলো প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

১. শিশুকে প্রথম থেকেই আল্লাহর উপর ঈমান, ইবাদত এবং সকল ভীতিপ্রদ বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরতা শেখাতে হবে। যদি সন্তানকে ঈমানের উপর গড়া যায় এবং দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতে অভ্যস্ত করা যায়, তাহলে পরীক্ষার সম্মুখীন হলে সে ভয় পাবেনা এবং বিপদ-মুসীবতে টলবেনা। কোরআন এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, 'মানুষকে ভীরু স্বভাবের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন মন্দ ও অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ লাভ করে তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র যারা নামায আদায় করে। যারা নিজ নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।' (সূরা আল মায়ারিজ : ১৯-২২)

২. তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এবং বিকাশ ও উন্নয়নের পর্যায় মোতাবেক কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, যেন সে নবী করিম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণীর আওতায় এসে যায় : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।'

৩. **সন্তানকে ভয়–ভীতি না দেখানো** : বিশেষ করে কান্নার সময় জিন-ভূতের ভয় দেখিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা না করা। ফলে সন্তান অশরীরী ছায়ার ভয় থেকে মুক্ত থাকবে, হিম্মত ও সাহসের অধিকারী হবে এবং নবী (সা) নিম্নোক্ত বাণীর আওতাভুক্ত হবে : اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ 'শক্তিশালী মোমেন দুর্বল মোমেন অপেক্ষা উত্তম।'

৪. জ্ঞান-বুদ্ধি সৃষ্টির পর শিশুকে অন্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে এবং পরিচয়ের ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। তাহলে সে নবী করিম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণীর আওতায় পড়বে : اَلْمُؤْمِنُ اِلْفٌ مَأْلُوْفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلِفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 'মোমেন অন্যকে ভালোবাসবে এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসবে। যে ব্যক্তি ভালোবাসে না বা ভালোবাসা পায় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। সে ব্যক্তি উত্তম, যে লোকদের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী উপকারী।' (হাকেম, বায়হাকী)

মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু যে বিষয়ে বেশী ভয় পায়, তাকে সে বিষয়ে বেশী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। যেমন, সে যদি অন্ধকারকে ভয় পায় তাহলে বাতি নিভিয়ে তার সাথে হাসি-তামাশা করা যায়। পানিকে ভয় করলে, পাত্রে সামান্য পানি রেখে খেলতে দেয়া কিংবা বৈদ্যুতিক ক্লিনিং মেশিনকে ভয় করলে প্রথমে এর একটি অংশ এবং পরে পুরো মিশিন দিয়ে তাকে খেলতে দেয়া উচিৎ।

৫. শিশুকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধ, পূর্বসূরী বীর পুরুষদের ভূমিকা, মহান ব্যক্তি মহাপুরুষ ও বিজয়ী এবং সাহাবা ও তাবেঈদের চরিত্র শিক্ষা দেয়া হলে তাদের মধ্যে অসীম সাহস এবং বীরত্বের মনোভাব সৃষ্টি হবে, সৃষ্টি হবে জেহাদ এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার মানসিকতা। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) যথার্থই বলেছেন, كُنَّا نُعَلِّمُ اَوْلَادَنَا مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللهِ كَمَا نُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'আমরা আমাদের শিশুদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুদ্ধ এবং কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতাম।'

আমরা ইতোপূর্বে ঈমানী শিক্ষা পর্বে ওমার বিন খাত্তাবের বক্তব্যসহ বেশ কিছু হাদিস আলোচনা করেছি। এখন আমরা সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের বীরত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা আলোচনা করবো।

ক. মুসলমানরা যখন ওহুদের ময়দানে মোশরেকদের বিরুদ্ধে লড়াই'র উদ্দেশ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত, তখন নবী (সা) মুসলিম যোদ্ধাদেরকে পরিদর্শন করেন। তিনি বয়স্কদের সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট শিশদেরকে মুজাহিদদের কাতারে শামিল দেখতে পেয়ে দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে ফেরৎ পাঠান। তিনি যাদেরকে ফেরৎ দেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাফে বিন খোদাইজ এবং সামুরাহ বিন জুনদাব। তারপর রাফেকে অনুমতি দেন। কেননা, তাঁকে বলা হলো যে, রাফে ভালো তীর নিক্ষেপকারী। এতে সামুরা কেঁদে ফেলেন এবং নিজের সৎ পিতাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাফেকে অনুমতি দিলেন এবং আমাকে ফেরৎ দিলেন। অথচ আমি কুস্তিতে রাফেকে পরাজিত করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এই খবর পৌছলে তিনি দু'জনকে কুস্তি প্রতিযোগিতার নির্দেশ দেন। এতে সামুরা বিজয়ী হলে তিনি তাকেও অনুমতি দেন।

খ. রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন এবং সাওর গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন। তখন আয়েশা ও আসমা (রা) তাঁদের সফরের প্রস্তুতিতে সহায়তা করেন। আসমা নিজ কোমর বন্ধনীকে দ্বি-খণ্ডিত করে এক খণ্ড দিয়ে খাদ্য পাত্রের মুখ বেঁধে দেন। কোমর বন্ধনীকে 'নেতাক' বলা হয়। তাই তাঁকে 'জাত-আত-নেতাকাইন' বলা হয়।

এদিকে আবু বকর (রা)-এর অল্প বয়স্ক ছেলে আব্দুল্লাহ দিনে কোরাইশদের সাথে কাটাতেন এবং যাবতীয় খবর রাতে সাওর গুহায় দু'জনের কাছে পৌছাতেন। তিনি গুহা থেকে ভোর রাতে ফিরতেন। কোরাইশরা মনে করতো তিনি ঘরে ভোর থেকে জেগে আছেন।

উল্লেখ্য যে, আয়েশা ও আব্দুল্লাহ তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন। এটা এমন এক বীরত্বপূর্ণ কাজ যা কোন বয়স্ক পুরুষের পক্ষেও আঞ্জাম দেয়া সম্ভব ছিলো না।

গ. বোখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধের দিন সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক বালককে দেখতে পেলাম। তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, হে চাচা, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি প্রশ্ন করলাম, আবু জাহলকে দিয়ে তোমার কী হবে?

সে বললো, আমি জানতে পেরেছি, সে রাসূলুল্লাহ (সা)কে গালমন্দ করে। আল্লাহর কসম,আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে, তাকে অবশ্যই দ্রুত হত্যা করবো। আব্দুর রহমান বলেন, আমি তা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই। অপর বালকটিও আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করে। তখন আমি আবু জাহলকে লোকদের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে দেখলাম। আমি বললাম, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না? এই সে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। তারা উভয়ই তার উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তলোয়ার চালিয়ে তাকে হত্যা করলো। তারা নবী (সা) এর কাছে এসে তাঁকে এ খবর দেয়। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উভয়ই উত্তর দিলো, 'আমি'। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তলোয়ার মুছে ফেলেছো? তারা বললো, না। নবী (সা) দু'তলোয়ারের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছো। তবে নিহত আবু জাহলের যুদ্ধাস্ত্র পাবে মোয়াজ বিন আমর বিন জামুহ। অন্যজনের নাম ছিলো মোয়াজ বিন আফরা।

ঘ. ইবনু আবু শায়বা শা'বী থেকে বর্ণনা করেন। এক মহিলা ওহুদ যুদ্ধের দিন নিজ ছেলের হাতে তলোয়ার তুলে দেন। ছেলেটি তলোয়ারের বোঝা বহন করতে পারছিলো না। মা ছেলের হাতের বাজুতে তা বেঁধে দেন। তারপর নবী (সা) এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার এই ছেলে আপনার পক্ষে লড়াই করবে। নবী (সা) বলেন, হে বৎস, এদিকে হামলা কর। পরে ছেলেটি আহত হলো এবং মাটিতে পড়ে গেলো। তাকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি ছেলেটিকে বলেন, সম্ভবত তুমি ভয় পেয়ে গেছো। ছেলেটি বললো, না, হে আল্লাহর রাসূল।'

ঙ. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, বাজ্জার এবং ইবনুল আচীর তাঁর আল ইসাবাহ গ্রন্থে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। সা'দ বলেন, আমি আমার ভাই ওমাইর বিন আবি আক্কাসকে বদরের যুদ্ধের দিন মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখি। তখনও রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে পরিদর্শন করেননি। আমি প্রশ্ন করলাম, হে ভাই, তোমার কী হয়েছে? সে বললো, আমার আশংকা হয় যে, নবী (সা) আমাকে দেখলে ফেরৎ পাঠাবেন। অথচ আমি জেহাদে যেতে চাই, হতে পারে আল্লাহ আমাকে শাহাদাত নসীব করাবেন। সা'দ বলেন, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে পেশ করায় অল্প বয়স্ক হবার কারণে তিনি তাকে ফেরৎ পাঠান। সে কান্না শুরু করে দেয়। তখন নবী (সা) তাকে জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। সা'দ বলেন, সে ছোট হওয়ায় আমি তার তলোয়ারের খাপ বেঁধে দিই। তার বয়স ছিলো ষোল। যুদ্ধে সে শহীদ হয়।

এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের সন্তানেরা অপূর্ব সাহস, দুর্লভ বীরত্ব এবং বীরোচিত জেহাদের অসাধারণ শার্দুল ছিলেন। নবুয়্যতের পাঠশালা, মুসলিম পরিবার এবং মোমেন মুজাহিদ ও বীরোচিত সমাজ থেকে যোগ্য শিক্ষা লাভের কারণেই মোমেনরা ঘরে এই অসাধারণ ফসল তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বরং মায়েরা নিজ সন্তানদেরকে কোরবানী ও জেহাদের ময়দানে ঠেলে দিয়েছেন। যখনই তারা সন্তানদের শাহাদাতের খবর শুনতেন তখন তাদের একজনতো এরূপ বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে আমাকে মর্যাদাবান করছেন। আমি আল্লাহর কাছে এই তামান্না ও আশা করি, তিনি আমাকে ও তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাঁর রহমতের আবাসে একত্রিত করবেন।'

পিতারা নিজ সন্তানদেরকে বাল্যকালেই ঘোড় সওয়ারী, সাহস ও পৌরুষত্ব শিক্ষা দিতেন এবং বিপদ-মুসীবতে প্রবেশ করাতেন। সন্তান যখন বড় হতো, প্রাপ্ত বয়সের আগেই তারা মুক্তি কাফেলায় শরীক হতেন, রিযক তালাশ করতেন, সত্যবাদী দাঈ হতেন, বীর মুজাহিদ হতেন এবং কামাই রোজগার করতেন। এর মাধ্যমেই তারা ইজ্জত-সম্মান ছিনিয়ে আনতেন। আল্লাহ বলেন, 'ইজ্জত-সম্মান হলো আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মোমেনদের জন্য। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।' (সূরা মোনাফেকুন-৮)

৩. ঘাটতির অনুভূতি : শিশুদের মধ্যে কমতি ও ঘাটতির অনুভূতি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সৃষ্টিগত, অসুখ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদি। এর ফলে শিশুর মনে জটিলতা বিকৃতি কিংবা খারাপ ও অসৎ জীবন যাপন এবং অপরাধ প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এজন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবকের উচিৎ, সন্তানের এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রতিরক্ষা ও আরোগ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নিম্নোক্ত কারণে সন্তানের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিতে পারে :

১. অপমান ও উপেক্ষা ২. সীমাতিরিক্ত আদর-সোহাগ ও সাহায্য ৩. সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া ৪. শারীরিক পঙ্গুত্ব ৫. ইয়াতীম ৬. অভাব ও দারিদ্র্য।

এখন আমরা এ কারণগুলোর প্রতিকার আলোচনা করবো :

১. অপমান ও উপেক্ষা করা : সন্তানের বিকৃতি ও বিভ্রান্তির জন্য এটি একটি প্রধান কারণ। এর ফলে তাদের মধ্যে অভাববোধ কিংবা কমতি ও ঘাটতির অনুভূতি জাগে। দেখা যায়, সন্তান একবার একটা খারাপ কাজ করলে মা-বাবা

তাকে সে কাজের প্রতি সম্বোধন করে ডাকে। যেমন, একবার মিথ্যা কথা বললে তাকে 'মিথ্যুক', সে তার ছোট ভাইকে থাপ্পড় দিলে সে 'দুষ্ট', একবার ছোট বোনের হাত থেকে আপেল কেড়ে নিলে তাকে 'ধূর্ত', পিতার পকেট থেকে কলম নিলে তাকে 'চোর', এক গ্লাস পানি চাইলে সে না দিলে তাকে 'অলস' ইত্যাদি নামে ডেকে পরিবারের মধ্যে তাকে প্রথম ধাক্কা দেয়। তাকে তার ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সামনে কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও অপরিচিত লোকের সামনে খারাপ নামে ডাকলে সে অপমানবোধ করে এবং নিজেকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে ভাবতে থাকে, সবাই তাকে খারাপ জানে। তাই সকলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। ফলে সে সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে না। তাহলে কি করে তার কাছ থেকে আনুগত্য, সম্মান, ভারসাম্য ও দৃঢ়তা আশা করা যায়? বরং আমরাই তার অন্তরে বাল্যকালে ভ্রান্তি, আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহের বীজ বপন করছি।

এখানে একটি চুটকি উল্লেখ করা যায়। এক ব্যক্তি নিজ ছেলেকে তার মায়ের নাম ধরে গালি দেয় যে, তুই আমার বিরোধিতা করছিস, অথচ তুই তো এক দাসীর সন্তান। ছেলেটি বাবাকে বলে, আমার মা আপনার চাইতে উত্তম। বাবা জিজ্ঞেস করে, কীভাবে? সন্তান বলে, তিনিতো আপনার মতো একজন স্বাধীন পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে আমাকে প্রসব করেছেন। কিন্তু আপনিতো একজন দাসীকে বিয়ে করে আমাকে জন্ম দিয়েছেন।

বাবা সন্তানকে বিরাট অপরাধের কারণে সংশোধনের উদ্দেশ্যেই কেবল খারাপ শব্দ ব্যবহার করতে পারে, এর আগে নয়। এরও কুফল আছে। কেননা সন্তান পরে গালি গালাজ শেখে এবং খারাপ চরিত্র অবলম্বন করে। কঠোর পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সন্তানকে চারিত্রিক ও মানসিকভাবে ভেঙে ফেলি। আমরা তাকে বিবেকবান, ভারসাম্যপূর্ণ ও দৃঢ়পদ করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই।

ইসলামে সন্তানের এই ত্রুটি সংশোধনের উপায় :

সংশোধনের যথার্থ উপায় হলো, কোমল ও নরমভাবে তার দোষ ধরিয়ে দেয়া, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যে, তার এই ত্রুটিতে কোন বিবেকবান ও জ্ঞানী-গুণী লোক সন্তুষ্ট হবে না। সে যদি তা বুঝে নেয়, তাহলে তার ত্রুটির আকাঙ্ক্ষিত সংশোধন হয়ে গেলো। তা না হয় আমরা শাস্তির অধ্যায়ে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনা করবো।

নরম ও কোমল পদ্ধতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এর গৃহীত পদ্ধতি। এ বিষয়ে আমরা তাঁর কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

(ক) মোসনাদে আহমদে ভালো সনদসহকারে আবু ওমামাহ থেকে বর্ণিত। এক যুবক নবী করিম (সা) এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহর নবী, আমাকে যেনা ব্যভিচারের অনুমতি দিন। লোকেরা তার সম্পর্কে শোরগোল শুরু করলো। নবী (সা) বলেন, তাকে আমার নিকটবর্তী কর। সে নিকটবর্তী হলো এবং সামনা-সামনি বসলো। নবী (সা) তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বললো, না। 'আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।' নবী (সা) বলেন, তেমনি লোকেরাও তা নিজের মায়ের জন্য পছন্দ করবে না। নবী (সা) আবারও প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বললো, না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। নবী (সা) বলেন, ঠিক লোকেরাও তেমনি তা নিজেদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করবে না। নবী (সা) আবারও প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে? সে বললো, না। 'আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।' তিনি বলেন, লোকেরাও ঠিক তা তাদের বোনদের জন্য পছন্দ করবে না। তারপর তিনি তার চাচী ও খালার কথাও জিজ্ঞেস করায় সে প্রতিবারে বলে, না। আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তখন নবী (সা) নিজ হাত মোবারক তার বুকের উপর রাখেন এবং এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ 'হে আল্লাহ, আপনি তার অন্তরকে পবিত্র করে দিন, তার গুনাহ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।'

তারপর সে নবী (সা)-এর কাছ থেকে ওঠে চলে গেলো এবং তার অন্তরে তখন যেনা অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস এত নিকৃষ্ট ছিলো না।

আমরাও আমাদের যুবক-যুবতীর জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি।

(খ) ইমাম মুসলিম মুআওইয়া বিন হাকাম আল-সেলামী থেকে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো। আমি তার 'আলহামদুলিল্লাহ'র জবাবে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বললাম। লোকেরা আমার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো। আমি দুঃখ করে বললাম, মাগো, আমার ধ্বংস। তোমরা কেন আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছো? তারা নিজেদের উরুর মধ্যে হাত দিয়ে আওয়াজ দিতে থাকলো। আমি বুঝলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায়। আমি চুপ হয়ে গেলাম। নবী করিম (সা) নামাজ শেষ করে আমাকে ডাকেন। আমার মা-বাবার দোহাই, আমি আগে ও পরে তাঁর অপেক্ষা উত্তম কোন শিক্ষক দেখতে পাইনি। তিনি আমাকে ভর্ৎসনা,

তিরস্কার, গালমন্দ কিংবা মার দিলেন না। শুধু এতটুকু কথা বললেন যে, এই নামাজে মানবিক কোন কথা জায়েয নেই। বরং নামাজ হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কোরআন তেলাওয়াত।

(গ) বোখারী শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন মসজিদে নবওয়ীতে পেশাব করে। লোকেরা তাকে মারধর করার জন্য গেলো। নবী (সা) বলেন, তাকে পেশাব করতে দাও; পেশাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতার জন্য নয়।

এ সকল ঘটনা সমস্যার উত্তম সমাধানের পথ বাতলায়। তাই এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

নমনীয়তা ও কোমলতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপদেশ :

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনম্র, তিনি সকল বিষয়ে নমনীয়তাকে ভালোবাসেন।'

মুসলিম শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِى شَىْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ 'নমনীয়তা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং নমনীয়তার অভাবে সে বিষয় মন্দ হয়।'

মুসলিম শরীফে জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّ' যে ব্যক্তি নমনীয়তা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।'

উপসংহারে বলা যায়, সন্তানকে অব্যাহতভাবে অপমান করা ও তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করা ঠিক নয়। বিশেষ করে অন্য লোকের সামনে করলে তার মধ্যে ঘাটতির অনুভূতি থাকবে। সন্তানের মানসিক ও নৈতিক বিকৃতির সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হলো, তার ক্রটির জন্য নরমভাবে তাকে সংশোধন করা। যদি তাকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করতে হয়, তাহলে, অন্যদের সামনে নয়। তবে প্রথমে উত্তম উপায়ে তার ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদ্ধতি।

২. সীমাতিরিক্ত আদর-সোহাগ ও সাহায্য করা :

সন্তানের মানসিক ও নৈতিক বিকৃতির জন্য আদর ও সাহায্যের আতিশয্য

বিপজ্জনক। এর ফলে তার মধ্যে ঘাটতির অনুভূতি এবং জীবনের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দেয়। তার মধ্যে স্বভাবতই লজ্জা জাগে, পৌরষত্ব ও বীরত্ব লোপ পায়, আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয় এবং পিছুটান ভাব দেখা যায় ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সৃষ্ট অভাববোধের পরিণতি হলো :

* সে দেখে যে, লোকেরা এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কাফেলার পেছনে পড়ে রয়েছে।
* লোকদের রয়েছে সাহস-হিম্মত, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে ভয়-ভীতি ও কাপুরুষতা।
* লোকেরা চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দৌড়-ঝাঁপ করছে, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে নীরবতা ও স্থবিরতা।
* লোকেরা পরস্পরের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা করছে কিন্তু সে এক ঘরে ও একাকীত্বের মধ্যে আছে।
* লোকেরা বিপদ-আপদে হাসি-খুশী, কিন্তু সে সামান্য বিপদেও কান্নাকাটি ও পেরেশানীতে আছে।

এ দু'ধরনের সন্তানের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য সৃষ্টি হবে। তাহলে মাতা-পিতা কেন তাকে সীমাতিরিক্ত আদর-সোহাগ ও সাহায্য করে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিকৃত করছে? অনেক সময় মায়েরা সীমাতিরিক্ত আদর-সোহাগ করে।

এখন আমরা ইসলামী নীতি সম্পর্কে মায়েদের কিছু ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

* ভুল শিক্ষার আওতায় ছেলে যে কাজ করতে সক্ষম মা স্নেহ ও সোহাগের কারণে তাকে সে কাজ করতে দেয় না।

* সন্তানকে স্থায়ীভাবে মায়ের আঁচলে আগলে রাখা ঠিক নয়। দেখা যায়, তাকে নিজের কাছে রাখার যুক্তি থাক আর না-ই থাক, তথাপি তাকে হাতছাড়া করে না।

* মা সন্তানকে এক নিমেষের জন্যও চোখের আড়ালে যেতে দেয় না, পাছে কোন ক্ষতি হয়। এটা ভুল শিক্ষা।

* একই ধরনের ভুল শিক্ষা হলো, সন্তান ঘরের কোন আসবাবপত্র ভাঙলে, টেবিলে উঠলে কিংবা সাদা দেয়ালে কালো দাগ দিলে একটুও শাসন না করা।

দীর্ঘদিন পর সন্তান লাভ করলে, বেশ কয়েকবার গর্ভপাতের পর সন্তান প্রসব করলে, কয়েকটি মেয়ে সন্তানের পর ছেলে সন্তান হলে কিংবা জীবন নাশী অসুখ-বিসুখের হাত থেকে আরোগ্য লাভ করলে সন্তানের আদর-কদর অনেক বেড়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান :

১। **মাতা-পিতার মনে তকদীরের বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা** : তারা যেন একথা বুঝে যে, সন্তানের স্বাস্থ্য ও অসুখ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, বংশ বিস্তার ও বন্ধ্যাত্ব এবং ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না যা জগৎ সৃষ্টির আগেই কিতাবে লিখে রাখা হয়নি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্য হয়েছে যাতে তোমরা যা হারাও সে জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা হাদীদ : ২২-২৩)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, 'আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ তালারই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল।' (সূরা শূরা-৫০)

আল্লাহ আরও বলেন, 'এবং আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল-জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল নষ্ট করার মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের, যখন তারা বিপদে পতিত হয়ে বলে- নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াত প্রাপ্ত।' (সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

২. **সন্তানকে ক্রমান্বয়ে আদব শিক্ষা দেয়া** : যদি উপদেশ নসীহতের দ্বারা ফায়দা হয় তাহলে, তাকে বয়কট করা অভিভাবকের জন্য জায়েয নেই। আর যদি বয়কট করলে লাভ হয়, তাহলে মারার প্রয়োজন নেই। অভিভাবক যদি সংশোধনের সকল পদ্ধতি প্রয়োগের পরও তাকে ঠিক করতে না পারেন, তাহলে হালকা মার দিতে হবে।

৩. শৈশব থেকেই শিশুকে প্রাচুর্যের মধ্যে গড়ে না তোলা, আত্মবিশ্বাস জন্মানো, দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও হিম্মত সৃষ্টি করা। এর ফলে সে নিজের অস্তিত্বের এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের অনুভূতি উপলব্ধি করবে।

প্রাচুর্যের মধ্যে সন্তানকে যেন গড়ে তোলা না হয়। এ মর্মে মোসনাদে আহমদ ও আবু নাঈম মোয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকো। আল্লাহর নেক বান্দাহগণ প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকে না।'

সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' -এই হাদিসের মর্ম ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং শাসক ও শাসিত সকলের জন্য প্রযোজ্য।

ওমার (রা) বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে ঘোড়ায় আরোহনের জন্য হুকুম দাও।' (বায়হাকী)

যে সন্তান এ কাজগুলো শিখবে সে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ববোধ অনুভব করবে এবং পরে কষ্ট ও দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে।

ওবাদা বিন সামেত বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে পছন্দ-অপছন্দ, সুখ-দুঃখের আনুগত্য এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন- সত্য কথা বলা ও কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করার বায়আত করেছি।'

এই বায়আত ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুকরণ করা। তিনি শৈশবে ও যৌবনে বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। গুণের পূর্ণতায় পৌঁছার পর আল্লাহ তাঁকে নবুয়্যত দান করেন। তাঁর গোটা জীবনটাই অনুকরণীয়।

তিনি শৈশবে ভেড়া-বকরী চরাতেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি বলেন, 'আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ভেড়া-বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী অবস্থা? তিনি বলেন, হাঁ, আমিও মক্কাবাসীদের এক দেরহামের ভগ্নাংশের বিনিময়ে বকরী চরিয়েছি।'

শৈশবে তিনি ছোট শিশুদের সাথে খেলা-ধুলা করতেন। ইবনু কাসীর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি কোরাইশ গোত্রের শিশুদের সাথে খেলার উদ্দেশ্যে পাথর বহন করছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেই পরনের ইজার (লুঙ্গি) খুলে তা কাঁধে রেখে এর উপর পাথর বহন করি। আমিও অন্যান্য শিশুদের এভাবে উলঙ্গ সামনে ও পেছনে আসা যাওয়া করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে আমাকে থাপ্পড় দিলো। আমি ব্যথা পেলাম। অথচ আমি তাকে দেখতে পেলাম না। সে আমাকে বললো, ইজার বা লুঙ্গি পর। আমি ভালো করে ইজার পরলাম এবং খালি কাঁধে পাথর বহন করলাম অথচ আমার অন্য সাথীরা সকলেই উলঙ্গ।

তিনি রাজ মিস্ত্রির কাজ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। তিনি যখন যুবক, তখন কাবা ঘরের নির্মাণ কাজ চলছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভ্রান্ত

কোরাইশদের সাথে পাথর বহন করেন। আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, ইজার কাঁধে রেখে এর উপর পাথর বহন কর। তিনি এরূপ করাতে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর চোখ দু'টো আকাশের উর্ধ্বমুখী। তারপর উঠে বলেন, আমার ইজার, আমার ইজার। এরপর কষে ইজার পরেন। তিনি বলেন, আমাকে উলঙ্গ চলতে নিষেধ করা হয়েছে। নবুয়্যতের আগের এ ঘটনা তাঁর নিস্পাপ হবার প্রমাণ।

তিনি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফরে যেতেন। বর্ণিত আছে, তিনি মোট দু'বার বাণিজ্য সফরে যান। একবার অপ্রাপ্ত বয়সে নিজ চাচা আবু তালেবের সাথে এবং দ্বিতীয়বার খাদিজা (রা) এর ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, নবী (সা) বাল্যকালে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। একবার তাঁকে কেউ লাত ও ওজ্জা নামক দুই দেবতার নামে শপথ গ্রহণের আহ্বান জানালে তিনি তাকে বলেন, لَا تَسْأَلْنِيْ بِهِمَا شَيْئًا، فَوَاللهِ مَا بَغَضْتُ شَيْئًا بُغْضِيْ لَهُمَا 'আমাকে ওই দু'টোর নামে কিছু জিজ্ঞেস করো না। আল্লাহর কসম, আমি অন্য সব কিছু অপেক্ষা ওই দু'টোকে বেশী ঘৃণা করি।'

নবী (সা) পাপীদের যুদ্ধে (হারবুল ফুজ্জার) অংশগ্রহণ করেন। তখনও তিনি সাবালেগ হননি।

তিনি ছিলেন যথার্থ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। যুবক অবস্থায় কোরাইশরা হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী কাজ করে।

ইয়াতীম মোহাম্মদ শৈশবেই উত্তম গুণাবলি ও অভ্যাস আত্মস্থ করেন। তিনি কখনও মূর্তিকে সাজদা কিংবা জাহেলিয়াতের নোংরামীতে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, اَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَاحْسَنَ تَأدِيْبِيْ 'আমার রব আমাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন।' (আসকারী)

এ হচ্ছে নবী (সা) এর জীবনের সামান্য ঘটনা যা আমাদের সন্তান ও তাদের গঠনকারীদের জন্য উত্তম আদর্শ।

আমরা উপসংহারে বলতে পারি, সন্তানকে অতিরিক্ত আদর-সোহাগ করলে সে নষ্ট হবে। তাদেরকে সমানভাবে আদর-স্নেহ করতে হবে। তাহলে ঘাটতির অনুভূতি জাগবে না।

ভয়-ভীতির বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে।

সন্তানকে ভালো-মন্দ বোঝার বয়সে উপযুক্ত আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে শাস্তি দেয়া যাবে।

তাদেরকে প্রাচুর্যের মধ্যে না রাখা, আত্মনির্ভরশীলতা, দায়িত্বের বোঝা বহন এবং

আদব-কায়দাভিত্তিক হিম্মত শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে নবুয়্যত পূর্ব মহানবীর জীবন অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৩) **এক সন্তানের উপর অন্য সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয়া** : চাই সেটা কোন কিছু দান করা হোক, লেন-দেন হোক এবং ভালোবাসা- যাই হোক না কেন। এটা সন্তানের মানসিক সমস্যা সৃষ্টি ও বিকৃত আচরণের প্রধান কারণ। কেননা এর ফলে হিংসা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়, ভয় ও লজ্জা দেখা দেয়, কান্নাকাটি করে, আক্রমণ ও বেআদবী করে এবং ঝগড়া সৃষ্টি হয়; যা রাত্রি ভয়, স্নায়ুর অসুখ এবং মনে কমতি ও ঘাটতির অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাই মানবতার প্রধান শিক্ষক মহানবী (সা) মাতা-পিতাকে আল্লাহ্ ভীতি এবং সন্তানের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।

ইবনে হিব্বান রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, رَحِمَ اللهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهُ عَلٰى بِرِّهِ আল্লাহ সে পিতাকে রহম করুন যিনি সন্তানকে তাঁর হুকুম পালনের জন্য সাহায্য করেন।'

তাবারানী এবং অন্যরা আরকেটি হাদিস বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, سَاوُوْا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সমানভাবে দান কর।'

নোমান বিন বাশীর থেকে বর্ণিত। বাশীর নিজ ছেলে নোমানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে বললেন, আমি আমার এই ছেলেটিকে দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি তোমার অন্য সকল সন্তানকে অনুরূপ দান করেছো? বাশীর বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহলে এই দান প্রত্যাহার কর।' (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার অন্য ছেলেদের সাথে অনুরূপ করেছো? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا فِىْ اَوْلَادِكُمْ 'আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো।'

আমার আব্বা ফিরে এসে ওই দান প্রত্যাহার করে নেন।'

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবী (সা) বলেন, 'হে বাশীর, এছাড়া কি তোমার আর কোন সন্তান আছে? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (সা) প্রশ্ন করেন, তুমি সকলকে তার মতো দান করেছো? বাশীর বলেন, না। নবী (সা) বলেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী করো না। আমি অন্যায় ও জুলুমের সাক্ষী হবো না। তারপর তিনি প্রশ্ন

করেন, তুমি কি চাও যে তারা সকলে তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (সা) বলেন, তাহলে এরূপ করো না।'

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা) এর কাছে আসেন। তখন তার ছেলেও তার কাছে আসে। লোকটি ছেলেটিকে চুমু খায় ও নিজ উরুর উপর বসায়। তারপর মেয়ে আসলো। তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি তাদের সাথে সমান আচরণ করলে না কেন?

নবী (সা) এর এ সকল নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, সন্তানের মধ্যে ইনসাফ, সাম্য ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

হাঁ, সন্তানদের ভালো না বাসা ও গুরুত্ব না দেয়ার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণ থাকতে পারে। সেগুলো হলো :

– অজ্ঞতার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত হলে-যেমন, কন্যা সন্তান।

– কম সুন্দর ও কম বুদ্ধিমান হলে।

– শারীরিক পঙ্গুত্ব থাকলে।

তবে এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন যুক্তি হতে পারে না। কেননা সন্তান কন্যা হলে তার কি দোষ? অসুন্দর হলে কিংবা চেহারা দেখতে ভালো না লাগলে সে জন্য সে দোষী হবে কেন?

যদি অভিভাবকেরা সন্তানকে মানসিক জটিলতা থেকে নিরাপদ করতে চান এবং ফেতনা-ফ্যাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘাটতির অনুভূতি থেকে রক্ষা করতে চান, তাহলে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই হাদিসের উপর আমল করা ছাড়া কোন উপায় নেই :

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর।'

তাদেরকে কন্যা সন্তানের ব্যাপারে রাজি-খুশী থাকতে হবে এবং সকল সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, ক্ষমা ও সাম্যের মনোভাব দেখাতে হবে।

ইবনে হিব্বান বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, رَحِمَ اللّٰهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهٗ عَلٰى بِرِّهٖ 'আল্লাহ সে পিতাকে রহম করুন যিনি সন্তানকে তার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য সাহায্য করেছেন।

(৪) শারীরিক পঙ্গুত্ব : এটা সন্তানের মানসিক বিকৃতির অন্যতম কারণ। এর ফলে সে নিজের মধ্যে ঘাটতির অনুভূতি অনুভব করে এবং জীবনের প্রতি

বিতৃষ্ণাবোধ করে। সন্তান শৈশবে যদি কানা, বোবা ও বধির হয় তাহলে তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের উচিৎ তাকে স্নেহ-মায়া ও দয়া-মমতা দেখানো। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'দয়াকারীদের উপর আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা যমীনের অধিবাসীদের দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিই হলো পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।' (তিরমিযী, ইবনু হিব্বান)

কিন্তু সন্তানকে যদি বোবা, কানা, বধির ও বিকলাঙ্গ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হয়, তার মধ্যে কমতির ঘাটতিও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হবে।

তাই সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো বিজ্ঞোচিত উপায়ে দয়া ও স্নেহের সাথে আচরণ করা। কেননা, দ্বীনের মূলনীতি হলো, মানুষের মূল্য তার দ্বীন ও চরিত্রের মধ্যে, আকার-আকৃতিতে নয়।

এই সমস্যার সমাধান হলো–

(ক) পঙ্গুদের প্রতি দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে তাকাতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে, তারা অন্যদের চাইতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

(খ) চারপাশের লোকদেরকে তাদের প্রতি অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে নবীর (সা) পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ (সা) জিহ্বার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'বান্দাহ বেপরোয়াভাবে এমন কথা বলে যার ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।' (বোখারী)

তিনি আরও বলেন, 'তোমার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও প্রকাশ করো না, তাহলে আল্লাহ তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করবেন।' (তিরমিযী)

তিনি আয়েশা (রা)কে ইশারা-ইঙ্গিতে কাউকে হেয় করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত। আয়েশা বলেন, 'আমি নবী (সা)কে বললাম, সাফিয়া তো এরূপ... অর্থাৎ খাটো। তিনি বলেন, তুমি এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেছো যা সাগরের পানির সাথে মেশালে সমস্ত পানি নষ্ট হয়ে যাবে।'

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, 'হে মোমেনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে

উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ জাতীয় কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।' (সূরা হুজুরাত-১১)

(গ) নিজ সন্তানের জন্য অন্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী সাথী নির্বাচন করা দরকার। তারা তাদের সাথে মিশবে, খেলা-ধূলা এবং আলাপ আলোচনা করবে। এর ফলে তারা নিজেদের অন্তরে অন্য মানুষের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা বিনিময় শিখবে। শিশুর গঠনের উদ্দেশ্যে ইবনে সিনা বলেন, শিশুর ঘরে ভালো ও সন্তোষজনক আদব-শিষ্টাচার সম্পন্ন অন্য শিশু থাকা দরকার। কেননা, এক শিশু অন্য শিশু থেকে ভালোভাবে শিখে এবং তার প্রতি ভালোবাসার পোষণ করে।

তিরমিযী তাঁর নাওয়াদের গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, عُرَامَةُ الصَّبِيْ فِى الصِّغَرِ زِيَادَةٌ فِى عَقْلِهِ فِى كِبَرِهِ 'শৈশবে শিশুর অন্যের সাথে মেলা-মেশার শক্তি বড় হলে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষণ।'

(৫) সন্তান ইয়াতীম হলে বিকৃত হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে ভালো পরিবেশ না পেলে এবং তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা বিতরণ না করা হলে মানসিক বিকৃতির সম্ভাবনা বেশী। ইসলাম ইয়াতীম শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার জিন্দেগীর নিশ্চয়তা দেয় যেন সে সমাজের উপকারী সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে এবং উত্তম উপায়ে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য আঞ্জাম দিতে পারে। এ মর্মে কোরআন মাজীদ বলে, 'আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না।'(সূরা আদ-দোহা-৯)

আল্লাহ আরও বলেন, 'আপনি কি তাকে দেখেছেন যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।' (সূরা মাউন : ১-২)

রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াতীমের যত্ন ও প্রতিপালনের ওপর জোর দিয়ে এটাকে ফরজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ يَعْنِىْ السَّبَابَةُ وَالْوسْطى 'আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব পালনকারী জান্নাতে এক সাথে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত দেন।' (তিরমিযী)

মোসনাদে আহমদ এবং ইবনে হিব্বানে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কেউ যদি দয়াবশত কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, যতগুলো চুলের উপর হাত বুলিয়েছে, আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ নেক দান করবেন।'

ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদসহকারে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ : اَلْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ 'হে আল্লাহ, আমি ইয়াতীম ও নারীর মতো দুই দুর্বলের অধিকার নস্যাৎকারীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবো।'

আত্মীয়-স্বজনের উপরই ইয়াতীমের দেখা-শোনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। যদি তারা না পারে তাহলে, তাদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। নবী (সা) ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি ইয়াতীম শিশুদের যত্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ঈদের দিন এক ইয়াতীম শিশুকে দেখে আদর করেন এবং তাকে নিজ ঘরে নিয়ে যান। এরপর শিশুটিকে বলেন, তুমি কি তাতে রাজী যে, আমি তোমার পিতা এবং আয়েশা তোমার মাতা?

রাস্তায় পাওয়া শিশুর যত্ন নেয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ওমর বিন খাত্তাবের কাছে এক ব্যক্তি রাস্তায় পাওয়া এক শিশু নিয়ে আসলে তিনি তাকে বলেন, 'সে স্বাধীন, তার ভরণ-পোষণ আমাদের ওপর।'

এ জাতীয় সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম ইয়াতীম ও পথে পড়ে থাকা শিশুর প্রতিপালন করে।

(৬) দারিদ্র্য : এটা সন্তানের মানসিক বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। সন্তান যখন নিজ পিতার অভাব অনটন দেখে কিংবা স্কুল-মাদরাসায় অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গীদের উত্তম অবস্থায় দেখে, তখন তার মধ্যে হতাশা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। সে সমাজকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং ঘাটতির অনুভূতি ও মানসিক জটিলতার শিকার হয়। তখন তার আশা হতাশায় রূপ নেয়। নবী করিম (সা) যথার্থই বলেছেন, كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا 'দারিদ্র্য কুফরী পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে।' (আহমদ, বায়হাকী)

বরং নবী (সা) দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ 'হে আল্লাহ, আমি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।' (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)

ইসলামে দারিদ্র্যের সমাধান :

ইসলাম দু'টো মৌলিক বিষয় দ্বারা দারিদ্র্যের সমাধান করে।

১. মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

২. সামাজিক জিম্মাদারীর নীতি।

১. **মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন** : মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আওতায় ইসলাম সকল বর্ণ, বংশ ও শ্রেণীর প্রতি সম্মান দেখায়। যদি কাউকে প্রাধান্য দিতে হয়, তা হবে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত এই নীতি বহাল রাখার কথা ঘোষণা দিয়ে বলেছে, 'হে মানবগোষ্ঠী, আমি তোমাদেরকে এমন একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।' (সূরা হুজুরাত-১৩)

ইসলাম মানুষের দেহ ও আকৃতির দিকে তাকায় না, বরং তার অন্তর ও কাজ দেখে। মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَجْسَامِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও দেহ দেখেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।'

ইসলাম দুর্বল ও দরিদ্রের মর্যাদা উন্নীত করেছে এবং তাদেরকে অসন্তুষ্ট ও ঘৃণা করাকে আল্লাহর শাস্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আবু সুফিয়ান একবার সালমান, বেলাল ও সোহাইবের কাছে আসে। তারা তাকে দেখে বললো, 'আল্লাহর তরবারী আল্লাহর দুশমনদের প্রতিশোধ নেয়নি।' আবু বকর (রা) বলেন, তোমরা কোরাইশ বংশের সরদার ও নেতাকে এরূপ বলতে পারলে? আবু বকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসেন এবং ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবু বকর, আপনি সম্ভবতঃ তাদের তিনজনকে অসন্তুষ্ট করেছেন! আপনি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাকেন তাহলে আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করেছেন। আবু বকর তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাইয়েরা, আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি? তাঁরা জবাব দিলো, না। তারা বললো, হে ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

ইসলাম সামাজিক জিম্মাদারী ও নিরাপত্তার মাধ্যমে দারিদ্র্য সংকটের সমাধান করে। এজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে :

(ক) যাকাতভিত্তিক বাইতুল মাল তহবিল : এ তহবিল থেকে অভাবীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হয়। যাকাতের প্রাপ্ত লোকদের কথা কোরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, 'যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের মন জয় করা দরকার তাদের অধিকার এবং তা দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত,

আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাওবা-৬০)

বাজ্জার ও তাবারানী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, 'সে ব্যক্তি আমার ওপর সত্যিকার ঈমান আনেনি যে নিজে খায় এবং তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে অথচ সে জানে।'

ইসলাম তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের মনে আনন্দ প্রবেশ করানোকে উত্তম আমল হিসেবে বিবেচনা করে।

এ মর্মে তাবারানী আওসাত গ্রন্থে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, افضَلُ الْاَعْمَالِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ اَوْ اَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ اَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً 'মোমেনের মনে খুশি প্রবেশ করানো উত্তম আমল। তুমি তার সতর ঢাকার জন্য কাপড় পরাবে, ক্ষুধা দূর করবে কিংবা তার প্রয়োজন পূরণ করবে।'

কঠোর অভাব অনটনের সময় অভাবী ও বঞ্চিত মানুষকে সাহায্য করা ওয়াজিব। বোখারী শরীফে আব্দুর রহমান বিন আবি বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত। আসহাবে সুফফা ছিলেন গরীব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اَوْ سَادِسٍ 'যার ঘরে দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে নিয়ে খাইয়ে দেয়। আর যার ঘরে চার জনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে খাইয়ে দেয়।'

মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার অতিরিক্ত উট আছে সে যেন যার উট নেই তাকে তা দিয়ে দেয়। যার অতিরিক্ত সম্বল আছে সে যেন সম্বলহীনকে সম্বল দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন প্রকার সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা ভাবলাম যে, অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নেই।

বেকারদের কাজ দেয়া মুসলিম শাসকদের অন্যতম দায়িত্ব। এ মর্মে আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে সাহায্য চাইলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘরে কি কিছু আছে? আনসার সাহাবীটি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, একটি চাদর আছে। এর একাংশ বিছাই এবং অপর অংশ গায়ে দেই। আর একটি পান

পাত্র আছে। নবী (সা) বলেন, ওই দু'টো নিয়ে এসো। ওই দুটো নিয়ে আসলে নবী (সা) তা হাতে নিয়ে বলেন, কে এই দু'টো জিনিস কিনবে? একজন বললো, আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এর চাইতে বেশী দামে কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনবো।

তিনি তা বিক্রি করে আনসারীর হাতে দু'দিরহাম দিয়ে বলেন, এক দিরহাম দিয়ে পরিবারের জন্য খাদ্য এবং আরেক দিরহাম দিয়ে কুড়াল কিনে নিয়ে এসো। আনসারী কুড়াল কিনে আসলে নবী (সা) নিজ হাতে এর বাঁট লাগিয়ে দেন এবং বলেন, যাও কাঠ কেটে বিক্রি কর, ১৫ দিন পর আসবে। সে তাই করল। ১৫ দিনে ১০ দিরহাম আয় করলো। এর কিছু দিয়ে খাদ্য ও কিছু দিয়ে পোশাক কিনলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এটা হাশরের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার দাগ নিয়ে ওঠার চাইতে উত্তম।'

পারিবারিক ভাতা একটি অন্যতম সামাজিক জিম্মাদারী। সকল নবজাত সন্তানের জন্য ইসলাম ভাতা নির্ধারণ করে। চাই সে সন্তান শাসক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাসহ চাকর-চাকরানীর যারই হোক না কেন। আবু ওবায়েদ তাঁর 'আল আমওয়াল' কিতাবে ওমার বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেন। ওমার (রা) পিতার সাথে নবজাত সন্তানের জন্য একশ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। সন্তান বড় হবার সাথে সাথে ভাতাও বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে খলীফা ওসমানসহ অন্যান্য খলীফারা এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। ইসলামী আদর্শ সমাজের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও জিম্মাদারী, ত্যাগ ও কোরবানী এবং স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

এখন আমরা সামাজিক জিম্মাদারী ও নিরাপত্তার ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরবো :

১. মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, মদীনায় কিছু লোক বাস করতো। তারা জানতো না, কে তাদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজন যোগায়। যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইনের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি খাদ্য ও সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তিনি রাতের অন্ধকারে এসে তাদের জন্য খাদ্য রেখে যেতেন। মৃত্যুর পর তাঁর পিঠ ও কাঁধে বিধবা ও ফকির-মিসকিনদের ঘরে বস্তা বহনের দাগ পরিলক্ষিত হয়।

২. লাইস বিন সাদ অনেক ফসলের মালিক ছিলেন। যার মূল্য ছিল প্রায় ৭০ হাজার দিরহাম। তিনি এর সব কিছুই দান করে দিতেন। ফলে তার ওপর যাকাত

ফরজ হতো না। তিনি একবার নিলামে একটি বাড়ি কিনেন। তার প্রতিনিধি বাড়িটির মালিকানা গ্রহণ করতে গিয়ে তাতে ছোট ইয়াতীম শিশুদের দেখতে পান। শিশুরা ঘরটা তাদের জন্য ছেড়ে যেতে অনুরোধ করে। লাইসের কাছে এ খবর পৌছার পর তিনি বলেন, এই ঘর তোমাদের এবং সাথে প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণের অর্থও পাবে।

৩. প্রখ্যাত মোহাদ্দেস এবং অধিক দান-সদকাকারী আবদুল্লাহ বিন মোবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বছরে এক লাখ দিনার দান করতেন। একবার তিনি সাথীদেরকে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন। এক দেশ অতিক্রমের সময় দেখলেন যে একটি পাখি মারা গেছে। সেটিকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। সাথীরা আগে আগে চলছে। তিনি তাদের পেছনে চলছেন। ডাস্টবিনের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখেন পার্শ্ববর্তী ঘরের এক বালিকা মৃত পাখিটা উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি তাকে কারণ জিজ্ঞেস করায় বালিকাটি উত্তর দেয়, সে ও তার ভাই গরীব। তাদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না এবং তাদের কোন সম্পদ নেই। ইবনুল মোবারক ওই পাখিটা ফেলে দেবার জন্য নির্দেশ দেন এবং নিজ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে কত টাকা আছে? তিনি বলেন, এক হাজার দিনার। তিনি বলেন, মারও নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে যেতে আমাদের যে বিশ দিনার লাগবে তা রেখে অবশিষ্ট অর্থ এই বালিকাকে দাও। এই দান আমাদের চলতি সনের হজ্জ অপেক্ষা উত্তম। তারপর তারা হজ্জ না করে ফিরে যান।

রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গ যদি দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করতে চায়, তাহলে দেশের কোন দরিদ্র ও অভাবী থাকবে না। বরং উম্মাহ সুখ-শান্তি, কল্যাণ, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার সাগরে অবগাহন করবে। ফলে সমাজে কোন অপরাধ থাকবে না।

৪. হিংসা : হিংসা হলো অন্যের নেয়ামত দূর হবার কামনা করা। এটা একটা বিপজ্জনক বিষয়। অভিভাবক এবং শিক্ষক যদি ছাত্রের এ বিষয়টি দূর করতে না পারেন তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। প্রথম দিকে শিক্ষকেরা হয়তো ধারণা করবেন যে, এই শিশু কাউকে হিংসা করবে না। কিন্তু কৌশলের সাথে বিষয়টি ঠিকমতো বুঝতে না পারলে তা ক্ষতি ডেকে আনবে।

শিশুর মধ্যে যে কারণে হিংসা জাগে সেগুলো জেনে আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালো হয়। কারণগুলো হলো :

(ক) শিশু আশংকা করে যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার আবেগ-ভালোবাসার মতো সুবিধে লোপ পেতে পারে। বিশেষ করে সংসারে নবজাত সন্তানের আগমনের কারণে তার ভালোবাসায় ছিঁড় ধরতে পারে।

(খ) সন্তানের মধ্যে কাউকে মেধাবী এবং কাউকে বোকা বলে তুলনা করা।

(গ) নিজ সন্তানের মধ্যে কাউকে অন্যের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া। যেমন, একজনের সাথে হাস্যরস করা, তাকে দান করা ও সাথে আরোহন করানো এবং অন্যকে অবহেলা করা।

(ঘ) আদরের সন্তানটি কোন মন্দ ও অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করা আর অন্য সন্তানকে সামান্য ত্রুটির জন্যও শাস্তি প্রদান করা।

(ঙ) ধনী সমাজ ও পরিবেশে গরীব ও অভাবী ছেলের অবস্থান হিংসার আগুন জ্বালাতে সহায়ক।

হিংসা যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইসলাম সন্তানকে ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহযোগিতা ও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে। এজন্য নিম্নোক্ত শিক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় :

(ক) সন্তানকে বুঝতে দিতে হবে যে, তাকে আদর-স্নেহ করা হয়। নবী (সা) তাই করতেন, সাহাবায়ে কেরামকে তার আদেশ দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন। এ মর্মে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি :

তিরমিযী ও অন্যান্য ইমামগণ আব্দুল্লাহ থেকে তিনি নিজ পিতা বোরাইদা থেকে বর্ণনা করেন। আমি নবী (সা)কে বক্তৃতা দিতে দেখলাম। তখন হাসান ও হোসাইন আসলো। তাদের গায়ে ছিলো দু'টো লাল জামা। তারা হাঁটার সময় হোঁচট খাচ্ছিলো। নবী (সা) মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে কোলে তুলে নেন এবং নিজের সামনে বসান। তারপর বলেন, আল্লাহ যথার্থ বলেছেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান হচ্ছে পরীক্ষা।' (সূরা আনফাল-২৮) 'আমি শিশুদ্বয়কে হাঁটার সময় হোঁচট খেতে দেখে সহ্য করতে না পেরে বক্তৃতা বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিলাম।'

রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান, হোসাইনের সাথে হাস্যরস করতেন। তারা তাঁর হাত ও হাঁটুর মধ্যে হাটতো এবং তাঁর সাথে ছিলো তাদের নিবিড় সম্পর্ক। তিনি তাদেরকে পিঠে আরোহন করিয়ে বলতেন :

'তোমাদের উটটি কতইনা উত্তম এবং তোমরা কতইনা উত্তম সহোদর।'

নতুন শিশুর আগমনের আগে কিছু সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যেমন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে বড় শিশুর বিছানা আলাদা করা। তাকে ছোট সন্তানের

পোশাক পরানো, গোসল করানো ও খাদ্য খাওয়ানোর অনুমতি দেয়া এবং তার সাথে খেলাধুলা করতে দেয়া। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, তাতে নবজাতকের কোন ক্ষতি না হয়।

মোট কথা বড় শিশুটিকে বুঝাতে হবে যে, নবজাতকের আগমন সত্ত্বেও তার আদর এতটুকু কমেনি।

(খ) সন্তানের মধ্যে ইনসাফ করা : অভিভাবক যদি নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে তাদের মন থেকে হিংসার মনোভাব দূর হয়ে যাবে এবং তারা নিজ সহোদরদের মধ্যে পূর্ণ সমঝোতা ও ভালোবাসা সহকারে বাস করে ঘরে নির্মল ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করতে সক্ষম হবে। এজন্য মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী (সা) মাতা-পিতাকে নিজ সন্তানদের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে হাদিস থেকে অনেক প্রমাণ পেশ করেছি।

(গ) হিংসা সৃষ্টিকারী উপায় দূর করা : যে সকল কারণে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, কৌশলের সাথে সে সকল কারণ দূর করা প্রয়োজন। যেমন নতুন সন্তান আগমনের কারণে যদি বড় সন্তানের মধ্যে মাতা-পিতার ভালোবাসা হারানোর আংশকা দেখা দেয় তাহলে মাতা-পিতা তাকে এ ধারণা দেবে যে, তার প্রতি ভালোবাসা আগের মতোই অটুট থাকবে।

যদি মা-বাবা বোকা ছেলের প্রতি কটু শব্দ কিংবা খারাপ শব্দ প্রয়োগ করে, তাহলে মা-বাবার কর্তব্য হবে নিজ জিহ্বাকে সংশোধন ও সংযত করা।

হিংসা এক মারাত্মক বিপদ। তা থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে না পারলে তার সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে না। হিংসার বিপদ সম্পর্কে মহানবী (সা) সতর্ক করেছেন।

আবু দাউদ, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। আগুন যেভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা নেক কাজগুলোকে খেয়ে ফেলে।'

তাবারানী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'লোকেরা যে পর্যন্ত হিংসা না করবে সে পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে।' তাবারানীর আরেক বর্ণনায় এসেছে, لَيْسَ مِنِّى ذُوْ حَسَدٍ 'হিংসুক আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।'

দাইলামী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। الحسَدُ يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ 'হিংসা ঈমানকে তেমনি নষ্ট করে যেমনি মোসাব্বর মধুকে তেতো করে।'

৫. রাগ : এটা একটা মানসিক আবেগ। শিশুদের মধ্যে শৈশব থেকেই এটা দেখতে পাওয়া যায়, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বয়সের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান থাকে। রাগকে খারাপ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টির মধ্যে একটা কল্যাণ রেখেছেন।

রাগের উপকারিতা :

উপকারী রাগ ক্রোধ দ্বারা জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান এবং দ্বীন ও দেশকে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের হাত থেকে হেফাজত করা যায়। আল্লাহ যদি মানুষের মধ্যে এই আবেগকে সুপ্ত না রাখতেন, তাহলে মানুষ কখনও আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানা লঙ্ঘন, তার দ্বীনের অপমান এবং নিজ দেশের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত হতো না। এ জাতীয় রাগ প্রশংসিত যা কখনও কখনও নবী করিম (সা) এর মধ্যে দেখা গেছে।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে। আল্লাহর নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি জারি না করার জন্য যখন একজন সুপারিশ করতে আসলো, তখন তাঁর চেহারা মোবারকে রাগের লক্ষণ ফুটে উঠলো। তিনি তখন তাঁর এই অমীয় বাণী শোনান :

'তোমাদের আগে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে যাদের সম্ভ্রান্ত লোকেরা চুরি করলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হতো, আর দুর্বল লোকেরা চুরি করলে তাদের উপর দণ্ড-বিধি জারি করা হতো। আল্লাহর কসম, যদি ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদও চুরি করে, তাহলে আমি তার হাত কেটে দেবো।'

তাবারানী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি। তবে, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করতে দেখলে তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন। যখন তাঁর কাছে দু'টো বিষয় পেশ করা হয়, আল্লাহর অসন্তুষ্টি না থাকলে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়টি গ্রহণ করেন। আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকলে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন।

যে সকল শিক্ষাবিদ ও আলেম রাগকে খারাপ বলে মনে করেন, তারা এর দ্বারা সেই রাগ বোঝান যা দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করা হয় এবং যে রাগ দ্বারা উম্মাহর অনৈক্য, দলের ভাঙ্গন, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করা হয় না।

নবী করিম (সা) রাগ দমন ও নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করেছেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না। একথা তিনি বার বার বলেন।'

মোসনাদে আহমদে আব্দুল্লাহ বিন ওমরের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করেন, কোন জিনিস আমাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে রাখবে? তিনি উত্তর দেন, 'রাগ করো না।'

বোখারী শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَّهُوَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ 'যে ব্যক্তি রাগ বাস্তবায়নের ক্ষমতা সত্ত্বেও তা দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টি জগতের উপর যে কোন হুর বাছাই করার সুযোগ দেবেন।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। 'রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন, তোমরা কুস্তি বীর বলতে কী বোঝ? তাঁরা বলেন, যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে সেই বীর। নবী (সা) বলেন, না। সেই সত্যিকারের বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

পবিত্র কোরআন মাজীদেও রাগ নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, 'ভালো ও মন্দ সমান নয়। জওয়াবে উৎকৃষ্ট কথা বলুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা আছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সূরা হা-মীম-সাজদাহ-৩৪)

আল্লাহ আরও বলেন, 'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নরমভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলেন, সালাম।' (সূরা ফোরকান-৬৩)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আল্লাহ নেককার লোকদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল ইমরান-১৩৪)

তিনি আরও বলেন, 'আর তারা যখন রাগ করে তখন ক্ষমা করে দেয়।' (সূরা শূরা-৩৭)

মন্দ রাগ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বিবেক ও ভারসাম্য নষ্ট করে এবং সমাজের ঐক্য ও সংহতির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য হলো, শিশুকে ছোট থাকতেই মন্দ রাগ থেকে বেঁচে থাকার উপায় বাতলানো।

রাগ সৃষ্টির পেছনে যে সকল উপাদান ক্রিয়াশীল সেগুলোকে আগেই নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম প্রতিষেধক। প্রতিরক্ষামূলক কাজে এক দিরহাম ব্যয় করা চিকিৎসা বাবদ অঢেল অর্থ ব্যয় করার চাইতে উত্তম।

রাগের পেছনে যদি ক্ষুধা দায়ী হয়, তাহলে শিক্ষকের উচিৎ নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে খাদ্যের প্রতি অবহেলা সন্তানের

শারীরিক রোগ এবং মানসিক আবেগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যার ওপর কারও রিযিকের দায়িত্ব, তা নষ্ট করা বিরাট গুনাহ। এ মর্মে আবু দাউদে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে। 'কেউ যদি তার উপর অর্পিত কারো পোষণের দায়িত্ব নষ্ট করে সেটা গুনাহ।'

যদি অসুখের কারণে রাগ আসে, তাহলে শিশুর গঠনকারীর দায়িত্ব হলো, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। নবী (সা) বলেন, 'সকল রোগের ওষুধ আছে। ঠিকমতো ওষুধ পড়লে আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ করবে।' (মুসলিম, আহমদ)

যদি মা-বাবার রাগ সন্তানের রাগের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে মা-বাবার উচিৎ, তাদের জন্য সংযমের ক্ষেত্রে আদর্শ হওয়া।

রাগ কমানোর কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

১. অবস্থার পরিবর্তন করা : মোসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ রাগ করলে, দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে। যদি তাতে রাগ চলে যায় ভালো, না হয় শুয়ে পড়বে।'

২. রাগ আসলে ওজু করা : আবু দাউদে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে। রাগের সৃষ্টি শয়তান থেকে, আর শয়তানের সৃষ্টি আগুন থেকে। আগুন পানি দিয়ে নেভানো হয়। তোমাদের কেউ রাগ করলে সে যেন ওজু করে।'

৩. রাগের সময় চুপ করে থাকা : মোসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ 'তোমাদের কারো রাগ দেখা দিলে সে যেন চুপ করে থাকে।'

৪. শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া : বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে ঝগড়া করলো। একজন তার সঙ্গীকে এমনভাবে গালি দিলো যে তার নিজ চেহারা লাল হয়ে গেলো। নবী (সা) বলেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে ব্যক্তির রাগ চলে যাবে। আর তা হলো : আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।'

রাগের সময় দেখা যায়, চোখ বড় হয়ে যায়, গলার রগ মোটা হয়ে যায়, চেহারা লাল হয়ে যায়, আওয়াজ বড় হয়ে যায়। শিশুরা এগুলো দেখে শেখে।

মোসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'রাগ হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা যা আদম সন্তানের মনে প্রজ্জ্বলিত হয়। তোমরা কি তার গলার রগ মোটা এবং চোখ লাল হতে দেখো না? কেউ নিজের মধ্যে রাগ অনুভব করলে সে যেন মাটিতে বসে বা শুয়ে পড়ে।'

সন্তান গঠনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবককে উপরিউক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক শিক্ষা বা গঠন

সামাজিক গঠন বলতে বোঝায়, সমাজের উন্নত আদব-শিষ্টাচার ও মহান মানবিক মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা গ্রহণ করা যা ইসলামের চিরন্তন আকীদা-বিশ্বাস ও গভীর ঈমানী অনুভূতি থেকে উৎসারিত। শিশু যেন সমাজে উত্তম আচরণ, আদব-কায়দা, ভারসাম্য, বিবেকের পরিপক্কতা ও বিজ্ঞ চাল-চলনে সক্ষম হয়। সন্তান গঠনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের এটি এক বিরাট দায়িত্ব। সামাজিক শিক্ষা মূলত ইতোপূর্বে আলোচিত ঈমানী, নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার সার-নির্যাস।

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়, সমাজের সুস্থতা ও মজবুত ভিত্তি সমাজের সদস্যদের প্রস্তুতি ও সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই ইসলাম শিশুদের সামাজিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তান গঠনের চারটি প্রক্রিয়া বা উপায় আছে।

১. মহান আত্মিক ও মানসিক নীতিমালা মনে বদ্ধমূল করা।

২. অন্যের অধিকার রক্ষা করা।

৩. সাধারণ সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে চলা।

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে তদারকি ও সামাজিক সমালোচনা করা।

এখন আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো :

১. মহান আত্মিক ও মানসিক নীতিমালা মনে বদ্ধমূল করা :

ইসলাম ছোট-বড়, যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষের মনের মধ্যে শিক্ষার উচ্চ নীতিমালা বদ্ধমূল করে যা স্থায়ী ও মানবিক মূল্যবোধও বটে। ব্যক্তির মন-মানসে এ মূল্যবান নীতিমালা বদ্ধমূল করার জন্য ইসলাম মূল্যবান উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেয়। যার ফলে শিক্ষা তার যথার্থ অর্থ ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আর এর মাধ্যমেই ফলপ্রসূ সহযোগিতা, গভীর বন্ধন, উন্নত আদব-শিষ্টাচার, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং গঠনমূলক আত্মসমালোচনার ওপর ভিত্তি করে আদর্শ সমাজ তৈরী হয়। সে নিয়ম নীতিগুলো হচ্ছে :

(ক) তাকওয়া : তাকওয়া হলো, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। আর এটা হলো, আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও ভয়-ভীতি। তাঁর আজাব-গজব ও

শাস্তি এবং ক্ষমা ও মাফ করার লোভ সম্বলিত ঈমানী অনুভূতির স্বাভাবিক ফল। আলেমদের মতে, এর অপর অর্থ হলো, আল্লাহ আপনাকে নিষিদ্ধ কাজে দেখতে চান না এবং আদিষ্ট কাজে অনুপস্থিত থাকাকে পছন্দ করেন না। এর আরেকটি সংজ্ঞা হলো, 'নেক আমল দ্বারা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচা এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁকে ভয় করা।'

কোরআন তাকওয়ার মান-মর্যাদার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। পাঠক কোরআনের প্রায় প্রতি পাতায় কিংবা কয়েকটি পাতায় অবশ্যই তাকওয়ার উল্লেখ দেখতে পাবেন।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও নেক পূর্বসূরীরা তাকওয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন এবং মোত্তাকীর জিন্দেগী যাপনের জন্য যারপর নাই চেষ্টা চালিয়েছেন। ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি উবাই বিন কা'বকে তাকওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করেন। উবাই বলেন, আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? ওমার বলেন, হ্যাঁ। উবাই প্রশ্ন করেন, কিভাবে? ওমার বলেন, সতর্কতার সাথে। উবাই বলেন, তাকওয়াও অনুরূপ।'

'মূলত তাকওয়া হচ্ছে মনের তীক্ষ্ম অনুভূতি, অনুভূতির স্বচ্ছতা, অব্যাহত ভয়-ভীতি, স্থায়ীভাবে সতর্ক থাকা, পথের কাঁটার ব্যাপারে সজাগ থাকা, জীবনের পথে কামনা-বাসনার কাঁটা, কাঁটাযুক্ত লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও মিথ্যা আশা এবং অর্থহীন ভয়ের পথে আরও যত কাঁটা আছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।' (তাফসীর ফি জিলালিল কোরআন-সাইয়েদ কুতুব, ১ম খণ্ড-৪০ পৃষ্ঠা)

তাকওয়া মোমেনের অন্তরকে আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ করে তাঁর পর্যবেক্ষণের অনুভূতির কথা স্মরণ করায়। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া হলো, সামাজিক মান-মর্যাদার উৎস এবং ফেৎনা ফ্যাসাদ, মন্দ ও অনিষ্ট এবং গুনাহ ও কাঁটা থেকে বাঁচার একমাত্র রক্ষাকবচ। শুধু তাই নয়, তাকওয়া ব্যক্তির মনে লোক ও সমাজের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টির প্রথম উপায়। আর এ কারণেই নবী করিম (সা) বার বার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا 'তাকওয়া এখানে।'

এখন আমরা ব্যক্তির আচরণের উপর তাকওয়ার প্রভাব সম্পর্কিত কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করবো :

(১) ইমাম গাযালী (র) 'এহইয়াউল উলুম' বইতে উল্লেখ করেছেন। ইউনুস বিন ওবাইদের দোকানে বিভিন্ন দামের অলঙ্কার ছিলো। কোনটির দাম চারশ' এবং কোনটির দাম দু'শ দিরহাম। তিনি নিজ ভাতিজাকে দোকানে বসিয়ে নামাজে

যান। তখন এক বেদুঈন চারশ' দিরহামের অলঙ্কার চাইলে ভাতিজা দু'শ দিরহাম মূল্যের অলঙ্কার দেখায়। বেদুঈন এটিকে পছন্দ করে চারশ' দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়। বেদুঈন তা হাতে নিয়ে চলছে। পথে ইউনুসের সাথে তার দেখা। ইউনুস অলঙ্কার দেখে তা নিজ দোকানের বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করেন, কত দিয়ে তা কিনেছ। বেদুঈন চারশ' দিরহামের কথা বলায় ইউনুস তাকে বলেন, এর মূল্য দু'শ দিরহাম। তুমি তোমার বাকী টাকা ফেরৎ নিয়ে যাও। বেদুঈন বললো, এটা আমার এলাকায় পাঁচশ দিরহাম। আমি রাজী হয়েই তা কিনেছি। ইউনুস বলেন, আমার সাথে চল এবং অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ নাও। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে নসীহত ও কল্যাণ কামনা দুনিয়ার সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম। তিনি তাকে দোকানে এনে অবশিষ্ট দু'শ দিরহাম ফেরৎ দেন এবং ভাতিজার সাথে রাগারাগি করেন। তিনি বলেন, তুমি লজ্জা এবং আল্লাহকে ভয় করলে না? নিজেতো ভালো করে দাম আদায় করলে আর উপদেশ অন্য মুসলমানদের জন্য রেখে দিলে? ভাতিজা বললো, আল্লাহর কসম, সে রাজী হয়েই তা কিনেছে। ইউনুস বললো, তুমি তার জন্য সেটা কেন পছন্দ করলে না যেটা নিজের জন্য কর?

(২) আব্দুল্লাহ বিন দীনার বলেন, একবার আমি ওমার বিন খাত্তাবের সাথে মক্কায় রওয়ানা করলাম। পথে এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি করলাম। দেখলাম পাহাড় থেকে এক রাখাল নীচে নেমে এসেছে। ওমার বলেন, হে রাখাল, আমাদের কাছে একটি বকরী বিক্রি কর। রাখাল বললো, আমি দাস। ওমার এবার তাকে পরীক্ষা করার জন্য বলেন, তুমি তোমার মনিবকে বলবে যে, নেকড়ে বাঘ একটি বকরী খেয়ে ফেলেছে। রাখাল বললেন, আল্লাহ কোথায়, তিনি দেখছেন না? ওমার কেঁদে ফেললেন এবং গোলামের সাথে মনিবের কাছে গিয়ে তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। তারপর বলেন, দুনিয়ার এই বাক্যটি তোমাকে মুক্ত করেছে। আশা করি তুমি পরকালে তোমাকে মুক্ত করবে।

(৩) বহু লোকেই এ ঘটনাটি জানে যে, মদীনার এক মা তার মেয়েকে দুধের সাথে পানি মেশানোর আদেশ দেয় যেন বেশী লাভ করা যায়। মেয়েটি মাকে আমীরুল মোমেনীন খলীফা ওমারের নিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মা বললো, আমরা তাঁর থেকে অনেক দূরে। তিনিতো আমাদেরকে দেখছেন না। মেয়েটি বললো, আমীরুল মোমেনীন না দেখলেও তাঁর প্রভুতো আমাদেরকে দেখছেন।

এ জাতীয় আল্লাহভীতি ও আল্লাহর পর্যবেক্ষণের ভয় সন্তানকে শিক্ষা দেয়া উচিৎ।

খ. ভ্রাতৃত্ব : এটা এমন এক মানসিক বন্ধন যা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান ও স্নেহ-

ভালোবাসার জন্ম দেয়। ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীর প্রতি এবং তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির প্রতি সে ভালোবাসা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। ভ্রাতৃত্বের এই অনুভূতি অন্যের প্রতি সহযোগিতা, ত্যাগ, দয়া এবং প্রতিশোধের সামর্থ্য সত্ত্বেও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করে। মানুষের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কারো জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে। ইসলাম এ জাতীয় ভ্রাতৃত্বের জন্য উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ 'মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত-১০)

তিনি আরও বলেন, سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ 'আমরা তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাতকে শক্ত করবো। (সূরা আল-কাসাস–৩৫)

আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তাঁর নেয়ামতের কারণে ভাই ভাই হয়ে গেছো।' (আল ইমরান-১০৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يَخْذِلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ – كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ – اَلتَّقْوَى هَهُنَا (ثلاث مرات) وَيُشِيْرُ اِلَى صَدْرِهِ ..... 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, তার উপর জুলুম করা যায় না, তাকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করা যায় না, অপমান করা যায় না এবং ঘৃণা করা যায় না। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে। এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান হারাম। তাকওয়া এখানে। তিনি তিনবার একথা বলে বুকের দিকে হাতে ইঙ্গিত করেন।' (মুসলিম)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমরা কেউ সেই পর্যন্ত মুসলিম হতে পারবে না যে পর্যন্ত না নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ কর।'

মুসলিম শরীফে ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى 'মোমেনদের ভালোবাসা, স্নেহ ও দয়া-

মায়ার উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো। যখন দেহের একটি অংশ অসুস্থ হয় তখন সারা শরীর অনিন্দ্রা ও জ্বরে ভোগে।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَ اَيْنَ الْمُتَحَابُوْنَ بِجَلَالِيْ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْم لَا ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّيْ 'আল্লাহ কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, আমার উদ্দেশ্যে ভালোবাসাকারীরা কোথায়? আমি আজ তাদেরকে ছায়া দেবো, আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।'

এই ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কারণে ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে, মুসলিম সমাজে সর্বোত্তম সহানুভূতি, সহমর্মিতা, জিম্মাদারী ও ত্যাগ কোরবানী বিদ্যমান ছিলো।

এখন আমরা এর কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

(১) হাকেম মোসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুয়াওইয়া বিন সুফিয়ান আয়েশা (রা) এর কাছে ৮০ হাজার দেরহাম পাঠান। তিনি রোযা রেখেছিলেন এবং পরনে ছিলো পুরাতন কাপড়। তিনি এই অর্থ সাথে সাথে ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন এবং এক দিরহামও নিজের জন্য রাখেননি। তাঁর চাকরানী বললো, হে উম্মুল মোমেনীন, আপনি যদি এই অর্থ থেকে এক দেরহাম দিয়েও গোশত কিনে ইফতার করতেন, তাহলে ভালো হতো। তখন আয়েশা (রা) বলেন, হে বেটি, আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তো তা করা যেতো।'

(২) তাবারানী তাঁর 'আল-কবির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খলীফা ওমার বিন খাত্তাব (রা) একটি থলেতে চারশ দিনার ঢুকিয়ে তাঁর চাকরকে বলেন, এ অর্থ আবু ওবায়দা বিন জাররার কাছে দিয়ে এসো এবং কিছুক্ষণ সেখানে থেকে দেখবে, তিনি তা কি করেন। চাকর গিয়ে তাঁকে বললো, খলীফা আপনাকে এই অর্থ পাঠিয়েছেন আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য। আবু ওবায়দা বলেন, আল্লাহ ওমারের উপর রহম করুন। তিনি নিজ দাসীকে বলেন, এই সাত দিনার অমুককে, পাঁচ দিনার অমুককে এবং এই পাঁচ দিনার অমুককে দিয়ে এসো। এভাবে তিনি সমস্ত অর্থ শেষ করে ফেললেন। চাকর ওমারের কাছে এসে ঘটনা খুলে বললো। ইতোমধ্যে ওমার (রা) মুয়াজ বিন জাবালের জন্যও অনুরূপ অর্থ প্রস্তুত করেন। চাকরকে বললেন, যাও, মুয়াজের কাছে গিয়ে তা পৌঁছিয়ে দাও এবং এই অর্থ দিয়ে তাকে নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে বলো। মুয়াজ বলেন,

আল্লাহ ওমারকে রহম করুন। তিনি নিজ দাসীকে দিয়ে বিভিন্ন লোকের বাসায় সে সকল অর্থ পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে মুয়াজের স্ত্রী এটা দেখে বললো, আল্লাহর কসম আমরা তো ফকির মিসকিন। আমাদেরকেও কিছু দিন। তখন থলির মধ্যে মাত্র দুই দিনার অবশিষ্ট ছিলো। তিনি তা স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করেন। চাকর ওমারের কাছে ফিরে এসে খবর জানালো। ওমার (রা) তাতে খুশী হন এবং বলেন, 'তারা ভাই, পরস্পর পরস্পরের অংশ।'

(৩) ওমার (রা) এর সময় অভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তখন সিরিয়া থেকে ওসমান (রা)-এর এক হাজার উট বিশিষ্ট কাফেলা মদিনায় ফিরে এলো। তাতে ছিলো বিভিন্ন খাদ্য ও পোশাক। ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে মাল কেনার জন্য লোকেরা ভিড় জমালো। ওসমান জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমাকে কী পরিমাণ লাভ দেবে? তারা বললো শতকরা পাঁচ ভাগ। ওসমান বলেন, আমাকে এর চাইতে বেশী লাভদাতা আছেন। ব্যবসায়ীরা বললো, আমাদের জানা মতে এর চাইতে বেশী লাভ দেয়ার মতো আর কোন ব্যবসায়ী নেই। ওসমান বলেন, একজন আমাকে সাতশগুণ লাভ দেবেন। আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি, مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 'যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে– এর উদাহরণ হলো একটি শস্যদানা, যা থেকে সাতটি ছড়া বের হয়। প্রত্যেক ছড়ায় ১০০ করে শস্যদানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনেক বেশী দান করেন। আল্লাহ প্রশস্ত ও বিজ্ঞ।' (সূরা বাকারা–২৬১)

হে ব্যবসায়ীরা, আপনারা সাক্ষী থাকুন, এই কাফেলায় যে গম, আটা, তেল ও ঘি আছে আমি সব মদিনার গরীব লোকদের জন্য দান করে দিলাম।'

ইমাম বোখারী তাঁর আদাব আল মোফরাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমার বলেন, 'আমাদের এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন কেউ নিজের দীনার-দেরহামকে অন্য ভাইয়ের তুলনায় অধিকতর হকদার মনে করতো না।'

গ. **দয়া** : এটা হচ্ছে অন্তরের নম্রতা এবং হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, যার লক্ষ্য হলো, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন, সহমর্মিতার প্রকাশ এবং কারো দুঃখ-কষ্টে শরীক হওয়া। এই গুণটি মোমেনকে কষ্ট দেয় এবং অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে এবং তা অন্য মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ মহানবী (সা)কে মানবতার জন্য দয়া ও রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন।

তিরমিযী, আবু দাউদ ও মোসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন, 'দয়ালু লোকদের উপর মেহেরবান আল্লাহ রহম করেন। তোমরা জমীনের অধিবাসীদের উপর রহম কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনিও তোমাদের উপর রহম করবেন।'

নবী করিম (সা) নির্দয় লোকদেরকে দুর্ভাগা আখ্যা দিয়ে বলেন, لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِىْ। 'কেবল দুর্ভাগা লোকদের থেকেই দয়া ও রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয়।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

দয়া ও রহমত কেবল মুসলিম ভাইদের মধ্যেই সীমিত নয়। একবার নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, لَنْ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَرْحَمُوْا : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّنَا رَحِيْمٌ قَالَ : اِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ اَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ 'তোমরা দয়া ব্যতিত মোমেন হতে পারবে না। তারা বললো, আমাদের প্রত্যেকেই দয়ালু। তিনি বলেন, তোমাদের সাথীদের প্রতি দয়ালু হলে চলবে না বরং সকলের প্রতি দয়ালু হতে হবে।' (তাবারানী)

দয়া মানুষ নয় পশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত :

মোমেনই কেবল দয়া করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। সে জানে আল্লাহ এ ব্যাপারে তার হিসাব নেবেন এবং কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাকলে পাকড়াও করবেন। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক বেশ্যাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। পক্ষান্তরে বিড়াল আটক রাখায় পোকা-মাকড় খেতে না পারার ফলে মৃত্যুর কারণে অপর এক মহিলাকে দোযখে দিয়েছেন।

একবার ওমার (রা) এক ব্যক্তিকে দেখেন, সে জবেহ করার জন্য এক বকরীকে পায়ে ধরে টেনে নিচ্ছে। তিনি বলেন, তোমার ধ্বংস, তাকে মৃত্যুর জন্য ভালোভাবে নিয়ে যাও।

এখন আমরা মুসলিম সমাজে দয়া-মায়ার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

(১) ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, আমর বিন আস মিসর জয়ের সময় যে তাঁবু স্থাপন করেন তার উপর একটি কবুতর বাসা বাঁধে। তিনি মিসর ত্যাগের সময় ঐ কবুতরটিকে বিরক্ত করা পছন্দ করলেন না। তাই তাঁবুটি রেখে চলে আসেন। পরে তাঁবুর পাশে আবাদী ও ঘর-বাড়ি গড়ে ওঠে। আরবীতে তাঁবুকে 'কোস্তাত' বলা হয়। এরপর গড়ে ওঠা ওই শহরটির নামকরণ করা হয় ফোসতাত শহর।

(২) জাহেলিয়াতের যুগে ওমার বিন খাত্তাব (রা) খুবই কঠোর ও কঠিন ছিলেন। পরে ইসলাম তাঁর মনে দয়ার সাগর সৃষ্টি করে। তাই তিনি ইরাকের প্রান্তরে রাস্তায় কোন খচ্চর হোঁচট খেলে সেজন্য নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়ী মনে করেন। কেননা, তিনি সে রাস্তাটি মেরামত করেননি।

(৩) খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রা) উসামা বিন যায়েদের বাহিনীকে রওয়ানা করানোর সময় উপদেশ দেন, যেন কোন নারী, বৃদ্ধ ও শিশুকে হত্যা করা না হয় এবং খেজুর গাছসহ অন্যান্য ফলবান গাছ না কাটা হয়। তিনি আরও বলেন, তোমরা মন্দিরে কিছু সন্ন্যাসী পাবে, তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

(৪) **ওয়াকফ** :

১. মালিকানাহীন কুকুরের জন্য ওয়াকফ : রাস্তাঘাটে কুকুরের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করা, যাতে করে সেগুলোকে খাবার দেয়া হয়। হয় সেগুলো স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে অথবা কেউ নিয়ে সেগুলোকে পাহারার কাজে লাগাবে।

২. বিয়ের ওয়াকফ : এতে বিভিন্ন অলঙ্কার রাখা হয়। গরীব লোকেরা ঈদ ও বিয়ের উৎসবে এগুলো ধার নেয় ও পরে ফেরত দেয়। এতে করে তারাও আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়।

৩. রোগী ও অসহায় লোককে আনন্দ দেয়ার জন্য ওয়াকফ : এর আওতায় সুরেলা কণ্ঠের গায়ক রোগী ও অসহায় লোকের মনে আনন্দ দেয়ার লক্ষ্যে কবিতা আবৃতি ও গান গায়। সারা রাত তারা এভাবে গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়। এতে করে দুঃখী ও অসহায় মানুষের মনের দুঃখ-বেদনা কিছুটা দূর হয়।

৪. ক্রোকারিজ ওয়াকফ : চাকর কোন সময় প্লেট-কাপ ও গ্লাস ভেঙ্গে মালিকের কোপানলে পড়ে। তাকে উদ্ধারের জন্য এই ওয়াকফ থেকে ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে এর বিনিময়ে একটি নতুন পাত্র দেয়া হয়। ফলে সে মালিকের রাগ ও ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারে।

এছাড়া খাদ্য সরবরাহ ওয়াকফ, পান করার পানি ওয়াকফ, বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র দান ওয়াকফ, মুসাফিরের জন্য ওয়াকফ, রোগীর সেবা ওয়াকফ, নিরক্ষরকে শিক্ষাদান ওয়াকফ, মুর্দার দাফন দান ওয়াকফ, ইয়াতীম ওয়াকফ ও অভাবী লোককে সাহায্য দান ওয়াকফ ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

এ সকল সমাজকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়াই উল্লেখিত ওয়াকফসমূহের উদ্দেশ্য। আর একমাত্র লক্ষ্য হলো, দয়া প্রদর্শন ও দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করা।

দয়ার নীতির ওপর সন্তান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ঘ. **ত্যাগ** : এটি এমন মানসিক অনুভূতি, যার ফলে মানুষ নিজের উপর কল্যাণের ব্যাপারে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়। এটা এক মহৎ গুণ। যদি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করা হয় তাহলে তা ঈমানের সত্যতা ও মনের পবিত্রতার স্বাক্ষর বহন করে। অন্যদিকে, তা সামাজিক জিম্মাদারীর খুঁটি। আল্লাহ কোরআন মাজীদে মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে আনসারগণ, মোহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করছিলো এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো সে আনসারগণ মোহাজিরদেরকে ভালোবাসে, মোহাজিরদেরকে যা দান করা হয়েছে, সেজন্য তারা অন্তরে কোন খারাপ মনোভাব পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারাই মনে কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফল।' (সূরা হাশর-৯)

আনসারদের চরিত্রে যে স্বেচ্ছামূলক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সামাজিক ভালোবাসা ছিলো, মানবতার ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। যে মোহাজিরগণ দ্বীনের কারণে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত, নিজ ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত এবং সকল সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত, আনসারগণ সেই মোহাজিরদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্যের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং নিজেদের বহু সহায় সম্পত্তির ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেন। এমনকি তাঁদের কেউ মারা গেলে মোহাজির তাঁর সম্পদের অংশ পেতো।

প্রথম মুসলিম সমাজে ত্যাগের দৃষ্টান্ত :

(১) ইমাম গাযালী এহইয়াউল উলুম বইতে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক সাহাবীর প্রতি একটি বকরীর মাথা উপহার পাঠানো হলো। সে সাহাবী তাঁর চাইতে অভাবী অন্য সাহাবীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তা সাত জন সাহাবীর ঘর ঘুরে পুনরায় প্রথম সাহাবীর ঘরে ফেরত আসে।

(২) উম্মুল মোমেনীন যয়নব বিনতে জাহ্‌শকে 'উম্মুল মাসাকীন' 'মিসকীনের মা' বলা হতো। তিনি ছিলেন বেশী ত্যাগী। তাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে। বারযাহ বিনতে বাতে' বর্ণনা করেন। ওমার বিন খাত্তাব (রা) যয়নবের (রা) কাছে কিছু অর্থ পাঠালেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ওমরকে মাফ করুন। আমার অন্য বোনেরা আমার অপেক্ষা এই সম্পদের বেশী হকদার। তাঁকে বলা হলো এসব আপনার জন্য। তিনি বারযাহকে বলেন, কাপড় দিয়ে তা ঢেকে রাখো। তারপর তিনি বারযাহকে বলেন, এগুলো অমুকের কাছে এবং এগুলো অমুক ইয়াতীমের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। বিলি-বণ্টনের পর দেখা গেলো, কাপড়ের নীচে সামান্য অর্থ

বাকী আছে। বারযাহ তাঁকে বলেন, হে উম্মুল মোমেনীন, এর মধ্যে আমাদের কিছু হক অবশ্যই আছে। তখন তিনি বলেন, কাপড়ের নীচে অবশিষ্ট যে অর্থ আছে, সেগুলো তোমাদের। বারযাহ বলেন, আমরা কাপড় তুলে দেখি তার নীচে মাত্র ৮৫ দিরহাম বাকী আছে।

(৩) কুরতুবী ত্যাগের এক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেন। আদওয়ী উল্লেখ করেন যে, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইকে তালাশ করতে বের হলাম। আমার সাথে ছিলো সমান্য পানি। আমি মনে মনে বললাম, যদি ধড়ে তার জান অবশিষ্ট থাকে আমি তাকে এই পানিটুকু পান করাবো। আমি তাকে দেখে বললাম, তুমি পানি পান করবে? সে মাথা নেড়ে সাড়া দেয়। তখন পাশ থেকে আরেক জনের হু-হা শব্দ ভেসে আসলো। চাচাত ভাই আমাকে তাকে পানি পান করানোর ইঙ্গিত দেন। আমি গিয়ে দেখি তিনি হলেন হেশাম বিন আস। আমি বললাম পানি পান করবেন? তিনি ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন পাশ থেকে অন্য একজনের হু-হা শব্দ ভেসে আসলো। হেশাম তাকে গিয়ে পানি পান করানোর ইঙ্গিত দেন। আমি গিয়ে দেখি সে মারা গেছে। হেশামের কাছে ফিরে এসে দেখি তিনিও মারা গেছেন। অবশেষে আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি সেও মারা গেছে। অন্যের প্রতি ত্যাগের কারণে কেউ পানি পান করেননি। এসব আদর্শকে সামনে রেখে সন্তানকে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর করে তুলতে হবে।

ঙ. **ক্ষমা** : এটা এক মহৎ মানসিক গুণ যার ফলে একে অপরকে ক্ষমা করে। এমনকি সীমা লঙ্ঘনকারী জালেম কিংবা অত্যাচারী হলেও তাকে ক্ষমা করে। তবে শর্ত হলো নির্যাতিত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য থাকতে হবে এবং সে জুলুম যেন দ্বীন ইসলামের উপর আঘাত না হয়। এ অবস্থায় ক্ষমা করলে তা হবে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পণ। এই অর্থে, ক্ষমা এটি মৌলিক চারিত্রিক গুণ যা মজবুত ঈমান এবং ইসলামের অতি উন্নত আদব-শিষ্টাচারের প্রমাণ। এজন্যই কোরআন মাজীদ ক্ষমাকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ বলেন, 'আর তোমরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেজগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলো না।' (সূরা বাকারাহ-২৩৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন, 'ভালো ও মন্দ কখনো সমান নয়। জওয়াবে উৎকৃষ্ট কথা বলুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সূরা হা-মীম-সাজদাহ-৩৪)

তিনি আরও বলেন, 'মেহেরবান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নরমভাবে

চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে মূর্খরা যখন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।' (সূরা ফোরকান-৬৩)

আল্লাহ আরও বলেন, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (আল ইমরান-১৩৪)

একথা সুস্পষ্ট যে মোমেনের চরিত্র ধৈর্য ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত, তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নমনীয়তা ও কমনীয়তা, উন্নত চরিত্র এবং সদাচার বিদ্যমান। বরং তাকে মনে হবে, যমীনে কোন ফেরেশতা চলছে, যিনি মহান, পবিত্র ও স্বচ্ছ।

ইতিহাস থেকে সলফে সালেহীনের ক্ষমা ও ধৈর্যের কিছু উদাহরণ :

(১) আব্দুল্লাহ বিন তাহের বলেন, আমি একদিন খলীফা মামুনের কাছে ছিলাম। তিনি চাকরকে ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। দ্বিতীয়বার চিৎকার করে ডাকায় এক তুর্কী চাকর এসে হাজির। চাকরটি বললো, চাকর কি পানাহার করবে না? যখনই আপনার কাছ থেকে বের হই, তখনই আপনি চাকর চাকর বলে চিৎকার করতে থাকেন। এ কথা শুনে মামুন বেশী সময় ধরে মাথা নিচু করে রাখেন। আমার কোন সন্দেহ ছিলো না যে, তিনি চাকরের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাকে বলবেন। তারপর মাথা তুলে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, হে আব্দুল্লাহ, ব্যক্তির চরিত্র ভালো হলে, তার চাকর-বাকরের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। আমি চাকরের চরিত্র ভালো করার জন্য নিজ চরিত্র খারাপ করতে পারি না।

(২) জয়নুল আবেদিন বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি চাকরকে ডাকলেন। দু'বার ডাকলেন। কোন সাড়া পেলেন না। জয়নুল আবেদিন চাকরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমার ডাক শোননি? সে বললো, হ্যাঁ শুনেছি। তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে জবাব দিলে না কেন? চাকর বলে, আমি আপনাকে নিরাপদ পেয়েছি এবং আপনার চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছি। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি চাকরকে আমার থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

তাঁর আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি একবার মসজিদে যান। এক লোক তাঁকে গালি দেয়। চাকর-বাকররা লোকটিকে মারতে চেয়েছিলো। তিনি তাদেরকে নিষেধ করেন। তারপর ওই লোকটিকে বলেন, তুমি যা বলেছো আমি তা অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট। তুমি আমার সম্পর্কে যা জান না তার পরিমাণ, যা

জান তার চাইতে অনেক বেশী। তোমার প্রয়োজন থাকলে আমি তা বলতে পারি। লোকটি লজ্জা পেলো। জয়নুল আবেদিন নিজের জামা খুলে তাকে দেন এবং আরও এক হাজার দেরহাম দেয়ার আদেশ দেন। লোকটি যাওয়ার সময় বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, যুবকটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধর হবে।

জয়নুল আবেদিনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। গোলাম মাটির বদনা থেকে তাঁর পায়ে পানি ঢালার সময় তা ভেঙ্গে যায় ও পা যখম হয়ে যায়। গোলাম সাথে সাথে বলেন, হে মনিব, আল্লাহ বলেন, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ 'যারা রাগ নিয়ন্ত্রণকারী।' জয়নুল আবেদিন বলেন, আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করলাম। তারপর গোলাম বলে, وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ 'যারা মানুষকে ক্ষমাকারী।' জয়নুল আবেদিন বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। গোলাম বলে, আল্লাহ বলেন, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' জয়নুল আবেদিন বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম।

(৩) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। ওয়াইনাহ বিন হোসাইন মদিনায় এসে নিজ ভাতিজা হোর বিন কায়েসের ঘরে উঠেন। হোর বিন কায়েস ছিলেন ভালো ক্বারী। আর ক্বারীরা ওমার (রা)-এর মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। চাই তারা যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক। ওয়াইনাহ ভাতিজাকে বলেন, আমার জন্য খলীফার দরবারে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে এসো। অনুমতি লাভের পর তিনি খলীফার দরবারে প্রবেশ করে বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র, আপনি আমাদেরকে না বেশী কিছু দান করেন, আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফ ঠিকমতো করেন। একথা শুনে ওমার রাগে থর থর করতে থাকেন এবং তাকে মারার জন্য উদ্যত হন। তখন হোর বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ 'আপনি ক্ষমা করুন, সৎ কাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।' ওয়াইনাহ মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সে বেহুদা কথা বলেছে। আল্লাহর কসম, এ আয়াত শোনার পর ওমার সম্পূর্ণ থেমে যান। কেননা তাঁর মতের সমর্থনে কোরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। (বোখারী)

(৪) আবু বকর (রা)-এর আত্মীয় মেসতা আবু বকরের দয়া ও জিম্মাদারীর ওপর জীবন-যাপন করে। কিন্তু সে আয়েশা (রা) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের নায়ক। মোনাফেকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে সে ইসলাম, আত্মীয়তা ও জিম্মাদারীর অধিকার ভুলে যায়। আবু বকর রাগান্বিত হন এবং কসম করেন যে, তিনি মেসতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বয়কট করবেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল

হয়– ‘তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিৎ এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিৎ। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।’ (সূরা নূর–২২)

এরপর আবু বকর (রা) মেসতাকে ক্ষমা করেন, তাকে আগে যে সাহায্য-সহযোগিতা করে এসেছিলেন তা পুনর্বহাল করেন এবং বলেন, আমি চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

সাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী সলফে সালেহীন প্রথম দাঈ নবী মোহাম্মদ (সা)-এর মহান চরিত্রকে অনুকরণ করেই ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফলে, অন্য যে কোন জাতির চরিত্র ও নৈতিকতা থেকে মুসলিম উম্মাহর চরিত্র ও নৈতিকতা বহু গুণে সমৃদ্ধ।

আবু দাউদে বর্ণিত আছে। নবী করিম (সা) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাগ বাস্তবায়নের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অন্য সকল সৃষ্টির ওপর যে কোন হুর বাছাই করার এখতিয়ার দেবেন।’

তাবারানী ওবাদাহ বিন সামেত থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে কিসে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তা বলবো না? তারা বলে, জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, মূর্খ লোকের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, জুলুমকারীদের ক্ষমা করবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করবে এবং যে তোমাকে বয়কট করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখবে।’

সন্তানকে ক্ষমা ও ত্যাগের মহিমায় জাগ্রত করে তুলতে হবে।

চ. **হিম্মত** : এটা এমন এক মানসিক শক্তি যা মোমেন ব্যক্তি এক ও একক আল্লাহর উপর ঈমান-বিশ্বাস থেকে, যে সত্যে বিশ্বাস করে সে সত্য থেকে, যে তকদীরে বিশ্বাস করে সে ভাগ্য থেকে, যে দায়িত্ববোধ ও শিক্ষার উপর গড়ে উঠেছে সে শিক্ষা থেকে তা সংগ্রহ করে থাকে। প্রত্যেকেই আল্লাহর উপর ঈমান, সত্যের উপর বিশ্বাস, তকদীর, দায়িত্ব ও শিক্ষা থেকে সে পরিমাণ সাহস ও হিম্মতের হিস্‌সা লাভ করে। তাই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এর পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে আমরা তা আবু বকরের (রা) মধ্যে সর্বাধিক দেখতে

পাই। তাঁর ঈমানী ও সাহসী ভূমিকা শক্তিশালী ওমার (রা) কে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে, وَاللهِ لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِى بَكْرٍ بِإِيمَانِ هٰذِهِ الْأُمَّةُ لَرَجَحَ إِيْمَانُ أَبِى بَكْرٍ 'আল্লাহর কসম, এই উম্মাহর ঈমানের সাথে আবু বকরের ঈমানের ওজন করলে, আবু বকরের ঈমানের পাল্লা ভারী হবে।'

তাঁর আরেক উল্লেখযোগ্য সাহসী ভূমিকা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)'র ইনতিকালের দিনের ঘটনা। সেদিন মুসলমানরা শোক-দুঃখে মুহ্যমান। বলতে গেলে জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। তাই ওমার (রা) বলেছিলেন, কেউ যদি বলে যে, মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে আমার এই তলোয়ার দিয়ে তার এই গর্দান উড়িয়ে দেবো। এ সময় আবু বকর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যে ব্যক্তি মোহাম্মদের ইবাদত করতো, সে জানুক মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতো, সে জানুক আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। তারপর তিনি কোরআনের এই আয়াতটি শোনান, 'মোহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল। তাঁর আগেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা নিজেদের পশ্চাতে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পশ্চাতে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ শোকরগুজার বান্দাদের বিনিময় দেন। ' (সূরা আল-ইমরান-১৪৪)
তাঁর আরেক সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনা সোনালী অক্ষরে লেখা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)'র ইন্তেকালের আগে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মুসলমানরা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত। উসামা বিন যায়েদের বাহিনীর মিশন বাস্তবায়নের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা খলীফা আবু বকরের কাছে উক্ত মিশন বন্ধ রাখার আহ্বান জানায়। কেননা, তাঁর ইন্তেকালের পর বহু ঘটনা ও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কে জানে, এর ফলে বিভিন্ন আরব গোত্র ও গ্রামবাসীরা কি করে বসে। কিন্তু আবু বকর (রা) তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন, আবু বকরের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, যদি আমার এই ধারণা জন্মে যে, নেকড়ে বাঘ আমাকে থাবা মেরে খেয়ে ফেলবে, তথাপি আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশিত ওসামা বাহিনী মিশন বাস্তবায়ন করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) যে হাতে পতাকা বেঁধেছেন, সে পতাকা আমি খুলতে পারবো না। যদি গ্রামাঞ্চলে আমি ছাড়া আর কেউ না থাকে, তথাপি আমি এ মিশন বাস্তবায়ন করবো।

ধর্মত্যাগী মোরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এ সময় জাহেলিয়াতের মনোভাব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে

ওঠে। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রা)-এর ভাষায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানরা যেন বর্ষণমুখর রাতের বকরীর পালের মতো অসহায় হয়ে পড়ে। এমনকি কিছু সংখ্যক মুসলমান খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রা)কে বলেন, সকল আরবের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা আপনার নেই। তাই দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকুন এবং দৃঢ় ঈমান ও ইয়াকীন আসা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন। কিন্তু এই বিনয়ী ও ক্রন্দনরত ব্যক্তি, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ার মতো নরম, সিল্কের মতো মোলায়েম এবং স্নেহবৎসল মায়ের মতো দয়ালু অন্তর মুহূর্তের মধ্যে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর এবং বাঘের মতো গর্জন করে ওমরের প্রতি জোর আওয়াজে বলেন,জাহেলিয়াতের শক্তিবান কি আজ ইসলামে এসে গো-বৎসে পরিণত হবে? অহী পূর্ণ হয়েছে। আমি জীবিত থাকতে কি দ্বীন সংকুচিত হতে থাকবে? আল্লাহর কসম, তারা রাসূলুল্লাহ (সা)'র যাকাত বাবদ যা দিতো তা থেকে যদি একটি রশিও কম দেয়, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আমার হাতে যতক্ষণ তলোয়ার আছে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়বো। শেষ পর্যন্ত ওমার বলেন, আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের বক্ষ সম্প্রসারিত করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি সত্যের উপর আছেন।

সাহসের সাথে সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ। এ মর্মে আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
'জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ।'

'সাইয়েদুশ শোহাদা' বা শহীদানের সরদার প্রসঙ্গে নবী (সা) বলেন, سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ رَجُلٌ قَامَ اِلَى اِمَامٍ جَائِرٍفَامَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ
'হামযা বিন আব্দুল মোত্তালিব হলেন সাইয়েদুশ শোহাদা এবং সে ব্যক্তিও, যে জালেম শাসকের কাছে গিয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করায় শাসক তাকে হত্যা করে।' (হাকেম)

নবী করিম (সা) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে সাহসের সাথে কথা বলার জন্য অঙ্গীকার নিয়েছেন। মুসলিম শরীফে ওবাদাহ বিন সামেত থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ সুখ-দুঃখ, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শোনা ও আনুগত্য করার, অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া, প্রকাশ্য কুফরী ছাড়া যে ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে প্রমাণ রয়েছে- কোন শাসকের কাছ থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে না আনা, আমরা যেখানেই থাকি যেন সত্য কথা বলি এবং আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।'

আল্লাহ সে সকল লোকের প্রশংসা করেছেন, যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছায় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে, তারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।' (সূরা আযহাব-৩৯)

ইসলামের ইতিহাসে সাহস ও বীরত্বের কিছু ঘটনা

ইসলামের ইতিহাসে এ জাতীয় বীরত্ব এবং সত্য ও ইসলামের জন্য সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনার কোন অভাব নেই।

(১) এজ্জ বিন আব্দুস সালাম আলেম ও দা'য়ী ছিলেন। তিনি একবার মিসরের সুলতান নাজমুদ্দিন আইউবকে তার দরবারে সভাসদদের উপস্থিতিতে বলেন, হে আইউব, আল্লাহর সামনে আপনার জবাব কি? তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাকে মিসরের শাসন ক্ষমতা দিইনি, তুমি কেন মদকে হালাল করে দিয়েছো? তিনি বলেন, এরূপ হয়েছে কী? সালাম জবাব দেন, হ্যাঁ। অমুক দোকানে মদ বিক্রি হয় এবং হারাম কাজকে হালাল করা হয়। অথচ আপনি এই ভূখণ্ডের সুখ-সম্পদের মধ্যে ডুবে আছেন। আইউব বলেন, আমি মদ চালু করিনি, এটা আমার বাবার আমলে চালু হয়েছে। এজ্জ বিন আব্দুস সালাম বলেন, আপনি তো তাদের মতো যারা বলে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে দ্বীনের উপর পেয়েছি, সে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি।' (সূরা যোখরোফ-১৩)

এরপর সুলতান মদের দোকান বন্ধ করে দেন।

(২) সালামা বিন দীনার ওরফে আবু হাযেম মুআওইয়া (রা)-এর কাছে প্রবেশ করে বলেন, 'হে মজুর, আসসালামু আলাইকা'। লোকেরা বললো, আপনি বলুন, আমীরুল মোমেনীন, আসসালামু আলাইকা। তিনি মুআওইয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি এই উম্মাহর মজুর। আল্লাহ আপনাকে প্রজাদের যত্নের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

(৩) আবু হাযম এবং খলীফা সোলায়মান বিন আব্দুল মালেকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয় :

সোলায়মান বলেন, হে আবু হাযেম, আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি?

আবু হাযম : কেননা আপনারা পরকালকে বরবাদ এবং ইহকালকে আবাদ করেছেন। তাই আপনারা আবাদী থেকে বিরান ভূমির দিকে যেতে ইচ্ছুক নন।

সোলায়মান : আগামীকাল আমরা কীভাবে আল্লাহর কাছে হাজির হবো?

আবু হাযম : নেককার হবে পরিবারের কাছে অনুপস্থিত লোকের উপস্থিতির মতো। আর পাপী হবে মনিবের কাছে ভাগুড়ে গোলামের হাজির হওয়ার মতো।

সোলায়মান : কোন্ কথা অধিকতর ইনসাফপূর্ণ?

আবু হাযম : সে ব্যক্তির সামনে সত্য কথা বলা যাকে আপনি ভয় করেন কিংবা তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন।

সোলায়মান : কোন্ ব্যক্তি অধিক জ্ঞানী?

আবু হাযম : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে এবং লোকদেরকে সে পথ বাতলায়।

সোলায়মান : কোন্ লোক বোকা?

আবু হাযম : জালেম ভাইয়ের কামনা-বাসনা পূরণে অধপতিত ব্যক্তি। সে অন্যের দুনিয়া লাভের জন্য নিজের আখেরাতকে বিক্রি করে দিয়েছে।

সোলায়মান : হে আবু হাযেম, আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? ফলে আমরা আপনার থেকে এবং আপনি আমাদের থেকে পরস্পর উপকৃত হবো।

আবু হাযম : আউজুবিল্লাহ অর্থাৎ আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

সোলায়মান : কেন এটা বললেন?

আবু হাযম : আমার ভয় হয়, আমি আপনাদের কাছে থাকলে আল্লাহ আমাকে জীবন ও মৃত্যুর দুর্বল দিকগুলো আস্বাদন করাবেন।

আবু হাযম উঠে দাঁড়ান। সোলায়মান বলেন, আমাকে উপদেশ দিন। আবু হাযম বলেন, সংক্ষেপে উপদেশ হলো, আপনার প্রভুকে সম্মান দেখান। তিনি যেখানে আপনাকে দেখতে নিষেধ করেছেন সেখানে যেন আপনাকে উপস্থিত না দেখেন কিংবা যেখানে দেখতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে যেন আপনাকে অনুপস্থিত না দেখেন।

শিক্ষক ও মাতা-পিতার, বিশেষ করে মায়ের কর্তব্য হলো, শিশুর মনে ঈমান, তাকওয়া, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, দয়া ও ত্যাগ এবং ধৈর্য ও হক কথা বলার সাহস ও হিম্মত সৃষ্টি করা। আজকের শিশু যেন ভবিষ্যতের যুবকে পরিণত হলে নির্দ্বিধায় নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং তাদের সামাজিক আচার-আচরণ যেন অন্যদের তুলনায় উত্তম ও নজীরবিহীন হয়।

যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই আত্মিক নীতি ও ভিত্তি অনুপস্থিত, সে ব্যবস্থার তুলনা

হলো সে গাছের মতো, যার পাতা হলুদ ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, এখন পাতার চিকিৎসা করা হচ্ছে। কিন্তু, যে মূলের উপর গাছটি দাঁড়িয়ে আছে তার চিকিৎসা ও সংশোধনের কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। অথচ মূল ঠিক হলে পত্র-পল্লব, শাখা ও কাণ্ড সবই ঠিক হবে। অন্য কথায়, যিনি সামাজিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন, তিনি যদি এই স্থায়ী নীতিটির উপর শিক্ষার ভিত্তি তৈরী না করেন, তার উদাহরণ হলো, সে ব্যক্তির মতো, যিনি পানিতে লেখেন, কয়লায় ফুঁ দেন কিংবা কোন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বেহুদা চিৎকার দেন।

২. **অন্যের অধিকার :** সমাজের অন্যান্য মানুষের অধিকার সামাজিক শিক্ষার অন্যতম মহান মূলনীতি। অর্থাৎ এই আত্মিক নীতিকে অথবা তাৎপর্য এবং সমাজের অধিকারকে এর প্রকাশ বলা যায়। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, প্রথমটি হলো রূহ বা আত্মা, আর দ্বিতীয়টি হলো শরীর। তাই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি থেকে কোন অবস্থায় অমুখাপেক্ষী করা সম্ভব নয়। তা না হয় সমাজে ঘাটতি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এখন আমরা অন্যদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করবো। অধিকারগুলো হলো :

ক. মাতা-পিতার অধিকার : সন্তান গঠনকারীর অন্যতম দায়িত্ব হলো, সন্তানকে তার পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে অবগত করা, যেন সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আনুগত্য করে, দয়া প্রদর্শন করে, সেবা করে, বার্ধক্যে যত্ন নেয়, তাদের সাথে জোরে কথা না বলে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়াসহ অন্যান্য অধিকারগুলো পূরণ করে।

এখন আমরা এ বিষয়ে নবী করিম (সা)-এর উপদেশমূলক কিছু হাদিস পেশ করবো–

(১) আল্লাহর সন্তোষ পিতা-মাতার সন্তোষের উপর :

বোখারী 'আদব আল-মোফরাদ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'যে মুসলমানের দু'জন মুসলিম মাতা-পিতা আছে, সে যদি সকালে তাদের সেবার মাধ্যমে সওয়াবের নিয়ত করে তাহলে, আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য দু'টো দরজা খুলে দেবেন। আর যদি মাতা-পিতার মধ্যে একজন (জীবিত) থাকে, তাহলে একটি দরজা খুলে দেবেন। তাদের কোন একজন সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট হলে তাদের সন্তুষ্ট হবার আগ পর্যন্ত আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি মাতা-পিতা তার উপর জুলুম করে? তিনি উত্তরে বলেন, যদিও জুলুম করে।'

সুকুস-সালাম গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন, رِضَى اللهِ فِى رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللهِ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ 'মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।'

(২) মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জেহাদ অপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য :

বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক লোক এসে নবী (সা)কে বললো, আমি জেহাদে যাবো। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার মাতা-পিতা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের দু'জনের জন্য জেহাদ কর।'

মোসনাদে আহমদ ও নাসাঈ মোয়াওইয়া বিন জাহেমাহ আস-সোলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করিম (সা) এর কাছে এসে বলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُ اَسْتَشِيْرَكَ, فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ الزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই, সেজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার মা কি জীবিত আছে? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তার কাছে থাকো। কেননা মায়ের দু'পায়ের কাছে জান্নাত।'

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে বললো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জেহাদের বাইয়াত করে আল্লাহর নিকট এর বিনিময় চাই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে? ব্যক্তিটি বললো, তারা উভয়ই জীবিত আছে। নবী (সা) বলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে বিনিময় চাও? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে ভালো সাহচর্য দাও।'

(৩) মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা নেক কাজ। এ বিষয়ে আল্লাহর এই বাণীটির উপর আমল করতে হবে :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 'মাতা-পিতার সামনে দয়ার সাথে বিনয়ের বাহু অবনত কর এবং বল, হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি সেরূপ রহম কর, যেরূপ রহম তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালনের সময় করেছেন।' (সূরা বনী ইসরাইল-২৪)

ইমাম বোখারী তাঁর 'আল আদাব আল মোফরাদ' গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ, فَيَقُوْلُ : اىْ رَبِّىْ اىُّ شَىْءٍ هذَا ؟ فَيَقُوْلُ لَهُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ 'মৃত্যুর পর মুর্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। এ বর্ধিত মর্যাদা দেখে সে প্রশ্ন করে, হে আমার রব, এটা কীভাবে? আল্লাহ বলেন, তোমার ছেলে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।'

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম মালেক বিন রবীয়া'হ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে ছিলাম। এমন সময় বনি সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করে। 'হে আল্লাহর রাসূল, মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কিছু কি অবশিষ্ট থাকে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর তা হলো তাদের জন্য রহমতের দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা, তাদের বন্ধুদেরকে সম্মান করা এবং তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা।'

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) নেক সন্তান হিসেবে আমাদের জন্য এক উদাহরণ রেখে গেছেন। মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন দীনার থেকে বর্ণিত আছে। মক্কা আসার পথে আব্দুল্লাহ বিন ওমার এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে সালাম দেন, নিজ গাধার উপর আরোহণ করান এবং তাকে মাথার পাগড়ি দান করেন। আব্দুল্লাহ বিন দীনার প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। তারাতো বেদুঈন এবং অল্পতেই খুশী হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ বিন ওমার বলেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমার বিন খাত্তাবের বন্ধু ছিলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'সর্বোত্তম নেক কাজ হলো বাবার বন্ধুর পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।'

'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مِنَ البِرِّ اَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ اَبِيْكَ 'বাবার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখা নেক কাজ।'

(৪) বাবার উপর মায়ের সদ্ব্যবহারের অগ্রাধিকার দেয়া :

বোখারী শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, 'আমার সৎ সাহচর্যের সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বলেন, তোমার মা। তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার বাবা।'

ইবনে কাছীর নিজ তাফসীরে সোলায়মান থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় নিজ মাকে কাঁধে করে তাওয়াফ করেন। তিনি নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি এর মাধ্যমে মায়ের হক আদায় করেছি? তিনি বলেন, না, প্রসব বেদনার একটি ব্যথার হকও না।'

'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বোরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা) এর কাছে এসে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার মাকে কঠোর রোদের মধ্যে দুই মাইল পথ কাঁধে বহন করেছি। যদি সে তাপে গোশতের টুকরো রাখা হতো তা শুকিয়ে পরিপক্ক হয়ে যেতো। আমি কি তার শোকর আদায় করতে পেরেছি? তিনি বলেন, সম্ভবত তুমি তার প্রসব বেদনার একটি ব্যথার সমতুল্য শুকরিয়া আদায় করেছো।'

দু'কারণে ইসলাম বাবার উপর মায়ের অগ্রাধিকার দিয়েছে :

ক. মা সন্তানের গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধ পান করান এবং সন্তানকে গঠন করার ব্যাপারে বাবা অপেক্ষা বেশী কষ্ট স্বীকার করেন। একথা আল্লাহ কোরআন মাজীদে স্পষ্ট করে বলেছেন।

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। সর্বশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।' (সূরা লোকমান-১৪)

খ. জন্মগতভাবে মা সন্তানের প্রতি বাবা অপেক্ষা বেশী স্নেহবৎসল ও দয়ালু হয়ে থাকে। সন্তান হয়তো মায়ের অধিকারের ব্যাপারে অবহেলা করতে পারে। সে দেখে যে, মা বাহ্যিকভাবে তার প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান। তাই শরীয়ত মায়ের প্রতি অধিক যত্নবান হবার নির্দেশ দিয়েছে, যেন তার অধিকার ও ইজ্জত-সম্মান নষ্ট না হয়।

সন্তানের প্রতি মায়ের আদর-স্নেহের পরিমাণ তখন বুঝা যায়, যখন এমনকি অবাধ্য সন্তানও বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হয়।

মোসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে বর্ণিত আছে। আবু লাইছ সমরখন্দী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে মদীনায় আলকামা নামক এক যুবক বাস করতো। সে কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাকে কালেমা পড়ার জন্য বলা হলে সে মুখে তা উচ্চারণ করতে অক্ষম হলো। রাসূলুল্লাহ

(সা)কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার মাতা-পিতা কি জীবিত? তাকে বলা হলো বাবা নেই, তবে বৃদ্ধ মা আছে। তার কাছে লোক পাঠালে তিনি নবী (সা)-এর কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বৃদ্ধাকে আলকামা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, আলকামা নামায-রোজা করতো এবং বহু অর্থ দান-সদকা করতো যার পরিমাণ আমার জানা নেই। তিনি বৃদ্ধাকে তার নিজের ও আলকামার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। বৃদ্ধা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার উপর অসন্তুষ্ট। নবী (সা) কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, সে আমার উপর তার স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিতো এবং বহু বিষয়ে তার আনুগত্য করতো। নবী (সা) বলেন, মায়ের অসন্তোষই তার জিহ্বায় কলেমা উচ্চারণে বাধ সেজেছে। তারপর তিনি বেলালকে কাঠ যোগাড় করে আনতে বলেন, যেন তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা যায়। মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কলিজার টুকরা আলকামাকে আমার সামনে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন, আমি তা কীভাবে সহ্য করবো? নবী (সা) বলেন, তাহলে আপনি তার উপর খুশী হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি অসন্তুষ্টি থাকলে তার নামায-রোজা ও দান-সদকা কোন লাভ হবে না। তারপর বৃদ্ধা দু'হাত তুলে বলেন, আমি আসমানে অবস্থানকারী আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং উপস্থিত লোকদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বেলাল যাও এবং দেখো, আলকামা কলেমা উচ্চারণ করতে পারছে কিনা। হতে পারে বৃদ্ধাটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর লজ্জা-শরমে মুখে সন্তোষের কথা বলেছে, কিন্তু অন্তর থেকে নাও বলতে পারে। বেলাল ঘরের দরজায় গিয়ে শুনলেন, আলকামা কলেমা পড়ছে এবং সে সেদিনই মৃত্যুবরণ করেছে। তাকে গোসল ও কাফন দিয়ে দাফন করা হয়। নবী (সা) তার জানাযার নামায পড়ান। তারপর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ, যে ব্যক্তি মায়ের উপর নিজ স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ, তার তাওবা ও ফিদইয়া কোনটাই কবুল হবে না।

(৫) মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদব :

সন্তান গঠনকারীর দায়িত্ব হলো, সন্তানদেরকে মা-বাবার সাথে আচরণের আদব-কায়দাগুলো শিক্ষা দেয়া। সেগুলো হলো :

তাদের সামনে দিয়ে না চলা, তাদের নাম ধরে না ডাকা, তাদের আগে না বসা, তাদের উপদেশকে বিরক্তিকর মনে না করা, তারা যে খাবারের দিকে তাকিয়ে

আছেন, সে খাবার না খাওয়া, উঁচু স্থানে তাদের উপরে না বসা এবং তাদের হুকুমের বিরোধিতা না করা। এ সকল আদব-কায়দার মূল হলো, কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত :

'তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে আদব-কায়দাসহকারে কথা বলো। মাতা-পিতার সামনে দয়ার সাথে বিনয়ের বাহু অবনত করো এবং বলো, হে আমার রব, তাঁদের উভয়ের প্রতি সেরূপ রহম করুন, যেরূপ রহম তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালনের সময় করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'সে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, যে তাদের প্রতি অসন্তোষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এক ব্যক্তি আসলো, সাথে ছিলো এক বৃদ্ধ। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দেন, আমার পিতা। তখন নবী বলেন, 'তাঁর আগে চলো না ও বসো না, তাঁকে নাম ধরে ডেকো না ও গাল দেবে না।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মাতা-পিতার আদব রক্ষাকারী পূর্বসূরীদের কিছু ঘটনা :

'উয়ুনুল আখবার' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ওমার বিন যায়েদকে তাঁর সাথে নিজ ছেলের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, সে দিনে সর্বদা আমার পেছনে এবং রাতে আমার সামনে দিয়ে চলেছে। আমি নীচে থাকা অবস্থায় সে কখনো ছাদের উপর ওঠেনি।

'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থের লেখক আবু গাস্‌সান আদ-দাবীর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আবু গাস্‌সান বলেন, আমি আমার পিতাকে সাথে নিয়ে সওয়ারীতে করে বের হলাম। রাস্তায় আবু হোরায়রা (রা) এর সাথে দেখা হলো। তিনি প্রশ্ন করেন, তিনি কে? আমি বললাম, আমার পিতা। তিনি বলেন, তোমার পিতার সামনে চলো না, তাঁর পিছে কিংবা পাশে চলো; তোমার পাশে তার মাঝে কাউকে আড়াল হতে দেবে না, তাঁর মাথার উপর দিয়ে চলো না এবং গোশত বিহীন সে হাড্ডি খাবে না, যেটার দিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন, সম্ভবত তিনি সেটা খেতে চান।

'উয়ুনুল আখবার' বইতে উল্লেখ আছে, মামুন (র) বলেন, আমি ফদল বিন ইয়াহইয়া অপেক্ষা পিতার সাথে অধিকতর সদ্ব্যবহারকারী অন্য কাউকে দেখতে পাইনি। ইয়াহইয়া গরম পানি ছাড়া ওজু করতেন না। একবার বাপ-বেটা দু'জনই কারাগারে ছিলেন। কারারক্ষী শীতের রাতে পানি গরম করার জন্য কারাগারে কাঠ ঢুকাতে অনুমতি দেয়নি। পিতা ইয়াহইয়া যেখানে ঘুমাতেন, ফদল সেখান থেকে পানির পাত্র নিয়ে পানি ভরেন এবং বাতির আলোর সামনে তা গরম করতে থাকেন। সকাল হওয়া পর্যন্ত তিনি বাতির কাছে দাঁড়িয়ে পানির পাত্র ধরে রাখেন যেন সকাল বেলায় পিতা ঘুম থেকে উঠলে গরম পানি দিয়ে ওজু করতে পারেন।

সালেহ আব্বাসী একবার খলীফা মনসুরের দরবারে হাজির হন। কথা বলেন এবং প্রায়ই বলেন, আমার পিতার উপর আল্লাহর রহম হোক। খলীফার দারোয়ান রোবাই বলেন, আপনি খলীফার সামনে নিজ পিতার উপর এত বেশী রহমতের দোয়া করবেন না। সালেহ বলেন, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, আসল কথা হলো তুমি বাপের মজা ভোগ করনি। খলীফা মনসুর মুচকি হেসে বলেন, এটা সে ব্যক্তির শাস্তি যে বনি হাশেমের কথায় বাধা সৃষ্টি করে।

ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবু দারদার (রা) কাছে আসেন এবং বলেন, আমার বিয়ের আগ পর্যন্ত আমার পিতা আমার সাথে ছিলেন। এখন তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন। আবু দারদা (রা) বলেন, 'আমি তোমাকে পিতার নাফরমানী কিংবা স্ত্রী তালাকের কথা বলবো না। তুমি চাইলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদিস বর্ণনা করতে পারি। আমি রাসূল (সা)কে বলকে শুনেছি, 'বাবা হলো জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। তুমি চাইলে তা হেফাজত কর, আর নয় ভেঙ্গে ফেল। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাবী আতা বলেছেন যে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন।'

ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদার কাছে এক ব্যক্তি এলো এবং বললো, আমার স্ত্রী আছে, আমার মা তাকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'বাবা হলো জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, তুমি চাইলে দরজাটি ভেঙ্গে ফেল, না হয় এর হেফাজত কর।'

ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বানে আব্দুল্লাহ বিন ওমার থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আমার এক স্ত্রী ছিলো। আমি তাকে বেশী ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিতে

বলেন। আমি অস্বীকার করি। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে তা পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তালাক দিয়ে দাও।'

(৬) নাফরমানী ও অবাধ্যতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

মা-বাবার অধিকার পূরণ না করা ও তাদের আদেশ না মানা গুনাহ। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের রাগসুলভ দৃষ্টি কিংবা নিজেকে বাবার সমতুল্য মনে করা অবাধ্যতার শামিল। মাতা-পিতার দুহাতে চুমু না খাওয়া, তাদের সম্মানে না দাঁড়ানো, সন্তান উঁচু সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছলে বাবাকে পরিচিত করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করা ও গরীব মাতা-পিতার খরচ না দেয়া অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। তখন মাতা-পিতা আদালতে শরণাপন্ন হলে, আদালত সন্তানকে খরচ দিতে বাধ্য করবে।

বড় নাফরমানী হলো : মা-বাবার কথায় সন্তানের অসন্তোষ প্রকাশ করা, তাদের কথার উপর উচ্চস্বরে কথা বলা, তাদেরকে ব্যথা দিয়ে কথা বলা, অপমান করা এবং গালি দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা) মা-বাবার নাফরমানীর গুনাহ, আমল বরবাদ হওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিশোধের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলবো না? তিনি একথা তিনবার বলেন। আমরা বললাম, জ্বি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। সোজা হয়ে বসে বলেন, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যাপারে সাবধান। তিনি এটা বার বার বলতে থাকলেন। আমরা তাঁর প্রতি দয়াবশত ভাবলাম, হায়, তিনি যদি চুপ করতেন!

আহমদ, নাসাঈ, বাজ্জার ও হাকেম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করেছেন। তারা হলো, মদ পানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং সে দাইউস যে নিজ স্ত্রীর নিকৃষ্ট কাজকে অনুমোদন করে।'

বোখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহ। তিনি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। সে কোন ব্যক্তির বাবাকে গালি দেয়, ফলে সে ব্যক্তি তার মা-বাবাকে গালি-গালাজ করে।'

আহমদ প্রমুখ মুয়াজ বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ১০টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমাকে হত্যা বা আগুনে জ্বালালেও আল্লাহর সাথে শিরক করো না এবং তোমার পরিবার ও সহায়-সম্পদ থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দিলেও মাতা-পিতার নাফরমানী করো না।'

হাকেম ও ইস্পাহানী আবু বাকরাহ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সকল গুনাহর শাস্তি পিছিয়ে দেন। তবে মাতা-পিতার নাফরমানীর শাস্তি মৃত্যুর আগে ব্যক্তির জীবনে কার্যকর করেন।'

ইস্পাহানী এবং অন্যান্যরা আবুল আব্বাস আল আচ'ম থেকে এবং তিনি আ'ওয়াম বিন হাওশাব থেকে বর্ণনা করেন। আওয়াম বলেন, আমি একবার এক মহল্লায় যাই। পাশে ছিলো কবরস্থান। বিকেলে একটি কবর ফেটে গাধার মাথা ও মানুষের দেহ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বেরিয়ে তিনবার গাধার মতো আওয়াজ দিয়ে আবার কবরে প্রবেশ করলো এবং কবরটি মিলে গেলো। এক বৃদ্ধা কবিতা কিংবা মারফতী গান গাইলো। অন্য এক মহিলা প্রশ্ন করলো, ওই বৃদ্ধাটিকে কি দেখবেন? আমি বললাম তার ঘটনা কী? সে বললো, তিনি হলেন ওই মৃত ব্যক্তির মা। মৃত ব্যক্তিটি মদ পান করতো। মা তাকে বলতো, হে সন্তান আর কত দিন মদ পান করবে? সে নিজ মাকে বলতো, তুমিতো কেবল গাধার মতো চিৎকার করছো। সে বিকেলে মারা গেলো। তখন থেকে প্রতিদিন বিকেলে সে কবর ফেটে বের হয়, তিনবার গাধার মতো আওয়াজ দেয়। তারপর আবার কবর মিলে যায়।'

মাতা-পিতার অধিকার পূরণ করার লক্ষ্যে সন্তানকে গঠন করতে হবে। মাতা-পিতার অধিকার সচেতন সন্তান পাড়া-প্রতিবেশী এবং শিক্ষকসহ অন্যদের অধিকার পূরণে যত্নবান হয়ে থাকে। এজন্য সন্তানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া জরুরী :

১. গুনাহর হুকুম ছাড়া মা-বাবার সকল আদেশ মেনে চলা।

২. আদব ও নম্রতার সাথে তাদেরকে সম্বোধন করা।

৩. তারা ঘরে প্রবেশ করলে তাদের সম্মানে দাঁড়ানো।

৪. সকাল-সন্ধ্যা কিংবা বিভিন্ন দিবস ও উপলক্ষে মা-বাবার হাতে চুমু খাওয়া।

৫. তাদের সুনাম, মর্যাদা ও সম্পদের হেফাজত করা।

৬. তারা যা চায় তা দেয়া ও সম্মান করা।

৭. সকল কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করা।

৮. তাদের জন্য বেশী বেশী দোয়া করা ও গুনাহ মাফ চাওয়া।

৯. মাতা-পিতার মেহমান আসলে দরজার কাছে বসা এবং তাদের চোখের প্রতি নজর রাখা, হতে পারে তারা চুপিসারে কিছুর আদেশ দিতে পারে।

১০. আদেশ দেয়ার আগেই মাতা-পিতার কাজে সহযোগিতা করা।

১১. তাদের কথার উপর উচ্চস্বরে কথা না বলা।

১২. তাদের কথায় বাধা দিয়ে কথা না বলা।

১৩. অনুমতি না দিলে ঘর থেকে বের না হওয়া।

১৪. ঘুমে থাকলে ঘুমের ক্ষতি না করা।

১৫. স্ত্রী ও সন্তানকে তাদের উপর অগ্রাধিকার না দেয়া।

১৬ .পছন্দ না হলেও তাদের কাজকে মন্দ না বলা।

১৭. হাসির কারণ না থাকলে তাদের সামনে না হাসা।

১৮. তাদের কাছের খাবার না খাওয়া।

১৯. তাদের আগে খাওয়া শুরু না করা।

২০. তাদের বসা অবস্থায় অনুমতি ছাড়া না ঘুমানো।

২১. তাদের সামনে পা লম্বা করে না বসা।

২২. তাদের আগে না চলা ও প্রবেশ না করা।

২৩. ডাকলে দ্রুত হাজির হওয়া।

২৪. জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।

২৫. পিতা-মাতার অবাধ্য কোন ব্যক্তির সাথে না চলা।

২৬. তাদের জন্য দোয়া করা। মৃত্যুর পরের দোয়া বেশী কাজে আসে। বেশী বেশী করে এই দোয়াটি পড়া উচিৎ : 'হে রব, তাদের প্রতি সেরূপ দয়া করুন, যেমনি তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে।' (সূরা বনি ইসরাইল–২৪)

খ. আত্মীয়ের অধিকার :

رَحِم বলতে বোঝায় বংশ ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। এগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ :

বাবা-মা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, ভাতিজা-ভাগিনা, মামা-খালাসহ নিকটবর্তী অন্যান্য আত্মীয়। দু'কারণে শরীয়ত তাদেরকে رَحِم আখ্যা দিয়ে থাকে।

ক. এটা আল্লাহর নাম رَحْمَنُ থেকে নির্গত। এক হাদিস একথাকে সমর্থন করে। আব্দুর রহমান বিন আওফ থেকে আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছেন, 'আমি আল্লাহ, রহমান। আমি আত্মীয়তাকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে এই নাম নির্গত করেছি। যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন। আর যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।'

খ. এই মূল থেকেই আত্মীয়তার সৃষ্টি। তাই নবী (সা) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ফরজ এবং তা ছিন্ন করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

সন্তানকে শৈশব থেকেই আত্মীয়তার অধিকার পূরণের গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যেন সে বড় হবার সাথে সাথেই তা পালন করতে পারে। আল্লাহ কোরআন মাজীদে আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার উপর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমরা যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে থাক সে আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (সূরা নিসা-০১)

'আত্মীয় মিসকিন এবং মুসাফিরের হক আদায় কর। অপচয় করো না।' (সূরা বনি ইসরাইল–২৬)

'আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও আত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ কর।' (সূরা নিসা–৩৬)

অন্যদিকে, কোরআন মাজীদ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং যমীনে বিদ্রোহ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিশাপ ও পারলৌকিক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ বলেন, 'যারা শক্ত অঙ্গীকারের পর তা ভঙ্গ করে, আত্মীয়তার যে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং পরকালে তাদের রয়েছে মন্দ ঠিকানা।' (সূরা রা'দ–২৫)

আল্লাহ আরও বলেন, 'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিশাপ দেন। তারপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (সূরা মোহাম্মদ ঃ ২২-২৩)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের লক্ষণ :

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন মেহমানের মেহমানদারী করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন হয় ভালো কথা বলে, না হয় চুপ থাকে।' (বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে হায়াত ও রিযক বাড়ে :

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি রিযক ও হায়াত বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।'

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারীর খারাপ মৃত্যু হয় না:

আবু ইয়া'লী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيْدُ اللهُ بِهِمَا فِى الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ بِهِمَا مَيْتَةَ الْمَكْرُوْهِ وَالْمَحْذُوْرَ 'দান-সদকা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আল্লাহ ব্যক্তির হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট মৃত্যু থেকে হেফাজত করেন।'

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আল্লাহ দেশ আবাদ ও সম্পদ দান করেন :

তাবারানী ও হাকেম আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন জাতি দ্বারা দেশ আবাদ করেন এবং তাদেরকে সম্পদ দান করেন, কিন্তু সৃষ্টির পর থেকে তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকাননি। প্রশ্ন করা হলো, সেটা কীভাবে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, সেটা আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে।' অর্থাৎ তারা নাফরমানী করা সত্ত্বেও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে দেশ আবাদ ও সম্পদ লাভ করেছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে গুনাহ ও ত্রুটি মাফ হয় :

হাকেম ও ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে আসলো এবং বললো, 'আমি বিরাট গুনাহ করেছি। আমি কি তাওবাহর সুযোগ পেতে পারি? নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা আছে? সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার খালা আছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়তার হক আদায় কর।'

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে পরকালে সহজ হিসাব ও জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হবে :

বাজ্জার, তাবারানী ও হাকেম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে আল্লাহ তার সহজ হিসাব নেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমাদের মা-বাবা উৎসর্গ হোক, সেগুলো কী? তিনি বলেন, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করবে; যে তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে মাফ করবে। এগুলো করলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

বোখারী ও মুসলিম জোবায়ের বিন মোতয়ে'ম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা)কে বলতে শুনেছেন : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'

কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর উঁচু মর্যাদা হবে :

বাজ্জার ও তাবারানী ওবাদাহ বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে কীসে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বলবো না? তিনি বলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন, যে তোমার সাথে অজ্ঞ-মূর্খের মতো ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে জ্ঞানীর মতো ব্যবহার কর, তোমার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দাও, তোমাকে যে বঞ্চিত করে তাকে দান কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখ।'

সন্তান গঠনকারী পিতা-মাতা কিংবা শিক্ষক যদি শিশুর সামনে এ সকল মূল্যবোধ তুলে ধরে, তাহলে তারা ভালো হবে বলে আশা করা যায়।

গ. প্রতিবেশীর অধিকার :

প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা ফরজ। প্রশ্ন হলো, প্রতিবেশী কে? প্রতিবেশী হলো, নিজের ডানে-বামে এবং উপরে নীচে বসবাসকারী ৪০ ঘরের লোক। প্রতিবেশীর পরস্পরের ওপর পরস্পরের যে হক বা অধিকার রয়েছে, এই অধিকার তাবারানীতে কা'ব বিন মালেক থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমর্থিত। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি অমুক লোকের মহল্লায় অবস্থান করছি। আর আমাকে সর্বাধিক কষ্টদানকারী ব্যক্তি

সেখানে আমার নিকটতম প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর, ওমার ও আলী (রা)কে বলেন, মসজিদে যাও এবং জোরে লোকদেরকে জানিয়ে দাও, ৪০টি ঘর হলো প্রতিবেশী। সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, প্রতিবেশী যার ক্ষতির আশংকা করে।'

ইসলামে প্রতিবেশীর চার প্রকার অধিকার আছে। সেগুলো হলো-১. প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া, ২. প্রতিবেশীকে হেফাজত করা, ৩. প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা, ৪. প্রতিবেশীর কঠোরতা ও ক্ষতির বিপরীতে ধৈর্য ধারণ করা।

১. প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া : কষ্ট বিভিন্ন প্রকার। যেমন, চুরি-ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, গালি-গালাজ ও ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা। তবে সর্বাধিক বিপজ্জনক কষ্ট বা ক্ষতি হলো, যেনা-ব্যভিচার, ইজ্জত-সম্মান নষ্ট ও চুরি-ডাকাতি করা।

ইমাম আহমদ ও তাবারানী মেকদাদ বিন আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদেরকে প্রশ্ন করেন, 'যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা অপেক্ষা অন্য দশজন মহিলার সাথে যেনা করা সহজ বিষয়। তিনি চুরি সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর চুরি করা অপেক্ষা অন্য দশজনের ঘরে করা সহজ বিষয়।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদিছে হাত ও মুখে কষ্ট দেয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'আল্লাহর শপথ, সে মোমেন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মোমেন নয়, আল্লাহর শপথ, সে মোমেন নয়। প্রশ্ন করা হলো, সে কে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

২. প্রতিবেশীকে হেফাজত করা : প্রতিবেশীকে হেফাজত করা ও জুলুম প্রতিহত করা আত্মার পবিত্রতার লক্ষণ এবং ইসলামের অন্যতম নৈতিক গুণ। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এর ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, এক ভাই অন্য ভাইয়ের উপর জুলুম ও তাকে অপমান করতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের

একটি বিপদ দূর করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তার একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি অপর মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন।'

৩. **প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা** : সৎ ও উত্তম প্রতিবেশী হবার জন্য শুধু প্রতিবেশীর ক্ষতি থেকে দূরে থাকা, কিংবা ক্ষতি প্রতিহত করা অথবা কোন জালেমের হাতকে বাধা দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সেজন্য আরও কিছু কাজ করতে হবে। যেমন, বিপদ-মুসিবতে শোক প্রকাশ, আনন্দের সময় অভিনন্দন জানানো, রোগ হলে দেখতে যাওয়া, সালাম দেয়া এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে সাধ্য মতো উপদেশ দেয়া ও ইজ্জত-সম্মান করা। এ মর্মে তাবারানী ও খারায়েতী নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

আমর নিজ পিতা শোয়া'ইব থেকে, শোয়া'ইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিবার ও সম্পদের ভয়ে প্রতিবেশীর জন্য নিজ দরজা বন্ধ রাখে, সে মোমেন নয়। সে ব্যক্তিও মোমেন নয়, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। তুমি কি জান যে, প্রতিবেশীর অধিকার কি? তা হলো তোমার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে, ঋণ চাইলে ঋণ দেবে, গরীব এবং অসুস্থ হলে তাদেরকে দেখতে যাবে, তাদের ভালো ও খুশীর খবরে মোবারকবাদ জানাবে, বিপদ-আপদে শোক প্রকাশ করবে, মারা গেলে জানাযায় অংশ নেবে, বড় বিল্ডিং বানিয়ে অন্যদের বাতাস বন্ধ করবে না, তবে তাদের অনুমতি নিয়ে পারা যাবে, পাতিলের রান্নার ঘ্রাণ দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেবে না, যদি না তাদেরকে তরকারী দাও, ফল কিনলে তাদেরকে উপহার দেবে। তা করতে না পারলে, লুকিয়ে ফল ঘরে ঢুকাবে। তোমার সন্তান যেন তা বাইরে না নেয়, ফলে তাদের কষ্ট হবে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিবেশীকে সম্মান করা ঈমানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
'আর পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, সহপাঠী এবং মুসাফিরের সাথেও সদয় ব্যবহার কর।' (সূরা নেসা-৩৫)

নিকট ও দূর প্রতিবেশী উভয়েরই অধিকার রয়েছে। তাবারানী জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী তিন প্রকার। একমাত্র প্রতিবেশী যার একটিমাত্র অধিকার আছে, সে হলো মোশরেক। আরেক প্রকার প্রতিবেশী যার দু'টো অধিকার আছে। সে হচ্ছে মুসলিম প্রতিবেশী। তার প্রথম হক ইসলামের এবং দ্বিতীয় হক প্রতিবেশী হিসেবে। অন্য এক প্রকার প্রতিবেশী যার তিনটি অধিকার আছে। যেমন,আত্মীয় প্রতিবেশী। তার প্রতিবেশী হিসেবে, ইসলাম এবং আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে।'

মোজাহিদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন ওমরের কাছে ছিলাম। তার গোলাম একটি ভেড়া জবাই করে চামড়া খুলছিলো। তিনি বলেন, হে গোলাম, চামড়া খোলার পর প্রথমে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে গোশত দেবে। তিনি কয়েকবার একথা বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'জিবরীল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অব্যাহত উপদেশ দিচ্ছেন। আমি ধারণা করেছিলাম যে, প্রতিবেশীকে হয়তো ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন হলো, কোরআনের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা কি প্রতিবেশীর অধিকার ঠিকমতো পূরণ করে? আয়েশা (রা) বলেন, 'নারীরা কোন ভালো নেক আনসারের ঘরে গেলে, প্রথমে নিজ মাতা-পিতার কাছে যেতো।'

প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহের মধ্যে আগুন, পানি ও লবণ চাইলে তা দেয়া অন্তর্ভুক্ত এবং যদি কোন প্রচলিত জিনিসের হাওলাত চায়, যেমন গৃহস্থালী দ্রব্য ও আসবাবপত্র অর্থাৎ হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা, চাকু, চালনী ইত্যাদি– তাও দিতে হবে। অনেক তাফসীরবিদ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 'যারা নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না' এই আয়াতের তাফসীরে উপরিউক্ত জিনিসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো না দেয়া খারাপ স্বভাব ও নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক।

আল্লামা খাওয়ারেযমী 'মুফীদুল উলুম' বইতে লিখেছেন, প্রখ্যাত আলেম ও আবেদ আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের একজন ইহুদি প্রতিবেশী ছিলো। সে নিজ ঘর বিক্রির ইচ্ছা করলো এবং মূল্য চাইলো দু' হাজার। লোকেরা বললো এর মূল্য হবে এক হাজার। সে বললো, আপনারা ঠিক বলেছেন। এক হাজার হলো ঘরের দাম আর এক হাজার হলো আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের প্রতিবেশী হবার দাম। ইবনুল মোবারককে এ খবর দেয়া হলে তিনি তাকে ঘরের দাম দিয়ে বলেন, ঘর বিক্রি করো না। ইহুদি ইবনে মোবারকের সচ্চরিত্রতা ও সদ্ভাব দেখতে না পেলে তাঁর উক্ত ভূমিকার ফলে ঘর বিক্রি থেকে বিরত থাকতো না।

৪. প্রতিবেশীর কঠোরতা ও ক্ষতির বিপরীতে ধৈর্যধারণ করা : প্রতিবেশীর ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করা, তার ক্ষতি ও মন্দকে ধৈর্য ও সহ্যের সাথে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। বিশেষ অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি কিংবা যে ক্রটির জন্য লজ্জিত হয় অথবা দুঃখ প্রকাশ করে, সেগুলো প্রশস্ত মনে গ্রহণ করা অন্যতম সম্মান ও মর্যাদার কাজ।

আল্লামা হারীরী তাঁর 'মাকামাত' বইতে লিখেছেন, 'আমি প্রতিবেশীকে জালেম হলেও ক্ষমা করি। নিঃসন্দেহে, মূর্খতা, ক্ষতি, জুলুম ও মন্দের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা মহৎ গুণ এবং উন্নত মর্যাদার কাজ।

বাজ্জার ও তাবারানী ওবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে বলবো না যার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? তারা বললো, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন, অজ্ঞ লোকের সাথে ধৈর্য ধারণ করবে, জালেমকে ক্ষমা করবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে।'

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ক্ষমা দ্বারা বহু খারাপ লোককে সৎ পথ দেখানো, বিকৃতি ও ভ্রান্তি দূর করা এবং হেদায়েতের পথে আনা সম্ভব হয়েছে। তখন কঠোরতা ভালোবাসায়, দূরত্ব নৈকট্যে এবং শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারেনা, তোমরা ভালো দ্বারা মন্দের প্রতিরোধ কর। তাহলে দেখতে পাবে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-৩৪)

সন্তানকে এগুলো দুইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। ১. মৌখিকভাবে ও ২. বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। এভাবে শিক্ষা পেলে তারা সমাজের সুন্দর সৃষ্টিতে পরিণত হবে।

ঘ. শিক্ষকের অধিকার : ছাত্রের কাছে শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষক উপযুক্ত হলে, তাকওয়া ও পরহেজগারী এবং উন্নত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হলে তাকে অধিক হারে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। নবী করিম (সা) শিক্ষকের মর্যাদা দানের ব্যাপারে আমাদেরকে দিক নিদের্শনা দিয়েছেন।

আহমদ, তাবারানী ও হাকেম ওবাদাহ বিন সামেত থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমদের হক বা অধিকার জানে না।'

তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা বরেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'জ্ঞান শেখো, জ্ঞানের জন্য প্রশান্তি ও সম্মান শেখো এবং শিক্ষকের কাছে বিনয়ী হও।'

তাবারানী 'আল কবীর' গ্রন্থে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'মোনাফেক ছাড়া তিন ব্যক্তিকে কেউ হেয় চোখে দেখে না, ১. বৃদ্ধ মুসলিম ২. আলেম ৩.ন্যায়পরায়ণ নেতা বা শাসক।'

ইমাম আহমদ সাহল বিন সাদ আস সা'য়েদী থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি যেন এমন যুগ না পাই, যখন আলেমকে অনুসরণ করা হবে না, ধৈর্যধারণকারীকে দেখে লজ্জা পাবে না, যাদের অন্তর হবে অনারব এবং জিহ্বা হবে আরবের।'

ইমাম বোখারী জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'নবী (সা) ওহুদের শহীদানদের দাফনের সময় দু' জনকে এক কবরে সমাহিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন কে সর্বাধিক কোরআন শিখেছে? একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলো তাঁকে আগে কবরে শোয়ানো হলো।'

শিক্ষার্থীর করণীয় :

(১) শিক্ষকের কাছে বিনয়ী হতে হবে এবং তার মত ও নির্দেশের বাইরে অবস্থান করবে না। বরং তার সাথে এমনভাবে থাকবে যেমন রোগী অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে থাকে এবং তার সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করবে, তার সন্তোষ লাভের চেষ্টা করবে। শুধু তাই নয়, তাকে জানতে হবে যে, শিক্ষকের সামনে বিনয় প্রকাশ নিজের ইজ্জত সম্মান, মর্যাদা ও গর্বের বিষয়। কথিত আছে, শিক্ষকের কাছে অতিশয় বিনয়ের জন্য ইমাম শাফেঈ'কে তিরস্কার করা হলে তিনি বলেন, أُهِينُ لَهُمْ نَفْسِي فَهُمْ يُكْرِمُونَهَا، وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهِينُهَا 'আমি তাদের কাছে আমার আত্মাকে হেয় করবো, তারা এর সম্মান করবে, সে আত্মাকে কখনো সম্মান করা হয় না, যাকে তুমি হেয় না কর।'

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) যায়েদ বিন ছাবেত আনসারী (রা) এর উঁচু মর্যাদার কারণে তাঁর সওয়ারীর পাদানি ধরেন এবং বলেন, ওলামাদের সাথে এরূপ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর শিক্ষক খালাফ আল-আহমারকে বলেন, আমি আপনার সামনে ছাড়া বসবো না। আমরা শিক্ষকের মর্যাদা দানের জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

ইমাম গাজালী (র) বলেন, বিনয় ও শোনা ছাড়া এলম অর্জন করা যায় না।

(২) ছাত্রকে মনে করতে হবে শিক্ষক যোগ্য ও মর্যাদাবান : এতে করে ছাত্র বেশী উপকৃত হতে পারবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, আমি আমার শিক্ষক ইমাম মালেকের সামনে তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এত আস্তে কাগজ ভাঁজ করতাম যেন তা পড়ে শব্দ না হয়।

প্রখ্যাত আলেম আর-রোবাই' বলেন, আল্লাহর কসম ইমাম শাফেঈ'র সম্মানের ভয়ে, তিনি দেখে ফেলতে পারেন, এ কারণে আমি তাঁর সামনে পানি পান করিনি।

একবার খলীফা মাহদির এক ছেলে প্রসিদ্ধ আলেম শোরাইকের কাছে যায় এবং একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে হাদিস জিজ্ঞেস করে। শোরাইক তাতে কর্ণপাত করেননি। তারপর ছেলেটি পুনরায় শোরাইককে প্রশ্ন করায় তিনি আগের মতোই ভ্রূক্ষেপ করেননি। ছেলেটি বললো, খলীফার ছেলের প্রতি এই অবহেলা? শোরাইক বললো, তা নয়, তবে আমি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান এলম নষ্ট করতে পারি না। ছেলেটি শিক্ষার মজলিসে হেলান দিয়ে বেআদবের মতো বসায় তিনি তার প্রতি গুরুত্ব দেননি।

শিক্ষককে 'তুমি' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে 'ওস্তাজ' 'শিক্ষক' বা 'সাইয়েদ' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা ভালো। এমনকি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও তার নাম ধরে আলোচনা করা ঠিক নয়। বরং এরূপ বলা উত্তম যে, আমাদের মহান শিক্ষক বা মোরশেদ এই বলেছেন।

(৩) ছাত্রের কর্তব্য শিক্ষকের অধিকার বা মর্যাদা না ভুলা : প্রখ্যাত আলেম শো'বা বলেন, আমি যদি কারো কাছে হাদিস শুনতাম, তিনি যতদিন জীবিত থাকতেন, আমি তার গোলাম হয়ে যেতাম। তিনি আরও বলেন, আমি কারো কাছে জ্ঞানের কোন কথা শুনলে, তার খেদমতের জন্য এর চাইতে আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠতাম।

মিসরের আরব কবি সম্রাট শওকী বলেন,

قُمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجِيْلَا – كَادَ الْمُعَلِّمُ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلًا

أَعَلِمْتَ اَشْرَفَ اَوْ اَجَلَّ مِنَ الَّذِىْ – يَبْنِىْ وَيُنْشِىءُ اَنْفُسًا وَّعُقُوْلًا ؟

'শিক্ষকের সম্মনার্থে দাঁড়াও এবং তাঁর মর্যাদা পূর্ণ কর, শিক্ষকতো প্রায় রাসূল হবার কাছাকাছি। তুমি কি তার অপেক্ষা বেশী সম্মান ও মর্যাদাবান কাউকে জান, যিনি আত্মা ও বিবেককে গঠন ও তৈরী করেন?'

ছাত্রকে আজীবন শিক্ষকের জন্য দোয়া করতে হবে। তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে, তাঁর কবর জেয়ারত ও এস্তেগফার করবে, সুযোগ পেলে দান-সদকা করবে, এলেম, দ্বীনদারী ও চাল-চলনে তাঁর চরিত্রকে অনুসরণ করবে এবং তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবে চলবে।

(৪) শিক্ষকের খারাপ আচরণ ও কঠোরতার মোকাবিলায় ছাত্রের ধৈর্যধারণ : শিক্ষকের খারাপ আচরণ কিংবা কঠোরতা সত্ত্বেও ছাত্র যেন শিক্ষকের সান্নিধ্য ত্যাগ না করে এবং উপকার বঞ্চিত না হয়। শিক্ষক রাগ করলে ছাত্রের উচিৎ হবে, তার কাছে অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়া। এর ফলে শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্রের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হবে। যে ছাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্যধারণ করবে না, তাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যে ছাত্রকে খাটো করেছি তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়াকে জোরদার করেছি।'

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলা হলো, আপনার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে, আপনি তাদের উপর রাগ করেন। হতে পারে তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। তিনি বলেন, তারা বোকা, আমার মন্দ আচরণের কারণে চলে গেলে তাদের কোন উপকার হবে না।

(৫) শিক্ষকের কাছে ছাত্রের আদবের সাথে বসা : ছাত্রকে শিক্ষকের সামনে শান্ত, নিরিবিলি, বিনয় ও সম্মানের সাথে বসতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, ডানে-বামে না তাকিয়ে শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ছাত্রকে ইজ্জত-সম্মান ও আদব-শিষ্টাচার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাইরের কোন শব্দ বা গোলযোগের প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে শিক্ষকের কথার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। নিজের কাপড়-চোপড় কিংবা অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিনা প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকা যাবে না, আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে বা কোন কিছুতে লেখা যাবে না, কিংবা আঙ্গুল ফুটানো, বিনা প্রয়োজনে কথা বলা এবং বন্ধুর সাথে জোরে হাসা যাবে না। বড়জোর মুচকি হাসবে। বিনা প্রয়োজনে গলা খা খা ও থুথু ফেলা পরিহার করতে হবে। নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে টিস্যু পেপার ব্যবহার করবে। হাঁচি আসলে ছোট আওয়াজ সহকারে হাঁচি দেবে, হাই তুললে মুখ বন্ধ রাখবে।

এ ব্যাপারে আলী (রা) এর উপদেশ খুবই উপকারী। তিনি বলেন, শিক্ষকের অধিকার হলো, কওমের লোকদেরকে সাধারণভাবে সালাম দেয়ার পর শিক্ষককে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাবে, তাঁর সামনে বসবে, হাত দিয়ে কোন কিছুর প্রতি ইশারা করবে না, অন্যকে চোখের ইশারায় কিছু বলবেনা। তাঁর মতের বিপরীতে এ কথা বলবে না যে, 'অমুক একথা বলেন, 'তাঁর কাছে কারো গীবত করবে না, তাঁর ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না, ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে সম্মান করবে, তার কোন প্রয়োজন থাকলে অন্যদের আগে তা পূরণের চেষ্টা করবে, তাঁর মজলিসে কারো সাথে গোপনে কথা বলবে না, তাঁর কাপড় ধরবে না, তাঁর অলসতা দেখলে খারাপ মনোভাব প্রকাশ করবে না, তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য লাভে বিরক্ত হবে না, বরং তাঁকে খেজুর গাছ মনে করে অপেক্ষা করতে হবে, খেজুর কখন ঝরে পড়ে।'

(৬) শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা : ক্লাশ, ঘর কিংবা শিক্ষার নির্দিষ্ট জায়গায় শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা উচিৎ। অনুমতি না দিলে ফেরৎ আসা উচিৎ। তিনবারের বেশী অনুমতি চাওয়া ঠিক নয় এবং আদবের সাথে আস্তে দরজায় আওয়াজ দিতে হবে।

শিক্ষকের কাছে ভালো আকার-আকৃতি, পোশাক-আশাক এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করবে। কেননা এলেমের মজলিসকে জিকর ও ইবাদতের মজলিস বলা হয়। শিক্ষকের কাছে খোলা ও মুক্ত মনে প্রবেশ করবে, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী সহকারে নয়। যাতে শিক্ষক যা বলে তা ভালোভাবে শুনতে পারে এবং বক্ষ প্রশস্ত হয়। শিক্ষককে না পেলে অপেক্ষা করতে হবে। তা না হয়, ওই ক্লাস থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষকের ঘরে গিয়ে তাঁকে বের করে আনার জন্য দরজায় আওয়াজ দেবে না এবং ঘুমে থাকলে জাগাবে না। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে, যেন তিনি ঘুম থেকে জেগে শিক্ষা দিতে আসেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি এলেমের জন্য জায়েদ বিন সাবিতের দরজায় গিয়ে বসে থাকতেন, যে পর্যন্ত না তিনি ঘুম থেকে জাগেন। তাঁকে বলা হলো, আমরা কি তাঁকে আপনার জন্য জাগাবো? ইবনে আব্বাস বলেন, না। হতে পারে তিনি দীর্ঘ সময় রাত জাগরণ করেছেন কিংবা রোদে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ হচ্ছে আমাদের নেক পূর্বসূরীদের চরিত্র।

(৭) শিক্ষক কোন হুকুমের প্রমাণ পেশ করলে, কোন অদ্ভুত ফায়দা উল্লেখ

করলে, কোন ঘটনা বা কবিতা আবৃত্তি করলে, ছাত্রকে তা ভালো করে শুনতে হবে এবং জ্ঞান পিপাসা মিটাতে হবে।

আ'তা বলেন, 'আমি কারো কাছে হাদিছ শুনলে তাকে বোঝাতাম যে, তা ভালো করে জানিনা। অথচ, আমি তা আরো ভালোভাবে জানি।'

তিনি আরো বলেন, 'কোন যুবক যখন হাদিস বর্ণনা করে, আমি এমনভাবে শুনি যেন তা আমি আগে শুনিনি। অথচ, তা আমি তার জন্মের আগে শুনেছি।'

জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিক নয় এবং যা বুঝে তা বোঝার জন্যও প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। এতে সময় নষ্ট হয়। হয়তো শিক্ষকের জন্য এটা বোঝা মনে হতে পারে।

যোহরী বলেন, 'হাদিস পুনরায় বর্ণনা করা পাথর অপেক্ষা ভারী মনে হয়।'

শিক্ষকের অধিকার পূরণের জন্য ছাত্রকে এভাবে মানসিকভাবে তৈরী করতে হবে।

হাবীব বিন শহীদ নিজ ছেলেকে বলেন, 'হে বেটা, আলেম ও ফেকাহবিদদের কাছে যাও, শেখো এবং আদব গ্রহণ করো। আমার কাছে এটা অনেক হাদিস অপেক্ষা পছন্দনীয়।'

মোখাল্লাদ বিন হোসেন ইবনে মোবারককে বলেন, 'আমরা অধিক হাদিস অপেক্ষা অধিক আদবের মুখাপেক্ষী।'

এক নেক পূর্বসূরী বলেছেন, হে বেটা, আদবের একটি অধ্যায় শেখা অন্য এলেমের ৭০টি অধ্যায় শেখা অপেক্ষা উত্তম।

সুফিয়ান বিন উমাইয়াহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হলেন সর্ববৃহৎ মাপকাঠি। তাঁর চরিত্র, জীবনী ও আচরণের উপর রেখে বিভিন্ন জিনিসকে পরিমাপ করতে হবে, যা এর সাথে মিলে যায়, তা সত্য। আর যা মিলে না তা বাতিল।

ইবনে শিরীন বলেন, তাঁরা নবী (সা) এবং সলফে সালেহীনের (নেক উত্তরসূরী) চরিত্র শিখতেন, যেমন এলেম শিখে থাকেন।

এগুলো হলো সব ভালো, নেক, ঈমানদার ও দ্বীনদার শিক্ষকের আদব। কিন্তু নাস্তিক ও বেদ্বীন শিক্ষকের জন্য এ সকল আদব প্রযোজ্য নয়। বরং তারা উল্টো কিছু বললে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; ফলে সত্যের অস্ত্র মিথ্যার মগজ চূর্ণ-বিচূর্ণ

করে দেয়, পরে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছো, সেজন্য তোমাদের ধ্বংস।' (সূরা আম্বিয়া-১৮)

সন্তান গঠনকারীকে নাস্তিক শিক্ষকের সামনে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিবাদ করতে হবে। সন্তানের মনে ইসলামের মূলনীতি গ্রথিত করতে হবে এবং বাতিলপন্থীদের ইসলাম বিরোধিতার জবাব দিতে হবে। সত্যকে অসত্য থেকে পার্থক্য করার হিম্মত ও সাহস প্রদর্শন করতে হবে।

শিক্ষকের অনুসরণ ছাত্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য :

পবিত্র কোরআন মাজীদে সূরা কাহাফে নবী মূসা (আ) ও খিজির (আ) এর কাহিনী বর্ননা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "মূসা তাকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি, যে সত্য পথের জ্ঞান আপনাকে শিখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? খিজির বলেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। যে বিষয় বুঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কিভাবে? মূসা (আ) বলেন, আল্লাহ্ চানতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। খিজির বলেন, যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।" (সূরা কাহাফ : ৬৫-৭০)

এ আয়াতে দেখা যায়, মূসা (আ) একজন নবী ও শীর্ষ স্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও খিজির (আ) এর কাছে সবিনয় অনুরোধ করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এদিকে খিজির (আ) এর নবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, ছাত্র শ্রেষ্ঠ হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞান অর্জনের আদব।

মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। তাই তাঁকে 'কালিমুল্লাহ' বলা হয়। এটা তাঁর বিশেষ মর্যাদা। মূসা (আ)-এর উম্মত ছিল। খিজির (আ)-এর উম্মত নেই।

ঙ. বন্ধুর অধিকার :

সন্তান গঠনকারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, সন্তানের নেক বন্ধু নির্বাচন। সন্তানের ভাল-মন্দ এর উপর অনেকটা নির্ভর করে। এটা একটা সত্য প্রবাদ, 'বন্ধু এমন এক ব্যক্তি যে টেনে নেয়।' আর নিম্নের প্রবাদটিও সত্য : 'আমি কে

তা জিজ্ঞেস না করে, আমার বন্ধু কে, তা জিজ্ঞেস করলে আমার পরিচয় পাওয়া যাবে।' একথা কবিও বলেছেন, ইংরেজিতে বলা হয়- A man is known by a company he keeps.

নবী করিম (সা) উত্তম ও নেক বন্ধু এবং খারাপ বন্ধুর উদাহরণ পেশ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "ভাল ও মন্দ সাথীর উদাহরণ হলো, মেশক-আতর বহনকারী ও কামারের হাঁপর। মেশক-আতর বহনকারী আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে কিংবা আপনি তার থেকে তা কিনতে পারেন, কমপক্ষে আপনি এর সুঘ্রাণ পেতে পারেন। পক্ষান্তরে, কামারের হাঁপর, হয় আপনার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, নচেত সেখানে আপনি দুর্গন্ধ ছাড়া কিছুই পাবেন না।"

আবু দাউদ ও তিরমিযী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ "মোমেন ছাড়া কাউকে সাথী বানিওনা এবং নেককার-পরহেযগার ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।"

তিরমিযী ও আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। তাই তোমাদের দেখা দরকার কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।'

কিশোর-তরুণের জন্য একদল ভালো বন্ধু জোগাড় কার জরুরী। সে তাদের সাথে মিশবে, খেলবে, লেখা-পড়া করবে, পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে, অসুস্থ হলে সেবা করবে, পরীক্ষায় পাশ করলে উপহার দেবে, ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে এবং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। আল্লাহ কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সামাজিকতার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য তাকে ভালো, নেক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে।

এখন আমরা বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১. দেখা হলে সালাম দেয়া : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন, মানুষকে খাবার খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেবে।'

মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা ঈমান ব্যতিত বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং ভালোবাসা ছাড়া ঈমান

আসবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না, কিসে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সালামের প্রসার ঘটাও।'

২. অসুখ হলে সেবা করা : ইমাম বোখারী আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'রোগীর সেবা কর, ক্ষুধার্তকে আহার দাও এবং দাস মুক্ত করো।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের অধিকার পাঁচটি : সালামের উত্তর দেয়া, রোগীর সেবা করা, যানাযার নামাজ পড়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া।'

৩. হাঁচির জবাব দেয়া : ইমাম বোখারী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الله, فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 'তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। যে শুনে সে যেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। এর জবাবে বলতে হবে 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।'

৪. আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করা : ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে রোগী দেখতে যায় কিংবা দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, একজন আওয়াজদানকারী এই বলে আওয়াজ দেয় : 'তোমার কল্যাণ হোক, তোমার চলাফেরা কল্যাণকর হোক, তুমি জান্নাতে একটি বাড়িতে বাসস্থান বানালে।'

মুসলিম শরীফে নবী করিম (সা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। 'এক লোক অন্য গ্রামে এক দ্বীনি ভাইকে দেখতে গেলো। আল্লাহ রাস্তায় এক ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি ফেরেশতার কাছে আসলো। ফেরেশতা তার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলো। লোকটি বললো, আমি এই গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করছি। ফেরেশতা প্রশ্ন করলো, তার কাছে তোমার কোন চাওয়া পাওয়া আছে? লোকটি বললো, না। আমি তাকে কেবল আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যেই ভালোবাসি। ফেরেশতা বললো, আমি তোমার কাছে প্রেরিত আল্লাহর দূত। তুমি তাকে যেরূপ ভালোবাস, আল্লাহও তোমাকে সেরূপ ভালোবাসেন।'

৫. বিপদের সময় সাহায্য করা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, কেউ কারো উপর জুলুম কিংবা কাউকে অপমান করতে পারে না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার একটা বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখবেন।'

৬. দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি অধিকার আছে। ১. সালামের জবাব দেয়া ২. রোগী দেখা ও সেবা করা ৩. জানাযায় অংশগ্রহণ করা ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচির জবাব দেয়া।'

৭. প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো : সুনামে দাইলামীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, مَنْ لَقِيَ اَخَاهُ عِنْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الْجُمْعَةِ فَلْيَقُلْ تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'জুমার নামাজ শেষে ফেরার পথে কোন ভাইয়ের সাথে দেখা হলে সে যেন বলে : 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের নামাজ কবুল করুন।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। তাওবা কবুল হওয়ায় তালহা (রা) কা'ব বিন মালেককে অভিনন্দন জানান।

৮. বিভিন্ন মওসুমে উপহার দেয়া : তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। تَهَادَوْا تَحَابُّوْا 'উপহার দাও, ভালোবাসা বাড়বে।'

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَهَادَيْنَ وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ فَاِنَّهُ يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ 'হে মোমেন মহিলাগণ, বকরীর খুর হলেও উপহার দাও। তা ভালোবাসা বাড়ায় ও বিদ্বেষ দূর করে।'

সুনানে দাইলামীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْهَدَايَا فَاِنَّهَا تُوْرِثُ الْمَوَدَّةَ وَ تُذْهِبُ بِالضَّغَائِنِ 'তোমাদের উপহার দেয়া কর্তব্য। তা ভালোবাসা জন্মায় ও বিদ্বেষ দূর করে।'

ইমাম মালেক মোয়াত্তায় একটি হাদিস বর্ণনা করেন। تَصَافَحُوْا يُذْهِبُ الْغِلَّ وَ

تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتُذْهِبُ الشَّحْنَاءَ 'হাত মেলাও, তা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবে; উপহার দাও, তা ভালোবাসা বাড়ায় ও শত্রুতা দূর করে।'

স্থায়ী বন্ধু বা সাথীর অধিকারের আওতায় অস্থায়ী বন্ধুর অধিকারও স্বীকৃত। যেমন, সফরসঙ্গী, লেখা-পড়ার সাথী ও চাকুরীর সহকর্মী। কোরআন এটাকে وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হিসেবে উল্লেখ করেছ। এ অস্থায়ী বন্ধুর প্রতিও যাবতীয় আদর-সোহাগ, সেবা-যত্ন, ইজ্জত-সম্মান, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, ত্যাগ-কোরবানী এবং নমনীয়তা ও কোমলতা প্রদর্শন করতে হবে। নবী করিম (সা) সকল অবস্থায় স্থায়ী ও অস্থায়ী সাথীদের প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সফরের সাথীর অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকতেন।

তাবারীতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। 'রাসূলুল্লাহ (সা) এক সাথীসহ পৃথক দুই সওয়ারীতে করে যাচ্ছিলেন।

তিনি কয়েকটা গাছের ভেতর গেলেন এবং দু'টো ডাল কাটলেন। একটি ডাল বাঁকা। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা ডালটি সাথীকে দেন। সাথী বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমি ওইটার যোগ্য। তিনি জবাবে বলেন, কখনো না।

প্রত্যেক সাথীর ব্যাপারে অন্য সাথী দায়িত্বশীল, যদি তা দিনের এক ঘণ্টার জন্যও হয়।'

চ. <u>বড়দের অধিকার</u> : প্রশ্ন হলো, বড় কে? উত্তর হলো, যে বয়সে বড়, জ্ঞানে-গুণে বড়, তাকওয়া ও পরহেজগারীতে বড় এবং মান ও সম্মানের দিক দিয়ে বড়। তারা যদি নিজ দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক হয় এবং শরীয়তকে ইজ্জত সম্মানের কারণ মনে করে, লোকদের উচিৎ, তাদের সম্মান করা ও তাদের হক আদায় করা। তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'যে যুবক বয়স বেশী হওয়ায় কোন বৃদ্ধকে সম্মান করে, আল্লাহও তার বৃদ্ধ বয়সে তাকে সম্মান করার লোক প্রস্তুত করবেন।'

আবু দাউদ ও তিরমিযী আমর বিন শোয়া'ইব থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। 'সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদেরকে দয়া-স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার জানে না।'

আবু দাউদ শরীফে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহর মহত্ত্ব হলো, বৃদ্ধ লোক, কোরআনের নিরহংকার বাহক যিনি তা ত্যাগ করেন না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা।'

আবু দাউদ মাইমুন বিন আবি শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) এর কাছে এক ভিক্ষুক এলে তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দেন। আরেকজন ভদ্র প্রকৃতির লোক আসলো। যার পরনে ভালো কাপড় ছিলো। তিনি তাকে বসান এবং আপ্যায়ন করেন। তাঁকে এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ 'লোকদেরকে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দাও।' অন্য বর্ণনায় আছে, أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন লোকদের যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দেই।'

মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি স্বপ্নে নিজেকে মেসওয়াক করতে দেখেছি। দু ব্যক্তি আমার কাছে আসলো। একজন অন্যজন থেকে বড়। আমি ছোট ব্যক্তিটিকে মেসওয়াক দিলাম। আমাকে বলা হলো, বড়কে দিন। পরে আমি তা নিয়ে বড়কে দিলাম।'

এসকল হাদিস থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারলাম–

(১) বড়কে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া : এর আওতায় তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা, মজলিসে সকলের আগে তাদেরকে বসতে দেয়া এবং আগে মেহমানদারী করা শামিল। বয়স্কদেরকে সম্মান করার বিষয়ে মোসনাদে ইমাম আহমদে শিহাব বিন আব'বাদ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের একজনকে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমরা যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে পৌঁছলাম, তাঁরা আমাদেরকে জায়গা করে দিলেন, আমরা বসলাম। নবী করিম (সা) আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন, দোয়া করলেন এবং আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নেতা কে? আমরা সকলে মোনযের বিন আয়েযকে দেখিয়ে দিলাম। মোনযের তাঁর কাছ গেলে সকলে জায়গা করে দিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে নিজের ডান পাশে বসান, অভিনন্দন জানান ও এলাকার খোঁজ-খবর নেন।.....

হাদিসের অনুসারীরা জানেন, সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং পরে তাঁর ডানের লোকের মেহমানদারী করতেন। এটাই পরে সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ।

(২) সকল বিষয়ে বড়দের থেকে শুরু করা : নামাজের জামায়াতে ছোটদের আগে বড়দেরকে এবং কথা ও লেন-দেন এবং কাজ কারবারের সময় আগে বড়দের

সাথে শুরু করতে হবে। মুসলিম শরীফে আবু মাসউদ থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) নামাজের কাতারে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, কাতার সোজা কর, মাঝে ফাঁক রাখবেনা, তাহলে তোমাদের পরস্পরের অন্তরে ফাঁক বা দূরত্ব সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী-গুণী (অবশ্যই বড়) তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে, এরপর অন্যরা, এরপর অন্যরা দাঁড়াবে।'

আবু ইয়াহইয়া আনসারী থেকে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ বিন সহল ও মোহাইয়াছা বিন মাসুদ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর খায়বার যান এবং উভয়ে পৃথক হয়ে পড়েন। মোহাইয়াছা পরে আব্দুল্লাহর কাছে ফিরে এসে দেখেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে তিনি মদিনায় আসেন। আব্দুর রহমান বিন সহল এবং মাসউদের দুই ছেলে মোহাইয়াছা ও হোয়াইয়াছা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, বয়স্ক লোককে আগে কথা বলতে দাও। আব্দুর রহমান ছিলেন অপেক্ষাকৃত ছোট।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা বয়স্ক লোকদের সম্মান ও অগ্রাধিকার বোঝা যায়।

(৩) বড়দের মর্যাদা খাটো করে দেখার বিরুদ্ধে ছোটদেরকে সতর্ক করতে হবে : ছোটরা যেন বড়দেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, মন্দ কথা না বলে, তাদের সামনে বেআদবী না করে কিংবা তাদেরকে ধমক না দেয়। এ মর্মে তাবারানী 'আল কাবীর' গ্রন্থে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তিন ধরনের ব্যক্তিকে মুনাফিক ছাড়া কেউ হেয় করতে পারে না। বৃদ্ধ মুসলিম, আলেম ও ন্যায় পরায়ণ শাসক।'

এজন্য সন্তান গঠনকারীদের উচিৎ, সন্তানদেরকে ভালো চারিত্রিক গুণাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। সেগুলো হলো :

১. **লজ্জা** : এটা এমন এক চারিত্রিক গুণ যা মন্দ কাজ ত্যাগ করা, বড়দের অধিকার পূরণে ত্রুটি প্রতিরোধ এবং প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

বোখারী ও মুসলিমে এমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে। 'লজ্জার সকল অংশেই কল্যাণ।'

তাবারানী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়েশা, 'লজ্জা যদি লোক হতো, তাহলে নেককার হতো। আর অশ্লীলতা যদি লোক হতো, তাহলে মন্দ লোক হতো।'

তিরিমিযী ও ইবনে মাজাহ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا كَانَ الْفَحْشُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِى شَيْىٍ اِلَّا زَانَهُ 'কোন কাজে অশ্লীলতা থাকলে তা মন্দ হয়, আর লজ্জা থাকলে সুন্দর হয়।'

মালেক ও ইবনে মাজাহ যায়েদ বিন তালহা বিন রাকানা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّض لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ 'প্রত্যেক ধর্মের চরিত্র আছে। ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ 'লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সকল নির্দেশনার ফলে সাহাবায়ে কেরামের সন্তানগণ উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন এবং বড়দের সামনে তারা এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা)-এর আমলে যুবক ছিলাম এবং তাঁর বাণী মুখস্থ করতাম। কিন্তু আমার চাইতে বয়সে বড় লোকদের উপস্থিতির কারণে আমি লজ্জায় তা বলতাম না।'

২. **আগন্তুকের জন্য দাঁড়ানো** : মেহমান, মুসাফির, আলেম ও বয়সে বড় লোকদের জন্য দাঁড়ানো মহান সামাজিক আদব। সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেয়া দরকার। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলো রয়েছে :

(ক) বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশা (রা) থেকে বর্ননা করেন, 'আমি ওঠা-বসায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতেমা অপেক্ষা তাঁর পদ্ধতি, পথ ও চরিত্র অনুসরণের বিষয়ে অনুরূপ অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখতে পাইনি। তিনি যখন নবী (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন, নবী (সা) উঠে তঁকে চুমু খেতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন। আর তিনি যখন ফাতেমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন ফাতেমা বসা থেকে উঠতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন।'

(খ) নাসাঈ ও আবু দাউদ আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'নবী (সা) আমাদের সাথে কথা বলতেন। তারপর তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম এবং দেখতাম, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে ঢুকেছেন।'

(গ) আবু দাউদ ওমার বিন সায়েদ থেকে বর্ণনা করেন। 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা)

বসা ছিলেন। তখন তাঁর দুধ পিতা আসলো। নবী (সা) একটা কাপড় বিছিয়ে দিলে তিনি তাতে বসেন। তারপর তাঁর দুধ মা আসলো। তিনি কাপড়ের অন্য অংশ ছিঁড়ে তা বিছিয়ে দিলে তিনিও তাতে বসেন। এরপর তার দুধ ভাই আসলো। তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকে নিজের সামনে বসালেন।'

এ হাদিসে দুধ ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর কথা আছে।

(ঘ) বোখারী ও মুসলিম সা'দ বিন মায়া'জ থেকে বর্ণনা করেন। সা'দ যখন মসজিদের নিকটবর্তী হলেন, নবী (সা) আনসারদেরকে বললেন, قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ او خَيْرِكُمْ 'তোমরা তোমাদের সর্দার কিংবা উত্তম ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়াও।'

(ঙ) বোখারী ও মুসলিম শরীফে বিশুদ্ধ হাদিসে কা'ব বিন মালেক তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণ নিজ জবানীতে বর্ণনা করেন। তাতেও সম্মানের জন্য দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। লোকেরা দলে দলে আমাকে তওবা কবুলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বললো, 'আল্লাহ তোমার তাওবাহ' কবুল করেছেন। আমি মসজিদে নবওয়ীতে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারপাশে ছিলেন লোকজন। তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে যান এবং আমার সাথে দ্রুত মোসাফাহা করেন ও অভিনন্দন জানান।'

এ সকল হাদিস ও বর্ণনা থেকে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আলেম ও গুণী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো জায়েয।

নবী করিম (সা) যে ধরনের ওঠা ও সম্মান জানানো নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলো হলো : যে ব্যক্তি চায় যে তার প্রতি ওঠে সম্মান জানানো হোক কিংবা বিশেষ ধরনের ওঠা ও সম্মান প্রদর্শন যাতে অহংকার রয়েছে অথবা অনারবদের সম্মান প্রদর্শনের বিশেষ পদ্ধতি। যেমন, যাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে তাকে ইজ্জত-সম্মানের সাথে বসিয়ে দিতে হবে, আর লোকেরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ইত্যাদি।

৩. বড়দের হাতে চুমু খাওয়া : সন্তানদেরকে এই আদবটি শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে, ছোটদের মনে বড়দেরকে সম্মান করার মানসিকতা তৈরী হবে। এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং ইমামদের ইজতিহাদের প্রমাণ রয়েছে ।

(ক) মোসনাদে আহমদ এবং বোখারীর 'আল আদাব আল সাগীর ' গ্রন্থে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের সদস্য যারে' বলেন, 'আমরা মদিনায় এসে সওয়ারী থেকে দ্রুত নামলাম এবং নবী করিম (সা) এর হাত ও পায়ে চুমু খেলাম।'

(খ) বোখারী 'আদাবুল মোফরাদ' গ্রন্থে ওয়াজে' বিন আমের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা মদিনায় আসলাম। নবী (সা)কে একথা জানানো হলো। এরপর আমরা তাঁর হাত ও পা ধরে চুমু খেলাম।

(গ) ইবনে আসাকের আবু আম্মার থেকে বর্ণনা করেন। যায়েদ বিন সাবেত (রা) এর জন্য একটা সওয়ারী আনা হলো। ইবনু আব্বাস এর পাদানী ধরেন। যায়েদ বিন সাবেত বলেন, হে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাত ভাই, সরে যান। ইবনু আব্বাস বলেন, আমাদেরকে এভাবে বয়সে বড় ও আলেমদের সাথে আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যায়েদ বিন সাবেত বলেন, আমাকে আপনার হাতটা দেখান। ইবনে আব্বাস হাত বের করলে যায়েদ তাতে চুমু খান এবং বলেন, নবী পরিবারের সাথে আমাদেরকে এরূপ করার হুকুম দেয়া হয়েছে ।

(ঘ) বোখারী আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে সোহায়ব থেকে বর্ণনা করেন। আমি আলী (রা)কে দেখেছি, তিনি আব্বাস (রা) এর হাত ও পায়ে চুমু খেয়েছেন।

(ঙ) হাফেজ আবু বকর আল মোকরী আবু মালেক আশজায়ী' থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনে আবি আওফাকে বলি, রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কৃত বায়আতের হাতটি বের করুন। তিনি তা বের করলে আমি তাতে চুমু খাই।

সন্তানদেরকে এ সকল কাজ ও মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে। তবে দু'টো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ১. এ সকল ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে পরিণাম খারাপ হবে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা ঠিকভাবে গড়ে উঠবে না। ২. শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। যেমন, দাঁড়ানোর সময় মাথা ঝুঁকে কিংবা হাতে চুমু দেয়ার সময় রুকুর মতো বাঁকা হওয়া যাবে না।

এ সকল আচরণ সন্তানকে পূর্ণ ইসলামী আদব শিক্ষার সহায়ক হবে এবং তাদেরকে নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে, তা হবে মহামূল্যবান।

শিশুরা ভালো জিনিস শেখার জন্য আগে বেড়ে যায়। তাই তাদের আবেগকে সতর্কতার সাথে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার সত্যিকার দাবী পূরণ করা সন্তান গঠনকারীর অন্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য।

৩. সাধারণ সামাজিক আদব-শিষ্টাচার মেনে চলা : এর আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিশুর মনে বদ্ধমূল করতে হবে : ১. পানাহারের আদব-কায়দা, ২. সালামের আদব, ৩. অনুমতির আদব, ৪. মজলিসের আদব, ৫. কথা-বার্তার আদব, ৬. ঠাট্টার আদব, ৭. অভিনন্দনের আদব, ৮. রোগী দেখার আদব, ৯. শোক প্রকাশের আদব, ১০. হাই ও হাঁচির আদব।

১. খাওয়ার আদব : খানা খাওয়ার আদব হলো :

(ক) খানার আগে ও পরে হাত ধোয়া : আবু দাউদ ও তিরমিযী সালমান আল ফারেসী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'খানার বরকত হলো, আগে ও পরে (হাত) ধোয়া।'

ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঘরে আল্লাহর অধিক কল্যাণ ও বরকত কামনা করে, সে যেন খানা উপস্থিত হলে এবং খাওয়া শেষ হলে ওজু করে।' অর্থাৎ হাত ধোয়।

(খ) প্রথমে বিসমিল্লাহ, শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা : আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ খানা খাওয়া শুরু করলে বিসমিল্লাহ বলবে। ভুলে গেলে পরে বলবে 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।'

ইমাম আহমদসহ আরো কেউ কেউ বলেছেন, পানাহারের সময় এই দোয়াটি পড়তে হবে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'সে আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।'

(গ) পেশকৃত খাবারের ত্রুটি না বলা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো খাদ্যের দোষ বলতেন না। ইচ্ছে হলে খেতেন আর ইচ্ছে না হলে খেতেন না ।

(ঘ) ডান দিক ও নিজের পাশ থেকে খাওয়া : মুসলিম শরীফে ওমার বিন আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) তত্ত্বাবধানে এক বালক ছিলাম। আমার হাত খাদ্যের পেয়ালায় এদিক-সেদিক ঘুরতো। নবী (সা) বলেন, 'হে বালক, বিসমিল্লাহ বলে খাও, তোমার ডান হাতে এবং নিজের পাশ থেকে খাও।'

(ঙ) হেলান দিয়ে না খাওয়া : হেলান দিয়ে খেলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অহংকার

প্রকাশ পায়। বোখারী শরীফে আবু জোহাইফা ওহাব বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না।'

মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দু'পা দাঁড় করিয়ে উভয় উরুর উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

(চ) খানার সময় কথা বলা মোস্তাহাব : মুসলিম শরীফে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ পরিবারের কাছে রান্না করা তরকারী চাইলেন। তাঁরা বললো, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন রান্না করা তরকারী নেই। তিনি তা আনতে বলেন এবং খাওয়া শুরু করেন। তিনি বলেন, সিরকা উত্তম তরকারী। বিশুদ্ধ হাদিসে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে খাওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথা বলেছেন।

(ছ) খানা শেষে মেজবানের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব : আবু দাউদ ও তিরমিজি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম (সা) সা'দ বিন ওবাদার কাছে আসেন। তিনি রুটি ও তেল আনেন। নবী (সা) খান এবং দোয়া করেন : اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارَ وَصَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ 'রোজাদারগণ তোমার কাছে ইফতার করেছে, নেক লোকেরা তোমাদের খাবার খেয়েছে এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেছে।'

(জ) বড় কেউ থাকলে আগে নিজে খাওয়া শুরু না করা : মুসলিম শরীফে হোজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা যখন নবী (সা) এর সাথে কোন খাবারে হাজির থাকতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) শুরু না করলে আমরা আগে খেতাম না।'

(ঝ) খাবার নষ্ট না করা : মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) খাওয়া শেষে তিন আঙুল চেটে খেতেন। তিনি বলতেন, যদি তোমাদের কারো খাবারের লোকমা নীচে পড়ে যায়, সেটা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খাবে এবং তা শয়তানের জন্য ফেলে রাখবে না। তিনি আমাদেরকে পেয়ালা চেটে খেতে বলেছেন। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা জান না, তোমাদের কোন্ খাদ্যটুকুতে বরকত রয়েছে।'

পান করার আদব :

(ক) বিসমিল্লাহ বলা, আল্লাহর প্রশংসা করা ও তিনবার পান করা মোস্তাহাব : এ মর্মে, তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'উটের মতো একবারে পান না করে, দু'তিন বারে পান কর। পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলো এবং শেষ করে আল্লাহর প্রশংসা করো।'

(খ) পান পাত্রের মুখ থেকে পান করা মাকরূহ : বোখারী ও মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) পান পাত্র ও মশকে মুখ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।' কেননা এটা সামাজিক রীতির বিরোধী এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন জিনিস তাতে পড়তে পারে।

(গ) পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেয়া মাকরূহ : তিরমিযী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। 'নবী (সা) পান পাত্রে শ্বাস কিংবা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।' ফুঁ দেয়া কিংবা শ্বাস নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং সামাজিক আদবের পরিপন্থী।

(ঘ) বসে পানাহার করা মোস্তাহাব : মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।'

কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস (রা)কে জিজ্ঞেস করলাম, দাঁড়িয়ে খানা খাওয়ার হুকুম কী? তিনি বলেন, সেটা অধিকতর মন্দ। মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আবু হোরায়রা (রা) বলেন, قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليكم وسلم لَايَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا , فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيءْ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে দাঁড়িয়ে পান করলে যেন বমি করে দেয়।'

নবী (সা) দাঁড়িয়ে পান করেছেন বলে সহীহ হাদিসের বর্ণনা দ্বারা তা জায়েয প্রমাণিত, তবে মাকরূহ। কোন কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। যেমন, তিনি দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করে নিম্নোক্ত নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন : يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা কামনা করেন, কঠোরতা নয়।' (সূরা বাকারা-১৮৫)

(ঙ) সোনা রূপার পাত্রে পানাহার করা নিষেধ : বোখারী ও মুসলিমে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজ পেটে জাহান্নামের বিকট শব্দ বিশিষ্ট আগুন গিলে।'

ইমাম মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী (সা) বলেন, 'যে লোক সোনা কিংবা রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজ পেটে জাহান্নামের বিকট শব্দ বিশিষ্ট আগুন ঢুকায়। কেননা এসকল পাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে গর্ব অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং দরিদ্র মানুষের সম্মানকে আহত করা হয়।'

(চ) পানাহারের মাধ্যমে পেট পূর্ণ করা নিষেধ : ইমাম আহমদ ও তিরমিযীসহ অন্যান্যরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। পেট ভর্তি করে খাওয়া অপেক্ষা মানুষের জন্য মন্দ কিছু নেই। আদম সন্তানের মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। যদি তাকে খেতেই হয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশ

খাদ্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখতে হবে।'

এভাবে সন্তানের খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২. সালামের নিয়ম : সন্তানকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সালাম শিক্ষা দিতে হবে।

(ক) শরীয়ত সালাম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মোমেনগণ, তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না দাও।' (সূরা নূর-২৭)

'যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ কর, তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দাও যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় শুভেচ্ছা ও পবিত্র দোয়া।' (সূরা নূর-৬১)

বোখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করেন। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি জবাবে বলেন, 'মানুষকে খানা খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেবে।'

ইমাম মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা ঈমান না আনলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালো না বাসলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী কাজের কথা বলবো? আর সেটা সালামের প্রসার ঘটানো।'

(খ) সালামের পদ্ধতি : সালাম দানকারী বলবে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' জবাবদানকারী বলবে, 'ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' যদিও সংখ্যায় মুসলিম একজনই হোকনা কেন। কেননা সালাম ও জবাবের বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। সালামের এই পদ্ধতি বিশুদ্ধ হাদিস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ।

আবু দাউদ ও তিরমিযী ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ তিনি সালামের জবাব দিয়ে বলেন, ১০। লোকটি বসে পড়লো। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ। তিনি তার সালামের জবাব দেন। সেও বসলো। তিনি বলেন, ২০। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ। তিনি তার জবাব দিয়ে বলেন, ৩০। লোকটি বসে পড়লো।'

বোখারী ও মুসলিম আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)

আমাকে বলেন, এই যে জিবরিল তোমাকে সালাম দিচ্ছে। আয়েশা (রা) জবাবে বলেন, وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

(গ) সালামের নিয়ম : সওয়ার ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তিকে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, কম লোক বেশী লোককে এবং ছোট বড়কে সালাম দেবে। বোখারী ও মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'সওয়ার ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং ছোট বড়কে সালাম দেবে।'

(ঘ) অমুসলিমদের সালামের পদ্ধতি থেকে বিরত রাখা : তিরমিযী শরীফে আমর বিন শোয়াইব থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং পিতা তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে অন্যদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। তোমরা ইহুদি, নাসারার সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইহুদিদের সালাম হলো, আঙুলের ইশারা, আর নাসারাদের সালাম হলো, হাতের তালুর ইশারা।'

এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্য উম্মাহ এবং তাদের সামাজিক ও চারিত্রিক আচরণ থেকে মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

(ঙ) সন্তান গঠনকারীকে আগে সন্তানকে সালাম দিতে হবে : নবী করিম (সা) যাওয়া আসার পথে শিশুদেরকে সালাম দিতেন। তাই আমাদেরকেও সেরূপ করতে হবে। ইমাম বোখারী ও মুসলিম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'আনাস (রা) শিশুদের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন। তিনি বলেন, নবী করিম (সা)ও তাই করতেন।'

ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে : 'নবী (সা) শিশুদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দেন।'

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে : 'নবী (সা) একবার খেলারত শিশুদের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে সালাম দেন।'

ইবনুস সুন্নীর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ 'হে শিশুরা, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

(চ) শব্দ দ্বারা অমুসলিমের সালামের জবাব শিক্ষা দেয়া : বোখারী ও মুসলিম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিলে তোমরা জবাবে বল, 'ওয়া আলাইকুম।'

সন্তানকে আরো শিক্ষা দিতে হবে যে, কাফেরকে যেন প্রথমে সালাম না দেয়।

নবী (সা) বলেন, لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ 'ইহুদি ও নাসারাকে প্রথমে সালাম দেবে না।'

(ছ) সালাম দেয়া সুন্নাত এবং জবাব দেয়া ওয়াজিব : ইবনুস সুন্নী নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, مَنْ اَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে সালাম দেয়, সেটা তার। আর যে জবাব দেয় না, সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়।' তিরমিযী আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, 'প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দু'ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে কে প্রথমে সালাম দেবে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উত্তম হতে চায়।'
আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, 'প্রথমে সালামদানকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উত্তম।'

যে অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ তা হচ্ছে : ওজুর সময়, বাথরুমে, খানার সময়, যুদ্ধরত অবস্থায়, কোরআন তেলাওয়াতের সময়, জিকর, হেরমে তালবিয়া পাঠ, জুমআর খোতবা, মসজিদে ওয়াজরত বক্তা, ক্লাসে শিক্ষারত অবস্থায়, গবেষণা অবস্থায়, আজান বা ইকামতের সময় মোয়াজ্জিনকে, ব্যস্ত কোন লোক কিংবা বিচার কাজে ব্যস্ত লোককে সালাম দেয়া ইত্যাদি। মোস্তাহাব বা পছন্দনীয় অবস্থায় সালাম না দিলে মাকরূহ সময়ে সালাম দিলে উত্তর পাওয়ার অধিকার রাখেনা।

৩. অনুমতি গ্রহণের নিয়ম : আল্লাহ কোরআন মাজীদে সূরা নূর-এর ৫৮-৫৯ নং আয়াতে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সে আলোকে অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দিতে হবে। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে তিনি বলেন, 'হে মোমেনগণ, তোমাদের দাস দাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে; ফজরের নামাজের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের জন্য সতর। এসময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছেতো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতগুলো বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'
এ আয়াতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. ফজরের আগে : তখন লোকেরা বিছানায় ঘুমায়।

২. দুপুরের খাবারের পর : মানুষ তখন নিজ স্ত্রীর সাথে শুয়ে বিশ্রাম নেয় এবং কাপড় খুলে রাখে। ৩. এশার পর : তখন ঘুম ও বিশ্রামের সময়।

এ তিন সময় এজন্য অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে, যেন ছোট শিশুরা নারী পুরুষের গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। আর যদি শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে তাদেরকে এই তিন অবস্থাসহ অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। ইসলাম সন্তানকে সামাজিক ও নৈতিক আচরণ শিক্ষা দিতে চায়।

অনুমতি গ্রহণের নিয়মগুলো হচ্ছে :

(ক) প্রথমে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। আবু দাউদ বর্ণনা করেন। বনি আ'মের গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (সা) এর ঘরে অনুমতি চাইতে গিয়ে বললো, আমি কি প্রবেশ করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) খাদেমকে বলেন, বেরিয়ে গিয়ে তাকে অনুমতির পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং বল, আপনি প্রথমে সালাম দিন এবং পরে বলুন, আমি কি প্রবেশ করবো? কথা শুনে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করবো? নবী (সা) তাকে অনুমতি দেন। সে প্রবেশ করলো।'

(খ) নিজের নাম, পরিচয় বা উপাধি প্রকাশ করা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে মেরাজের প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে। জিবরিল (আ) দুনিয়ার আসমানের (প্রথম আসমানের) দরজায় আওয়াজ দেন। প্রশ্ন করা হলো, কে? তিনি বলেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, মোহাম্মদ (সা)। তারপর জিবরীল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য আসমানে যান। প্রত্যেক আসমানেই প্রশ্ন করা হয়, আপনি কে? তিনি প্রতিবারেই জিবরীল বলে নিজের পরিচয় দেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মুসা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বাগানের কূপে বসা। আবু বকর (রা) অনুমতি চান। আবু মুসা প্রশ্ন করেন, কে? জবাবে বলেন, আবু বকর। তারপর ওমার (রা) আসেন ও অনুমতি চান। একই প্রশ্ন, কে? উত্তর : উমর। তারপর ওসমান।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঘরে এসে দরজায় আওয়াজ দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি জবাবে বললাম, 'আমি'। নবী (সা) বলেন, 'আমি' 'আমি'? অর্থাৎ তিনি এই জবাব অপছন্দ করেন।

(গ) তিনবার অনুমতি চাওয়া : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মুসা আশআরী

(রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তিনবার পর্যন্ত অনুমতি চাওয়া যায়। অনুমতি পেলে ভালো আর না পেলে ফিরে যাও।'

তবে প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফা অনুমতির মধ্যে চার রাকাত নামাজ পড়ার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা উচিৎ। হতে পারে ঘরের মালিক নামাজ কিংবা বাথরুমে ব্যস্ত থাকতে পারেন।

(ঘ) বেশী জোরে দরজায় আওয়াজ না দেয়া : যদি ঘরের মালিক পিতা, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হন তাহলে আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। ইমাম বোখারী আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। اِنَّ اَبْوَابَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقْرَعُ بِالْاَصَابِعِ 'রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরজা আঙুল দিয়ে আওয়াজ দেয়া হতো।' অতীতের বুজুর্গেরা তাদের শেখদের দরজায় আঙুল দিয়ে আওয়াজ দিতেন। এটা তাদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মানের নিদর্শন। আর যদি দরজায় বেল থাকে তাহলে হালকাভাবে বেলে আওয়াজ দিতে হবে।

(ঙ) অনুমতি পেলে দরজা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে : এ ধারণা করতে হবে একজন অমোহরাম মহিলা দরজা খুলবে। আর দৃষ্টি অবনত রাখার জন্যইতো অনুমতি। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ النَّظَرِ 'দৃষ্টির কারণেই অনুমতির বিধান চালু হয়েছে।'

তাবারানী আব্দুল্লাহ বিন বোসর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'দরজার সামনে দাঁড়াবে না, একপাশে দাঁড়াও, এরপর অনুমতি প্রার্থনা কর। তোমাদেরকে অনুমতি দিলে প্রবেশ কর, তা না হয় ফিরে যাও।'

আবু দাউদে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সম্প্রদায়ের বাড়িতে আসলে, দরজার সামনে দাঁড়াতেন না। দরজার ডানে কিংবা বাঁয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ 'কেউ যদি কোন সম্প্রদায়ের ঘরে উঁকি মেরে দেখে, তার চোখ কানা করে দেবে। এজন্য কোন রক্তপণ বা কেসাস নেই।'

(চ) বাড়ির মালিক চলে যেতে বললে ফিরে যাবে : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন মাজিদে বলেন, 'হে মোমেনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদের সালাম না

কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।' (সূরা নূর : ২৭-২৮)

আল্লাহর আদেশ পালন করার বিষয়ে অনুমতি গ্রহণকারী ব্যক্তি ফিরে আসার সময় যেন খারাপ কিছু মনে না করে। এমনকি সারা জিন্দেগী অনুমতি না পেলেও আল্লাহর নির্দেশ পালনকে অপূর্ব সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সন্তানকে অনুমতির নিয়ম শিক্ষা দিতে হবে।

৪.মজলিসের নিয়ম-কানুন : মজলিসের কিছু আদব-কানুন আছে। সন্তানকেও সেগুলো শিক্ষা দিতে হবে। সেগুলো হচ্ছে :

(ক) মজলিসের উপস্থিত লোকের সাথে হাত মেলানো। আবু দাউদ ও ইবনু সুন্নী নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'দু'জন মুসলিম একত্রিত হলে, হাত মেলালে, আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করেন।'

তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاَّغُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا 'দু'জন মুসলিম একত্রিত হয়ে হাত মেলালে পৃথক হওয়ার আগে তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

মোয়াত্তা মালেকে আতা খোরাসানী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الغِلُّ وَتَهَادَوْاتَحَبُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ 'হাত মিলাও, বিদ্বেষ দূর হবে, উপহার দাও, ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং শত্রুতা দূর হবে।'

(খ) ঘরের মালিক কর্তৃক মেহমানদের নির্ধারিত স্থানে বসা : মালিক ভালো জানে মেহমান কোথায় বসবে। তিনি যেখানে বসার ব্যবস্থা করেন, সেখানেই বসতে হবে। প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'মক্কাবাসীই মক্কার গিরিপথ সম্পর্কে ভালো ওয়াকেফহাল।' নূতন প্রবাদ আছে, ঘরের মালিকই ঘর সম্পর্কে ভালো ওয়াকিফহাল।' এটা সূরা নূরে বর্ণিত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।' (সূরা নূর-২৮)

আয়াতের হুকুম অনুযায়ী মেহমান বিদায় নেয়া পর্যন্ত মেজবানের হুকুমের অধীন।

এটা নিম্নোক্ত হাদিসেরও কথা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ حَيْثُ اَمَرُوْهُ فَاِنَّ الْقَوْمَ اَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ ‘যে ব্যক্তি কোন কওমের ঘরে প্রবেশ করে, সে যেন সেখানে বসে যেখানে তাকে তারা বসার জন্য বলে। কেননা কওম নিজেদের ঘরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।’

(গ) লোকদের কাতারে বসবে, মাঝখানে নয় : এটা একটা সামাজিক আদব। মজলিসের মাঝখানে বসলে কাউকে পিঠ দিয়ে বসতে হবে। ফলে তা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে। তারা অসন্তুষ্ট হয়ে গালি ও অভিশাপ দিতে পারে। আবু দাউদ ভালো সনদসহকারে হোজাইফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘যে মজলিসের মাঝখানে বসে, তার উপর অভিশাপ।’

তিরমিযী আবু মেজলায থেকে বর্ণনা করেন। ‘এক ব্যক্তি অধিবেশনের মাঝখানে বসলো। হোজাইফা বলেন, মোহাম্মদ (সা) এর জবানীতে সে ব্যক্তির উপর অভিশাপ যে অধিবেশনের মাঝখানে বসে।’

এসকল নিষেধাজ্ঞা তখন প্রযোজ্য যখন মজলিসে জায়গা খালি থাকে। যদি মজলিসে জায়গা সংকীর্ণ হয় এবং মাঝখানে বসতে বাধ্য হয়, তার কোন গুনাহ হবেনা। আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ‘আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কঠিন কিছু রাখেননি।’ (সূরা হজ্জ–৭৮)

(ঘ) অনুমতি ছাড়া দু'জনের মাঝখানে না বসা : তিরমিযী ও আবু দাউদ আমর থেকে, তিনি তাঁর পিতা শোয়া'ইব ও দাদার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘কারো জন্য অনুমতি ছাড়া দু' ব্যক্তির মাঝখানে বসে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা জায়েয নেই।’ আবু দাউদের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘দু ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা জায়েয নেই।’

(ঙ) মজলিসের যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানে বসতে হবে : আবু দাউদ ও তিরমিযী জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যখন নবী করিম (সা)-এর কাছে আসতাম, তখন লোকেরা যে পর্যন্ত বসেছে, তারপর বসতাম।’

এটা হলো আগন্তুক সাধারণ কোন লোক হলে। কিন্তু তিনি যদি জ্ঞানী-গুণী হন কিংবা সম্মানিত ও পদমর্যাদা বিশিষ্ট হন, তাহলে উপস্থিত লোকেরা কিংবা বাড়ির মালিক তাঁকে উপযুক্ত স্থানে বসাবেন। নবী (সা) বলেছেন, ‘লোকদেরকে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দাও।’ আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করায় নবী

(সা) তাদেরকে মর্যাদা দেন, অভিনন্দন জানান এবং প্রতিনিধি দলের প্রধান মোনজের বিন আয়েজকে নিজের ডান পাশে বসান।

(চ) মজলিসে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় গোপন আলোচনা করবে না : বোখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা তিনজন হলে তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজন গোপনে কথা বলবে না। কেননা এটা তার জন্য কষ্টদায়ক হবে।'

নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো তৃতীয় ব্যক্তি খারাপ ধারণা করতে পারে এবং তাকে গুরুত্ব না দেয়ায় কষ্ট পেতে পারে। তবে কষ্ট বা সন্দেহের কারণ না হলে, দুই বা অধিক ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে গোপন আলোচনা করা যেতে পারে।

(ছ) কোন কারণে মজলিস থেকে বেরিয়ে পুনরায় ফিরে এলে সাবেক জায়গায় বসার অগ্রাধিকার পাবে :

ইমাম মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ মজলিস থেকে বেরিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সাবেক জায়গায় বসার অগ্রাধিকার থাকবে।'

(জ) মজলিস থেকে বের হবার আগে অনুমতি নেবে : বোখারী ও মুসলিম নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'দৃষ্টির জন্যই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।' এই হাদিস আগমন ও নির্গমন দু'টোকেই শামিল করে। ইসলাম মজলিস ও ঘরের ইজ্জত-সম্মান এবং পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থেই এই নির্দেশ দিয়েছে।

(ঝ) মজলিসে গুনাহর কাফফারার দোয়া পড়া : হাকেম আবু বারযাহ থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) মজলিস থেকে ওঠার ইচ্ছা করলে এই দোয়াটি পড়তেন, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ 'হে আল্লাহ, পবিত্রতা ও প্রশংসা আপনার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। আমি আপনার কাছে আমার গুনাহ মাফ চাই ও তাওবাহ করি।'

এক লোক প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইতোপূর্বে এই দোয়া কখনো পড়েননি। তখন তিনি বলেন, 'এটা মজলিসের গুনাহর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ।'

আমরা সহ আমাদের সন্তানদেরকে এই নিয়মগুলো শিক্ষা দেয়া দরকার।

৫. কথা বলার নিয়ম : সন্তান গঠনকারীদের কর্তব্য হলো, সন্তানকে কথা বলার নিয়ম, আলোচনার ধরন এবং সংলাপের নীতিমালা শিক্ষা দেয়া। ফলে তারা বড় হলে, লোকদের সাথে কী ভাবে কথা বলতে হবে ও কথা শুনতে হবে, তা বুঝতে পারবে। নিম্নোক্ত আদবগুলো সামনে রাখতে হবে :

(ক) আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া : এটা যেহেতু কোরআন ও আমাদের নবীর ভাষা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের ভাষা, তাই এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা উত্তম। মানুষের সৌন্দর্য হলো তার ভাষার বিশুদ্ধতা এবং মিষ্টি কথা।

হাকেম মোস্তাদরাকে আলী বিন হোসেন থেকে বর্ণনা করেন। আব্বাস (রা) দু'টো চাদর পরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসেন। নবী (সা) তাঁকে দেখে মুচকি হাসেন। আব্বাস বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার মুখকে সহাস্য করুন, আপনি কেন হাসলেন? নবী (সা) জবাবে বলেন, নবীর চাচার সৌন্দর্য আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়েছে। আব্বাস জিজ্ঞেস করেন, কী সৌন্দর্য? নবী (সা) বলেন, 'ভাষা'।

আসকারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'প্রশ্ন করা, হলো, পুরুষের সৌন্দর্য কী? তিনি জবাবে বলেন, জিহ্বা বা ভাষার সৌন্দর্য।'

সিরাজী ও দাইলামী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল আমরা কাউকে আপনার অপেক্ষা অধিক শুদ্ধভাষী দেখিনা। তখন তিনি জবাব দেন, আল্লাহ আমাকে সুর লহরী দিয়ে সৃষ্টি করেননি। তিনি আমার জন্য সর্বোত্তম কথা মনোনীত করেছেন। সেটা হলো, কোরআনের লেখনী।'

(খ) থেমে থেমে বা ধীরে সুস্থে কথা বলা: থেমে থেমে বা আস্তে আস্তে কথা বললে শ্রোতা তা বুঝতে পারবে এবং মজলিসের উপস্থিত লোকেরা বক্তার কথা বুঝে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে। নবী (সা) উম্মতকে শিক্ষা দেবার জন্য এরূপ করতেন।

বোখারী ও মুসলিম আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'তোমরা যে রকম বিরতিহীন ও নিরবচ্ছিন্ন কথা বল, রাসূলুল্লাহ (সা) সে রকম কথা বলতেন না। তিনি এমন ধীরে-সুস্থে কথা বলতেন, গণনাকারী গুণতে চাইলে গুণতে পারতো।'

ইসমাঈলী নিজ বর্ণনায় আরো একটু বাড়িয়ে বলেন, إِنَّمَا كَانَ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهْمًا تَفْهَمُهُ الْقُلُوْبُ 'রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা সহজবোধ্য ছিলো যা অন্তরগুলো বুঝে নিতো।'

(গ) বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ নিষিদ্ধ : এ মর্মে আবু দাউদ ও তিরমিযী ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ عز وجل يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرُ بِلِسَانِهَا 'আল্লাহ সে বক্তার উপর অসন্তুষ্ট যে গরুর জাবর কাটার মতো জিহ্বার আড়-মোড়সহকারে গাল ভরা বুলি আওড়ায়।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) যেভাবে কথা বলতেন তা হলো : كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ فَصْلٍ، لَاهَزْرَ وَلَا نَزْرَ، وَيَكْرَهُ الثَّرْثَرَةَ فِي الْكَلَامِ وَالتَّشَدُّقَ بِهِ 'বিজ্ঞোচিত কথা বলতেন, বেশী বাড়িয়ে বা অতি কমিয়ে কথা বলতেন না। তিনি বেহুদা গাল-গল্প কিংবা কথার কৃত্রিমতা প্রকাশ করতেন না।'

(ঘ) যোগ্যতা অনুযায়ী লোকদের সাথে কথা বলা : বক্তাকে কওমের সংস্কৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, বুঝ-জ্ঞান ও বয়সের উপযোগী কথা বলতে হবে। এ মর্মে নবী (সা) বলেন, أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُحَدِّثَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِم 'আমাদের নবী সম্প্রদায়কে লোকদের বিবেক-জ্ঞানের উপযোগী কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (সুনানে দাইলামী-হাদিসের সনদ দুর্বল। কিন্তু অন্যান্য সহায়ক বর্ণনার ফলে তা হাসান হাদিসের মর্যাদা সম্পন্ন। আজলুনীর 'কাশফুল খাফা' কিতাব দ্রষ্টব্য)

বোখারী শরীফে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'লোকেরা জানতে ও বুঝতে পারে সেভাবে কথা বলো। সেভাবে না বললে, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?'

দাইলামী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'আমার উম্মতের কাছে আমার হাদিস এমনভাবে বর্ণনা করো না যা তাদের বিবেক বহন করতে পারবে না। তাহলে সেটা তাদের জন্য ফেতনা বা দুর্যোগের কারণ হবে।'

(ঙ) আলোচনা যেন বেশী লম্বা বা সংক্ষিপ্ত না হয় : কথা ক্ষতিকর সংক্ষিপ্ত বা বিরক্তিকর ও দীর্ঘ হওয়া উচিৎ নয়। কথা যেন শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয় ও অন্তর আকর্ষণবোধ করে। মুসলিম শরীফে জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে নামাজ পড়তাম। তাঁর নামাজ ও খোৎবা ছিলো মধ্যম। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ হাকিম বিন হেযাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জুময়া'র নামাজ দেখেছি। তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো স্বল্প, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ওয়াজ করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবু আব্দুর রহমান, আপনি যদি প্রত্যেক দিন আমাদেরকে ওয়াজ করতেন। তিনি বলেন, আমি এজন্য তা করবো না, আমি চাইনা যে, প্রত্যেক দিন আপনাদেরকে ওয়াজ করে বিরক্ত করি। নবী (সা)ও আমাদের বিরক্তির আশংকায় প্রতিদিন ওয়াজ করতেন না।'

তবে আলোচনায় কবিতা কিংবা হেকমতপূর্ণ কোন ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে। এ মর্মে আলী (রা) বলেন, إِنَّ الْقُلُوْبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْاَبْدَانُ فَابْتَغُوْا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةَ 'শরীরের মতো মনও ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়। তাই এর জন্য বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চুটকি তালাশ কর।'

(চ) পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা : কথার অন্যতম আদব হলো, বক্তার কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা, যেন শ্রোতা তা ভালো করে গ্রহণ করতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম সেরূপ ছিলেন। নবী (সা) যখন কথা বলতেন, তখন যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসতো, তারা এত ভীতি ও গুরুত্বের সাথে তা শুনতেন।

অনুরূপভাবে, নবী (সা)ও তাদের কথা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও উপলব্ধি করতেন।

আবু দাউদ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা)কে কারো সাথে গোপনে কথা বলার সময় কথা না শুনে মাথা মোবারক উপরে তুলতে দেখিনি, যে পর্যন্ত ব্যক্তি নিজে মাথা না তোলেন। আর নবী (সা)কে কারো হাত ধরে ছেড়ে দিতে দেখিনি, যে পর্যন্ত ব্যক্তি নিজে হাত ছাড়িয়ে না নেন।'

(ছ) আলোচনার অন্যতম আদব হলো, আলোচনাকারী উপস্থিত সকল সদস্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কথা বলবেন, যেন তারা মনে করে যে, তাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করে সম্বোধন করা হচ্ছে।

তাবারানী ভালো সনদ সহকারে আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) কথা বলার সময় মন জয় করার লক্ষ্যে কওমের সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলতেন। তিনি কথা বলার সময় আমার প্রতি মুখ করে কথা বলেন। ফলে আমি ধারণা করলাম যে, আমি বোধ হয় কওমের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি উত্তম, না আবু বকর? তিনি বলেন, আবু বকর। আমি আবার প্রশ্ন করি, আমি উত্তম, না ওমার? তিনি বলেন, ওমার। আমি আবারও প্রশ্ন করি, আমি উত্তম, না ওসমান? তিনি বলেন, ওসমান। আমি প্রশ্ন করায় তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন আমার আফসোস হলো-হায়, আমি যদি প্রশ্ন না করতাম!

(জ) কথা বলার সময় ও শেষে মুচকি হাসা : এতে করে শ্রোতারা একঘেঁয়ে বোধ করবে না এবং বিরক্ত হবে না। ইমাম আহমদ উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'আবু দারদা কথা বললে মুচকি হাসতেন। আমি বললাম, না এরূপ করবেন না। লোকেরা কথার সময় আপনার মুচকি হাসি দেখে বোকা বলবে। তখন আবু দারদা বলেন, আমি নবী (সা)কে কথা বলতে বা তাঁর কথা শোনার সময় মুচকি হাসতে দেখেছি। আবু দারদাও যখন কথা বলতেন, নবী করিম (সা)-এর অনুকরণে মুচকি হাসতেন।'

ইমাম মুসলিম সাম্মাক বিন হারব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাবের বিন সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একত্রে বসেছেন? তিনি বলেন, বহুবার। নবী (সা) ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ জায়নামাযে বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পর উঠতেন। তাঁর বসে থাকা অবস্থায় লোকেরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং হাসতেন। নবী (সা) মুচকি হাসতেন।'
কথা বলার এই নিয়মগুলো আমাদের বংশধরকে শিক্ষা দিতে হবে।

৬. হাসি-ঠাট্টার নিয়ম : কোন মুসলমানের জীবনে যদি সত্য ও যথার্থতার সাথে হাস্যরস, ঠাট্টা, মিষ্টি কথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চুটকি যোগ হয়, তাহলে তা কতইনা সুন্দর হয়! আকর্ষণীয় কথা দ্বারা হৃদয় কেড়ে নেয়ার গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম তার ক্ষমাসুন্দর নীতিমালা দ্বারা মানুষকে হাসিমুখ, সুখী, দয়াবান ও উত্তম সামাজিক সদস্যে রূপান্তরিত করতে চায়। ফলে যখন সে মানুষের সাথে মিশবে, লোকেরা তার প্রতি আকর্ষণবোধ করবে এবং তার পাশে জড় হবে। ব্যক্তি গঠন, সমাজ গঠন এবং মানুষকে হেদায়াতের মাধ্যমে ইসলাম এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

এখন আমরা হাসি-ঠাট্টার নিয়মগুলো আলোচনা করবো :

(ক) বেশী বেশী হাসি-ঠাট্টা করা যাবে না : ইমাম বোখারী 'আল আদব আল মোফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ الدَّدُ مِنِّى 'আমি বেহুদা গাল-গল্প ও তামাশাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই এবং না ওই দু'টো আমার কাছ থেকে হয়।'

কেননা, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা মানুষকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাকে আল্লাহর ইবাদত, যমীনে আল্লাহর হুকুম কায়েম এবং নেক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। নবুওতের পাঠশালার ছাত্র-সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করতেন। কিন্তু যখন যথার্থ ভূমিকা পালনের সময় উপস্থিত হতো, তখন তাঁরা ছিলেন বীর পুরুষ। সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঠাট্টা করে তরমুজ নিক্ষেপ করতেন। অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা দ্বারা অন্তর মরে যায়, শত্রুতা সৃষ্টি হয়, ছোটরা বড়দের সাথে দুঃসাহস দেখায়। তাই ওমার (রা) বলেন, 'যে বেশী হাসে তার সম্পর্কে লোকদের ভীতি কমে যায়। আর যে ঠাট্টা করে, লোকেরা তাকে হেয় মনে করে।'

(খ) ঠাট্টার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না : আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-বন্ধুদের মধ্যে কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং খাট না করার শর্তে হাসি-ঠাট্টা জায়েয। কষ্টদায়ক হাসি-ঠাট্টা না করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নবী (সা)-এর কিছু নির্দেশ হলো :

* আবু দাউদ ও তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন সায়েব, তাঁর পিতা ও দাদার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সা)কে বলতে শুনেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন হাসি-ঠাট্টাবশত কিংবা হাসি-ঠাট্টা ছাড়া নিজ ভাইয়ের মাল-সামানা না নেয়। কেউ নিজ ভাইয়ের লাঠি নিয়ে তা যেন ফেরত দেয়।'

* আবু দাউদ আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চলতেন। পথে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো। অন্য এক ব্যক্তি রশি নিয়ে তার কাছে গেলো। সে ভয়ে চমকে উঠলো। নবী (সা) বলেন, 'কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা জায়েয নেই।'

* খন্দকের যুদ্ধের দিন যায়েদ বিন সাবেত (রা) অন্যান্য মুসলমানের সাথে মাটি বহন করেন এবং এক পর্যায়ে তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন আম্মারা বিন হাযম তাঁর অস্ত্র তুলে নেন। তিনি টের পাননি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এটা করতে নিষেধ করেন।

* বাজ্জার, তাবারানী ও ইবনে হিব্বান আ'মের বিন রবীয়া'হ থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জুতো ঠাট্টা করে লুকিয়ে ফেললো। নবী (সা) এর কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করায় তিনি বলেন, لا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ,فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না। কেননা মুসলমানকে ভয় দেখানো বিরাট জুলুম।'

এ সকল নির্দেশের আলোকে যে ব্যক্তি কাউকে গীবত, হেয় করা ও ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করার জন্য ঠাট্টা করে, তার অবস্থা কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে?

(গ) মিথ্যা ঠাট্টা এড়িয়ে চলা : বহু লোক বৈঠকে মিথ্যা ও হাস্যকর গাল-গল্প করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের মনে আনন্দ-ফূর্তি দান করা এবং তাদেরকে হাসানো। নিঃসন্দেহে বানোয়াট গল্প মিথ্যার শামিল। ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় নিতে নিষেধ করেছে। এ জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে নবী করিম (সা) আজাব-গজবের হুমকি দিয়েছেন।

আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও বায়হাকী বোহজ বিন হাকিম, তিনি তাঁর পিতা ও দাদার বরাতে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ 'সে ব্যক্তির ধ্বংস, যে লোকদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে; তার ধ্বংস,তার ধ্বংস।'

আহমদ ও আবু দাউদ নাওয়াস বিন সাময়া'ন থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এটা জঘন্য খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাইকে যে কথা বলছো, সে তা সত্য মনে করছে, অথচ তুমি মিথ্যা বলছো।'

আহমদ ও তাবারানী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন লোক সে পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে হাসি-ঠাট্টায় এবং ঝগড়া-বিবাদে মিথ্যা ত্যাগ না করে, যদিও সে সত্যবাদী হয়।'

আমাদের সমাজে বিভিন্ন মিথ্যা এবং পাশ্চাত্যের 'এপ্রিল ফুল'-এর নোংরামী অন্ধ অনুকরণ চলছে। এগুলো মারাত্মক বেদআত ও নিন্দনীয় এবং হারাম ঠাট্টা ও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নবী করিম (সা) প্রত্যেক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তিনি তাদের সাথে যে ধরনের হাসি-ঠাট্টা করেছেন সেগুলোর ধরন হলো :

তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। যাহের নামক এক গ্রামীণ লোক

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য উপহার পাঠাতেন। সে যখন পুনরায় ফিরে যাবার ইচ্ছে করতো, নবী (সা) তাকে সব কিছু প্রস্তুত করে দিতেন। নবী (সা) ঠাট্টা করে বলেন, 'যাহের আমাদের গ্রাম আর আমরা তার শহর।' নবী (সা) তাকে ভালোবাসতেন। সে ছিলো খাট, দেখতে তেমন সুন্দর ছিলো না। সে যখন পণ্যদ্রব্য বিক্রি করছে, তখন নবী (সা) তার কাছে আসেন এবং পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। সে তাঁকে দেখতে পায়নি। যাহের বললো, কে? আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর মোড় ফিরে সে নবী (সা)কে দেখলো। এবার সে নবী (সা) বুকের সাথে নিজের পিঠ আরো বেশী ঠেকিয়ে দিতে কার্পণ্য করলো না। নবী বলেন, কে এই দাসকে কিনবে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমাকে কিনে লোকসান হবে। তখন নবী (সা) বলেন, তুমি আল্লাহর কাছে লোকসানজনক নও অথবা তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর কাছে মূল্যবান।

আবু দাউদ আওফ বিন মালেক আশজাঈ' থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসি। তিনি তখন চামড়ার ছোট একটি তাঁবুতে। আমি সালাম দিলে তিনি জবাব দেন। তারপর বলেন, প্রবেশ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সমস্ত শরীর? তিনি বলেন, তোমার সমস্ত শরীর। তারপর আমি প্রবেশ করি।

তিরমিযী ও আহমদ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'এক লোক নবী (সা)-এর কাছে এসে সওয়ারী চাইলো। তিনি বলেন, আমি তোমাকে উষ্ট্রীর একটি বাচ্চা দেবো। সে এটা ছোট পশু মনে করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি উষ্ট্রীর ছোট বাচ্চা দিয়ে কী করবো? তিনি জবাবে বলেন, সকল উটইতো উষ্ট্রীর বাচ্চা। ইবনু বাককার যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। এক মহিলার নাম ছিলো, নিগ্রো উম্মে আইমান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আমার স্বামী আপনাকে ডাকে। তিনি প্রশ্ন করেন, সে কে? সে কি ওই ব্যক্তি, যার চোখে শুভ্রতা আছে? মহিলাটি বললো, তার চোখে কোন শুভ্রতা নেই। তিনি বলেন হাঁ, তার চোখে শুভ্রতা আছে। মহিলা বললো, আল্লাহর কসম, নেই। নবী (সা) বলেন, এমন কোন লোক আছে কি, যার চোখে শুভ্রতা নেই? তিনি এর দ্বারা চক্ষু কুণ্ডলির চারপাশের শুভ্রতা বুঝিয়েছেন।

তিরমিযী হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন। এক বৃদ্ধা নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে বেহেশেতে প্রবেশ করান। তিনি বলেন, হে অমুকের মা, বেহেশতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে

ইমাম গাজালী (র) বলেন, বিনয় ও শোনা ছাড়া এলম অর্জন করা যায় না।

(২) ছাত্রকে মনে করতে হবে শিক্ষক যোগ্য ও মর্যাদাবান : এতে করে ছাত্র বেশী উপকৃত হতে পারবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, আমি আমার শিক্ষক ইমাম মালেকের সামনে তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এত আস্তে কাগজ ভাঁজ করতাম যেন তা পড়ে শব্দ না হয়।

প্রখ্যাত আলেম আর-রোবাই' বলেন, আল্লাহর কসম ইমাম শাফেঈ'র সম্মানের ভয়ে, তিনি দেখে ফেলতে পারেন, এ কারণে আমি তাঁর সামনে পানি পান করিনি।

একবার খলীফা মাহদির এক ছেলে প্রসিদ্ধ আলেম শোরাইকের কাছে যায় এবং একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে হাদিস জিজ্ঞেস করে। শোরাইক তাতে কর্ণপাত করেননি। তারপর ছেলেটি পুনরায় শোরাইককে প্রশ্ন করায় তিনি আগের মতোই ভ্রূক্ষেপ করেননি। ছেলেটি বললো, খলীফার ছেলের প্রতি এই অবহেলা? শোরাইক বললো, তা নয়, তবে আমি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান এলম নষ্ট করতে পারি না। ছেলেটি শিক্ষার মজলিসে হেলান দিয়ে বেআদবের মতো বসায় তিনি তার প্রতি গুরুত্ব দেননি।

শিক্ষককে 'তুমি' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে 'ওস্তাজ' 'শিক্ষক' বা 'সাইয়েদ' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা ভালো। এমনকি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও তার নাম ধরে আলোচনা করা ঠিক নয়। বরং এরূপ বলা উত্তম যে, আমাদের মহান শিক্ষক বা মোরশেদ এই বলেছেন।

(৩) ছাত্রের কর্তব্য শিক্ষকের অধিকার বা মর্যাদা না ভুলা : প্রখ্যাত আলেম শো'বা বলেন, আমি যদি কারো কাছে হাদিস শুনতাম, তিনি যতদিন জীবিত থাকতেন, আমি তার গোলাম হয়ে যেতাম। তিনি আরও বলেন, আমি কারো কাছে জ্ঞানের কোন কথা শুনলে, তার খেদমতের জন্য এর চাইতে আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠতাম।

মিসরের আরব কবি সম্রাট শওকী বলেন,

قُمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجِيْلَا – كَادَ الْمُعَلِّمُ اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلًا

اَعَلِمْتَ اَشْرَفَ اَوْ اَجَلَّ مِنَ الَّذِىْ – يَبْنِىْ وَيُنْشِىءُ اَنْفُسًا وَّعُقُوْلًا ؟

'শিক্ষকের সম্মনার্থে দাঁড়াও এবং তাঁর মর্যাদা পূর্ণ কর, শিক্ষকতো প্রায় রাসূল হবার কাছাকাছি। তুমি কি তার অপেক্ষা বেশী সম্মান ও মর্যাদাবান কাউকে জান, যিনি আত্মা ও বিবেককে গঠন ও তৈরী করেন?'

ছাত্রকে আজীবন শিক্ষকের জন্য দোয়া করতে হবে। তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে, তাঁর কবর জেয়ারত ও এস্তেগফার করবে, সুযোগ পেলে দান-সদকা করবে, এলেম, দ্বীনদারী ও চাল-চলনে তাঁর চরিত্রকে অনুসরণ করবে এবং তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবে চলবে।

(৪) শিক্ষকের খারাপ আচরণ ও কঠোরতার মোকাবিলায় ছাত্রের ধৈর্যধারণ : শিক্ষকের খারাপ আচরণ কিংবা কঠোরতা সত্ত্বেও ছাত্র যেন শিক্ষকের সান্নিধ্য ত্যাগ না করে এবং উপকার বঞ্চিত না হয়। শিক্ষক রাগ করলে ছাত্রের উচিৎ হবে, তার কাছে অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়া। এর ফলে শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্রের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হবে। যে ছাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্যধারণ করবে না, তাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যে ছাত্রকে খাটো করেছি তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়াকে জোরদার করেছি।'

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলা হলো, আপনার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে, আপনি তাদের উপর রাগ করেন। হতে পারে তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। তিনি বলেন, তারা বোকা, আমার মন্দ আচরণের কারণে চলে গেলে তাদের কোন উপকার হবে না।

(৫) শিক্ষকের কাছে ছাত্রের আদবের সাথে বসা : ছাত্রকে শিক্ষকের সামনে শান্ত, নিরিবিলি, বিনয় ও সম্মানের সাথে বসতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, ডানে-বামে না তাকিয়ে শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ছাত্রকে ইজ্জত-সম্মান ও আদব-শিষ্টাচার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাইরের কোন শব্দ বা গোলযোগের প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে শিক্ষকের কথার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। নিজের কাপড়-চোপড় কিংবা অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিনা প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকা যাবে না, আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে বা কোন কিছুতে লেখা যাবে না, কিংবা আঙ্গুল ফুটানো, বিনা প্রয়োজনে কথা বলা এবং বন্ধুর সাথে জোরে হাসা যাবে না। বড়জোর মুচকি হাসবে। বিনা প্রয়োজনে গলা খা খা ও থুথু ফেলা পরিহার করতে হবে। নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে টিস্যু পেপার ব্যবহার করবে। হাঁচি আসলে ছোট আওয়াজ সহকারে হাঁচি দেবে, হাই তুললে মুখ বন্ধ রাখবে।

এ ব্যাপারে আলী (রা) এর উপদেশ খুবই উপকারী। তিনি বলেন, শিক্ষকের অধিকার হলো, কওমের লোকদেরকে সাধারণভাবে সালাম দেয়ার পর শিক্ষককে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাবে, তাঁর সামনে বসবে, হাত দিয়ে কোন কিছুর প্রতি ইশারা করবে না, অন্যকে চোখের ইশারায় কিছু বলবেনা। তাঁর মতের বিপরীতে এ কথা বলবে না যে, 'অমুক একথা বলেন, 'তাঁর কাছে কারো গীবত করবে না, তাঁর ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না, ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে সম্মান করবে, তার কোন প্রয়োজন থাকলে অন্যদের আগে তা পূরণের চেষ্টা করবে, তাঁর মজলিসে কারো সাথে গোপনে কথা বলবে না, তাঁর কাপড় ধরবে না, তাঁর অলসতা দেখলে খারাপ মনোভাব প্রকাশ করবে না, তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য লাভে বিরক্ত হবে না, বরং তাঁকে খেজুর গাছ মনে করে অপেক্ষা করতে হবে, খেজুর কখন ঝরে পড়ে।'

(৬) শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা : ক্লাশ, ঘর কিংবা শিক্ষার নির্দিষ্ট জায়গায় শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা উচিৎ। অনুমতি না দিলে ফেরৎ আসা উচিৎ। তিনবারের বেশী অনুমতি চাওয়া ঠিক নয় এবং আদবের সাথে আস্তে দরজায় আওয়াজ দিতে হবে।

শিক্ষকের কাছে ভালো আকার-আকৃতি, পোশাক-আশাক এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করবে। কেননা এলেমের মজলিসকে জিকর ও ইবাদতের মজলিস বলা হয়। শিক্ষকের কাছে খোলা ও মুক্ত মনে প্রবেশ করবে, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী সহকারে নয়। যাতে শিক্ষক যা বলে তা ভালোভাবে শুনতে পারে এবং বক্ষ প্রশস্ত হয়। শিক্ষককে না পেলে অপেক্ষা করতে হবে। তা না হয়, ওই ক্লাস থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষকের ঘরে গিয়ে তাঁকে বের করে আনার জন্য দরজায় আওয়াজ দেবে না এবং ঘুমে থাকলে জাগাবে না। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে, যেন তিনি ঘুম থেকে জেগে শিক্ষা দিতে আসেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি এলেমের জন্য জায়েদ বিন সাবিতের দরজায় গিয়ে বসে থাকতেন, যে পর্যন্ত না তিনি ঘুম থেকে জাগেন। তাঁকে বলা হলো, আমরা কি তাঁকে আপনার জন্য জাগাবো? ইবনে আব্বাস বলেন, না। হতে পারে তিনি দীর্ঘ সময় রাত জাগরণ করেছেন কিংবা রোদে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ হচ্ছে আমাদের নেক পূর্বসূরীদের চরিত্র।

(৭) শিক্ষক কোন হুকুমের প্রমাণ পেশ করলে, কোন অদ্ভুত ফায়দা উল্লেখ

করলে, কোন ঘটনা বা কবিতা আবৃত্তি করলে, ছাত্রকে তা ভালো করে শুনতে হবে এবং জ্ঞান পিপাসা মিটাতে হবে।

আ'তা বলেন, 'আমি কারো কাছে হাদিছ শুনলে তাকে বোঝাতাম যে, তা ভালো করে জানিনা। অথচ, আমি তা আরো ভালোভাবে জানি।'

তিনি আরো বলেন, 'কোন যুবক যখন হাদিস বর্ণনা করে, আমি এমনভাবে শুনি যেন তা আমি আগে শুনিনি। অথচ, তা আমি তার জন্মের আগে শুনেছি।'

জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিক নয় এবং যা বুঝে তা বোঝার জন্যও প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। এতে সময় নষ্ট হয়। হয়তো শিক্ষকের জন্য এটা বোঝা মনে হতে পারে।

যোহরী বলেন, 'হাদিস পুনরায় বর্ণনা করা পাথর অপেক্ষা ভারী মনে হয়।'

শিক্ষকের অধিকার পূরণের জন্য ছাত্রকে এভাবে মানসিকভাবে তৈরী করতে হবে।

হাবীব বিন শহীদ নিজ ছেলেকে বলেন, 'হে বেটা, আলেম ও ফেকাহবিদদের কাছে যাও, শেখো এবং আদব গ্রহণ করো। আমার কাছে এটা অনেক হাদিস অপেক্ষা পছন্দনীয়।'

মোখাল্লাদ বিন হোসেন ইবনে মোবারককে বলেন, 'আমরা অধিক হাদিস অপেক্ষা অধিক আদবের মুখাপেক্ষী।'

এক নেক পূর্বসূরী বলেছেন, হে বেটা, আদবের একটি অধ্যায় শেখা অন্য এলেমের ৭০টি অধ্যায় শেখা অপেক্ষা উত্তম।

সুফিয়ান বিন উমাইয়াহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হলেন সর্ববৃহৎ মাপকাঠি। তাঁর চরিত্র, জীবনী ও আচরণের উপর রেখে বিভিন্ন জিনিসকে পরিমাপ করতে হবে, যা এর সাথে মিলে যায়, তা সত্য। আর যা মিলে না তা বাতিল।

ইবনে শিরীন বলেন, তাঁরা নবী (সা) এবং সলফে সালেহীনের (নেক উত্তরসূরী) চরিত্র শিখতেন, যেমন এলেম শিখে থাকেন।

এগুলো হলো সব ভালো, নেক, ঈমানদার ও দ্বীনদার শিক্ষকের আদব। কিন্তু নাস্তিক ও বেদ্বীন শিক্ষকের জন্য এ সকল আদব প্রযোজ্য নয়। বরং তারা উল্টো কিছু বললে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; ফলে সত্যের অস্ত্র মিথ্যার মগজ চূর্ণ-বিচূর্ণ

করে দেয়, পরে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছো, সেজন্য তোমাদের ধ্বংস।' (সূরা আম্বিয়া–১৮)

সন্তান গঠনকারীকে নাস্তিক শিক্ষকের সামনে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিবাদ করতে হবে। সন্তানের মনে ইসলামের মূলনীতি গ্রথিত করতে হবে এবং বাতিলপন্থীদের ইসলাম বিরোধিতার জবাব দিতে হবে। সত্যকে অসত্য থেকে পার্থক্য করার হিম্মত ও সাহস প্রদর্শন করতে হবে।

শিক্ষকের অনুসরণ ছাত্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য :

পবিত্র কোরআন মাজীদে সূরা কাহাফে নবী মূসা (আ) ও খিজির (আ) এর কাহিনী বর্ননা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "মূসা তাকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি, যে সত্য পথের জ্ঞান আপনাকে শিখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? খিজির বলেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। যে বিষয় বুঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কিভাবে? মূসা (আ) বলেন, আল্লাহ চানতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। খিজির বলেন, যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।" (সূরা কাহাফ : ৬৫-৭০)

এ আয়াতে দেখা যায়, মূসা (আ) একজন নবী ও শীর্ষ স্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও খিজির (আ) এর কাছে সবিনয় অনুরোধ করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এদিকে খিজির (আ) এর নবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, ছাত্র শ্রেষ্ঠ হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞান অর্জনের আদব।

মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। তাই তাঁকে 'কালিমুল্লাহ' বলা হয়। এটা তাঁর বিশেষ মর্যাদা। মূসা (আ)-এর উম্মত ছিল। খিজির (আ)-এর উম্মত নেই।

ঙ. বন্ধুর অধিকার :

সন্তান গঠনকারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, সন্তানের নেক বন্ধু নির্বাচন। সন্তানের ভাল-মন্দ এর উপর অনেকটা নির্ভর করে। এটা একটা সত্য প্রবাদ, 'বন্ধু এমন এক ব্যক্তি যে টেনে নেয়।' আর নিম্নের প্রবাদটিও সত্য : 'আমি কে

তা জিজ্ঞেস না করে, আমার বন্ধু কে, তা জিজ্ঞেস করলে আমার পরিচয় পাওয়া যাবে।' একথা কবিও বলেছেন, ইংরেজিতে বলা হয়- A man is known by a company he keeps.

নবী করিম (সা) উত্তম ও নেক বন্ধু এবং খারাপ বন্ধুর উদাহরণ পেশ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "ভাল ও মন্দ সাথীর উদাহরণ হলো, মেশক-আতর বহনকারী ও কামারের হাঁপর। মেশক-আতর বহনকারী আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে কিংবা আপনি তার থেকে তা কিনতে পারেন, কমপক্ষে আপনি এর সুঘ্রাণ পেতে পারেন। পক্ষান্তরে, কামারের হাঁপর, হয় আপনার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, নচেত সেখানে আপনি দুর্গন্ধ ছাড়া কিছুই পাবেন না।"

আবু দাউদ ও তিরমিযী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ "মোমেন ছাড়া কাউকে সাথী বানিওনা এবং নেককার-পরহেযগার ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।"

তিরমিযী ও আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। তাই তোমাদের দেখা দরকার কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।'

কিশোর-তরুণের জন্য একদল ভালো বন্ধু জোগাড় কার জরুরী। সে তাদের সাথে মিশবে, খেলবে, লেখা-পড়া করবে, পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে, অসুস্থ হলে সেবা করবে, পরীক্ষায় পাশ করলে উপহার দেবে, ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে এবং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সামাজিকতার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য তাকে ভালো, নেক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে।

এখন আমরা বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১. দেখা হলে সালাম দেয়া : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন, মানুষকে খাবার খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেবে।'

মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা ঈমান ব্যতিত বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং ভালোবাসা ছাড়া ঈমান

আসবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না, কিসে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সালামের প্রসার ঘটাও।'

২. অসুখ হলে সেবা করা : ইমাম বোখারী আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'রোগীর সেবা কর, ক্ষুধার্তকে আহার দাও এবং দাস মুক্ত করো।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের অধিকার পাঁচটি : সালামের উত্তর দেয়া, রোগীর সেবা করা, যানাযার নামাজ পড়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া।'

৩. হাঁচির জবাব দেয়া : ইমাম বোখারী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ, فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 'তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। যে শুনে সে যেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। এর জবাবে বলতে হবে 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।'

৪. আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করা : ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে রোগী দেখতে যায় কিংবা দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, একজন আওয়াজদানকারী এই বলে আওয়াজ দেয় : 'তোমার কল্যাণ হোক, তোমার চলাফেরা কল্যাণকর হোক, তুমি জান্নাতে একটি বাড়িতে বাসস্থান বানালে।'

মুসলিম শরীফে নবী করিম (সা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। 'এক লোক অন্য গ্রামে এক দ্বীনি ভাইকে দেখতে গেলো। আল্লাহ রাস্তায় এক ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি ফেরেশতার কাছে আসলো। ফেরেশতা তার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলো। লোকটি বললো, আমি এই গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করছি। ফেরেশতা প্রশ্ন করলো, তার কাছে তোমার কোন চাওয়া পাওয়া আছে? লোকটি বললো, না। আমি তাকে কেবল আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যেই ভালোবাসি। ফেরেশতা বললো, আমি তোমার কাছে প্রেরিত আল্লাহর দূত। তুমি তাকে যেরূপ ভালোবাস, আল্লাহও তোমাকে সেরূপ ভালোবাসেন।'

৫. বিপদের সময় সাহায্য করা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, কেউ কারো উপর জুলুম কিংবা কাউকে অপমান করতে পারে না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার একটা বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখবেন।'

৬. দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি অধিকার আছে। ১. সালামের জবাব দেয়া ২. রোগী দেখা ও সেবা করা ৩. জানাযায় অংশগ্রহণ করা ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচির জবাব দেয়া।'

৭. প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো : সুনামে দাইলামীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, مَنْ لَقِىَ اَخَاهُ عِنْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الْجُمْعَةِ فَلْيَقُلْ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'জুমার নামাজ শেষে ফেরার পথে কোন ভাইয়ের সাথে দেখা হলে সে যেন বলে : 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের নামাজ কবুল করুন।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। তাওবা কবুল হওয়ায় তালহা (রা) কা'ব বিন মালেককে অভিনন্দন জানান।

৮. বিভিন্ন মওসুমে উপহার দেয়া : তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। تَهَادَوْا تَحَابُّوْا 'উপহার দাও, ভালোবাসা বাড়বে।'

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَهَادَيْنَ وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ فَاِنَّهُ يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ 'হে মোমেন মহিলাগণ, বকরীর খুর হলেও উপহার দাও। তা ভালোবাসা বাড়ায় ও বিদ্বেষ দূর করে।'

সুনানে দাইলামীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْهَدَايَا فَاِنَّهَا تُوْرِثُ الْمَوَدَّةَ وَ تُذْهِبُ بِالضَّغَائِنِ 'তোমাদের উপহার দেয়া কর্তব্য। তা ভালোবাসা জন্মায় ও বিদ্বেষ দূর করে।'

ইমাম মালেক মোয়াত্তায় একটি হাদিস বর্ণনা করেন। تَصَافَحُوْا يُذْهِبُ الْغِلَّ وَ

تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتُذْهِبُ الشَّحْنَاءَ 'হাত মেলাও, তা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবে; উপহার দাও, তা ভালোবাসা বাড়ায় ও শত্রুতা দূর করে।'

স্থায়ী বন্ধু বা সাথীর অধিকারের আওতায় অস্থায়ী বন্ধুর অধিকারও স্বীকৃত। যেমন, সফরসঙ্গী, লেখা-পড়ার সাথী ও চাকুরীর সহকর্মী। কোরআন এটাকে وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হিসেবে উল্লেখ করেছ। এ অস্থায়ী বন্ধুর প্রতিও যাবতীয় আদর-সোহাগ, সেবা-যত্ন, ইজ্জত-সম্মান, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, ত্যাগ-কোরবানী এবং নমনীয়তা ও কোমলতা প্রদর্শন করতে হবে। নবী করিম (সা) সকল অবস্থায় স্থায়ী ও অস্থায়ী সাথীদের প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সফরের সাথীর অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকতেন।

তাবারীতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। 'রাসূলুল্লাহ (সা) এক সাথীসহ পৃথক দুই সওয়ারীতে করে যাচ্ছিলেন।

তিনি কয়েকটা গাছের ভেতর গেলেন এবং দু'টো ডাল কাটলেন। একটি ডাল বাঁকা। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা ডালটি সাথীকে দেন। সাথী বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমি ওইটার যোগ্য। তিনি জবাবে বলেন, কখনো না।

প্রত্যেক সাথীর ব্যাপারে অন্য সাথী দায়িত্বশীল, যদি তা দিনের এক ঘণ্টার জন্যও হয়।'

চ. **বড়দের অধিকার** : প্রশ্ন হলো, বড় কে? উত্তর হলো, যে বয়সে বড়, জ্ঞানে-গুণে বড়, তাকওয়া ও পরহেজগারীতে বড় এবং মান ও সম্মানের দিক দিয়ে বড়। তারা যদি নিজ দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক হয় এবং শরীয়তকে ইজ্জত সম্মানের কারণ মনে করে, লোকদের উচিৎ, তাদের সম্মান করা ও তাদের হক আদায় করা। তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'যে যুবক বয়স বেশী হওয়ায় কোন বৃদ্ধকে সম্মান করে, আল্লাহও তার বৃদ্ধ বয়সে তাকে সম্মান করার লোক প্রস্তুত করবেন।'

আবু দাউদ ও তিরমিযী আমর বিন শোয়া'ইব থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। 'সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদেরকে দয়া-স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার জানে না।'

আবু দাউদ শরীফে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহর মহত্ত্ব হলো, বৃদ্ধ লোক, কোরআনের নিরহংকার বাহক যিনি তা ত্যাগ করেন না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা।'

আবু দাউদ মাইমুন বিন আবি শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) এর কাছে এক ভিক্ষুক এলে তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দেন। আরেকজন ভদ্র প্রকৃতির লোক আসলো। যার পরনে ভালো কাপড় ছিলো। তিনি তাকে বসান এবং আপ্যায়ন করেন। তাঁকে এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ 'লোকদেরকে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দাও।' অন্য বর্ণনায় আছে, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন লোকদের যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দেই।'

মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি স্বপ্নে নিজেকে মেসওয়াক করতে দেখেছি। দু ব্যক্তি আমার কাছে আসলো। একজন অন্যজন থেকে বড়। আমি ছোট ব্যক্তিটিকে মেসওয়াক দিলাম। আমাকে বলা হলো, বড়কে দিন। পরে আমি তা নিয়ে বড়কে দিলাম।'

এসকল হাদিস থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারলাম−

(১) বড়কে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া : এর আওতায় তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা, মজলিসে সকলের আগে তাদেরকে বসতে দেয়া এবং আগে মেহমানদারী করা শামিল। বয়স্কদেরকে সম্মান করার বিষয়ে মোসনাদে ইমাম আহমদে শিহাব বিন আব'বাদ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের একজনকে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমরা যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে পৌঁছলাম, তাঁরা আমাদেরকে জায়গা করে দিলেন, আমরা বসলাম। নবী করিম (সা) আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন, দোয়া করলেন এবং আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নেতা কে? আমরা সকলে মোনযের বিন আয়েযকে দেখিয়ে দিলাম। মোনযের তাঁর কাছ গেলে সকলে জায়গা করে দিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে নিজের ডান পাশে বসান, অভিনন্দন জানান ও এলাকার খোঁজ-খবর নেন।.....

হাদিসের অনুসারীরা জানেন, সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং পরে তাঁর ডানের লোকের মেহমানদারী করতেন। এটাই পরে সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ।

(২) সকল বিষয়ে বড়দের থেকে শুরু করা : নামাজের জামায়াতে ছোটদের আগে বড়দেরকে এবং কথা ও লেন-দেন এবং কাজ কারবারের সময় আগে বড়দের

সাথে শুরু করতে হবে। মুসলিম শরীফে আবু মাসউদ থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) নামাজের কাতারে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, কাতার সোজা কর, মাঝে ফাঁক রাখবেনা, তাহলে তোমাদের পরস্পরের অন্তরে ফাঁক বা দূরত্ব সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী-গুণী (অবশ্যই বড়) তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে, এরপর অন্যরা, এরপর অন্যরা দাঁড়াবে।'

আবু ইয়াহইয়া আনসারী থেকে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ বিন সহল ও মোহাইয়াছা বিন মাসুদ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর খায়বার যান এবং উভয়ে পৃথক হয়ে পড়েন। মোহাইয়াছা পরে আব্দুল্লাহর কাছে ফিরে এসে দেখেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে তিনি মদিনায় আসেন। আব্দুর রহমান বিন সহল এবং মাসউদের দুই ছেলে মোহাইয়াছা ও হোয়াইয়াছা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, বয়স্ক লোককে আগে কথা বলতে দাও। আব্দুর রহমান ছিলেন অপেক্ষাকৃত ছোট।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা বয়স্ক লোকদের সম্মান ও অগ্রাধিকার বোঝা যায়।

(৩) বড়দের মর্যাদা খাটো করে দেখার বিরুদ্ধে ছোটদেরকে সতর্ক করতে হবে : ছোটরা যেন বড়দেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, মন্দ কথা না বলে, তাদের সামনে বেআদবী না করে কিংবা তাদেরকে ধমক না দেয়। এ মর্মে তাবারানী 'আল কাবীর' গ্রন্থে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তিন ধরনের ব্যক্তিকে মুনাফিক ছাড়া কেউ হেয় করতে পারে না। বৃদ্ধ মুসলিম, আলেম ও ন্যায় পরায়ণ শাসক।'

এজন্য সন্তান গঠনকারীদের উচিৎ, সন্তানদেরকে ভালো চারিত্রিক গুণাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। সেগুলো হলো :

১. **লজ্জা** : এটা এমন এক চারিত্রিক গুণ যা মন্দ কাজ ত্যাগ করা, বড়দের অধিকার পূরণে ত্রুটি প্রতিরোধ এবং প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

বোখারী ও মুসলিমে এমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে। 'লজ্জার সকল অংশেই কল্যাণ।'

তাবারানী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়েশা, 'লজ্জা যদি লোক হতো, তাহলে নেককার হতো। আর অশ্লীলতা যদি লোক হতো, তাহলে মন্দ লোক হতো।'

তিরিমিযী ও ইবনে মাজাহ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا كَانَ الْفَحْشُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِى شَيْئٍ اِلَّا زَانَهُ 'কোন কাজে অশ্লীলতা থাকলে তা মন্দ হয়, আর লজ্জা থাকলে সুন্দর হয়।'

মালেক ও ইবনে মাজাহ যায়েদ বিন তালহা বিন রাকানা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ 'প্রত্যেক ধর্মের চরিত্র আছে। ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ 'লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সকল নির্দেশনার ফলে সাহাবায়ে কেরামের সন্তানগণ উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন এবং বড়দের সামনে তারা এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা)-এর আমলে যুবক ছিলাম এবং তাঁর বাণী মুখস্থ করতাম। কিন্তু আমার চাইতে বয়সে বড় লোকদের উপস্থিতির কারণে আমি লজ্জায় তা বলতাম না।'

২. **আগন্তুকের জন্য দাঁড়ানো** : মেহমান, মুসাফির, আলেম ও বয়সে বড় লোকদের জন্য দাঁড়ানো মহান সামাজিক আদব। সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেয়া দরকার। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলো রয়েছে :

(ক) বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশা (রা) থেকে বর্ননা করেন, 'আমি ওঠা-বসায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতেমা অপেক্ষা তাঁর পদ্ধতি, পথ ও চরিত্র অনুসরণের বিষয়ে অনুরূপ অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখতে পাইনি। তিনি যখন নবী (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন, নবী (সা) উঠে তঁকে চুমু খেতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন। আর তিনি যখন ফাতেমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন ফাতেমা বসা থেকে উঠতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন।'

(খ) নাসাঈ ও আবু দাউদ আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'নবী (সা) আমাদের সাথে কথা বলতেন। তারপর তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম এবং দেখতাম, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে ঢুকেছেন।'

(গ) আবু দাউদ ওমার বিন সায়েদ থেকে বর্ণনা করেন। 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা)

বসা ছিলেন। তখন তাঁর দুধ পিতা আসলো। নবী (সা) একটা কাপড় বিছিয়ে দিলে তিনি তাতে বসেন। তারপর তাঁর দুধ মা আসলো। তিনি কাপড়ের অন্য অংশ ছিঁড়ে তা বিছিয়ে দিলে তিনিও তাতে বসেন। এরপর তার দুধ ভাই আসলো। তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকে নিজের সামনে বসালেন।'

এ হাদিসে দুধ ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর কথা আছে।

(ঘ) বোখারী ও মুসলিম সা'দ বিন মায়া'জ থেকে বর্ণনা করেন। সা'দ যখন মসজিদের নিকটবর্তী হলেন, নবী (সা) আনসারদেরকে বললেন, قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَو خَيْرِكُمْ 'তোমরা তোমাদের সর্দার কিংবা উত্তম ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়াও।'

(ঙ) বোখারী ও মুসলিম শরীফে বিশুদ্ধ হাদিসে কা'ব বিন মালেক তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণ নিজ জবানীতে বর্ণনা করেন। তাতেও সম্মানের জন্য দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। লোকেরা দলে দলে আমাকে তওবা কবুলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বললো, 'আল্লাহ তোমার তাওবাহ' কবুল করেছেন। আমি মসজিদে নবওয়ীতে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারপাশে ছিলেন লোকজন। তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে যান এবং আমার সাথে দ্রুত মোসাফাহা করেন ও অভিনন্দন জানান।'

এ সকল হাদিস ও বর্ণনা থেকে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আলেম ও গুণী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো জায়েয।

নবী করিম (সা) যে ধরনের ওঠা ও সম্মান জানানো নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলো হলো : যে ব্যক্তি চায় যে তার প্রতি ওঠে সম্মান জানানো হোক কিংবা বিশেষ ধরনের ওঠা ও সম্মান প্রদর্শন যাতে অহংকার রয়েছে অথবা অনারবদের সম্মান প্রদর্শনের বিশেষ পদ্ধতি। যেমন, যাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে তাকে ইজ্জত-সম্মানের সাথে বসিয়ে দিতে হবে, আর লোকেরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ইত্যাদি।

৩. বড়দের হাতে চুমু খাওয়া : সন্তানদেরকে এই আদবটি শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে, ছোটদের মনে বড়দেরকে সম্মান করার মানসিকতা তৈরী হবে। এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং ইমামদের ইজতিহাদের প্রমাণ রয়েছে ।

(ক) মোসনাদে আহমদ এবং বোখারীর 'আল আদাব আল সাগীর ' গ্রন্থে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের সদস্য যারে' বলেন, 'আমরা মদিনায় এসে সওয়ারী থেকে দ্রুত নামলাম এবং নবী করিম (সা) এর হাত ও পায়ে চুমু খেলাম।'

(খ) বোখারী 'আদাবুল মোফরাদ' গ্রন্থে ওয়াজে' বিন আমের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা মদিনায় আসলাম। নবী (সা)কে একথা জানানো হলো। এরপর আমরা তাঁর হাত ও পা ধরে চুমু খেলাম।

(গ) ইবনে আসাকের আবু আম্মার থেকে বর্ণনা করেন। যায়েদ বিন সাবেত (রা) এর জন্য একটা সওয়ারী আনা হলো। ইবনু আব্বাস এর পাদানী ধরেন। যায়েদ বিন সাবেত বলেন, হে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাত ভাই, সরে যান। ইবনু আব্বাস বলেন, আমাদেরকে এভাবে বয়সে বড় ও আলেমদের সাথে আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যায়েদ বিন সাবেত বলেন, আমাকে আপনার হাতটা দেখান। ইবনে আব্বাস হাত বের করলে যায়েদ তাতে চুমু খান এবং বলেন, নবী পরিবারের সাথে আমাদেরকে এরূপ করার হুকুম দেয়া হয়েছে ।

(ঘ) বোখারী আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে সোহায়ব থেকে বর্ণনা করেন। আমি আলী (রা)কে দেখেছি, তিনি আব্বাস (রা) এর হাত ও পায়ে চুমু খেয়েছেন।

(ঙ) হাফেজ আবু বকর আল মোকরী আবু মালেক আশজায়ী' থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনে আবি আওফাকে বলি, রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কৃত বায়আতের হাতটি বের করুন। তিনি তা বের করলে আমি তাতে চুমু খাই।

সন্তানদেরকে এ সকল কাজ ও মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে। তবে দু'টো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ১. এ সকল ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে পরিণাম খারাপ হবে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা ঠিকভাবে গড়ে উঠবে না। ২. শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। যেমন, দাঁড়ানোর সময় মাথা ঝুঁকে কিংবা হাতে চুমু দেয়ার সময় রুকুর মতো বাঁকা হওয়া যাবে না।

এ সকল আচরণ সন্তানকে পূর্ণ ইসলামী আদব শিক্ষার সহায়ক হবে এবং তাদেরকে নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে, তা হবে মহামূল্যবান।

শিশুরা ভালো জিনিস শেখার জন্য আগে বেড়ে যায়। তাই তাদের আবেগকে সতর্কতার সাথে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার সত্যিকার দাবী পূরণ করা সন্তান গঠনকারীর অন্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য।

৩. সাধারণ সামাজিক আদব-শিষ্টাচার মেনে চলা : এর আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিশুর মনে বদ্ধমূল করতে হবে : ১. পানাহারের আদব-কায়দা, ২. সালামের আদব, ৩. অনুমতির আদব, ৪. মজলিসের আদব, ৫. কথা-বার্তার আদব, ৬. ঠাট্টার আদব, ৭. অভিনন্দনের আদব, ৮. রোগী দেখার আদব, ৯. শোক প্রকাশের আদব, ১০. হাই ও হাঁচির আদব।

১. খাওয়ার আদব : খানা খাওয়ার আদব হলো :

(ক) খানার আগে ও পরে হাত ধোয়া : আবু দাউদ ও তিরমিযী সালমান আল ফারেসী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'খানার বরকত হলো, আগে ও পরে (হাত) ধোয়া।'

ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঘরে আল্লাহর অধিক কল্যাণ ও বরকত কামনা করে, সে যেন খানা উপস্থিত হলে এবং খাওয়া শেষ হলে ওজু করে।' অর্থাৎ হাত ধোয়।

(খ) প্রথমে বিসমিল্লাহ, শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা : আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ খানা খাওয়া শুরু করলে বিসমিল্লাহ বলবে। ভুলে গেলে পরে বলবে 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।'

ইমাম আহমদসহ আরো কেউ কেউ বলেছেন, পানাহারের সময় এই দোয়াটি পড়তে হবে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'সে আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।'

(গ) পেশকৃত খাবারের ত্রুটি না বলা : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো খাদ্যের দোষ বলতেন না। ইচ্ছে হলে খেতেন আর ইচ্ছে না হলে খেতেন না ।

(ঘ) ডান দিক ও নিজের পাশ থেকে খাওয়া : মুসলিম শরীফে ওমার বিন আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) তত্ত্বাবধানে এক বালক ছিলাম। আমার হাত খাদ্যের পেয়ালায় এদিক-সেদিক ঘুরতো। নবী (সা) বলেন, 'হে বালক, বিসমিল্লাহ বলে খাও, তোমার ডান হাতে এবং নিজের পাশ থেকে খাও।'

(ঙ) হেলান দিয়ে না খাওয়া : হেলান দিয়ে খেলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অহংকার

প্রকাশ পায়। বোখারী শরীফে আবু জোহাইফা ওহাব বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না।'

মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দু'পা দাঁড় করিয়ে উভয় উরুর উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

(চ) খানার সময় কথা বলা মোস্তাহাব : মুসলিম শরীফে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ পরিবারের কাছে রান্না করা তরকারী চাইলেন। তাঁরা বললো, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন রান্না করা তরকারী নেই। তিনি তা আনতে বলেন এবং খাওয়া শুরু করেন। তিনি বলেন, সিরকা উত্তম তরকারী। বিশুদ্ধ হাদিসে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে খাওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথা বলেছেন।

(ছ) খানা শেষে মেজবানের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব : আবু দাউদ ও তিরমিজি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম (সা) সা'দ বিন ওবাদার কাছে আসেন। তিনি রুটি ও তেল আনেন। নবী (সা) খান এবং দোয়া করেন : اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ الْمَلَائِكَةُ 'রোজাদারগণ তোমার কাছে ইফতার করেছে, নেক লোকেরা তোমাদের খাবার খেয়েছে এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেছে।'

(জ) বড় কেউ থাকলে আগে নিজে খাওয়া শুরু না করা : মুসলিম শরীফে হোজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা যখন নবী (সা) এর সাথে কোন খাবারে হাজির থাকতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) শুরু না করলে আমরা আগে খেতাম না।'

(ঝ) খাবার নষ্ট না করা : মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) খাওয়া শেষে তিন আঙুল চেটে খেতেন। তিনি বলতেন, যদি তোমাদের কারো খাবারের লোকমা নীচে পড়ে যায়, সেটা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খাবে এবং তা শয়তানের জন্য ফেলে রাখবে না। তিনি আমাদেরকে পেয়ালা চেটে খেতে বলেছেন। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা জান না, তোমাদের কোন্ খাদ্যটুকুতে বরকত রয়েছে।'

পান করার আদব :

(ক) বিসমিল্লাহ বলা, আল্লাহর প্রশংসা করা ও তিনবার পান করা মোস্তাহাব : এ মর্মে, তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'উটের মতো একবারে পান না করে, দু'তিন বারে পান কর। পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলো এবং শেষ করে আল্লাহর প্রশংসা করো।'

কাছে কোন কিছু একটা এসেছে। তিনি ওজু করলেন। কারো সাথে কোন কথা বললেন না। তিনি কি বলেন তা শোনার জন্য আমি হুজরার দেয়ালের সাথে বসলাম। তিনি মসজিদের মিম্বারে বসেন। আল্লাহর হামদ ও শোকর আদায় করেন। তারপর বলেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ কর, নচেৎ দোয়া করবে আমি তাতে সাড়া দেবো না, আমার কাছে চাইবে আমি সাহায্য করবো না। এরপর তিনি আর বেশী কিছু না বলে মিম্বার থেকে নেমে আসেন।'

নবী করিম (সা) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তোমরা যদি কোন অন্যায় দেখ, তাহলে হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করো। না পারলে মুখে দিয়ে, আর তাও না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করো। সেটা হলো দুর্বল ঈমান। (মুসলিম)

যারা বলে, এখানে হাত দ্বারা শাসকগোষ্ঠী, মুখ দ্বারা আলেম সমাজ এবং অন্তর দ্বারা সাধারণ লোকের প্রতিরোধ বোঝানো হয়েছে। একথার পেছনে কোরআন হাদিসের কোন দলিল প্রমাণ নেই। হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান শব্দ এর অর্থ হলো 'যে কোন ব্যক্তি'। অর্থাৎ যে হাত, মুখ ও অন্তর দিয়ে অন্যায় প্রতিরোধ করতে পারে। তাদের সকলকে বোঝায়; চাই তারা শাসক হোক, আলেম হোক বা সাধারণ লোকই হোক। সকলের দায়িত্ব হলো, অন্যায় বিস্তার লাভ করলে তার প্রতিরোধ করা।

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের নীতিমালা : যারা মানুষকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়, তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করলে, দাওয়াত বেশী সফল ও কার্যকর হবে। এজন্য মূলনীতিগুলো জানা দরকার :

(ক) কথা ও কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে মোমেনগণ, তোমরা নিজেরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা নিজেরা যা কর না তা অন্যকে বলা আল্লাহর কাছে অসন্তোষের কাজ।' (সূরা সফ-৩)

তিনি আরো বলেন,'তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা আল্লার কিতাব পাঠ কর? তোমরা কি চিন্তা করো না? (সূরা বাকারা-৪৪)

বোখারী ও মুসলিম উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তখন অন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক, তুমি কি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করোনি? সে বলবে, হাঁ, তবে আমি নেক কাজের হুকুম দিতাম, নিজে করতাম না এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।'

ইবনু আদিব দুনিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেন 'মে'রাজের রাতে আমি এক দল লোকের কাছে আসি যারা আগুনের কাঁচি দিয়ে নিজ নিজ ঠোঁট কাটছিলো। আমি বললাম, হে জিবরীল, এরা কারা? জিবরীল বলেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সকল লোক, যারা নিজেরা যা করে না, তা অন্যকে বলতো এবং যারা আল্লাহর কিতাব পড়তো, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করতো না।'

তাই দেখা যায়, আমাদের সুযোগ্য পূর্বসূরীরা নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের আত্মসমালোচনার আগে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া, অন্যকে শিক্ষা দান এবং নেক কাজ ও তাকওয়ার প্রতি আহবান জানাতে দ্বিধাবোধ করতেন।

এক্ষেত্রে ওমার (রা) অন্যতম উদাহরণ। তিনি লোকদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের আগে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করে বলতেন, 'আমি লোকদেরকে অমুক জিনিসের নির্দেশ এবং অমুক জিনিস থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যদি জানতে পারি যে, আমি লোকদেরকে যা করার ও বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি,যদি তোমাদের কেউ তা করে, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবো। তারপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিতেন। কেউ তার আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করতো না।

মালেক বিন দীনারের ঘটনা হলো, যখন লোকেরা বায়হাকী ও ইবনু আবিদ দুনিয়া কর্তৃক নিম্নোক্ত হাদিসটি আলোচনা করতো, তিনি কাঁদতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً اِلاَّ اللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اَرَدْتَ بِهَا 'কোন ব্যক্তি বক্তৃতা করলে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এর দ্বারা কী এরাদা করেছিলে?' মালেক বিন দীনার জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি মনে করেন যে, আমার চোখ আপনাদের কাছে আমার কথা দ্বারা শীতল হবে? আমি জানি যে, আল্লাহ আমাকে হাশরের দিন জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি এর দ্বারা কি এরাদা করেছিলে? আমি বলবো, আপনি আমার অন্তরের সাক্ষী। আমি যদি না

জানতাম যে এটা আপনার অধিক পছন্দনীয়, তাহলে আমি দু'জনের কাছেও কিছু পড়তাম না।'

সকল দাঈ-ইলাল্লাকে এই গুণ অর্জন করতে হবে। তাহলে লোকেরা তার কথা শুনবে।

(খ) মন্দ কাজটির উপর সকলের ঐক্যমত থাকতে হবে : সকল ফেকাহবিদগণ ও ইমামের মন্দ কাজটির উপর ইজমা থাকতে হবে। যদি ইমাম ও মুজতাহিদগণের মধ্যে তা মন্দ হবার ব্যাপারে মতভেদ থাকে, তাহলে তাকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাম্বলী মাজহাবের কোন অনুসারী কোন মাসলায় মালেকী মাজহাবের কোন অনুসারীর বিরোধিতা বা প্রতিরোধ করতে পারবে না। কেননা সকল ইমাম দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। তারা সকলেই কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কেয়াস থেকে মাসলা বের করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি ইমাম ছিলেন এলেমের পাহাড়, তাকওয়া পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও যোগ্যতার নিদর্শন। প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'যে কোন আলেমের অনুসরণ করে, সে আল্লাহর সাথে নিরাপদে সাক্ষাৎ করবে।'

বর্তমান যুগে কথিত মুজতাহিদগণ তাকলিদকারী অন্য ইমামের অনুসারীদের বিরোধিতা করলে বুঝতে হবে, তারা উগ্রপন্থী এবং ইসলামী দলগুলোর অগ্রযাত্রা ব্যাহতকারী। তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো, তারা যেন নিজেদের উগ্রতা ও তীব্রতাকে কমিয়ে আনে এবং মুসলমানদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। তাদেরকে এই নীতির উপর কাজ করতে হবে :

'ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন বিষয়ে আমরা একযোগে কাজ করবো, আর মতভেদপূর্ণ বিষয়ে অন্যের ওজরকে বিবেচনা করবো।' এটা করলে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিতে অবদান রাখা যাবে এবং ইসলামকে যমীনে প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

(গ) পর্যায়ক্রমে মন্দের প্রতিরোধ করতে হবে : মন্দের প্রতিরোধের কিছু পর্যায় আছে। (১) প্রথমে মন্দটি সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি ছাড়াই চেষ্টা করা।(২) তারপরে মন্দ কাজকারীকে বুঝাতে হবে যে,ওইটা মন্দ। (৩) এরপর ওয়াজ-নসিহত, উপদেশ ও আল্লাহর ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখা। (৪) উপদেশ ও নসীহতে কাজ না হলে কঠোর ভাষা ব্যবহার করে শাসাতে হবে। (৫) এরপরও কাজ না হলে হাত বা শক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। যেমন,

হারাম খেলার আড্ডা নষ্ট করা ও মদের দোকানের গ্লাস ভেঙে ফেলা। তবে অন্যায়কারীদের উপর আক্রমণ কার যাবে না। (৬) এরপর অস্ত্র ছাড়া দলীয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। (৭) সর্বশেষ জাতি বা জাতির একটা অংশ অস্ত্র দিয়ে এর মোকাবিলা করবে। কেননা, মন্দ কাজটির মাধ্যমে দেশে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং দেশ নষ্ট হচ্ছে। (ইমামা গাজালীর এহইয়াউল উলুম বই থেকে সংক্ষেপিত)

ফেকাহবিদদের মতে, অন্যায়ের প্রতিরোধের স্বীকৃত নীতি হলো, অল্প ফায়দা হলে কঠোর পদ্ধতি গ্রহণ না করা। যদি উপদেশ ও আদর-যত্নের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যায়– তাহলে কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করা। আর যদি কঠোর বাক্য দ্বারা লাভ হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ না করা।

অন্যায় প্রতিরোধকারীকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে কাজ করতে হবে। তা না হয় হিতে বিপরীত হতে পারে। 'যাকে বিজ্ঞতা ও হেকমত দেয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে।'

(ঘ) অন্যায় প্রতিরোধকারীকে নমনীয়, মোলায়েম ও ভালো চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে ভালো প্রভাব পড়বে এবং ভালো সাড়া পাওয়া যাবে। নমনীয়তা, কোমলতা ও সহনশীলতা দ্বীনের দাঈ'র উত্তম গুণ। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশও দিয়েছেন।

বায়হাকী আমর বিন শোয়াইব থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। مَنْ امَرَ بِمَعْرُوْفٍ فَلْيَكُنْ بِمَعْرُوْفٍ 'যে সৎ কাজের আদেশ করবে সে যেন তা সৎভাবে করে।'

ইমাম মুসলিম নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'কোন জিনিসের মধ্যে নমনীয়তা থাকলে তা এর শোভাবর্ধন করে। আর তা ছিনিয়ে নেয়া হলে তাকে মন্দে পরিণত করে।'

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ দয়ালু ও কোমল। তিনি নমনীয়তাকে পছন্দ করেন, কোমলতার জন্য যা দেন, কঠোরতা ও সহিংসার জন্য তা দেন না এবং কোমলতা ছাড়া অন্য কিছুর জন্যও দেন না।'

নমনীয়তা ও কোমলতার ক্ষেত্রে নবী (সা)-এর আদর্শ :

বোখারী আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। 'এক বেদুঈন মসজিদে নবওয়ীতে পেশাব করে। লোকেরা তাকে আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে গেল। নবী (সা)

বলেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং পেশাবের জায়গায় এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সহজকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরকারী হিসেবে নয়।'

মোসনাদে আহমদ আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন। এক যুবক নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী, আমাকে যেনার অনুমতি দিন। লোকেরা চিৎকার করে উঠলো। নবী (সা) বলেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। সে কাছে আসলো এবং সামনে বসলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বলে, না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুক। তিনি বলেন, ঠিক লোকেরাও তেমনি তাদের মায়ের জন্য পছন্দ করবে না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা নিজ কন্যার জন্য পছন্দ করবে? সে বলে, না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুক। তিনি বলেন, লোকেরাও নিজ কন্যার জন্য পছন্দ করবে না। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা নিজ বোনের জন্য পছন্দ করবে? সে বলে, না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুক। তিনি বলেন, লোকেরা ঠিক তেমনি তা নিজ বোনের জন্য পছন্দ করবে না। হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে আওফ বলেন, তিনি এমন কি ফুফু ও খালা সম্পর্কেও একই প্রশ্ন করেন। আর সে প্রত্যেকবারই 'না' বলে জওয়াব দেয় এবং বলে, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। আর নবী (সা)ও বলতে থাকেন, ঠিক লোকেরাও তা পছন্দ করবে না। তারপর নবী নিজ হাত মোবারক তার বুকের উপর রাখেন এবং এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, তার অন্তরকে পবিত্র করুন, গুনাহ মাফ করুন ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।' যুবকটি বললো, এরপর আমার কাছে যেনা অপেক্ষা আর কোন জিনিস এত অধিক ঘৃণিত মনে হয়নি।'

মুসলিম শরীফে মোয়াওইয়া বিন হাকাম সালামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদিন আমি নবী (সা) এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললাম। লোকেরা সকলে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, মাগো আফসোস! তোমরা কেন আমার দিকে তাকিয়ে আছো? লোকেরা হাত দিয়ে উরুর মধ্যে থাপড়াতে লাগলো। আমি দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চায়। আমি চুপ করলাম। নবী (সা) সালাম ফিরালেন। আমার মাতা-পিতার দোহাই, আমি এর আগে ও পরে তাঁর চাইতে কোন উত্তম শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে ধমক,মার ও গালি দেননি। শুধু এইটুকু বললেন, এই নামাজে মানবীয় কোন কথা চলে না। বরং তা হচ্ছে, তাসবীহ, তাকবীর ও কোরআন তেলাওয়াত।'

এক ওয়াজকারী খলীফা আবু জাফর মনসুরের কাছে প্রবেশ করলো এবং কঠোর ভাষায় কথা বললো। খলীফা বলেন, হে অমুক, আমার সাথে নরমভাবে কথা বলো। আল্লাহ তোমার চাইতে উত্তম এক ব্যক্তিকে আমার চাইতে মন্দ এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ মূসা (আ)কে ফেরআউনের কাছে পাঠিয়ে বলেন, فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى 'তোমরা উভয়ই ফেরআউনের কাছে নরম ভাষায় কথা বল। হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ কিংবা ভয় করবে।' একথা শুনে ওয়াজকারী ব্যক্তি লজ্জিত হলো। কেননা সে মূসা (আ) অপেক্ষা উত্তম নয় এবং আবু জাফর মনসুর ফেরআউন অপেক্ষা মন্দ নয়। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে আদব শিক্ষা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে, আপনি যদি কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা চান, কাজে- কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল ইমরান-১৫৯)

(ঙ) কষ্টে ধৈর্যধারণ করা : সমালোচক বা দাঈ'দেরকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। অহংকারী, মূর্খ ও বিদ্রূপকারীরা তাদেরকে জর্জরিত করে তোলে। এটা সকল যুগে নবী, দাঈ' ও সংস্কারকদের সুন্নাত। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,' লোকেরা কি ভেবেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমরা এর আগের লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি, আল্লাহ জানতে চান যে, ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাধী।' (সূরা আনকাবূত-৩)

আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমরা কি ভেবে বসেছো যে, এমনিতেই বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো তোমাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না? তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে তাদেরকে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।' (সূরা বাকারা-২১৪)

লোকমান তাঁর ছেলেকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন : 'হে বেটা, নামাজ কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।' (সূরা লোকমান-১৭)

আল্লাহর রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট পেলে তা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যেই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করবো এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।' (সূরা আল ইমরান-১৯৫)

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কোন লোকের সর্বাধিক পরীক্ষা নেয়া হবে? তিনি জবাবে বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ। লোককে তার দ্বীন অসুসারে পরীক্ষা করা হবে। যদি পাক্কা দ্বীনদার হয়, তাহলে তার পরীক্ষা হবে কঠিনতর। আর যদি দ্বীনদারীতে নমনীয়তা ও দুর্বলতা থাকে তাহলে তার পরীক্ষাও সেরূপ দুর্বল হবে।

বান্দাহর বালা-মুসিবত ও পরীক্ষা সে পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যে পর্যন্ত না বান্দা জমীনে চলাচল করে এবং তার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না।'

মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে । তিনি বলেন, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ 'বেহেশতের কাজ কষ্ট দ্বারা এবং জাহান্নামের কাজ কামনা-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত।'

দাঈ' ও সমালোচকদের দুঃখ-কষ্ট,অত্যাচার-নির্যাতন এবং অভিযোগের বিষয়ে মহান দাঈ' ও শিক্ষক মোহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মতো নির্যাতন, কষ্ট ও অভিযোগ আগে ও পরে আর কাউকে সহ্য করতে হয়নি। মোশরেকরা তাঁকে দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য প্রলোভন ও প্রতারণসহ ব্যাপক বয়কট করে। তা সত্ত্বেও তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের পথে সব কিছু ধৈর্য ও সবরের সাথে মোকাবিলা করেন, তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ও সবর ধারণ করতে হবে, যদি তারা সাফল্য অর্জন করতে চায়।

একটি প্রশ্ন : অন্যায় প্রতিরোধকারী যদি এ কারণে নিজের জানের উপর ক্ষতির আশংকা এবং মন্দ দূর হওয়ার আশা না করে, তাহলে কি তার প্রতিরোধ করা জায়েয হবে?

উত্তর : কোরআনে বর্ণিত লোকমানের উপদেশ থেকে বোঝা যায় যে, সর্বাবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ জায়েয।

'সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।' (সূরা লোকমান-১৭)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান-মালের ক্ষতি হলে মন্দ কাজ প্রতিরোধ করতে হবে না। প্রতিরোধ বিশুদ্ধ নিয়তের প্রমাণ বহন করে। মোমেনকে অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে। আর এটা সাহসিকতার কাজ।

মালেকী মাজহাবের আলেম আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, মন্দ তো দূর হবে কিন্তু এর ফলে তার মার খাওয়া বা নিহত হওয়ার আশংকা আছে, অধিকাংশ আলেমের মতে, তার অগ্রসর না হওয়া জায়েয। আর যদি মন্দ দূর হওয়ার আশা করা না যায়, তাহলে প্রতিরোধ করে ফায়দা কী?

শেখ আলী যাদাহ شِرْعَةُ الْاِسْلَام বইয়ে লিখেছেন, লোকদের কাছে আপসকামিতা পছন্দনীয় নয়। প্রতিরোধকারী কারো গাল-মন্দ, মার ও হত্যাকে ভয় করে না। অতীতের পূর্বসূরীরা উম্মাহ ও শাসকদের অন্যায়ের প্রতিরোধ করতেন। এজন্য তারা কোন পরোয়া করতেন না।

তবে দাঈ'কে এলেম ও জ্ঞানের অস্ত্রে সুসজ্জিত হতে হবে, যেন তার নসিহত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ ইসলামী শরীয়তের অনুকূল হয়।

(৩) পূর্বসূরীদের ভূমিকা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয়া : এ সকল ভূমিকা আমাদের নতুন বংশধরকে প্রেরণা যোগাবে এবং তারাও পূর্বসূরীদের মতো নির্ভিক ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত হবে। এখন আমরা এ জাতীয় কিছু ভূমিকা উল্লেখ করবো :

(ক) বর্ণিত আছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত আবু গিয়াছ বোখারা শহরের কবরস্থানে বাস করতেন। তিনি একদিন তার ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য শহরে আসেন। শহরের গভর্নর ছিলেন নসর বিন আহমদ। তার দরবার থেকে বালক, গায়ক ও বাদকের দল বের হলো। সে দিন ছিল গভর্নরের মেহমানদারীর দিন। আবু গিয়াছ তা দেখে মনে মনে বললেন, হে নফস, চুপ থাকলে তুমি এই পাপের শরীক গণ্য হবে। তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন এবং একটি লাঠি হাতে নেন। তিনি একাই তাদের সকলের উপর হামলা করেন। তারা পরাজিত হয়ে সকলেই গভর্নরের দরবারে ফিরে যায় এবং ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি আবু গিয়াছকে ডাকেন এবং প্রশ্ন করেন, আপনি কি জানেন, যে ব্যক্তি গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে কারাগারের খানা খেতে হয়?

আবু গিয়াছ : আপনি কি জানেন, যে ব্যক্তি মেহেরবান আল্লাহর বিদ্রোহ করে তাকে দোজখের আগুনে যেতে হয়?

গভর্নর : কে আপনাকে (হাছবাহ) সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের দায়িত্ব দিয়েছে?

আবু গিয়াছ : যিনি আপনাকে বাদশাহী দিয়েছেন।

গভর্নর : আমাকে খলীফা গভর্নর বানিয়েছেন।

আবু গিয়াছ : আমাকে খলীফার প্রভু হাছবার দায়িত্ব দিয়েছেন।

গভর্নর : আমি আপনাকে সমরখন্দের হাছবার দায়িত্ব দিলাম।

আবু গিয়াছ : আমি তা থেকে অপারগতা প্রকাশ করছি।

গভর্নর : ব্যাপারতো বড়ই আশ্চর্যজনক। যখন আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি, তখন আপনি দায়িত্ব পালন করলেন। আর এখন দায়িত্ব দেয়ার পর তা থেকে বিরত থাকছেন!

আবু গিয়াছ : আপনি আমাকে দায়িত্ব দিলে আবার বরখাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু আমার প্রভু দায়িত্ব দিলে কেউ আমাকে বরখাস্ত করতে পারবে না।

গভর্নর : আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন।

আবু গিয়াছ : আমার যৌবন কাল ফিরিয়ে দিন।

গভর্নর : এটা আমার ক্ষমতার বাইরে। আপনার অন্য কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন।

আবু গিয়াছ : দোজখের দারোয়ান খাযেনকে লিখে দিন, যেন আমাকে শাস্তি না দেয়।

গভর্নর : এটাও আমার ক্ষমতার বহির্ভুত। আপনার কি অন্য কোন প্রয়োজন আছে?

আবু গিয়াছ :বেহেশতের দারোয়ান রেদোয়ানকে লিখে দিন, আমাকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করায়।

গভর্নর : এটাও আমার এখতিয়ার বহির্ভূত।

আবু গিয়াছ : সমস্ত প্রয়োজনের মালিক আল্লাহর কাছেই চাওয়া যায়। আমি যখনই তাঁর কাছে চেয়েছি, তিনি সাড়া দিয়েছেন। এরপর গভর্নর তাকে বিদায় করে দেন।

(খ) ইমাম গাজালী (র) 'এহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান হজ্জের সময় মক্কার সকল সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে

নিয়ে মিলিত হন। তিনি খাটের উপর বসা। তখন প্রখ্যাত তাবেঈ' আতা বিন আবু রেবাহ তাঁর কাছে প্রবেশ করেন। খলীফা তাঁকে দেখে দাঁড়ান, নিজ খাটের উপর বসান এবং নিজে তাঁর সামনা সামনি বসেন। খলীফা বলেন, হে আবু মোহাম্মদ, আপনার প্রয়োজন কী?

আতা বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পবিত্র হারামে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন এবং তাকে আবাদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন। মোহাজির ও আনসারদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি এই মজলিসে তাদের সাথেই বসা। সীমান্তরক্ষীদের ব্যাপারে আল্লাহে ভয় করুন। তারা হলেন মুসলমানদের দুর্গ। মুসলমানদের খোঁজ-খবর জানার চেষ্টা করুন। আপনি একাই তাদের দায়িত্বশীল। আপনার দরজায় যারা আসে তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাবেন না এবং তাদের জন্য দরজা বন্ধ রাখবেন না।' খলীফা বলেন, ঠিক আছে। আতা ওঠে দাঁড়ালেন। আব্দুল মালেক তাঁকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে আবু মোহাম্মদ, আপনিতো অন্যদের প্রয়োজনের কথা বললেন, আমরা সেগুলো পূরণ করবো। কিন্তু আপনার প্রয়োজন কী? আতা বলেন, কোন সৃষ্টির কাছে আমার প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আব্দুল মালেক বলেন, এটাই সম্মান।

(গ) الشَّقَائِقُ النُّعْمَانِيَّةُ لِعُلَمَاءِ الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ বইয়ে উল্লেখ আছে, তুর্কী সুলতান সেলিম খান রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ১৫০ জন রক্ষীকে হত্যার ফরমান জারি করেন। দেশের গ্রান্ড মুফতি আলাউদ্দিন আলী বিন আহমদ আল মুফতি তা জানতে পেরে সুলতানের দরবারে যান। কোন বড় বিষয় ছাড়া সাধারণত গ্রান্ড মুফতি কখনো সর্বোচ্চ দরবারে আসেন না। সুলতানের দরবারের সকলেই পেরেশান। তিনি সুলতানের দরবারে ঢুকে মন্ত্রীদেরকে সালাম দেন। তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং মজলিসের সামনে বসান। তারা জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন এসেছেন? মুফতি বলেন, আমি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করবো। তাঁর সাথে আমার কথা আছে। তিনি একা সুলতানের কাছে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। প্রবেশ করে সুলতানকে সালাম দেন এবং বলেন, মুফতিদের কাজ হলো সুলতানের আখেরাত হেফাজত করা। আমি শুনেছি, আপনি ১৫০ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আপনার উচিৎ, তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া। সুলতান ছিলেন রাগী ও জেদী। তিনি বলেন, আপনি সুলতানের কাজে বাধা দিচ্ছেন? এটাতো আপনার দায়িত্ব নয়। মুফতি বলেন, না, আমি আপনার আখেরাতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছি, আর এটাই আমার কাজ। আপনি ক্ষমা করলে মুক্তি পাবেন। নচেৎ বিরাট শাস্তি লাভ করবেন। তখন তার

রাগের মাত্রা কমে এলো। তিনি সবাইকে মাফ করে দেন। তারপর তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন। তিনি উঠে যেতে চাইলে মুফতি বলেন, আমি আপনার আখেরাতের বিষয়ে কথা বলেছি, কিন্তু একটা মানবিক বিষয় রয়ে গেছে। সুলতান বলেন, সেটা কী? তিনি বলেন, এ সকল লোক সুলতানের চাকর-বাকর। সুলতানের কি শোভা পায় লোকরেদকে আটকে দেয়া? সুলতান বলেন, না। মুফতি বলেন, তাহলে তাদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করুন। সুলতান তাকে চুমু খান এবং বলেন, আমি তাদেরকে কাজের ক্রটির জন্য শাস্তি দেবো। মুফতি বলেন, সেটা জায়েয। কেননা শাস্তির বিষয়টা সুলতানের হাতে। তারপর তিনি সুলতানকে সালাম ও শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় নেন।

(ঘ) ১৯ শতকের শেষ দিকে মিসরের শাসক খাদিউ ইসমাইল। তখন মিসরের সাথে ইথিওপিয়ার যুদ্ধ চলছে। সেনা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতবিরোধের কারণে মিসরীয় বাহিনীর পরাজয় অব্যাহত থাকে। এতে খাদিউ ইসমাইলের মন ব্যথিত। তিনি একদিন ব্যথাতুর মন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশার সাথে গাড়ীতে আরোহন করে একটু স্বস্তি লাভের চেষ্টা করেন। তিনি শরীফ পাশাকে বলেন, বিপদ দূর করার জন্য আপনি কি করেন? তিনি বলেন, আমি খাঁটি আলেমদেরকে দিয়ে বোখারী শরীফ খতম করাই। তাতে আল্লাহ আমার বিপদ দূর করেন।

একথা শুনে খাদিউর মন নরম হলো। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আরুসীর সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেন। বেশ কিছু নেক ও দ্বীনদার আলেমকে একত্রিত করে বোখারী শরীফ খতম করা হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিসরীয় বাহিনীর অব্যাহত পরাজয়ের খবর আসতে থাকে। খাদিউ শরীফ পাশাকে নিয়ে পুনরায় আল আযহারে যান এবং বোখারী শরীফ পাঠকারী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে রাগত কণ্ঠে বলেন, আপনারা যা পাঠ করেছেন তা হয়তো বোখারী শরীফ নয় অথবা আপনারা সলফে সালেহীনের সুযোগ্য নেক উত্তরসূরী নন। তাই আল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে কিংবা আপনাদের বোখারী শরীফ তেলাওয়াতের উসিলায় বিপদ-মুসিবত দূর করছেন না। আলেমরা চুপ করে রইলেন। সর্বশেষ সারি থেকে একজন শেখ উঠে জবাব দেন, হে ইসমাইল, আপনার কারণেই তা হচ্ছে। নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তোমরা হয় সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করবেন। এরপর তোমাদের নেক ব্যক্তিরা দোয়া করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।

খাদিউ ইসমাইল একথা শুনে শরীফ পাশাসহ ফিরে গেলেন এবং একটি কথাও বললেন না। অন্যান্য আলেমরা ওই স্পষ্টভাষী আলেমটাকে তিরস্কার করতে লাগলেন, কেন তিনি সরাসরি এরূপ কথা বললেন। একদিন শরীফ পাশা আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় এসে স্পষ্টভাষী সে শেখকে খুঁজতে থাকেন। শেখ বলেন, আমিই সে ব্যক্তি। শরীফ পাশা তাকে সাথে নিয়ে যান। ওলামায়ে কেরাম তাঁকে চির বিদায় দিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। শরীফ পাশা ও শেখ খাদিউর দরবারে প্রবেশ করেন। খাদিউ তখন প্রাসাদের আঙিনায় বসা। সামনের চেয়ারটিতে শেখকে বসালেন। তিনি বলেন, আপনি আযহারে যে কথাটি বলছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করুন। শেখ পুনরাবৃত্তি করেন। খাদিউ জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কোন্ ত্রুটির জন্য এই বিপদ এসেছে? শেখ উত্তর দেন, আদালতে কি ইসলাম ও অনৈসলাম একাকার হয়ে গেছে না, যাতে সুদের অনুমতি রয়েছে? যেনা-ব্যভিচারের কি অনুমতি দেয়া হচ্ছে না? মদ ও মাদক দ্রব্য কি নেই, নেই অমুক অমুক হারাম জিনিস এবং ইসলাম বিরোধী অগণিত আইন-কানুন? সরকার এগুলো বন্ধ করছে না। আমরা আসমানী বিজয় কিভাবে আশা করবো? খাদিউ বলেন, আমরা বিদেশীদের সাথে বাস করে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। আমরা কী করবো? শেখ বলেন, তাহলে বোখারী শরীফের দোষ কী এবং আলেম সমাজের ত্রুটি কী? খাদিউ একটু চিন্তা করেন এবং চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর শেখ আযহারে ফিরে আসেন। তাঁর সহপাঠিরা তাঁর জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে যেন তাঁরা নতুন জীবন লাভ করেন।

উল্লেখ্য, মিসর ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছে। আর মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন খৃষ্টান। তিনি ইথিওপিয়ার খৃষ্টান সরকারকে মিসর সরকারের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, দেশে অন্যায় ও গুনাহর কাজ বিনা বাধায় চলছে।

ইসলামের ইতিহাসে আমাদের পূর্বসূরীদের এ জাতীয় বহু ঘটনা সোনালি অক্ষরে লিখিত আছে। যার লক্ষ্য হলো, সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা এবং উম্মাহর সম্পর্ক মজবুত করার জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করা।

ব্যক্তি সমাজ নামক ইমারতের একটা ইট। তাই তাকে মানব কল্যাণ নিয়ে আসা এবং অকল্যাণ দূর করার জন্য অবশ্যই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের লক্ষ্যও তাই। তাকে ইসলামী আদর্শ ও মহান চারিত্রিক নীতিমালা এবং দ্বীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করে সমাজ সংগঠনকে দাঁড় করাতে হবে। এজন্য সে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা রক্তচক্ষুকে ভয় করবে না। তাকে নিজের এবং অন্যের অতন্দ্র প্রহরী হতে হবে। সংস্কার ও উপদেশের জন্য ধৈর্য ও সবরের সাথে কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, 'সময়ের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে। শুধু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে এবং হক ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।' (সূরা আল-আসর)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা : সন্তান গঠনকারীদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ এবং জাতির সার্বভৌমত্ব ও দুনিয়ার শান্তি নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্বীন-দুনিয়া, আত্মিক ও বৈষয়িক দিক এবং কোরআন ও তলোয়ার, ইবাদত ও জিহাদ। এতে আরো রয়েছে, ঈমান-বিশ্বাস, তাকওয়া-ইহসান, নামাজ-রোজা, কল্যাণ-নেক, ধৈর্য-সবর, সত্য ও বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব, দান ও দানশীলতা, ওয়াদা-অঙ্গীকার, ইচ্ছা ও যথার্থতা, যুদ্ধ ও শান্তি, শাস্তি ও কেসাস। নিম্নোক্ত আয়াতে ওই ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে :

'নেক কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে বরং নেক কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করে এবং অভাবে, রোগ-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই হলো সত্যবাদী, আর তারাই পরহেজগার। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, দাস দাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে। যদি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করবে। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।' (সূরা বাকারা : ১৭৭-১৭৮)

সে মুসলমান কতইনা মূর্খ, যে মনে করে যে, ইসলাম হলো ইবাদতের দ্বীন কিন্তু জিহাদের দ্বীন নয়। সে ব্যক্তি কতইনা ভ্রান্ত কল্পনার অধিকারী যে মনে করে যে, ইসলাম শাসন ব্যবস্থা এবং মানব জীবনকে সংগঠিত করার আহ্বান জানায় না! তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে অপমান এবং পরকালে তাদেরকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।' (সূরা বাকারা–৮৫)

সন্তানকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধে অভ্যস্ত না করালে তার মধ্যে সংকোচ ও লজ্জা জন্মাবে।

সপ্তম অধ্যায়

যৌন শিক্ষা

যৌন শিক্ষা বলতে বোঝায়, যৌন বিষয়ে বোঝার বয়স হলে সন্তানকে যৌন প্রকৃতি ও বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা দেয়া। ফলে সন্তান যৌবনে পদার্পণ করলে কোন্‌টা হালাল এবং কোন্‌টা হারাম তা যেন বুঝতে পারে, ইসলামী চরিত্র যেন তার বৈশিষ্ট্য হয় এবং অবৈধ যৌন কামনা কিংবা হারাম পথে যেন হাবুডুবু না খায়।

সন্তানকে পর্যায়ক্রমে যৌন শিক্ষা দিতে হবে।

- ০৭–১০ বছর বয়স ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়স বলা হয়। এ বয়সে তাকে অনুমতি গ্রহণ ও দৃষ্টিদানের নিয়মনীতি শিক্ষা দিতে হবে।
- ১০–১৪ বছর বয়সকে কৈশোর বলা হয়। এ বয়সে তাকে সকল যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়াদি থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ১৪-১৬ বছর বয়সকে বালেগ হওয়ার বয়স বলে। এ পর্যায়ে সে যদি বিয়ের প্রস্তুতি নেয়, তাহলে তাকে যৌন সম্পর্কের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতে হবে।
- বালেগ পরবর্তী পর্যায়কে যৌবনকাল বলা হয়। এ পর্যায়ে বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে পবিত্রতার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতে হবে।

একটি প্রশ্ন : ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে সন্তানের সাথে যৌন বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা যাবে কীনা? -হে সন্তান গঠনকারীরা, এ বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. অনুমতি গ্রহণের নিয়ম : (আমরা ইতোপূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'সামাজিক নিয়ম শিষ্টাচার মেনে চলা'-এর আওতায় অনুমতি গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।) অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সন্তান যদি অনুমতি ছাড়া মাতা-পিতার কক্ষে প্রবেশ করে দেখে যে, তারা যৌন আচরণে লিপ্ত, পরে তার অন্য ছোট বন্ধুদের কাছে তা বর্ণনা করে কিংবা যদি এটার ছাপ তার মনে বদ্ধমূল হয়, তাহলে তা কত বড় ক্ষতিকর, চিন্তা করলে শরীর শিহরে ওঠে! এর ফলে সন্তান যৌন বিকারগ্রস্ত হতে পারে।

২. **দৃষ্টির নিয়ম-কানুন** : সন্তান গঠনকারীর উচিৎ, ভালো-মন্দ বিবেচনা করার বয়সে পৌঁছলে সন্তানদেরকে কোন জিনিস দেখা জায়েয ও হারাম তা শিক্ষা দেয়া। এর ফলে সে বালেগ হলে ভালো ও নেক চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে।

দৃষ্টির নিয়মগুলো হলো :

(ক) মোহরম আত্মীয়ের প্রতি দৃষ্টির বিধান : যে নারীকে বিয়ে করা চিরস্থায়ী হারাম, সে নারী তার জন্য মহরম। মহরম আত্মীয়েরা হলেন :

* বংশের কারণে মহরম : সাত জন নারী বংশের কারণে মহরম। আল্লাহ কোরআন মাজীদে তা উল্লেখ করেছেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ 'তোমাদের জন্য তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী ও ভাগিনীকে হারাম করা হলো।' (সূরা নিসা-২৩)

বিয়ের কারণে মোহরম : তাদের সংখ্যা চার জন।

১. বাবার স্ত্রী (সৎ মা)। আল্লাহ বলেন, لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 'তোমাদের বাবারা যে নারীকে বিয়ে করেছে তোমরা তাকে বিয়ে করো না।' (সূরা নিসা–২২)

২. আপন ছেলের স্ত্রী : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 'তোমাদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রী।' (সূরা নিসা-২৩)

৩. শাশুড়ি: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীদের মা।' (সূরা নিসা–২৩)

৪. স্ত্রীর ঘরের কন্যা (সৎ মেয়ে): وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 'তোমরা যে স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করেছো সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের (স্ত্রীদের) সাথে যৌন মিলন না করে থাকো, তবে এ বিয়েতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।' (সূরা নিসা-২৩)

দুধ পানের কারণে মোহরম : আল্লাহ বলেন, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ 'দুধপান করানোকারী মা ও দুধ বোন।' (সূরা নিসা–২৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاءِ 'বংশীয় কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তা হারাম হয়।' (মুসলিম)

বংশগত কারণে যেমন, মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী ও ভাগিনী হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তেমনি দুধ মা, দুধ বোন, দুধ কন্যা ইত্যাদি হারাম।

কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী, পুরুষ তার মোহ্‌রম মহিলা আত্মীয়দের যে সকল অঙ্গ সাধারণত খোলা থাকে সেগুলোর প্রতি নজর করতে পারবে। যেমন, ঘাড়, মাথা, হাতের কবজি, পায়ের পাতা ইত্যাদি। যেগুলো সাধারনত ঢাকা থাকে সেগুলোর প্রতি নজর করা যাবে না। যেমন, বুক, পেট, পিঠ ইত্যাদি। এ মর্মে কোরআনের দলিল হলো, আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ.

'মুসলিম নারীরা যেন নিজেদের সৌন্দর্য নিজ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা ও ভাগিনা ছাড়া অন্যদের কাছে প্রদর্শন না করে।' (সূরা নূর-৩১)

এ আয়াতে উল্লেখিত হুকুম স্বামীর জন্য প্রযোজ্য নয়। স্বামী-স্ত্রী যৌন কামনাসহ বা যৌন কামনা ছাড়া পরস্পরের সকল কিছু দেখতে পারে। এ বিষয়ে পরে 'স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিদান' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

হাদীসের দলিল হলো, আবু দাউদসহ অন্যরা বর্ণনা করেছেন। সাহ্‌লা বিনতে সোহাইল বললো, হে আল্লাহর রাসূল, সালেম যখন ছোট বালক, তখন থেকে আমরা তাকে দেখে আসছি। সে আমার এবং আবু হোজায়ফার সাথে একই ঘরে থাকতো। সে আমাকে অপূর্ণ পোশাকে দেখতো। (অর্থাৎ আমি তার কাছে পর্দা করতাম না) এখনতো তাদের সাথে পর্দা করার আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই। নবী (সা) বলেন, إِرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ 'তাকে পাঁচবার তোমার দুধ পান করাও। তাহলে সে তোমার দুধ ছেলের মতো হয়ে যাবে।'

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সালেম বড় হবার পরও সোহাইলার প্রকাশমান অঙ্গ যেমন মাথা ঘাড়, দুই হাতের কবজি ও দু'পা ইত্যাদি দেখতো।

যে অঙ্গ সাধারণত ঢাকা থাকে, ইসলাম তার প্রতি দৃষ্টিদান নাজায়েয করেছে। আর এর প্রয়োজনও নেই। একদিকে যৌন কামনা না আসার কোন নিশ্চয়তা নেই, অন্যদিকে তা পুরুষত্বেরও অনুপযোগী। এছাড়া তা নারীর সতীত্বের সাথে

খাপও খায় না। দৃষ্টি না দেয়াকে ফেতনার অগ্রিম প্রতিরোধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, যে সংরক্ষিত চারণগাহের পাশে অবস্থান করে, তাতে তার পতন ও দুর্ঘটনার আশংকা থাকে।

পুরুষ মহরম বালেগ হলে, মহিলা মোহরমের হাঁটুর উপরে খাটো পোশাক, খোলা দুই উরু, পাতলা ও আঁট-সাট পোশাক যাতে ভেতরের অঙ্গ বোঝা যায় বা ভেসে ওঠে-সেগুলোর প্রতি তার নজর করা হারাম। অনুরূপ কন্যা ও স্ত্রীরও মোহরম পুরুষের নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান দেখা জায়েয নেই। যেমন, নিজ ছেলে, ভাই ও বাবা ইত্যাদি। যদিও ফেতনার আশংকা না থাকে, এমন কি গোসলখানায় শরীর ঘষা-মাজার সময়ও না। আল্লাহ বলেন, 'এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এটা লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, তারা জালেম।' (সূরা বাকারা–২২৯)

(খ) বিয়ের পাত্রী দেখার নিয়ম : ইসলামী শরীয়াহ পাত্রকে পাত্রী দেখার এবং পাত্রীকে পাত্র দেখার অনুমতি দিয়েছে, যাতে করে উভয়ই জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বাস্তব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এগুতে পারে। এক্ষেত্রে মুসলিম শরীফে মুগীরা বিন শো'বা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا 'তুমি পাত্রী দেখে নাও, এটা মহব্বত ও ভালোবাসা স্থায়ী করার উপায়।'

মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে এক আনসারী স্ত্রী বিয়ে করেছে বলে জানায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? সে জবাবে বলে, না। তিনি বলেন, তাকে দেখে নাও। আনসারদের চোখে কিছু না কিছু দোষ থাকে।' অর্থাৎ তাদের চোখ ছোট।

পাত্রের পাত্রী দেখার নিয়মাবলী :

১. পাত্র কেবল পাত্রীর মুখ ও দু'হাতের কবজি দেখতে পারবে।

২. মনে বাস্তব ছবি অঙ্কনের জন্য বার বার দেখা জায়েয আছে।

৩. পাত্র-পাত্রী পরস্পরের সাথে ওই অধিবেশনে কথা বলা জায়েয।

৪. বিয়ের আগে পাত্রীর সাথে হাত মেলানো জায়েয নেই। কেননা তখনও সে অমোহরম। এ মর্মে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'বাইয়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে তাদের বাইয়াত দিতেন।' (বোখারী)

৫. পাত্রীর মোহরম পুরুষ আত্মীয় ছাড়া পাত্র পাত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হতে পারবে না। ইসলাম অমোহরম নারীর সাথে নির্জনতাকে নাজায়েয করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'মোহরম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে এবং কোন নারী যেন একাকী সফর না করে।' (বোখারী, মুসলিম)

উল্লেখ্য, কিছু তথাকথিত উদার মহলে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র জানার জন্য পরস্পরের অবাধ মেলা-মেশার রেওয়াজ রয়েছে। ইসলাম এই মত শুধু প্রত্যাখ্যান করে না বরং প্রতিহত করে। কেননা, তা মর্যাদা ও চরিত্রের ন্যূনতম নীতিমালার পরিপন্থী। অবাধ মেলা-মেশা পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর সুনামের জন্য ক্ষতিকর। বিয়ে না হলে পাত্রীর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অপবাদ উত্থাপিত হতে পারে। ফলে, তা অনেক লোকের বিয়ের পথে অন্তরায় এবং বিয়ের বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টির নিয়মাবলী : স্ত্রীর সকল কিছু দেখা স্বামীর জন্য জায়েয, চাই তাতে যৌন বাসনা উপস্থিত থাক বা না থাক। কেননা, স্পর্শ ও যৌন মিলন জায়েয হবার এ দু'টো ছাড়াও অবশিষ্ট শরীর দেখা উত্তমরূপেই জায়েয। যদিও উত্তম বিষয় হলো পরস্পর পরস্পরের সতর না দেখা। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি আমার এবং আমি তাঁর গুপ্তাঙ্গ দেখিনি।'

মূল কথা হলো স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সকল কিছু দেখা জায়েয। এ মর্মে মুয়া'ওইয়া বিন হিদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কতটুকু সতর ঢাকবো এবং কতটুকু ছাড়বো? তিনি জবাবে বলেন, তুমি তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্যদের কাছে নিজ সতরের হিফাজত কর।' (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে নিজ স্ত্রী ও বাঁদী ব্যতিত। এতে কোন দোষ নেই।' (সূরা মোমেনুন-৪)

(ঘ) অমোহরম নারীকে দেখা : কোন বালেগ পুরুষের কোন অমোহরম নারীকে দেখা নাজায়েয যদিও যৌন কামনা না থাকে।

অমোহরম পুরুষ বলতে বোঝায়, সে পুরুষ যার সাথে একজন মেয়েলোকের বিয়ে জায়েয। যেমন চাচাত, ফুফাত, খালাত ভাই ইত্যাদি।

অমোহরম নারী বলতে বোঝায়, যাকে কোন পুরুষের বিয়ে করা জায়েয। যেমন, চাচাত, ফুফাত, খালাত বোন ইত্যাদি।

কোন কিশোর যদি বালেগ হয় কিংবা সুন্দরী-অসুন্দরী নারীর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে, তারও অমোহরম নারীকে দেখা নাজায়েয।

কোরআনের প্রমাণ : আল্লাহ্ বলেন, 'হে নবী আপনি মোমেন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম বিষয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। হে নবী, আপনি মুসলিম রমণীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।' (সূরা নূর : ৩০-৩১)

হাদীসের প্রমাণ

তাবারানী ও হাকেম আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। 'দৃষ্টি ইবলিসের তীর। যে আমার ভয়ে তা ত্যাগ করে, আমি এর পরিবর্তে তাকে এমন ঈমান দান করি, যার স্বাদ সে অন্তরেও পায়।' হাকেম বলেছেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

মোসনাদে আহমদ এবং তাবারানীতে আবু উমামা নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'কোন নারীর সৌন্দর্যের প্রতি নজর পড়ার পর যদি কোন মুসলিম নিজ চোখ অবনত করে, আল্লাহ্ তার ইবাদতকে স্বাদযুক্ত করে দেন।'

আহমদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম ওবাদা বিন সামেত থেকে এবং তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো। সেগুলো হলো, তোমরা সত্য কথা বলবে, ওয়াদা পূরণ করবে, আমানত ফেরত দেবে, গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করবে, চোখ অবনত করবে এবং মানুষকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকবে।'

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আদম সন্তানের ভাগ্যে যেনা-ব্যভিচারের একটা অংশ লেখা হয়েছে, যা সে অবশ্যই পাবে। দৃষ্টি দু' চোখের যেনা, শোনা দু' কানের যেনা, কথা মুখের যেনা, স্পর্শ করা হাতের যেনা, সে উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা, মন কামনা করে এবং লজ্জাস্থান তাকে সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে। (বোখারী ও মুসলিম)

জারীর (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে আকস্মিক দৃষ্টির হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, তোমরা দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও'। (মুসলিম, তিরমিযী)

উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি এবং মাইমুনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ছিলাম। হিজাবের হুকুম নাযিলের পর আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম সেখানে হাজির হন। নবী (সা) বলেন, তোমরা উভয়েই তার থেকে হিজাব (পর্দা) কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে কি অন্ধ নয় এবং আমাদেরকে তো দেখতে পায় না? তিনি বলেন, তোমরা কি অন্ধ, যে তাকে দেখছো না?' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ সকল হাদীস অমোহরম নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিকে হারাম করেছে। অনুরূপ, অমোহরম পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিকেও হারাম করেছে, যদি এক মজলিসে হয় এবং তাতে ফেতনার আশংকা থাকে। সাইয়েদ কুতুব তাফসীর 'ফি জিলালিল কোরআন'-এ বলেছেন, চোখ অবনত করার মাধ্যমে ইসলামের লক্ষ্য হলো, এমন এক পবিত্র সমাজ গঠন, যাতে প্রতি মুহূর্তে কামনা বাসনাকে উত্তেজিত না করা এবং যৌন প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি না দেয়া হয়।

যৌন সুড়সুড়ি এমন উন্মত্ততা সৃষ্টি করে যা নেভে না। খেয়াতমূলক গোপন দৃষ্টি, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়, প্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং দৈহিক নগ্নতা কেবল যৌন উন্মাদনাই সৃষ্টি করে। পবিত্র সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যৌন সুড়সুড়ি ও উত্তেজনা প্রতিরোধ এবং দু'লিঙ্গের মধ্যে বিদ্যমান যৌন প্রবৃত্তিকে সঠিক ও যথার্থ খাতে প্রবাহিত করার জন্য ইসলামের অন্যতম উপায় হলো দৃষ্টি অবনত রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

কারো কারো মতে, নিষ্কলুষ দৃষ্টি, সাদাসিদে কথা, সহজ ও অবাধ মেলা-মেশা, দু'লিঙ্গের হাস্যরস এবং ফেতনার গোপন অঙ্গ দেখায় কোন দোষ নেই। এটা মনের বিনোদন, প্রশান্তি, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি, ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে নাজাত, মানসিক চাপের তীব্রতা এবং এর পেছনে যে অনিরাপদ প্রেষণা রয়েছে তা কমানোর প্রচেষ্টা।

কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে, নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ প্রাণী সৃষ্টির গভীরে প্রোথিত এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে মানব জাতির বিস্তার করে যমীনে মানুষের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। যৌন আকর্ষণ স্থায়ী বিষয় যা এক সময় স্থবির থাকে এবং অন্য সময় সক্রিয় হয়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাকে উত্তেজিত করলে তা কঠোরতর হয় এবং তখন প্রশান্তি লাভের জন্য যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। যদি চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন যৌন স্নায়ুগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর এটাকে অব্যাহত শাস্তির সাথে তুলনা করা যায়।

যে সকল জিনিস উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেগুলো হলো : দৃষ্টি, চাল-চলন, হাসি-ঠাট্টা এবং যৌন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা। এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ পথ হলো, এ সকল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জিনিস কমানো যেন তা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে এবং বিয়ের বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা থাকে। ইসলাম এই মনোনীত পদ্ধতিকে গোটা মানব সমাজের জন্য নির্বাচন করেছে। যাতে করে তারা মানসিক প্রশান্তি, চিন্তার স্থিতিশীলতা, স্নায়ুবিক আরাম এবং সকল মানব সন্তানকে সংযুক্তকারী সুষ্ঠু বন্ধনের আওতায় আসে।

যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি ও দৃষ্টির ক্ষতির ব্যাপারে কবি বলেন,

> *'প্রত্যেক ঘটনার সূচনা দেখা থেকে–ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে বৃহত্তর অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।*
>
> *সংখ্যায় বহু দৃষ্টি ব্যক্তির অন্তরে–বিনা ধনুকের তীর নিক্ষেপ করেছে।*
>
> *ব্যক্তি তার চোখ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অন্যের চোখের উপর ঘোরায়-যা বিপদ ডেকে আনতে পারে।*
>
> *ক্ষতিকর অন্তরের কাজ দেখে দৃষ্টিদানকারী, আনন্দ লাভ করে-কিন্তু ক্ষতিকর আনন্দকে স্বাগত জানানো যায় না।'*

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তিন চোখ দোজখের আগুন দেখবে না। যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছে, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকেছে।' (তাবারানী)

(ঙ) পুরুষের প্রতি পুরুষের দৃষ্টির নিয়ম : অন্য পুরুষের নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান দেখা জায়েয নেই। চাই সে ব্যক্তি আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় এবং মুসলিম কিংবা কাফের হোক। এটা ছাড়া পেট, পিঠ ও বুক দেখা এ শর্তে জায়েয, যদি দৃষ্টিদানকারী যৌন কামনা থেকে নিরাপদ থাকে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস এর প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সতর এবং কোন নারী অন্য নারীর সতর দেখবে না।'

মোসনাদে আহমদ এবং তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

'তুমি তোমার স্ত্রী ও বাঁদী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে সতরের হেফাজত কর।'

হাকেম রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান সতর।'

হাকেমের অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে। নবী (সা) এক ব্যক্তির উরু খোলা দেখে তাকে উপদেশ দেন, 'তুমি উরু ঢেকে রাখো, নিঃসন্দেহে উরু সতর।'

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'উরু সতর।'

এ সকল প্রমাণ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পুরুষের নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান খোলা জায়েয নেই। চাই খেলাধুলা, সাঁতার, প্রশিক্ষণ এবং গোসলখানা যেখানেই হোক না কেন এবং যৌন কামনা থেকে নিরাপদ হলেও। কেউ যদি তার সতরের অংশ বিশেষ খোলার আহ্বান জানায়, তাহলে নিম্নোক্ত হাদিসের আলোকে তার আনুগত্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহর নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

যারা বলে মালেকী মাজহাবে সতর দু'টো। লজ্জাস্থান ও গুহ্যদ্বার। এছাড়া বাকী অঙ্গগুলো সতরের বাইরে। এ বক্তব্য ঠিক নয়। বরং তা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি। মালেকী মাজহাবে সতর দু'প্রকার। ১. নামাযের সতর ২. দৃষ্টির সতর। নামাযের সতর আবার দু'প্রকার।

১. কঠিন সতর : সেটা হলো লজ্জাস্থান ও গুহ্যদ্বার।

২. হালকা সতর : সেটা হলো হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত।

তাদের মতে নামাযে হালকা সতর খুলে গেলে ওয়াক্তের ভেতর নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর ওয়াক্ত চলে গেলে পড়া লাগবে না।

দৃষ্টির সতর : এটা সর্বাবস্থায় হারাম। এটা কঠোর বা হালকা সতর যাই হোক।

এক পুরুষের সতর অপর পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।

নারী মুসলিম হলে তার সতর অপর নারীর জন্য নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।

এক মত অনুযায়ী, মুসলিম নারীর সতর অমুসলিম নারীর জন্য দু' হাতের কব্জি ও মুখ ছাড়া সারা শরীর। অন্য একমত অনুযায়ী, সারা শরীর।

মোহরম পুরুষের সাথে মুসলিম রমণীর সতর হলো, মুখ, দু' হাত, মাথা, ঘাড় ও পায়ের পাতা ব্যতিত অবশিষ্ট শরীর যা দেখা জায়েয নেই। এই হচ্ছে মালেকী মাজহাবের মত।

চার মাজহাবের ইমামগণের দৃষ্টিতে, পুরুষের জন্য পুরুষের সতর হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী স্থান। তাই এ অংশটুকু দেখা নাজায়েয। আর অবশিষ্ট শরীর দেখা জায়েয।

আনাস বিন মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহর (স) খায়বর যুদ্ধের সময় আমরা সেখানে চাশতের নামায পড়ি। এরপর নবী (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করেন। আমি আবু তালহার সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করি। নবী (সা) দ্রুত চলেন। আমার দু, হাঁটু তাঁর উরু স্পর্শ করে। তাঁর উরু থেকে ইজার সরে যায়। আমি তাঁর উরুর শুভ্রতা দেখতে পাই। ইমাম নওয়ী বলেন, আক্রমণ ও দ্রুত চলার কারণে নবীর (সা) উরুর কাপড় সরে যায়। এর মানে এই নয় যে, সতর হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা খোলা রাখতেন। তাতে আনাসের আকস্মিক নজর পড়ে যায়।

ইবনু হাযেম এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, উরু সতর নয়। কিন্তু ফিকাহবিদরা এর জবাবে বলেন,

১. কয়েকটি হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, পুরুষের উরু সতর। (মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) বোখারী জারহাদের সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছ দিয়ে অতিক্রমের সময় আমার উরুর কাপড় সরে গেলে তিনি বলেন, উরু ঢাক, এটা সতর।

২. উসুলে হাদীসের আলোচকরা বলেছেন, দু'হাদীসের মধ্যে বিরোধ থাকলে, সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হলে তা করা উচিৎ। ইমাম নওয়ীর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা সমাঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. ওলামায়ে উসুলে হাদীসের মতে, সামঞ্জস্য বিধান করা না গেলে, হালাল ও হারামের মধ্যে হারামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই নীতি অনুযায়ীও উরু খোলা হারাম।

৪. বোখারী ও মুসলিমের বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবুয়্যতের আগে ও শৈশবে যেখানে নবী এর উরু খোলা নিষিদ্ধ ছিলো, নবুয়্যতের পরে তা কী করে খোলা রাখবেন?

৫. বিনা প্রয়োজনে উরু খোলা রাখা সুস্থ রুচি বিরোধী, বরং তা লজ্জা শরমের পরিপন্থী। তা ইসলামের সামাজিক ও নৈতিক নিয়মেরও খেলাফ।

(চ) নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টির নিয়ম : এক নারী আরেক নারীর নাভী থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান দেখা জায়েয নেই। চাই সে আত্মীয় ও অনাত্মীয় কিংবা কাফের ও মুসলিম যাই হোক। এর প্রমাণ :

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সতর এবং কোন নারী অন্য নারীর সতর দেখবে না।'(মুসলিম)

'হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী স্থান সতর।' (হাকেম)

'উরু সতর।' (তিরমিযী)

এ সকল দলিল প্রমাণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় :

নারীর জন্য তার কন্যা, বোন, মা, নারী প্রতিবেশী ও বান্ধবীর সতর দেখা জায়েয নেই, চাই তা গোসলখানা বা অন্য কোথাও হোক। এই নিষেধাজ্ঞার হেকমত হলো, নারী যেন ফেতনা বা উত্তেজক জিনিস দেখে যৌন উত্তেজনার শিকার না হয়। হতে পারে এই উত্তেজনা তাকে অন্য নারীর সাথে সমকামিতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বিশুদ্ধ হাদীসে এটাকে কিয়ামতের একটা লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর সমকামিতা।'

তাই সম্ভ্রমবোধের ব্যাপারে মুসলিম নারীর উচিৎ, অন্য নারীর সতর না দেখা। চাই তা গোসলের সময় কাপড় খোলা, শরীর ঘষা-মাজা করা এবং বিয়ের অনুষ্ঠান– যেখানে হোক না কেন। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে উলঙ্গপনা দেখলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। পুরুষদের উচিৎ নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে পাবলিক টয়লেটে নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও ফ্যাসাদের অনুমতি না দেয়া। বিভিন্ন সমাজে এর প্রচলন দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি যেন নিজ স্ত্রীকে পাবলিক টয়লেটে প্রবেশ না করায়।' (নাসাঈ, তিরমিযী, হাকেম। তিরমিযী এটাকে হাসান হাদিস বলেছেন)

তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হেমস ও সিরিয়ার মহিলারা আয়েশা (রা)-এর কাছে আসে। আয়েশা (রা) বলেন, 'তোমরা নাকি মহিলাদেরকে পাবলিক টয়লেটে প্রবেশের অনুমতি দাও? আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলতে শুনেছি, 'যে নারী স্বামীর ঘর ছাড়া অন্যত্র কাপড় খোলে, সে নিজের ও রবের মধ্যে সতর লঙ্ঘন করে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, তোমাদের জন্য অনারব ভূ-খণ্ড বিজিত হবে। সেখানে তোমরা গোসলখানার নামে ঘর দেখতে পাবে। পুরুষরা যেন তাতে ইজার পরে প্রবেশ করে এবং অসুস্থ ও সন্তান প্রসবকারী নারী ছাড়া অন্য নারীদেরকে তা থেকে বিরত রাখবে।' (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

(ছ) কাফের নারীর মুসলিম নারীকে দেখার নিয়ম : কাফের নারীর সামনে কোন মুসলিম নারীর পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় কেবল হাত, পা ও মুখ ছাড়া কোন ফেতনার অঙ্গ দেখানো জায়েয নেই। সূরা নূরের ৩১ নাম্বার আয়াতে মহিলারা যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে তাদের মধ্যে 'নিসায়িহিন্না'

শব্দের উল্লেখ আছে। অর্থ : 'তাদের নারীদের সামনে।' অর্থাৎ মুসলিম নারীদের সামনে ছাড়া অন্য নারীদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। তবে মজলিসের মুসলিম নেককার নারী হতে হবে। পাপীয়সী কিংবা কাফের নারী নয়। মালেকী মাজহাবের 'শরহুল কবীর' গ্রন্থের টীকা লেখক আল্লামা দুসুকী, এর হেকমত এই উল্লেখ করেছেন, যেন কাফের নারী তার স্বামীর কাছে মুসলিম রমণীর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে না পারে। নিষেধাজ্ঞা সতরের কারণে নয় বরং অন্য কারণে। অনুরূপ ফাসেক নারীও যেন তার স্বামীর কাছে নেককার মুসলিম নারীর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে না পারে। 'আল-হাদিয়্যাতুল আ'লাইয়াহ' গ্রন্থে একথা উল্লেখ আছে।

শেখ আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী (র) নিসায়িহিন্না' শব্দের ব্যাখ্যায় তাঁর তাফসীর তাফহীমুল কোরআন-এ বলেছেন, *'তাদের নারীরা' বলতে ওই সকল রমণীকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সাথে সাহচর্য, সেবা ও পারস্পরিক পরিচিতির সম্পর্ক রয়েছে; চাই তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। এই আয়াতের লক্ষ্য হলো, অমোহরম মহিলার সংজ্ঞা থেকে তাদেরকে খারিজ করা যাদের চরিত্র আদব শিষ্টাচার ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে কিছু জানা নেই। কিংবা বাহ্যিকভাবে সন্দেহজনক অবস্থার কারণে যারা নির্ভরযোগ্য নয়। এখানে বিবেচ্য বিষয় ধর্ম নয় বরং চরিত্র। মুসলিম নারীরা বিনা পর্দায় সেখানে নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবে, যে ঘরের নারীদের চরিত্র সম্পর্কে তারা পূর্ব পরিচিত। এতে মুসলিম অমুসলিমের ব্যবধান নেই। পক্ষান্তরে ফাসেক নারীরা নির্লজ্জ, তাদের চরিত্র অনির্ভরযোগ্য ও আদব-শিষ্টাচার অজ্ঞাত। তাই নেক মুসলিম মহিলাদের উচিৎ, তাদের কাছে পর্দা করা। কেননা, ক্ষতির দিক থেকে তারা অমোহরম পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।*

প্রশ্ন হলো, আজকের যুগে মর্যাদা নেক ও চরিত্রের অধিকারী অমুসলিম রমণী কোথায়? হতে পারে তা সীমিত কোন পরিবেশে থাকতে পারে, সাধারণ পরিবেশে নয়। তাই মুসলিম নারীর উচিৎ, অমুসলিম ও ফাসেক মুসলিম নারীর খারাপ চারিত্রিক প্রভাবমুক্ত থাকা।

(জ) দাঁড়ি গজায়নি এমন যুবকের প্রতি তাকানো : সাধারণত, ১০-১৫ বছরের ছেলেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বেচা-কেনা, দেয়া-নেয়া, চিকিৎসা ও শিক্ষাদানের মতো প্রয়োজনে তাদের প্রতি তাকানো জায়েয। তাদের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য তাকানো জায়েয নেই। কেননা তা যৌন কামনার কারণ হতে পারে যা পরে

ফেতনাও সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রমাণ হলো সূরা নূরের ৩০ নাম্বার আয়াত। 'হে নবী, আপনি মোমেন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে।'

আমাদের নেক পূর্বসূরীরা দাঁড়ি গজায়নি, এমন ছেলেদের প্রতি না তাকানোর ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ি করেছেন।

* হাসান বিন জাকওয়ান বলেন, لاَ تُجَالِسُوْا اَوْلاَدَ الْاَغْنِيَاءِ فَاِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ الْعَذَارى وَهُمْ اَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ النِّسَاءِ 'তোমরা ধনীদের ছেলেদের সাথে ওঠা-বসা করো না। কেননা তাদের আকৃতি কুমারী মেয়েদের মতো এবং তারা নারী অপেক্ষা অধিক ফেতনার কারণ।'

সুফিয়ান সাওরী গোসলখানায় প্রবেশ করেন। এক সুন্দর চেহারার বালকও প্রবেশ করলো। তিনি বলেন, তাকে আমার কাছ থেকে বের কর। আমি একজন নারীর সাথে একজন শয়তান এবং শ্মশ্রুবিহীন একজন বালকের সাথে ১৭ জন শয়তান দেখি।

* ইমাম আহমদের কাছে এক ব্যক্তি এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছেলে নিয়ে হাজির হলো। তিনি প্রশ্ন করেন, এই ছেলেটি তোমার কি হয়? লোকটি জবাবে বলে, আমার ভাগিনা। তিনি বলেন, দ্বিতীয়বার তাকে নিয়ে আমার কাছে এসো না এবং তুমিও তাকে নিয়ে রাস্তায় চলো না। তোমাকে যারা চেনেনা, তারা তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে।

* সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব বলেন, কেউ যদি শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে গভীরভাবে তাকায়, তাকে দোষারোপ করবে।

এ জাতীয় বালকের দিকে না তাকানোর উদ্দেশ্য হলো, অশ্লীল কাজে পতিত হবার আশংকা ও ফেতনা থেকে বাঁচা।

(ঝ) অমোহরম পুরুষের প্রতি নারীর তাকানো : কোন মুসলিম মহিলা রাস্তায় চলাচলকারী পুরুষ, জায়েয খেলা-ধুলাকারী এবং বেচা-কেনায় জড়িত পুরুষের প্রতি তাকাতে পারে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) ঈদের মসজিদে নবওয়ীর আঙিনায় ইথিওপিয়ান নিগ্রোদের যুদ্ধাস্ত্রের খেলা উপভোগ করেন। আয়েশা (রা) তাঁর পেছন থেকে ওই খেলা উপভোগ করেন। তিনি তাঁকে আড়াল করে রাখেন, যে পর্যন্ত না তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসেন। এটা সপ্তম হিজরী সালের ঘটনা।

অপরদিকে নবী (সা) উম্মে সালামাহ ও মাইমুনাকে অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়ে 'তোমরাও কি অন্ধ?' একথা বলে একই মজলিসে সামনা সামনি বসে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর 'পর্দা ও ইসলাম' বইতে লিখেছেন, 'পুরুষের চোখে নারীকে এবং নারীর চোখে পুরুষকে দেখার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সামান্য পার্থক্য আছে।. পুরুষের প্রকৃতিতে অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করার প্রবণতা আছে। কোন কিছু মনোপুত হবার পর সে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু নারী প্রকৃতিতে আছে বাধা প্রদান ও পলায়নপরতার প্রবণতা। যে পর্যন্ত তার প্রকৃতি পরিবর্তন না হয়, সে পর্যন্ত সে এতখানি নির্ভীক ও দুঃসাহসী হতে পারে না যে কেউ তার মনোপুত হওয়ার পর তার দিকে ধাবিত হবে। শরীয়তদাতা এ পার্থক্যের প্রতি রক্ষ্য রেখে নারীর জন্য পুরুষকে দেখার ব্যাপারে ততখানি কঠোরতা আরোপ করেনি, যতখানি করেছে পুরুষের পক্ষে নারীকে দেখার ব্যাপারে। কেননা, হাদীসের কিতাবগুলোতে আয়েশা (রা)-এর এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ যে, নবী (সা) তাকে ঈদ উপলক্ষে নিগ্রোদের খেলা দেখিয়েছেন। এটা থেকে জানা যায় যে, নারীর জন্য পুরুষকে দেখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু একই সমাবেশে উভয়ের মিলিত বসা এবং অপলক নেত্রে দেখা নিষিদ্ধ। এমন দৃষ্টিও জায়েয নেই যা দ্বারা কোন অনাচার হতে পারে।

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়েশা (রা)'র নিগ্রোদের খেলা দেখার হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, অমোহরম নারীর অমোহরম পুরুষ দেখা জায়েয, কিন্তু অমোহরম পুরুষের অমোহরম নারীর দিকে তাকানো জায়েয নেই। এজন্যই নারীদের নেকাব পরে মসজিদ, বাজার ও সফর জায়েয, যেন পুরুষ তাদেরকে দেখতে না পারে। পক্ষান্তরে পুরুষদেরকে যেন নারীরা দেখতে না পায়, সে জন্য নেকাব পরতে বলা হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দু' দলের হুকুম ভিন্ন।

এর ভিত্তিতে ইমাম গাজালী বলেন, আমরা বলি না যে, নারীর কাছে পুরুষের মুখ সতর, যেমন নারীর মুখ পুরুষের কাছে সতর। ফেতনার আশংকা হলে পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি নাজায়েয, আর তা না হলে নয়। এজন্যই যুগে যুগে পুরুষের মুখ খোলা এবং নারীর মুখে নেকাব। উভয়ের বিষয়টি সমান হলে পুরুষের নেকাব পরা এবং নারীকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হতো।

এ আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, অমোহরম পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি দু' শর্তে জায়েয। ১. ফেতনার আশংকা নেই। ২. একই মজলিসে মুখোমুখি হয়ে অপলক নেত্রে তাকানো।

(ঞ) ছোটদের সতর দেখা : ফেকাহবিদদের মতে, চার বছর বা কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সতর বিবেচিত নয়। চার বছরের অধিক হলে, তার দু' গুপ্তাঙ্গ ও এর আশ-পাশ সতর হিসেবে বিবেচিত। তবে তা দেখলে যদি যৌন কামনা সৃষ্টি হয়, তাহলে এর হুকুম বালেগের হুকুমের মতোই নাজায়েয। ছোট থাকতেই সতরের বিষয়ে অভ্যস্ত করানো উত্তম।

(ট) যে সকল প্রয়োজনে দৃষ্টি দেয়া জায়েয : কোন পুরুষ কোন অমোহরম নারীকে দেখা জায়েয নেই যদিও সেটা অনাকর্ষণীয় পুতুল হয় এবং যদিও যৌন কামনা থাক বা না থাক। এর প্রমাণ হলো সূরা নূরের ৩০ নাম্বার আয়াত। আল্লাহ বলেন, 'মোমেনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জা স্থানের হেফাজত করে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নাও।' (মুসলিম)

কিন্তু নিম্নোক্ত জরুরী ক্ষেত্রগুলো এর ব্যতিক্রম :

১. বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রের পাত্রী দেখা।

২. শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাজগোজবিহীন অমোহরম মহিলার প্রতি কতিপয় শর্তে তাকানো জায়েয :

* দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণসহ শরীয়তসম্মত জ্ঞান হতে হবে।

* নার্সিং ও ডেলিভারীর মতো বিশেষজ্ঞ জ্ঞান শেখা।

* মুখের দিকে তাকালে ফেতনার আশংকা না থাকা।

* শিক্ষা গ্রহণের সময় নির্জনতা না থাকা।

* পুরুষের স্থানে শিক্ষা দেয়ার জন্য মহিলা না থাকলে, মহিলা ছাত্রী পুরুষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

এ সকল শর্তারোপের মাধ্যমে ইসলাম পূত-পবিত্র সমাজ গঠন করতে চায়, য়েন সন্দেহ সংশয় কোন অভিযোগ না থাকে এবং যুবতী যেন নিষ্কলুষ ও পবিত্র থাকে। তার প্রতি যেন কোন পাপীর হাত এগিয়ে না আসে এবং কোন

খেয়ানতকারীর চোখ তার প্রতি না তাকায়। আল্লাহ যথার্থ বলেছেন, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ 'এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।' (সূরা আহযাব-৫৯)

৩. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দেয়া : চিকিৎসক অমোহরম মুসলিম নারীর যে অঙ্গের চিকিৎসা করছে, তা দেখতে পারবে। মুসলিম শরীফে উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি শিঙ্গা লাগানোর জন্য নবী (সা)-এর অনুমতি চান। নবী (সা) তাঁকে শিঙ্গা লাগানোর জন্য আবু তাইয়েবাকে আদেশ দেন।

অমোহরম মহিলাকে চিকিৎসার লক্ষ্যে চিকিৎসকের জন্য শর্তগুলো হচ্ছে :

১. চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ হবেন ও পরহেজগার, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হবেন।

২. যতটুকু দেখার প্রয়োজন এর বেশী অঙ্গ দেখবেন না ।

৩. পুরুষ ডাক্তারের স্থলে বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার না থাকা।

৪. চিকিৎসার সময় স্বামী, অন্য কোন মোহরম পুরুষ কিংবা মা-বোন ও নির্ভরযোগ্য মহিলা প্রতিবেশীর উপস্থিতি জরুরী।

৫. মুসলিম চিকিৎসক থাকতে অমুসলিম চিকিৎসকের কাছে না যাওয়া।

এসকল শর্ত পাওয়া গেলে পুরুষ ডাক্তারের নারীর অঙ্গ দেখা বা স্পর্শ করা জায়েয। কেননা ইসলাম মানুষের কষ্ট দূরকারী এবং কল্যাণ ও উপকারী দ্বীন।

আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 'তিনি দ্বীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা ও কষ্ট রাখেননি।' (সূরা হজ্জ-৭৮)

আল্লাহ আরো বলেন, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা কামনা করেন না।' (সূরা বাকারা-১৮৫)

৪. বিচার ও সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে দেখা : বিচারক ও সাক্ষীর পক্ষে ফেতনার আশংকা থাকলে ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম প্রতিরোধের লক্ষ্যে নারীর মুখ ও দু' হাতের কবজি দেখা জায়েয। কেননা নেকাব পরিহিতা মহিলা তাদের কাছে পরিচিত না হওয়ায় তাকে দেখা জায়েয আছে। এ অবস্থায় নারী তার মুখ খুলবে যেন তার যথার্থ পরিচয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ না থাকে। ইসলাম হচ্ছে, বাস্তবতা ও জীবনের দ্বীন, যা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত এবং তাদের অধিকারের হেফাজত করে।

সম্ভ্রমবোধের অভিমানী নারী পুরুষের জন্য আমাদের পূর্বসূরী এক নেক লোকের

কাহিনী তুলে ধরবো যাতে বোঝা যায় যে, তিনি জায়েয হওয়া সত্ত্বেও পর পুরুষের সামনে স্ত্রীর মুখ খোলাকে বিব্রতকর মনে করতেন।

তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে রাই ও আহওয়াজের বিচারক মূসা বিন ইসহাক লোকদের বিচার করতেন। এক নারী স্বামীর বিরুদ্ধে ৫০০ দিনার দেন মোহরের দাবী জানায়। স্বামী তা অস্বীকার করে। বিচারক সাক্ষী হাজির করার নির্দেশ দেন। সাক্ষী হাজির হলে বিচারক সাক্ষীকে মহিলার দিকে তাকানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, সাক্ষী দানের সময় তার দিকে ইঙ্গিত করবে। সাক্ষী মহিলাকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। স্বামী প্রশ্ন করে, তুমি কী করতে চাও? বলা হলো, সাক্ষীকে অবশ্যই মহিলার মুখ দেখে তার যথার্থতা যাচাই করে সাক্ষ্য দিতে হবে।

স্ত্রী অন্যদের সামনে মুখ খুলুক, স্বামী তা অপছন্দ করলেন এবং চিৎকার দিয়ে বললেন, স্ত্রী আমার কাছে ৫০০ দিনার পাবে। তার মুখ খোলার প্রয়োজন নেই। স্ত্রী এ অবস্থা দেখে এবং স্বামীর কথা শোনে বিচারকের সামনে জোরে বললো, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার এই মোহর স্বামীকে দান করে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্ত করে দিলাম। বিচারক মুহুরীদেরকে বললো, এ ঘটনাকে উন্নত চরিত্রের মধ্যে গণ্য কর।

৩. সন্তানকে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে দূরে রাখা : অভিভাবকের কর্তব্য হলো, দশ বছর থেকে বালেগ হবার সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সন্তানকে যৌন উত্তেজনা এবং চরিত্র বিধ্বংসী বিষয় থেকে দূরে রাখা। শিক্ষা ও নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে, কৈশোর মানব জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়। সন্তান গঠনকারী যদি জানে যে, কীভাবে সন্তান গঠন করতে হবে, কীভাবে তাদেরকে ফ্যাসাদের জঞ্জাল এবং উলঙ্গপনার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, কীভাবে তাদেরকে উত্তম দিক নির্দেশ দিতে হবে, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান উন্নত চরিত্র, উত্তম আদব-শিষ্টাচার এবং মহান ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠবে। নিম্নোক্ত দলিল প্রমাণগুলো সন্তানকে যৌন উত্তেজক জিনিস থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়।

আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশ চাদর বা বড় ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে এবং নিজেদের স্বামী ও বাবাদের... কিংবা নারীর সতর সম্পর্কে অনবহিত শিশুর সামনে ছাড়া নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে...।' (সূরা নূর-৩১)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নারীর অবস্থা ও সতর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এমন শিশুদের তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে বাধা নেই। কিন্তু যদি কিশোর

বা এর নিকটবর্তী বয়সে হয়, অর্থাৎ নয় বছর পরবর্তী বয়সের পর্যায়ে হয় তাহলে নারীদের কাছে তাদের প্রবেশ জায়েয নেই। কেননা, তারা তখন সুন্দরী অসুন্দরী নারীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানে। ফলে উত্তেজক জিনিস দেখলে যৌন কামনা জাগতে পারে।

ইবনে কাসীর 'নারীর সতর সম্পর্কে অনবহিত শিশু'–এ বিষয়ের তাফসীরে লিখেছেন, শিশু যদি ছোট হবার কারণে নারীর অবস্থা ও সতর কোমল কথা-বার্তা ও আকর্ষণীয় চাল-চলন এবং তৎপরতা বুঝতে অক্ষম হয়, তাহলে নারীদের কাছে তাদের প্রবেশে কোন অসুবিধা নেই।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা নারীদের কাছে প্রবেশ করো না। জিজ্ঞেস করা হলো, দেবরের ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি বলেন, দেবরতো মৃত্যু সদৃশ।' অর্থাৎ দেবরকে দেখা দেয়া জায়েয নেই।

হাকেম ও আবু দাউদে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামায পড়ার আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে মারো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, মাতা-পিতার প্রতি শরীয়তের হুকুম হলো, দশ বছর বয়সে সন্তানকে পৃথক বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করা। কিশোর বয়সে এক বিছানায় একত্রে ঘুমালে ঘুম কিংবা জাগ্রত অবস্থায় একে অপরের সতর দেখতে পারে, যা যৌন উত্তেজনার কারণ হতে পারে। ফলে তাদের চরিত্রে ধ্বস নামতে বাধ্য। যৌন উত্তেজনা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলাম অভিভাবককে ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়, যেন তারা উন্নত চরিত্রের উপর গড়ে উঠতে পারে।

বোখারী শরীফে বর্ণিত। কোরবানীর দিন ফদল বিন আব্বাস নবী করিম (সা) এর সওয়ারীর পেছনে বসা ছিলেন। খাসয়াম গোত্রের এক সুন্দরী মহিলা নবী (সা) কে দ্বীনের ব্যাপারে মাসলা জিজ্ঞেস করার সময় ফদল তার দিকে তাকিয়ে থাকায় নবী (সা) তার থুতনি ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।'

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে। আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করেন, 'আপনিতো আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় ফিরিয়ে দিলেন। তখন নবী (সা) বলেন, আমি একজন যুবক ও যুবতীকে ফেতনা থেকে নিরাপদ দেখতে পাইনি।' (তাই ঘাড় ফিরিয়ে দিয়েছি)

এ সকল বর্ণনায় নবী (সা)-এর কাজ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক সাবালকদের পথ নির্দেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন যেন তাদের চরিত্র গঠন ও যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তাদেরকে বিপর্যয় ও বেহায়াপনার হাত থেকে নিরাপদ রাখা যায়। সন্তান গঠন ও শিক্ষার বিষয়ে নবী (সা)-এর এ সকল দিক নির্দেশের লক্ষ্য হলো, ভবিষ্যৎ বংশধরের সংশোধন ও শিক্ষা এবং সামাজিক বিকৃতির সংস্কার সাধন। সন্তানকে যৌন উত্তেজক বিষয় থেকে বাঁচানোর জন্য অভিভাবককে দু' পর্যায়ে কাজ করতে হবে :

প্রথম : আভ্যন্তরীণ তদারকি, দ্বিতীয় : বহির্মুখী তদারকি।

প্রথম: **আভ্যন্তরীণ তদারকি :**

- সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো, যৌন প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি দানকারী সকল বিষয় ও উপকরণ থেকে দূরে রাখার বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা।
- ভালো মন্দ বিবেচনার বয়সে পৌঁছলে বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় যেমন, ফজরের আগে, দুপুরে এবং এশার নামাযের পরে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে দিলে তার মধ্যে কামভাব দেখা দিতে পারে। কেননা সন্তান সাধারণত আকস্মিকভাবে সতর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবার জন্য প্রবেশ করে যা দেখা অভিভাবকরা অপছন্দ করে। তাই সন্তানকে এই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেয়া অভিভাকের দায়িত্ব।
- সুসজ্জিত অমোহরম মহিলার কাছে নয় বছর পরবর্তী কিশোর বালকদের প্রবেশ কামভাব সৃষ্টিতে সহায়ক। তাই অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে সেখানে যেতে না দেয়া।
- দশ বছর বয়সের কিশোর ভাই কিংবা বোনের এক লেপের নীচে থাকলে বিশেষ করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমালে কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই তাদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।
- ভালো-মন্দ বিবেচনার বয়স কিংবা পরবর্তী বয়সে পৌঁছার পর নারীর সতরের খোলা অংশের প্রতি অপলক নেত্রে তাকালে কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই শিশুকে শৈশবেই দৃষ্টি দানের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতে হবে।
- ঘরে টেলিভিশনের পর্দায় কামোদ্দীপক দৃশ্য, অশ্লীল নাটক ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা দেখলে কিশোর মনে যৌন কামনা সৃষ্টি হতে পারে। তাই অভিভাবকের উচিৎ ওই জাতীয় অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত রাখা।

- কিশোরকে নগ্ন ছবি ও ম্যাগাজিন ধারণ, উত্তেজক প্রেম-কাহিনী পড়া এবং লারে লাপ্পা গান বাজনা শুনতে দিলে সে খারাপ হতে বাধ্য। তাই এ সকল হারাম কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে।
- কিশোরকে নিকটাত্মীয়া ও প্রতিবেশীর মেয়ের সাথে লেখা পড়ার অজুহাতে বন্ধুত্ব করতে অনুমতি দেয়া হলে তা কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। তাই অভিভাবকের কর্তব্য হলো, ছেলের সাথে মেয়েদের সম্পর্ক যেন গভীর না হয়। তা না হয় নেক চরিত্রের উপর বিরাট বিপদের আশংকা আছে।

মোট কথা, সন্তান গঠনকারী অভিভাবককে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সন্তানের সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ **বহির্মুখী তদারকি** : আভ্যন্তরীণ তদারকি থেকে এটি মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সন্তানের চরিত্র ধ্বংসের উপায় উপকরণ অগণিত। এখন আমরা অধিক ধ্বংসাত্মক কারণ ও উপকরণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা কামভাব সৃষ্টি ও যৌন প্রবৃত্তির জোয়ার সৃষ্টি করে থাকে।

১. সিনেমা ও নাটকের ক্ষতি : এগুলোতে সাধারণত যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, কামোদ্দীপনা সৃষ্টি এবং নষ্টামী ও উলঙ্গপনার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় যে, আজকাল সিনেমা ও নাটক বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনার মাধ্যম। সিনেমা ও নাটক ইজ্জত-সম্মান হীনকর যৌন প্রবৃত্তির ব্যবসা ও কামাই রোজগারের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং নোংরা মানসিকতা ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতিযোগী ময়দানে রূপান্তরিত হয়েছে। এগুলো ইহুদি ও অমুসলিমদের চিন্তা ও চরিত্রের ফসল, যারা ইসলামের প্রতি বহু মিথ্যা ও জুলুমের অপবাদ লাগিয়েছে।

২. নারীর লজ্জাকর পোশাক : অশালীন পোশাক পরিহিতা নারীর প্রতি কিশোর–তরুণ ও যুবকের দৃষ্টি পড়লে তারা স্থির থাকতে পারে না এবং সুন্দরী, উলঙ্গ ও নষ্ট মেয়েদের খারাপ পোশাক দেখলে নিজ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায় সে তাদের পেছনে ধাবিত হয়।

এ রকম ফ্যাসাদ ও নষ্টামীর মোকাবিলায় কিশোর তরুণরা কি করবে? এ অবস্থা তাদের স্নায়ুকে দুর্বল, চরিত্র নষ্ট এবং গঠনমূলক কাজ থেকে বিরত রাখে।

কে অশালীন পোশাক আবিষ্কার করে? : এক ধরনের ব্যবসায়ী যাদের অধিকাংশই ইহুদি, যারা সর্বত্রই অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়-এটা তাদের আবিষ্কার। তারা

নৈতিক চরিত্রের গোড়া কেটে দিতে চায় এবং ওই সকল জায়গা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা অন্যদের আকীদা বিশ্বাস এবং অন্যদের নষ্ট চরিত্র আমাদের কাছে রপ্তানী করে।

মানসিক লেজুড়বৃত্তি, ঘাটতির অনুভূতি এবং অন্ধ অনুকরণের মানসিকতাই আমাদের সমাজের আবেগপ্রবণ অসচেতন নারীদেরকে লজ্জাকর পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এর মাধ্যমে ফেতনা ও লোভ-লালসা সৃষ্টি করেছে। আমি বুঝি না কীভাবে মুসলিম রমণী ওই নোংরা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, যা তার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বকে ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং তাকে তথাকথিত উন্নতি, প্রগতি ও সভ্যতার নামে বিকৃত করে দিচ্ছে? পোশাকের ঢেউ কোন সীমা মানে না। বরং বিপজ্জনক বিষয় হলো, তা অপরিচিত লোকের মনে আগুন জ্বালায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও মানুষের মধ্যে চমক সৃষ্টিকারী সকল কিছুর আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ফেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও রকমারী পোশাকের কোন তুলনা নেই, যা মানুষকে প্রলুব্ধ ও বিকৃত করে ছাড়ে। বরং এর প্রবণতা এমন যে, শত ত্রুটিপূর্ণ হলেও বিকৃত পোশাক তৈরীর কোন উপায় বাদ দেয়া হয় না, তাতে মানবতার যতই অপমান এবং পশুর মতোই তার মূল্য যতই কমে যাকনা কেন। আধুনিক যুগের নারী সেটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত যা তাকে গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য শত্রুরা করছে। তাদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সকল নূতন মডেলের কাপড় না পরা মানে পশ্চাৎপদতা এবং প্রগতি ও অগ্রগতির কাফেলা থেকে বিচ্যুতি।

ইউরোপীয় ও মার্কিন নারী পোশাকের জালেম ও লক্ষ্যহীন স্রোতের আনুগত্য করতে পারে। কিন্তু একজন মুসলিম নারী তা করতে পারে না। তাকে প্রমোদ গুণতে হবে এর ফলে, অবিবাহিতদের কী বিপদ হতে পারে। তারা যৌন অরাজকতা ও উন্মাদনার শিকার হবে। তাকে বিবেচনা করতে হবে, গরীব, মূর্খ মহিলারা এটাকে গোপনে ব্যভিচারের উপায় ও অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছে। কেননা তারা এ সকল নগ্ন পোশাকের মাধ্যমে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে অন্যদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

তাদের আরো ভেবে দেখা দরকার, নূতন পোশাক ও ডিজাইনের দাবীর কারণে বহু দম্পতি যুগলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হচ্ছে।

মুসলিম রমণীর কাছে ইসলামের দাবী হলো, নিজ চরিত্র, মৌলিক নীতিমালা ও

ইসলামের মূলতত্ত্ব ঠিক রাখা, সমাজের দৃঢ়তা ও প্রশান্তি সংরক্ষণ করা এবং ইজ্জত-সম্মান ও পূর্ণতার মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে হিজাব ও ওড়না পরে কিশোর-তরুণ অবিবাহিত যুবকদের প্রতি দয়া করা। তা না হয়, তাদের সর্বনাশ হবে। এর ব্যতিক্রম হলে, সেটা হবে ইসলামী মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি, গুনাহ ও নাফরমানীর ময়দানে বিচরণ, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও গোমারাহীর পথে পা বাড়ানো। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে।' (সূরা আল আহযাব–৩৬)

৩. প্রকাশ্য ও গোপন বেশ্যাখানা : বেশ্যাখানার মতো অপরাধজনক স্থানে মিলিত হয়ে কত মর্যাদাবান নারী ও পুরুষ ইজ্জত-সম্মান হারিয়েছেন! তারা যেন বেলেল্লাপনার প্রকোষ্ঠে শুকরের মতো হীনতা ও নীচতা এবং পশুর মতো যৌন আচরণে লিপ্ত। এটা নষ্টামী ও যৌন ক্ষুধা পূরণের নোংরা ভূমি, যেখানে আনন্দ ও শারীরিক চাহিদা পূরণকারী এবং বেহায়াপনার শিকার লোকজনের ভীড়। এটা হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসরণের জীবাণু, যা আমাদের শরীরকে আক্রমণ করছে অথবা তা বেহুদা কাজে কালক্ষেপণ এবং মূল্যবান জীবনকে ধ্বংস করছে।

এ সকল বেশ্যাখানা প্রকাশ্য হোক বা গোপনে হোক, যৌন ক্ষুধা মেটানোর সম্প্রসারিত ময়দান, যাতে গুনাহর জীবাণু বৃদ্ধি ও নিজ রবের নাফরমানী করে। মাদকতা ও মাদকাসক্তি এই বন্ধ দরজাটিকে উন্মুক্ত করে, ঘুমন্ত ফেতনা জাগায় এবং মানুষকে দৃঢ়তা ও পবিত্র পয়গামের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে। সর্বোপরি এটা হচ্ছে, হারাম ও বিকৃত যোগাযোগ যা পরিবারকে ধ্বংস, নারীকে বিকৃত ও তার সম্মান নষ্ট এবং অর্থ নাশ করে।

বেশ্যাবৃত্তির বিপদের এখানে শেষ নয়। বরং তা সহজে অর্থ কামানোর জন্য মেয়েদেরকে এ ময়দানে টেনে আনে। ফলে তারা যৌন ক্ষুধা পূরণ এবং সাময়িক উপভোগ করলে ও পরে আরো বহু বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মেয়ে বিশেষ করে ছাত্রীনিবাসের অবস্থানকারীদের কেউ কেউ রাতে বিভিন্ন নামী দামী হোটেলে দেহ ব্যবসা করে।

প্রিয় সন্তান গঠনকারী অভিভাবক, এখন আমরা এ ময়দানে মেয়েদের পা বাড়ানোর কিছু ঘটনা উল্লেখ করবো, যেন আপনাদের সামনে এর একটা পরিষ্কার চিত্র থাকে।

(ক) আরব দেশের এক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে গণিতের শিক্ষিকার

ক্লাসে এক ছাত্রী মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় সে গর্ভবতী। কারণ হচ্ছে ব্যভিচার। তদন্তে দেখা গেছে, সে গোপন বেশ্যাখানার সাথে জড়িত। তার বয়সের আরো পাঁচ ছাত্রীও তাতে জড়িত। তাদের পিতা ও স্কুল এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তদন্তে আরো জানা গেছে, স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই ওই ছাত্রীটি তার বেশ্যা মায়ের ইঙ্গিতে বেশ্যাখানার সাথে জড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সে তার অন্য বান্ধবীদেরকেও মন্দ ও অশ্লীল কাজে প্রলুব্ধ করে। ফলে তারা সকলেই দুঃখজনক পরিণতির শিকার হয়।

(খ) নষ্টামীর জন্য খারাপ সাহচর্যের বিরাট প্রভাব : এক যৌন উন্মাদ পিতা কেবল অবৈধ ক্ষুধা মেটানোর জন্য মন্দ পথে ঘুরে বেড়ায়। একদিন সে এক গোপন বেশ্যাখানায় যায়। পরিচালক তাকে বেশ্যাদের ছবি দেখায়। ছবিতে তার শিক্ষিতা মেয়েকে দেখে সেতো বেসামাল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালককে জিজ্ঞেস করে, আমি এই ছবির বেশ্যাকে চাই। পরিচালক বলে : ওই কক্ষে গেলে তাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাবেন। পিতাকে দেখে মেয়ে ভয়ে অস্থির। সে চিৎকার দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাপের মনে সম্মান ও মর্যাদার অভিমান দেখা দেয়। সে অজ্ঞানে হিংস্র সিংহের মতো মেয়েকে মারার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য লোকদের হস্তক্ষেপের কারণে তাকে জানে মারা সম্ভব হয়নি। যারা এ ঘটনা জানেন তারা বলেছেন, অসৎ সাহচর্যই অর্থাৎ প্রতিবেশীর একটা খারাপ মেয়ে তাকে এ পথে টেনে নিয়েছে। অথচ তার পরিবারের কেউ জানে না, মেয়েটা বেশ্যাবৃত্তি করে।

(গ) একজন সম্ভ্রমবোধসম্পন্ন শিক্ষক এক কফিখানায় তার বন্ধুর তালাশে যান। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কফিখানার দোতলায় উঠতে দেখে কৌতূহলী হয়ে দেখতে যান। তিনি সেখানে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত দেখতে পান।

প্রশ্ন হলো, তাদের মধ্যে কীভাবে এ সম্পর্ক হলো এবং কীভাবে তারা এখানে একত্রিত হলো? এর উত্তর হলো টেলিভিশন, সিনেমা, পর্ণো ম্যাগাজিন, যৌন উপন্যাস ও গল্প, লারে লাপ্পা গান, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নগ্ন ছবি সম্বলিত ম্যাসেজ ইত্যাদি। আর এর পরিণতি হলো এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি।

(ঘ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বহু চিঠি লেখে। তারা সেগুলোতে প্রেমের আবেদন, কবিতা, গান ইত্যাদি লিখে থাকে। ঘরের ও মাতা-পিতার তদারকির অভাবেই এ সকল ঘটনা ঘটছে।

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, মনে ঈমান-আকীদা না থাকলে, চরিত্রহীন হলে, মৃত অন্তর হলে, মন্দ সাথীদের সাথে মিশলে এবং ফাসেকদের সাথে চললে লজ্জাজনক ও দুঃখজনক পরিণতি হতে বাধ্য।

৪. সমাজে উলঙ্গপনার ক্ষতি : কিশোর-যুবকেরা রাস্তায় ও প্রকাশ্য স্থানে কি দেখে? তারা সিনেমার উলঙ্গ বিজ্ঞাপন ও পত্র-পত্রিকায় নগ্ন ছবি দেখে। তাতে উলঙ্গ মহিলারা অত্যন্ত চিত্তহরী পোশাক ও আকর্ষণীয় দৃশ্যে আবির্ভূত হয়। তারা সম্মান ও চরিত্রের ধার ধারে না। স্কুলে যাবার সময় রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলা-মেশা ও ভীড় লক্ষ্য করা যায়। বহু ছাত্র ছাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে অশোভনীয় মন্তব্য করে। সিনেমার গেটে যুবক-যুবতীরা দেখে বেশ্যাদের উলঙ্গ ছবি এবং ভেতরে সিনেমা ও নাটকে দেখে অশ্লীল ছবি। ফলে এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার শিকার তারাই।

৫. খারাপ সাহচর্যের ক্ষতি : আমরা প্রথম খণ্ডে 'সন্তানের বিকৃতির কারণ' অধ্যায়ে 'খারাপ সাথী ও বন্ধুর ক্ষতিকর প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে সন্তান বুদ্ধিমান না হলে, দুর্বল আকীদা ও চরিত্রের অধিকারী হলে, মন্দ ও পাপী লোকদের সাহচর্যের কারণে সে দ্রুত প্রভাবিত হয়। তার আচার অভ্যাস ও চরিত্র খারাপ হয়। সে তাদের সাথে খারাপ পথে চলে। ইবনে হিব্বানে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ব্যক্তি বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই কাকে বন্ধু বানাচ্ছো, তা দেখে নাও।' নবী (সা) আরো বলেন, 'খারাপ সাথী থেকে দূরে থাকো। তার মাধ্যমেই তোমার পরিচিতি।' (ইবনু আসাকের)

৬. ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা : ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা চরিত্র, জ্ঞান, অর্থনীতি ও স্নায়ুর জন্য ক্ষতিকর যদি তারা কৈশোর ও ভালো-মন্দ পার্থক্যের বয়সে পৌছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এ যুক্তিতে চলছে যে, এর ফলে দু'লিঙ্গের যৌন প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ হবে, গোপন কামনা দূর হবে, উভয় লিঙ্গের মিলন স্বাভাবিক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আমরা 'বিবেকের শিক্ষা' অধ্যায়ে এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করে 'অবাধ মেলা-মেশার দাবীদারদের' শক্তিশালী ও দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি।

বাঁচার তিনটি উপায়

অভিভাবককে আভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী তদারকির পাশাপাশি সন্তানের সংশোধনের

জন্য আরো কিছু ইতিবাচক উপায় গ্রহণ করতে হবে। তিনটি ইতিবাচক উপায় আছে। অভিভাবকগণ সন্তানের চারিত্রিক সংশোধন ও যৌন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, তারা ফেরেশতার মতো পবিত্র, নবীর চরিত্রের মতো সুন্দর আদর্শ এবং আধ্যাত্মিক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে খোদায়ী পথ প্রদর্শক হতে পারবে।

সে উপায় তিনটি হলো : ১. সচেতনতা সৃষ্টি ২. হুঁশিয়ার করা ৩. সংযোগ।

১. সচেতনতা সৃষ্টি : শৈশবেই যদি সন্তানকে বোঝানো হয় যে, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বসের পেছনে ইহুদি, কম্যুনিস্ট, ক্রুসেডার ও উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র কাজ করছে, তাহলে সে বড় হলে এবং জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্কতা আসলে, যৌন কামনার নষ্টামী ও ফেতনা ফ্যাসাদে পা বাড়াবে না। নিঃসন্দেহে তাদের ধ্বংসের উপায়গুলো হচ্ছে, যৌন কার্যক্রম, সিনেমা, নাটক, পর্ণ পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন, নগ্ন পোশাক, উলঙ্গ ছবির প্রচার এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বেশ্যাখানা ইত্যাদি। এ বিষয়ে 'দায়িত্বের অনুভূতি' এবং 'বিবেকের শিক্ষা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এখন আমরা সংক্ষেপে দুশমনদের ষড়যন্ত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

*** ইহুদি ও ম্যাসন** : তারা ফ্রয়েডের মতবাদে বিশ্বাসী যা সকল মানুষকে যৌনাকাঙ্ক্ষা ও উন্মুক্ত কামনা-বাসনার দৃষ্টিতে দেখে ও বিচার করে। তারা ইহুদি বংশোদ্ভূত কার্ল মার্ক্সের মতবাদেও বিশ্বাসী যা সকল ধর্মীয় বিশ্বাস, চরিত্র এবং আল্লাহর উপাসনার মূলে কুঠারাঘাত করে। কার্ল মার্ক্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আল্লাহর ইবাদত বিশ্বাসের বিকল্প কী? সে উত্তরে বলে, 'নাট্যমঞ্চ। তাদেরকে ইবাদতের ধারণা থেকে রঙমঞ্চে এনে ব্যস্ত করে দাও।'

তারা নীটসের মতবাদেও বিশ্বাসী যা নেক চরিত্রকে ধ্বংস এবং ভোগ-বিলাসের সকল কিছুকে বৈধ ঘোষণা করে।

তারা সকল স্থানে চারিত্রিক ধ্বস নামানোর কাজে ব্যস্ত। এজন্য যৌন বিষয় এবং নারীকে ব্যবহার করে থাকে। তাদের ও ম্যাসনদের শ্লোগান হলো, 'আমাদের কর্তব্য হলো নারীদেরকে জয় করা, তারা যে দিন আমাদের দিকে হাত বাড়াবে, সেদিন আমরা হারাম কাজে সফল হবো এবং ধর্মের সৈনিকদের উপর জয় লাভ করবো।'

*** উপনিবেশবাদ ও ক্রুসেড** : উপনিবেশবাদের একজন উর্ধ্বতন প্রবক্তার মতে, মদ ও গায়িকা দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীর যে ক্ষতি করা যাবে, তা এক হাজার

কামান দিয়েও পারা যাবে না। তাদেরকে বস্তু ও যৌন কামনা-বাসনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখো।'

একবার জেরুজালেমে খৃস্টান মিশনারীদের সম্মেলনে পাদ্রী যোয়াইমার বলেন, 'আপনারা মুসলিম দেশসমূহে এমন এক প্রজন্ম তৈরী করেছেন, যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয় কিছুই বুঝে না। ফলে উপনিবেশবাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ওই প্রজন্ম মর্যাদাপূর্ণ কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে না, তারা অলস ও আমার প্রিয় এবং দুনিয়ায় তারা যৌন কামনা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। শিক্ষা গ্রহণ করলে যৌন কামনার জন্যই করে, অর্থ সম্পদ কামাই করলেও একই উদ্দেশ্যে করে। বিশাল ও মহান কেন্দ্রগুলোও যৌন কামনার জন্যই। অর্থাৎ তাদের সকল কিছুই যৌন কামনার জন্য নিবেদিত।'

* **কম্যুনিজম** : এ বিষয়ে 'দায়িত্বের অনুভূতি' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে বিষয়বস্তুর সম্পর্কের কারণে আমরা এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

এক কমিউনিস্ট বলে, আমরা ধর্ম বিধ্বংসী গল্প, নাটক, বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকা, কুফরীর দিকে আহ্বানকারী বই পুস্তক যা ধর্ম ও আলেম ওলামার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে, যা কেবল জ্ঞান অর্জন এবং একেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, এগুলোতে সাফল্য লাভ করেছি।'

এ সকল ষড়যন্ত্র ও বক্তব্য প্রমাণ করে ইহুদি, ম্যাসন, কমিউনিস্ট, ক্রুসেডার, খৃস্টান মিশনারী ও উপনিবেশবাদীরা একে অপরের সহযোগী। তারা মুসলিম বিশ্বকে মদ, যৌন নোংরামী, নাটক, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি, ধর্ম বিরোধী বই-পুস্তক প্রচার ও অনৈতিক গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ধ্বংস করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা তাদের এই হীন ও নিকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌছে গেছে। তাই আমরা আমাদের যুবক-যুবতীদেরকে দেখি, তারা আমাদের ভাষা ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও যৌন কামনার পেছনে ছুটছে, অবৈধ ও হারাম পথে পা বাড়াচ্ছে এবং অন্ধ অনুকরণ করে চলছে। তাদের অবস্থা দেখে শোক প্রকাশ করতে হয়। তারা মন্দ ও অশ্লীলতা এবং যৌন উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না। তারা সর্বদা যৌন ফিল্ম, অশ্লীল নাটক, দেখে এবং মর্যাদা ও সম্মান হানির রঙমঞ্চে ঘুরে বেড়ায়। এ হচ্ছে তাদের অবস্থা।

সন্তান গঠনকারীর অন্যতম দায়িত্ব হলো, নিজ সন্তান ও কলিজার টুকরাকে জ্ঞান দান ও সচেতন করা, যেন তারা শত্রুদের ষড়যন্ত্র বোঝে। তাদেরকে বোঝাতে হবে, তারাও যদি অন্যায় ও নষ্টামীর মধ্যে ডুবে যায় এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের পেছনে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তারাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুসলিম দেশে ইহুদি, ক্রুসেডার, কমিউনিস্ট, ম্যাসন, খৃস্টান মিশনারী এবং উপনিবেশবাদীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করবে।

২. **সতর্ক করা** : আমার মতে, সন্তানের সচেতনতা ও জ্ঞান দানের জন্য এ উপায়টি গ্রহণ করা হলে, তাদেরকে হারাম ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে এবং তারা যৌন নোংরামী ও কেলংকারীর সঠিক বিপদ বুঝতে সক্ষম হবে। অভিভাবক যেনা-ব্যভিচার, হারাম যোগাযোগ ও সন্দেহজনক সম্পর্কের বিপদগুলোর বিষয়ে সন্তানকে হুঁশিয়ার করা ও জ্ঞান দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। ফলে সন্তান হারাম কাজ থেকে স্বেচ্ছায় দূরে থাকবে।

(ক) **স্বাস্থ্যের বিপদ** :

* সিফিলিস রোগ : এটা ব্যভিচারের কারণে সংক্রমিত হয়, যার ফলে জরায়ু ও অণ্ডকোষে স্থায়ী ও মারাত্মক সংক্রমণ রোগ দেখা দেয়, যা শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে এবং জয়েন্টেও সংক্রমণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, তা নবজাত শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং চোখে সংক্রমের ফলে অন্ধত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

* গনোরিয়া রোগ : আফ্রিকায় ব্যভিচার অধিক হওয়ায় সেখানে এ রোগ বেশী।

* যৌন আলসার : এটা অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে সংক্রমিত হয়ে থাকে। ফলে টিউমারের মতো ফুলে গিয়ে স্থায়ীভাবে পুঁজ বের হতে থাকে। পরে পেশাব নালীতে সংক্রমণ ও জয়েন্টের ব্যথাসহ আশ-পাশ ফুলে যায়। এটাকে Lympho Granuloma Venerum ও বলা হয়।

* নরম আলসার : ব্যভিচারের মাধ্যমে পেশাবের রাস্তায় বেদনাদায়ক ঘা দেখা দেয়। পরে চামড়া ওঠে যায়। এটাকে Herpes Symplex ও বলা হয়।

* অগ্রিম যৌন পরিপক্কতাজনিত রোগ : সময় আসার আগে অগ্রিম যৌন কামনার কারণে কোন কোন শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। যৌন গ্লান্ডগুলোও পূর্ণতা লাভ না করায় কামভাব ও উত্তেজনার কারণে দৈহিক বিকৃতি এবং স্নায়ুবিক ও মানসিক রোগ দেখা দেয়।

খ. মানসিক ও চারিত্রিক বিপদ : পাশবিক যৌন উত্তেজনার কারণে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে

* সমকামিতা : নারী ও পুরুষের মধ্যে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা এক মারাত্মক রোগ। পুরুষ পুরুষে এবং নারী নারীতে ইংল্যান্ডের মতো প্রগতি ও উন্নতির দাবীদার সমাজগুলো এ রোগে আক্রান্ত। একমাত্র আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পাঁচ লাখ নারী পুরুষ এ রোগে শিকার। এটা হলো পেশাদার প্রকাশ্য সমকামীর সংখ্যা। গোপন সমকামীর সংখ্যা অসীম।

* যৌন কামনায় সর্বদা ব্যস্ততা : এ জাতীয় রোগীরা সারাক্ষণ যৌন উন্মাদনায় ভোগে। তাদের কল্পনা হলো বিয়ে, চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা ও কোলাকুলি করা। তারা নারীর মুখ, চোখ, ঘাড়, দু' ঠোঁট, পাছা ও উরু নিয়ে চিন্তায় বিভোর। তারা অন্য সকল কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের ভুলের পরিমাণ বেশী, উদাসীনতা ও সচেতনতা কমে যায়। দেখলে মনে হবে সে মদ্যপ কিংবা হয়রান পেরেশান। এ বেদনাদায়ক অবস্থা তার শরীর ও স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা এবং মানসিক উদ্বেগ বাড়ায়।

* সাধারণভাবে মানব সমাজে ব্যভিচারের নৈতিক বিপদ :

গোপনে পালিয়ে বেড়ায়, যৌন তাড়ানায় ব্যস্ত। মদ, হাসিস, আফিম, হেরোইনসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবন করে।

হত্যা, অপহরণ ও যৌন ধর্ষণ করে।

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হয়।

মাদকদ্রব্যের চোরাচালানকারী।

যৌন ব্যবসায়, যুবতীদের বেচা-কেনা এবং বেশ্যাদের ভাড়া দেয়।

চিকিৎসক আইনজীবী, শাসকশ্রেণী, আইনজ্ঞরা অপরাধ ঢাকা দেয়া এবং ঘুষ, যৌন সম্ভোগ ও অর্থের বিনিময়ে অধিকার নষ্ট করে।

প্রকাশ্য নগ্নতার ক্লাবগুলো আগন্তুককে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে উলঙ্গপনার শিকার বানায়।

জীবিকা নির্বাহের জন্য দলে দলে বেশ্যারা ব্যভিচারের পেশা গ্রহণ করে।

অশ্লীল গান-বাজনা, নাচ, অপরাধী নাট্যমঞ্চ তৈরী করে ও সেগুলোতে আসা যাওয়া করে।

যৌন বিষয়ক বই পুস্তক, নগ্নতার ম্যাগাজিন এবং নাচ, গান ও দেহ ব্যবসার হল রুমে আহ্বান।

মদ, নেশা, ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজে দলে দলে লোকের অংশগ্রহণ।

পশুর মতো যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য দলে দলে তাদের আগমন।

এ সকল অসৎ ও হারাম যৌনকামীরা সকল মান-মর্যাদাকে পদদলিত করে, সকল মন্দ ও নিকৃষ্ট জিনিসকে বৈধ মনে করে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে থাকে। ফ্যাসাদ ও নষ্টামীর এরূপ আরো বহু উদাহরণ আছে।

১৯৬২ সালে রুশ নেতা ক্রুশ্চভ মন্তব্য করেন, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক। রুশ যুবকরা দেশের ভবিষ্যতের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। কেননা, তারা যৌন ভোগ-লালসার মধ্যে ডুবে আছে ।

একই মন্তব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিরও। তিনি বলেন, আমেরিকার ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক। যুব সমাজ কামভাবের মধ্যে ডুবে আছে। তারা তাদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বের মর্যাদা দিতে জানে না। প্রতি সাতজনের ছয়জন রিক্রুটের অযোগ্য। যৌন কামনা-বাসনা তাদের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা নষ্ট করে দিয়েছে।

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের এই অশুভ যৌন ঢেউ মুসলিম সমাজেও আঘাত হেনেছে। মুসলিম দেশগুলোতে তাই বেশ্যালয়, জুয়া ক্লাব, নাইট ক্লাব, মদ ও মাদকদ্রব্য-হাসিসের আড্ডা ও উলঙ্গ নাচ গানের আসর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো শাসক ও কর্মকর্তাদের চোখের সামনে রয়েছে। দুঃখজনক হলেও আমরা যৌন ব্যবসায়ীদের বেশ্যা ও যুবতীদেরকে বেচা-কেনা ও ভাড়া দেয়ার কথা শোনে থাকি। এটা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলছে। বহু যুবক যৌন রসনা চরিতার্থ ও মদ পান করছে। তাদের কোন তদারককারী নেই। এ সকল বিষয় এখন সকল মুসলমানেই জানে।

(গ) সামাজিক বিপদ : অবাধ অশ্লীল যৌনাচার ব্যক্তি ও পরিবারের স্বার্থ সমানভাবে নষ্ট করে এবং সাধারণভাবে তা সমাজের বিরাট ক্ষতি করে।

* পরিবার ধ্বংস এর অন্যতম ক্ষতি। হারাম উপায়ে অবিবাহিত যৌন সম্ভোগকারী পরিবার গঠন ও সন্তান উৎপাদনের চিন্তা করে না। ব্যভিচারিণী যুবতীও গর্ভধারণ এবং সন্তান লাভের ইচ্ছুক নয়। সে এটা থেকে মুক্তি চায়।

* জারজ সন্তান : যেহেতু তারা বিয়েতে আগ্রহী নয় এবং হারাম যৌন রসনা পূরণ

করছে, তাই সমাজে জারজ সন্তানের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের না আছে বংশ, না আছে মর্যাদা। এটা তাদের জন্য বিরাট জুলুম।

এটা তাদের জন্য এ কারণে জুলুম, যখন সে বুঝতে পারবে যে সে জারজ সন্তান, নার্সারী ও হাসপাতালে লালিত-পালিত হয়েছে, তখন তার মনে জটিলতা সৃষ্টি হবে, আচরণে বিকৃতি ঘটবে এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যক্তি ও সমাজ এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

* নারী ও পুরুষের দুর্ভাগ্যের বিপদ : কেননা নারী-পুরুষ সুখী জীবন যাপন করতে পারবে না, যদি না তারা দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হয়, যার ভিত্তি হলো দয়া ও ভালোবাসা। যে সমাজে বিয়ের বাজারে খরিদ্দার নেই এবং যারা অবৈধ যৌন নোংরামীতে লিপ্ত, সে সমাজে দয়া-মায়া ও ভালোবাসা অনুপস্থিত।

* আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা : অবিবাহিত যুবকরা যখন হারাম যৌন বাজারে নিজেদের রসনা পূরণ করবে, তখন নিকটাত্মীয়দের কাছে ঘৃণিত ও অবহেলিত হবে। ফলে তার মধ্যে বিদ্রোহ ও সম্পর্ক ছিন্ন করার মনোভাব দেখা দেবে এবং তাদের সাথে তার সম্পর্ক হবে সাপে-নেউলের। অথচ ইসলামে শিরকের পর মাতা-পিতার নাফরমানী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা দ্বিতীয় বড় গুনাহ নেই।

(ঘ) অর্থনৈতিক বিপদ : একথায় কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না যে, যারা যৌন লালসার বাজারে খরিদ্দার, যারা বৈধ বিয়ে থেকে দূরে এবং হারাম ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত, তারা উম্মাহর অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ। তাদের কারণে তিনটি অবস্থা দেখা দেবে : ক. শক্তির দুর্বলতা খ. কম উৎপাদন গ. অবৈধ আয়।

ক. শক্তির দুর্বলতা : অবৈধ যৌন লালসা চরিতার্থকারী যুবক বিবেক, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগগ্রস্ত। রোগীর শক্তি কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে যায়, দৃঢ় শক্তির ধ্বস নামে। ফলে সে নিজ দায়িত্ব বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে না। এর ফলে অর্থনৈতিক ও সভ্যতার ধ্বস নামে।

খ. কম উৎপাদন : এর কারণ হলো অবৈধ যৌন কামনা পূরণের লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করতে হয়, যা উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কল্যাণে ব্যয় করা হয় না। যৌন পিপাসু ব্যক্তি কাজে-কর্মে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হয় না এবং ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে না। তার মনে দ্বীনি ধ্যান-ধারণা ও নৈতিক ভর্ৎসনা অনুপস্থিত। এতে চরিত্র নষ্ট ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ. অবৈধ আয় : যে ব্যক্তি যৌন লিপ্সা পূরণের জন্য ব্যস্ত, যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি নেই, সে তার অশুভ লক্ষ্য হাসিলের জন্য যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে চাইবে। সে সুদ, জুয়া, খেলাধুলা, প্রাচুর্য, ঘুষ ও অর্থ আত্মসাৎ, ইজ্জত-সম্মানের ব্যবসা, উলঙ্গ ছবির ব্যবসা, যৌন ম্যাগাজিন, পর্ণফিল্ম, মদ ও মাদকতা, অশ্লীল বই পুস্তক ও প্রেমের গল্প-কাহিনীর ব্যবসা করবে। এগুলো অর্থ উপার্জনের অবৈধ উপায়। এর ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দেখা দেয়, মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে, উৎপাদনকারীর শক্তি নষ্ট হয়, বৈধ আয়-রোজগার নস্যাৎ হয়। ফলে সমাজ শোষণ ও চুরির কাছে জিম্মী, স্বার্থপরতার কাছে কারাবন্দী এবং যৌন কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয়। এর ফলে উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যহত হয় এবং অর্থনীতি ও উৎপাদন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ঙ. দ্বীনি ও পারলৌকিক বিপদ : যে অবিবাহিত ব্যক্তি হারাম থেকে পবিত্র থাকে না এবং অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে বাঁচতে পারে না। নবী করিম (সা) এর মতে তার মধ্যে চারটি মন্দ অবস্থা দেখা দেবে।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, 'তোমরা যেনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাক। এর কারণে চারটি অবস্থা দেখা দেয় : ১. মুখের ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্য কমে যায় ২. রিযক বন্ধ হয়ে যায় ৩. আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় ৪. চিরন্তন দোজখের আজাবের কারণ হয়।'

পারলৌকিক বিপদ : ব্যভিচারের সময় ঈমান থাকে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারীর ঈমান থাকে না।'

ব্যভিচারকারী ব্যভিচার অব্যাহত রাখলে এবং তাওবা করে ফিরে না আসলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ আজাব দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা বৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।' (সূরা আল ফোরকান : ৬৮-৬৯)

সন্তান গঠনকারীদের ভেবে দেখতে হবে, যেনা-ব্যভিচারের ক্ষতি হচ্ছে এগুলো। এ বেদনাদায়ক ক্ষতি স্বাস্থ্য, চরিত্র, জান-মাল, বিবেক-বুদ্ধি, দ্বীন-ধর্ম, পরিবার ও

সমাজের। শৈশবে যদি সন্তানকে এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা যায় এবং ক্ষতিগুলো দেখানো যায়, তাহলে সে পবিত্র ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে। হারাম ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকবে, চরিত্র ও আচরণে ইসলামের পদ্ধতি মেনে চলবে, বিয়ে ছাড়া যৌন চাহিদা পূরণ করবে না এবং নবী (সা) এর এই বাণীর উপর আমল করবে : 'হে যুব সমাজ, যাদের বিয়ের সামর্থ আছে, তারা যেন বিয়ে করে।' (হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাবগুলোতে তা বর্ণিত)

সন্তানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারেও সতর্ক করতে হবে :

মোরতাদ বা ধর্মত্যাগী হওয়া, কুফরী করা, হারাম খেলা-ধুলা করা, অন্ধ অনুকরণ করা, খারাপ সাথী গ্রহণ করা, মন্দ চারিত্রিক ত্রুটি এবং হারাম কাজ করা। আমরা এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে 'সতর্ক করা' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মোরতাদ হওয়া ও কুফরীর বিরুদ্ধে সতর্ক করলে সন্তান কুফরী, গোমরাহী ও বেহায়াপনার দিকে যাবে না। হারাম খেলাধুলা থেকে সতর্ক করলে যৌন কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে, অনুরূপ অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করলে ইজ্জত-সম্মান ধ্বংস করবে না। খারাপ বন্ধুর বিরুদ্ধে সতর্ক করলে মানসিক ও চারিত্রিক বিকৃতি ঘটবে না। মন্দ চরিত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক করলে অশ্লীল ও হীন কাজে জড়িত হবে না। হারাম থেকে সতর্ক করলে তা মানসিক রোগ-শোক, নষ্টামী থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। এগুলোর মধ্যে সন্তানের সংশোধন, আকীদার মজবুতি ও চরিত্র শুদ্ধ, শরীরের শক্তি বৃদ্ধি, বিবেকের পরিপক্কতা এবং মহান ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সক্ষম হবে। এর ওপর সকলের আমল করা উচিৎ।

৩. **সেতু বন্ধন** : জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভালো-মন্দ পার্থক্যের বয়স থেকে কিশোর ও যৌবনে ঈমান-বিশ্বাস ও আকীদা, আত্মীক, চিন্তামূলক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যায়ামের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে ঈমান ও তাকওয়ার উপর গড়ে ওঠবে। তার মধ্যে জাহেলিয়াতের উপর বিজয় লাভকারী আকিদার রক্ষাকবচ বিদ্যমান থাকবে। সে কুপ্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করবে এবং সত্য ও হেদায়াতের উপর দৃঢ়পদ থাকবে। ঈমান-আকীদা, চিন্তা ও আত্মার বন্ধন অপেক্ষা আর কি কোন বড় বন্ধন আছে? খোদায়ী শিক্ষক ও নেক সাথীর সাহচর্য অপেক্ষা উত্তম কি কোন সাহচর্য আছে? নবী, সাহাবী ও সুযোগ্য পূর্বসূরীদের আচরণ অপেক্ষা কি উত্তম কোন আচরণ আছে?

তাহলে সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো, সন্তানকে আকীদার বন্ধনে আবদ্ধ করা, ইবাদতে জড়িয়ে নেয়া, ভালো পথ পদর্শক নেক সাথী, আল্লাহর পথে দাঈ' ও

দাওয়াত, মসজিদ, জিকর ও আল্লাহর ধ্যান ও কোরআন হাদিসের বন্ধনে আবদ্ধ করা। ইতিহাস ও মর্যাদা, নবী ও রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম ও নেক লোকদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত করা। অভিভাবক হিসেবে আপনি যদি সন্তানকে ওই সকল বন্ধনের সাথে পরিপূর্ণ আবদ্ধ করতে চান, তাহলে এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের 'বন্ধনের নিয়মাবলী' অধ্যায় পড়ুন। সেখানে আপনি সন্তানের ঈমানী গঠন ও চারিত্রিক পরিপুষ্টির সঠিক পদ্ধতি পাবেন।

আমি এ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো, সন্তানের সংশোধনে ঈমানী শিক্ষার বিরাট প্রভাব এবং চরিত্র ও আচরণ গঠনে এর বিরাট অবদান রয়েছে। সন্তান যদি আল্লাহর উপর ঈমান, প্রকাশ্য ও গোপনে তাঁকে ধ্যান এবং ওঠা-বসায় তাঁকে ভয় করে, তাহলে সে ভালো মানুষ ও পরহেজগার যুবক হিসেবে গড়ে উঠবে। বস্তু তাকে লোভী, যৌন কামনা তাকে দূরে নিক্ষেপ, শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা এবং ভেতরের কুপ্রবৃত্তির ওয়াসওয়াসা তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কোন উচুঁ বংশের সুন্দরী নারী আহ্বান জানালে সে জবাবে বলবে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে সে বলবে, আমার উপর তোর কোন নিয়ন্ত্রণ চলবে না। কোন খারাপ সাথী তাকে মন্দ ও অশ্লীল পথ দেখালে সে বলবে, আমি অজ্ঞ-মূর্খদের পথ পছন্দ করি না।

এই হচ্ছে ইসলামের সংশোধন ও শিক্ষার পদ্ধতি। ইসলাম প্রথমে ব্যক্তির নফসের আভ্যন্তরীণ সংশোধন চায়, বাইরের অংশের নয়। প্রথমে বিবেকের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা এবং আবেগ অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা আনতে চায়। তারপর প্রকাশ্যে ও গোপনে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর ধ্যান ও মনের গভীরে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, আল্লাহ মানুষের সাথে আছেন, যিনি তাকে দেখেন, তার গোপন বিষয় জানেন, চোখের খেয়ানত ও মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। অভিভাবক ও কর্মীদের এই পদ্ধতিতেই কাজ করা উচিৎ।

সন্তান গঠনকারী মাতা-পিতা, সংশোধনকারী ও শিরক যদি ইসলামের ইতিবাচক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেন তাহলে, সন্তান বিকৃত ও অবৈধ যৌন লালসা পূরণ ত্যাগ করবে এবং গোমরাহী ও নষ্টামীর কারণগুলো থেকে দূরে থাকবে।

হে আল্লাহ, আপনি সন্তান গঠনকারীদেরকে ইসলামের গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করার তৌফিক দিন, যেন তারা সেদিন আপনার সামনে এই দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করে- যেদিন সন্তান ও সম্পদ কোন কাজে আসবে না। বরং তারা যেন ভবিষ্যৎ মুসলিম বংশধরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বাস্তবায়ন, কোরআনের

নীতিমালাকে পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে সর্বদা টিকে থাকা এবং ইজ্জত-সম্মানের মধ্যে অবস্থান করতে দেখতে পায়।

৪. সন্তানকে কৈশোর ও সাবালকত্বের মাসলা শিক্ষা দেয়া : ইসলাম মা-বাবা, শিক্ষক ও সংধোনকারী সংস্কারকের উপর যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা হলো, সন্তান যখন যৌন প্রবণতা ও পরিপক্কতা বিষয়ক শরীয়তের বিধান বুঝবে, তখন তাকে এগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। এক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সমান। কেননা, শরীয়ত উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং সকলেই আল্লাহ, তাদেরকে গঠনকারী এবং সমাজের কাছে দায়ী। তাই সন্তান গঠনকারীদের কর্তব্য হলো, তারা তারুণ্যের স্তরে পৌছলে এ সম্পর্কিত মাসলা শিক্ষা দেয়া। সাধারণত ১২-১৫ বছরের বয়স এই স্তরের মধ্যে শামিল। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে, যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং উত্তেজনার সাথে স্ববেগে মনি বা গাঢ় ধাতু বের হয়, তাহলে তারা বালেগ। তাদের উপর বড়দের মতো সকল দায়িত্ব-কর্তব্য ও ফরজ-ওয়াজিব কার্যকর হবে।

পুরুষের ধাতুর রং সাদা ও গাঢ় এবং খেজুর গাছের মুকুলের মতো ঘ্রাণ যা আটা গোলার সময়ের ঘ্রাণের কাছাকাছি। ধাতু শুকিয়ে গেলে ডিমের সাদা অংশের ঘ্রাণের মতো ঘ্রাণ মনে হয়।

অনুরূপভাবে সন্তান গঠনকারীর দায়িত্ব হলো, নয় বছর কিংবা তদোর্ধ্ব বয়সের মেয়েকে এ সকল মাসলা স্পষ্ট শিক্ষা দেয়া। মেয়ে যদি স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারে এবং ঘুম থেকে জাগার পর যদি হলুদ বর্ণের পাতলা ধাতু দেখে থাকে, তাহলে তাকে শরীয়তের হুকুম পালনের উপযুক্ত সাবালিকা বিবেচনা করতে হবে। তখন তাকেও অন্যান্য বয়স্কা মহিলাদের ন্যায় সকল ফরজ ওয়াজিব আদায় করতে হবে।

এছাড়াও যদি এ বয়সে মেয়ের মাসিক ঋতুর রক্ত দেখে, তাহলে তাকে বলতে হবে যে, সে বালেগ হয়ে গেছে এবং তার উপর শরীয়তের সকল বিধি-নিষেধ কার্যকর।

ইসলাম প্রথমে ও শেষে সন্তানকে স্পষ্ট করে এসব শিক্ষা দানের দায়িত্ব মা-বাবার উপর অর্পণ করছে। যাতে করে তারা যৌন জীবন ও যৌন প্রবৃত্তি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয় এবং দ্বীনি ও শরয়ী দায়িত্ব-কর্তব্য ভালো করে বুঝতে পারে। আমরা অনেক মেয়ের খবর জানি, যারা মাসিক ঋতু কিংবা ফরজ

গোসলের মাসলা না জানার কারণে ঋতু বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রতা অর্জন করেনি। এমনও হয়েছে যে, তারা পবিত্র না হয়েই নামাজ পড়ছে এবং ভাবছে যে, তারা ঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করে যাচ্ছে। তাহলে তাদেরকে এসব বিষয়ে বলার বা শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কার, যখন তারা স্বপ্নদোষ বা বালেগ হবার বয়সে পৌঁছে? নিঃসন্দেহে প্রথমে এটা মা-বাবার দায়িত্ব। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিক্ষক ও সংশোধনকারীর দায়িত্ব। তা না হয়, সন্তান প্রভুর হুকুম, নিজের হুকুম এবং দ্বীনের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও ভাববে যে, সে ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

এখন আমরা সন্তানের বালেগ হওয়া ও স্বপ্নদোষের বয়সে পৌঁছার মাসলা আলোচনা করবো, যেন তারা বালেগ পুরুষ ও নারী হবার আগেই এ সংক্রান্ত মাসলাগুলো জেনে নিতে পারে।

গোসল কখন ফরজ হয়

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, যদি তারা স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারে এবং ঘুম থেকে জাগার পর যদি কাপড় ভেজা না থাকে, তাহলে তার উপর গোসল ফরজ নয়। এ মর্মে খাওলা বিনতে হাকীম রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করেন, পুরুষদের যেমন স্বপ্নদোষ হয় নারীরও হয়? নবী (সা) বলেন, 'ধাতু (বীর্য) বের না হলে গোসল ফরজ হবে না। অনুরূপ পুরুষদেরও ধাতু (বীর্য) বের না হলে গোসল ফরজ হয় না।' (আহমদ, নাসাঈ)

নাসাঈতে তার বর্ণনাটি এভাবে এসেছে যে, নারীর স্বপ্নদোষ হয়। নবী (সা) বলেন, 'পানি দেখলে গোসল ফরজ হবে।'

২. ছেলে বা মেয়ে ঘুম থেকে জাগার পর পরনের কাপড় ভেজা দেখলে এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না হলেও গোসল ফরজ হবে। এ মর্মে নাসাঈ ছাড়া পাঁচটি বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

'রাসূলুল্লাহ (সা)কে যে ব্যক্তি স্বপ্নদোষ ছাড়াই কাপড় ভেজা দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অপর ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হয়, যার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু কাপড় ভেজা নয়। তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মে সোলাইম বলেন, মহিলা এরূপ দেখলে কি গোসল ফরজ হবে? তিনি বলেন, হাঁ। নারীরা পুরুষের সহোদরা বোন।'

৩. সবেগে নারী ও পুরুষের ধাতু গোপন অভ্যাস কিংবা অন্য কোন উপায়ে বের

হলে, গোসল ফরজ হবে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার বেশী বেশী মজি বের হয়। (গাঢ় ধাতুর আগে পানির মতো পাতলা আঠালো ধাতু) এ বিষয়ে আমি নবী (সা)কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, মজির জন্য ওজু এবং মনির জন্য (গাঢ় ধাতু) গোসল ফরজ।' (আহমদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

মোসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে, 'যদি উত্তেজনার সাথে মণি বের করে থাক, জানাবতের গোসল কর। আর যদি বের না করে থাক, তাহলে গোসলের দরকার নেই।'

হাদীসের মর্মানুযায়ী যদি রোগ, ঠাণ্ডা, পিঠে মার খাওয়া কিংবা ভারী জিনিস বহনের কারণে মনি বের হয়, তাহলে গোসল ফরজ হবে না।

৪. পুরুষাঙ্গের খতনাকৃত মাথা حَشَفَةٌ নারী যোনীতে ঢুকলে, ধাতু বের হোক বা না হোক, উভয়ের উপর গোসল ফরজ হবে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'পুরুষ যখন স্ত্রীর চার অঙ্গ অর্থাৎ দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে বসে এবং পরস্পরের খতনার স্থান স্পর্শ করে, তখন গোসল ফরজ হয়।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন ওহাবের মোসনাদে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। إِذَاالْتَقَى الْخِتَانَانِ وَ غَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يَنْزِلْ 'যখন দুই খতনার স্থান মিলিত হবে এবং হাশফা (পুরুষাঙ্গের মাথা) ভেতরে ঢুকবে, তখন গোসল ফরজ হবে, চাই কিছু বের হোক বা না হোক।'

৫. মাসিক ঋতু ও সন্তান প্রসবের পর নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ফরজ হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 'তোমরা তাদের কাছেও যাবে না যে পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয়।'

মাসিক হলো, রোগ ছাড়া ৫০ বছরের আগ পর্যন্ত জরায়ু থেকে রক্ত বের হওয়া। এর নিম্নতম সীমা তিনদিন এবং উপরের সীমা ১০ দিন। পবিত্রতার নিম্নতম সময়সীমা ১৫ দিন। উপরের সময় সীমা অনির্দিষ্ট। অপরদিকে নেফাসের নিম্নতম সময়সীমা সুনির্দিষ্ট নয়। উপরের সময়সীমা ৪০ দিন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে হোবাইসের এস্তেহাজাজনিত রক্ত যেতো। তিনি নবী (সা)কে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'সেটা রোগ, মাসিক নয়। মাসিক আসলে নামাজ ছেড়ে দেবে এবং চলে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।' (বোখারী)

এস্তেহাজা হলো মাসিকের তিন দিন আগে বা ১০ দিন পর কিংবা নেফাসের ৪০ দিন পর যে রক্ত দেখা যায়। (হানাফী মাজহাব)

মাসিকের উপর কেয়াসের ভিত্তিতে নেফাস থেকে গোসল করে পবিত্র হবার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬. গোসল ফরজ হবার কারণ জানার পর সন্তানের উচিৎ গোসলের ফরজ, সুন্নাত এবং পদ্ধতি জানা। তাহলে সে জানাবতের সম্মুখীন হলে গোসল করে পবিত্র হতে পারবে।

এখন আমরা গোসলের ফরজ, সুন্নাত ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

গোসলের ফরজ

১. মুখ ২. নাক ও ৩. সারা শরীর ধোয়া।

এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا 'তোমরা নাপাক ও জানাবতে থাকলে পবিত্রতা অর্জন কর।'

চোখের ভেতরের অংশের মতো যেগুলো কষ্টকর, সেগুলো ধোয়ার দরকার নেই। আর সেগুলো ধু'তে কষ্ট নেই সেগুলো ধোয়া ফরজ। যেমন, মুখ ও নাকের ভেতর।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشْرَةَ 'প্রত্যেক চুলের নীচে জানাবত বা নাপাকী আছে। সুতরাং চুল ভেজাও এবং চামড়া পরিষ্কার কর।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

অর্থাৎ সারা শরীরে পানি ঢেলে পরিষ্কার কর।

শরীয়তের এই হুকুমের উপর ভিত্তি করে শরীরের যেসব অঙ্গ ধোয়া সহজ, যেমন- নাভী, নারীর লজ্জাস্থানের বহির্ভাগ খতনার নীচের সংকীর্ণ স্থান, দু'কানের বাহ্যিক অংশ এবং বগলের নীচসহ শরীরের সকল অংশ ধোয়া ফরজ।

গোসলের পদ্ধতি : প্রথমে দু'হাত ও লজ্জাস্থান ধোয়া এবং নাপাকী দূর করা। তারপর নামাযের মতো অজু করবে, তবে দু'পা ধোবে না। গোসলের শেষ পর্যায়ে দু'পা ধোবে।

গোসলের এই পদ্ধতির ভিত্তি হলো, হাদিসের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব। সেগুলো ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার খালা মায়মুনা আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জানাবতের (ফরজ) গোসলের জন্য পানি

এগিয়ে দিই। তিনি প্রথমে দু'হাতের কব্জি দু'বার বা তিনবার ধৌত করেন। তারপর পাত্রে হাত ঢুকান। এরপর গুপ্তাঙ্গের উপর পানি ঢালেন ও বাম হাতে তা ধৌত করেন। এরপর বাম হাত মাটিতে ভালো করে ঘষামাজা করেন। তারপর নামাজের মতো ওজু করেন। পরে মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালেন এবং সমস্ত শরীর ধৌত করেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু পা ধৌত করেন। এরপর আমি তাঁকে রুমাল এনে দিই। তিনি তা ফেরত দেন।'

পুরুষের চুলের বেনী থাকলে তা খুলতে হবে, যেন পানি সমস্ত শরীরে পৌঁছে। কিন্তু নারীর চুলে বেনী থাকলে তা খোলা লাগবে না। তাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলেই চলবে। আবু দাউদে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলেন, 'পুরুষ হলে মাথার চুল খুলে দিতে হবে এবং চুলের গোড়াসহ ধৌত করতে হবে। নারী হলে মাথার বেনী খোলার দরকার হবে না। মাথায় দু'হাতের তিন অঞ্জলি পানি ঢালতে হবে।'

মুসলিম শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে, এক নারী রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করেন, 'আমি কি মাসিক ও জানাবতের ফরজ গোসলের জন্য বেনী খুলবো? তিনি বলেন, না, বরং মাথার উপরে তিন অঞ্জলি পানি ঢালো। এরপর সারা শরীরে পানি ঢালো এবং পবিত্রতা অর্জন কর। '

গোসলের সুন্নাত

ক. নিয়ত করা খ. বিসমিল্লাহ্ বলা ৩. মেসওয়াক করা ৪. দাড়ি ও আঙ্গুল খেলাল করা এবং ৫. যতটুকু সম্ভব শরীর ধৌত করা।

তায়াম্মুম : গোসল ফরজ হলে পানি পাওয় না গেলে, তায়াম্মুম করতে হয়। আধ ঘন্টা দূরত্বে পানি থাকলে, পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে, ঠাণ্ডার মধ্যে পানি গরম করার ব্যবস্থা না থাকলে, শত্রুর ভয় কিংবা পিপাসা পূরণের পানি ফুরিয়ে যাবার আশংকা করলে তায়াম্মুম করতে হবে।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নিয়ম হলো, মাটি জাতীয় পবিত্র জিনিস যেমন, বালি, পাথর ইত্যাদির উপর দু'বার হাত মারা। একবার মুখ মাসেহ করা এবং দ্বিতীয়ভার কনুই পর্যন্ত দু'হাত মাসেহ করবে। এ মর্মে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ 'তোমরা পানি না পেলে পাক মাটিতে তায়াম্মুম কর এভাবে যে, প্রথমে মুখ ও পরে হাত মাসেহ করবে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ:ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 'তায়াম্মুম দু'বার হাত মারার নাম। প্রথম বার মুখ ও পরের বার কনুই পর্যন্ত দু'হাত মাসেহ করবে।' (দার কুতনী, হাকেম)

তায়াম্মুমের জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণ ইবাদত পালনের নিয়ত শর্ত যা পবিত্রতা অর্জন ছাড়া জায়েয নেই। অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে একবার তায়াম্মুম করা জায়েয।

গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

** হায়েয ও নেফাসের সময় নামায-রোজা হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলারা কেবল রোজা কাযা করবে, নামায কাযা করবে না। ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওই অবস্থায় আমাদেরকে কেবল রোজা কাযার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নামায নয়।'

** হায়েয-নেফাসের সময় মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। নবী (সা) বলেন, فَإِنِّيْ لاَأُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَّلاَ حَائِضٍ 'আমি ঋতুবতী ও জানাবতের গোসল ফরজওয়ালাদের জন্য মসজিদ হালাল করতে পারি না।' (আবু দাউদ) একই কারণে তাদের ওপর কাবা শরীফের তাওয়াফও নিষিদ্ধ।

** হায়েয-নেফাস অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর ইজারের নীচে হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী স্থান ভোগ করা নাজায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ঋতুবতী নারীদের থেকে দূরে থাক।' (সূরা বাকারা-২২২) আব্দুল্লাহ বিন সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ إِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ:لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে আমার স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তার কোন জিনিস হালাল তা জানার জন্য প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, তোমার জন্য যা হালাল তা হলো ইজারের উপর।' (আবু দাউদ)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيُبَاشِرُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يَأْمُرُهَا أَنْ تَأْتَزِرَ 'নবী (সা) ইজার পরার হুকুম দেয়ার আগে তাঁর কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে বাস করেননি।'

** এদের জন্য কোরআন পড়া নাজায়েয। ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ 'ঋতুবতী ও জানাবতের গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি যেন কোরআন না পড়ে।' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

এটা হলো, তেলাওয়াতের নিয়মে কোরআন পড়ার হুকুম। যদি যিকর ও প্রশংসার

নিয়তে পূর্ণ বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ে কিংবা ঋতুবতী মহিলা ও জুনুব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এক অক্ষর করে উচ্চারণ করে, ওজর ও প্রয়োজনের কারণে সকলের কাছে তা জায়েয।

**** ঋতু ও নেফাস অবস্থায় শিক্ষিকা কি কোরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে?** হাম্বলী মাজহাবের এক বর্ণনা অনুযায়ী হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলারা কোরআন পড়তে পারবে। এটা ইমাম ইবনে তাইমিয়ারও মত। (আল ইনসাফ) মালেকী মাজহাবেও তা জায়েয এবং তারা কোরআনও স্পর্শ করতে পারবে, চাই তারা শিক্ষিকা বা ছাত্রী হোকনা কেন। (শরহুছ ছাগীর-দারদীর) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ মাসলায় যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে।

ইমাম মালেকের মতে, জুনুবের জন্য ঘুমের সময়, ভয়ের সময়, বরকত লাভ, ব্যথা-বেদনা কিংবা চোখ লাগার কারণে অথবা শরীয়তের কোন হুকুম প্রমাণের জন্য কোরআনের স্বল্প কিছু পাঠ করা জায়েয, যা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় জায়েয হবার ব্যাপারে আরও বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য।

** অজু ছাড়া কিংবা জুনুব, হায়েয ও নেফাস অবস্থায় পৃথক গেলাফ ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা যাবেনা। আল্লাহ বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ 'পাক পবিত্র লোকেরই তা কেবল স্পর্শ করবে।'

হাকীম বিন হেযাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে ইয়েমেন পাঠান এবং বলেন, 'তুমি পাক পবিত্রতা ছাড়া কোরআন স্পর্শ করবে না।' (মোসতাদরাক-হাকেম- তিনি এটাকে সহীহ বলেছেন)

আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী বাঁদীকে কোরআন আনার জন্য আবু রাযীনের কাছে পাঠান। বাঁদী কোরআনের গেলাফের সুতা ধরে তা বহন করেন (আবু ওয়ায়েল ও আবু রাযীন উর্ধ্বতন তাবেঈ ছিলেন)।

নামাযে কোরআন পড়ার কারণে জুনুবের জন্য নামাজ হারাম। অনুরূপভাবে, তার মসজিদে প্রবেশ এবং তওয়াফও হারাম।

জুনুবের রোজা শুদ্ধ হবে, তবে গুনাহগার হবে যদি তার জানাবত নামাজ বিলম্বের কারণ হয়।

** স্বপ্নদোষ হলে, ঘুম থেকে জাগার পর কাপড়ে মণি দেখলে যদি তা ভেজা হয়, তাহলে ধোয়া ছাড়া পাক হবে না। আর শুকিয়ে গেলে ঘষে পরিষ্কার করলে চলবে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাপড় থেকে শুকনা মনি ঘষে এবং ভেজা হলে ধুয়ে পরিষ্কার করতাম।' (সুনানে দারু কোতনী ও মোসনাদে বাজ্জার)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তিনি নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন, কিন্তু তাঁর কাপড়ে ভেজা পানির চিহ্ন দেখা যেতো।

সন্তান গঠনকারীর উচিৎ, সন্তানকে বিবেক বুদ্ধির বয়স এবং শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়নের স্তরে পৌঁছালে হালাল-হারাম, যৌন বিষয়ক হুকুম, বালেগ হবার পর করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) যথার্থই বলেছেন, مَنْ يُّرِدِ اللهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ 'আল্লাহ যাকে কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান ও বোধ শক্তি দান করেন।' (বোখারী, মুসলিম)

৫. বিয়ে ও যৌন সম্পর্ক : মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রবণতা ও প্রবৃত্তি আমানত রেখেছেন যা মানব জাতির হেফাজত ও টিকে থাকার জন্য জরুরী। এ সকল প্রবণতা ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্য আল্লাহ প্রয়োজনীয় আইন-শরীয়ত নাযিল করে সেগুলোর অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছেন। বিয়ে হলো ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ পূরণের অন্যতম ইসলামী ব্যবস্থা, যেন মানুষ যৌন প্রকৃতি ও চাহিদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে চলতে পারে এবং জীবনের ফেতনা-পরীক্ষা, যৌন উন্মাদনা ও স্বভাব প্রকৃতির আগ্রহ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

এখন আমরা যৌন প্রবৃত্তি ও বিয়ের উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করবো। ওই বাস্তবতাগুলো দু'টো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

১. যৌন চাহিদার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

২. আল্লাহ কেন বিয়ে প্রথা চালু করেছেন

১. আমরা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে 'মানব প্রকৃতি বুঝা'-এ অধ্যায়ে মানুষের ইচ্ছা ও প্রবণতা পূরণের যে বর্ণনা দিয়েছি, তাতে বলা হয়েছে যে, সমাজের কোন মানুষ যেন তার স্বভাব প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন না করে, বিকৃত পথে না চলে যা তার প্রয়োজন ও প্রবণতার সাথে সংঘর্ষমুখর হয়। বরং সে ইসলামের সহজ-সরল পথেই চলবে। আর সেটা হলো বিয়ে। আল্লাহ কতইনা সত্য বলেছেন, وَ مِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً 'আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো তিনি তোমাদের সত্তা থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে বাস কর। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রূম-২১)

আমাদের জানা দরকার যে, ইসলাম আল্লাহর নৈকট্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিয়ে

থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে অনাসক্তিকে হারাম করেছে। বিশেষ করে বিয়ের সামর্থ্য থাকলে এবং প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সহজলভ্য হলে, বিয়ে না করা হারাম কাজ। ইসলাম বরং বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কেননা, তা মানব স্বভাব-প্রকৃতি এবং তাদের প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সংঘর্ষমুখর।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে সহজতা ও প্রশস্ততা দান করেছেন।' (বায়হাকী)

নবী (সা) বলেন, مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِاَنْ يَّنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّىْ 'বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে বিয়ে করেনি, সে আমার মধ্যে শামিল নয়।' (বায়হাকী, তাবারানী)

এক্ষেত্রে নবী করিম (সা) এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো এরূপ :

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের ঘরে আসলো। এদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে বলা হলে, তারা এটাকে কম মনে করলো এবং বললো, নবীর সাথে আমাদের কি তুলনা হয়? আল্লাহ তাঁর আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। একজন বললো, আমি সারারাত নামায পড়ি। আরেকজন বললো, আমি সর্বদা রোজা রাখি, কখনো রোজা ভাঙ্গি না। অন্যজন বললো,আমি অবিবাহিত, কখনো বিয়ে করবো না। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং বলেন, তোমরা এরূপ কথা বলেছো? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের চাইতে সর্বাধিক আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি ও ভাঙ্গি এবং বিয়ে করি। যে ব্যক্তি আমার এই সুন্নাত থেকে বিরত থাকে, সে আমার উম্মাহর মধ্যে শামিল নয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম যে স্বভাব-প্রকৃতির দ্বীন, জীবনের আইন এবং স্থায়ী পয়গাম-সে কথার বড় প্রমাণ, যে পর্যন্ত আল্লাহ কাউকে যমীনের উত্তরাধিকার দেন। ঈমানদারের জন্য আল্লাহর চাইতে কে উত্তম শাসক?

২. যৌন কামনার প্রতি ইসলামের আরেকটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো হালাল উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ করাকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এবং পুরস্কার ও সওয়াবের উপযোগী নেক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে।

আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করেন

হে আল্লাহর রাসূল, ধনীরা সকল সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের মতো নামায, রোজা ও অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান-সদকা করে। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সদকার ব্যবস্থা করেননি? সকল তাসবীহ, তাকবির, হামদ, কালেমা উচ্চারণ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ এবং স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন পৃথক পৃথক সদকা। তাঁরা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা যৌন কামনা পূরণ করবো অথচ এজন্য সওয়াব পাবো? তিনি বলেন, তোমরা যদি হারাম পথে যৌন কামনা পূরণ কর, সেটা কি গুনাহ নয়? তাঁরা জবাবে বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, অনুরূপ কেউ তা হালাল উপায়ে করলে সে বিনিময় পাবে।' (মুসলিম)

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন কামনা দমনের অভিযোগ করে, যৌন কামনা পূরণের ব্যাপারে এবং বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের বোঝা উচিৎ।

৩. 'যৌন মিলন সদকাহ' এ বিষয়ে প্রত্যেক দম্পতির বোঝা কর্তব্য, এটার প্রতি যেন তারা পূর্ণ ব্যস্ত ও আসক্ত না থাকে এবং তা যেন তাদেরকে দাওয়াতে দ্বীন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং ইসলামের বিজয়ের পথ থেকে বিরত না রাখে। ইসলাম এমন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ তৈরী করে যে, প্রত্যেকের অধিকার পূরণ করে একজনের অধিকার কিংবা কর্তব্যের উপর অন্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয় না। বরং যদি ইসলামের প্রয়োজন, জেহাদ ও আল্লাহর পথে ব্যক্তির জীবন যাপন, স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের সাথে সংঘর্ষমুখর হয়, তাহলে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ও দুনিয়াবী স্বার্থ, বংশীয়, জাতীয় ও পারিবারিক স্বার্থের উপর জেহাদ ও দাওয়াতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা, মুসলিম রাষ্ট্রের স্তম্ভ স্থাপন এবং বিভ্রান্ত মানবতাকে ইসলামের পথ দেখানোই চরম ও পরম লক্ষ্য। বরং একজন মুসলমানের কাছে তা হলো সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও প্রত্যাশা।

রবঈ' বিন আমের কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য সেনাপতি রুস্তমকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেন, তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষের গোলামী থেকে আল্লাহর গোলামীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায় বিচারের দিকে আহ্বানের জন্য।

এখন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের জীবন থেকে ব্যক্তি স্বার্থ, পারিবারিক ও বংশীয় অনুভূতি, বিশেষ করে স্ত্রী ও সন্তানদের উপর ইসলাম জেহাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

(ক) সাহাবী হানজালা বিন আবু আমের জুমার রাত জামিলা বিনতে উবাইকে বিয়ে করেন। সেদিন সকালে তিনি একজনের কণ্ঠে জেহাদে যাবার আহ্বান শোনামাত্র আর দেরী না করেই তলোয়ার ঝুলান, লৌহবর্ম পরেন এবং সওয়ারীর উপর আরোহণ করেন। তারপর ওহুদের ময়দানের উদ্দেশ্যে ছুটে যান। যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করেন। মুসলমানরা হানজালাকে যুদ্ধ করতে দেখতে পেলেন। তিনি মোশরেক বাহিনীর প্রতি নজর দিয়ে আবু সুফিয়ানকে দেখে তার উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালান। আবু সুফিয়ান মাটিতে পড়ে যায়। হানজালা তাকে তলোয়ার দিয়ে জবাই করতে ইচ্ছা করেন। আবু সুফিয়ান চিৎকার দিয়ে অন্যান্য কোরাইশদের সহযোগিতা চায়। তারা তার আওয়াজ শুনে হানজালার উপর আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গায়েবের জগৎ থেকে তাঁর নবীকে তা জানান। নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, আমি ফেরেশতাদেরকে রূপার সাদা পেয়ালায় মেঘের পানি দিয়ে হানজালাকে গোসল দিতে দেখছি। সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত হানজালার কাছে গিয়ে দেখেন, তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছে। তারা তাঁর স্ত্রীর কাছে লোক পাঠিয়ে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হানজালা জেহাদের ডাক শোনে বিনা গোসলে দ্রুত বেরিয়ে যায়। অথচ তাঁর উপর গোসল ফরজ ছিলো। ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছে।

(খ) আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর আ'তেকা বিনতে যায়েদকে বিয়ে করেন। আতেকা ছিলেন পরমা সুন্দরী, উন্নত চরিত্রবতী, অত্যন্ত ভদ্র-শিষ্ট। সে আব্দুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জিহাদ থেকে বিরত রেখেছে। তার পিতা আবু বকর সিদ্দিক এ কারণে তাকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ তাকে তালাক দেয়ার পর আবু বকর সিদ্দিক এই কবিতা পাঠ করেন :

فَلَمْ اَرَ مِثْلِىْ طَلَّقَ الْيَوْمَ مِثْلَهَا: وَلَا مِثْلُهَا فِىْ غَيْرِ ذَنْبٍ تُطَلَّقُ

لَهَا خُلُقٌ جَزِلٌ وَ رَاىٌ مَنْصِبٌ : عَلٰى كِبَرِمِنِّىْ وَ اَنِّىْ لَوَامِقُ

'আমার মতো লোক তার মতো নারীকে তালাক দিতে দেখিনি-

বিনা দোষে যাকে তালাক দেয়া হলো,

তার উন্নত চরিত্র ও ভালো-বিশুদ্ধ মতামত আছে-

আমার বার্ধক্যের ওপর এবং তাকে আমি ভালোবাসি।'

পিতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর পুনারায় বিয়ে বন্ধনে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তায়েফ যুদ্ধে নবী (সা) এর সাথে অংশ নেন এবং তীরবিদ্ধ হন এবং মদিনায় মারা যান।

(গ) তাবারানী ও ইসহাক বর্ণনা করেন। আবু খায়সামা এক সফর থেকে পরিবারে ফিরে এসে দেখেন, নবী (সা) তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কয়েকদিন আগে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। তাঁর দুই স্ত্রীকে নিজ বাগানে দু'টো তাঁবুতে দেখতে পান। তারা উভয়ই ঠাণ্ডা পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দুই স্ত্রীর ব্যবস্থাপনা এবং নবী (সা) এর গরম দাবদাহের কথা স্মরণ করে বলেন, আবু খায়সামা ঠাণ্ডা ছায়া, প্রস্তুত খাবার এবং সুন্দরী স্ত্রী ও মাল সম্পদের মধ্যে অবস্থান করবে, এটা কি ইনসাফ হবে? তারপর বলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাৎ করা ছাড়া তোমাদের কারো তাঁবুতে প্রবেশ করবো না। তারা তাঁর সফরের সম্বল ও উট প্রস্তুত করে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সন্ধানে তাবুক গিয়ে হাজির হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিম যুবকেরা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল, জিহাদ ও দাওয়াতে দ্বীনের জন্য জীবনের সকল কিছু উৎসর্গ করে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে যমীনের ক্ষমতা দান করেন। তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করেন এবং দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। তখন দুনিয়া তাদের কর্তৃত্বাধীন এবং মানবতা তাদের আদেশ–নিষেধের অনুগত হয়। আর তা না হলে, তাদেরকে আল্লাহর আযাবের আদেশ এবং অসন্তোষ নাযিলের অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বিমুখ এবং সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত লোকদেরকে হেদায়াত দেন না। আল্লাহ কোরআনে কতইনা যথার্থ বলেছেন, 'হে নবী, আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা বন্ধের ভয় এবং পছন্দনীয় বাসস্থান, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।' (সূরা তাওবা–২৪)

আমরা যেন নারীর উপর ফরজ দাওয়াতে দ্বীন ও জেহাদে ভূমিকা পালনের ব্যাপারে উদাসীন না থাকি। ইসলাম তাদেরকে প্রয়োজনবশত জেহাদে বের হবার হুকুম দিয়েছে। নারীরা মহানবী (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করে তলোয়ার দিয়ে লড়াই, আহত এবং রোগীর চিকিৎসা, নিহতের পরিবহন এবং খাদ্য তৈরীর কাজ করেছেন।

এ বিষয়ে আমরা কিছু ঘটনা তুলে ধরবো :

(ক) রোবাই বিনতে মোয়া'ওয়াজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং হতাহতদের মদিনায় নিয়ে এসেছি।

উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা তাদের কাফেলায় অবস্থান করে খাদ্য প্রস্তুত, আহতদের চিকিৎসা এবং রোগীর সেবা করতাম।

(খ) সীরাতে ইবনে হিশাম-এ বর্ণিত। উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ বিন রোবাই উম্মে আ'ম্মারার কাছে প্রবেশ করে বলেন, হে খালা, ওহোদ যুদ্ধের খবর বলুন। উম্মে আ'ম্মারা বলেন, আমি দিনের প্রথম ভাগেই জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হই এবং লোকেরা কি করে তা দেখছিলাম। আমার কাছে এক মশক পানি ছিলো। আমি নবী (সা) এর কাছে পৌঁছলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন ময়দানে মুসলমানদের বিজয় অবস্থা বিরাজ করছিলো। পরে যখন মুসলমানরা পরাজিত হলো, আমি নবী (সা) এর পাশে ছিলাম। আমি যুদ্ধ করে তাঁর উপর থেকে তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করি, ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করি এবং অস্ত্রোপাচারের কাজ করি।

(গ) সীরাতে ইবনে হিশাম-এ বর্ণিত। সফিয়াহ বিনতে আব্দুল মোত্তালেব এক ইহুদীকে চারদিকে ঘুরতে দেখে হাতে লাঠি নিয়ে দুর্গের বাইরে এসে তাকে আঘাত করে হত্যা করেন।

এ জাতীয় আরও বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ পুরুষের মতো নারীর উপরও ফরজ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো ও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপরই আল্লাহ রহমত দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।' (সূরা তাওবাহ-৭১)

এ হচ্ছে যৌন প্রবৃত্তির প্রতি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। সন্তান ভালো-মন্দের পার্থক্যের বয়সে পৌঁছার পর গঠনকারীরা সন্তানদেরকে এগুলো শিক্ষা দিতে হবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের পয়গাম পেশ করে ও বিয়ে করে এবং বুঝতে পারে যে, বৈধ যৌন সম্পর্ক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছার

মাধ্যম। বিয়ের পর তাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে জীবনে প্রত্যেকের অধিকার ঠিকমতো পূরণ করতে হবে এবং কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে অলস–উদাসীন হওয়া যাবে না।

(খ) আল্লাহ কেন বিয়ে প্রথা চালু করেছেন? বিয়ের উপকারিতা : আমরা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে 'বিয়ে একটি সামাজিক স্বার্থ' এ অধ্যায়ে বিয়ের হেকমত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো যাতে করে বিবাহিত ব্যক্তি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১. বংশ রক্ষা : আল্লাহ বলেন, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً 'আল্লাহ, যিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে সৃষ্টি করেছেন পুত্র ও পৌত্রাদি।' (সূরা নহল–৭২)

২. যৌন বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখা : নবী (সা) বলেন, হে যুব সমাজ, তোমাদের যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে। এটা চোখ অবনত রাখা ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য নিরাপদ।' (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

৩. পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সহযোগিতা : নবী (সা) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَّةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا 'পুরুষ পরিবারের তদারককারী এবং পরিবারের অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। আর নারী তার স্বামীর ঘরের তদারককারী এবং অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।' (বোখারী, মুসলিম)

৪. রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখা : নবী (সা) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতি করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।' (ইবনে মাজাহ, মোয়াত্তা মালেক)

৫. আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ : আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে শান্তি ও স্বস্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা-রূম–২১)

৬. ভালো মুসলিম সন্তান জন্ম দেয়া : রাসূলুল্লাহ (সা)বলেন, 'তোমরা বিয়ে কর,

বংশ বৃদ্ধি কর, লোক সংখ্যা বাড়াও। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করবো।' (বায়হাকী, আব্দুর রাজ্জাক)

সন্তান বিয়ের এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে এদিকে ধাবিত হবে এবং সাধ্যমতো চেষ্টা চালাবে।

হে সন্তান গঠনকারী, আপনি যদি ধনী পিতা হন, তাহলে আপনার সন্তানের যথাসময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তাকে মানসিক কল্পনা ও যৌন চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি দিন; যা তার চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার লক্ষ্য ও শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তাকে স্বাস্থ্য ধ্বংসকারী চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করুন, নতুবা তা তার সুনাম ও সুখ্যাতি ধ্বংস করবে। বিয়ের ব্যবস্থা করলে করুন। যদি অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, তাহলে আপনার ছেলের মারাত্মক খারাপ পরিণতি হতে পারে।

আমরা বহু ধনী পিতার কথা শুনি, যারা সন্তানের বৈষয়িক ও মানসিক সাহায্য দানে কার্পণ্য করে এবং ছেলে বড় হয়েছে এ অজুহাতে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও খরচ দেয় না। কিন্তু তারা যদি বুঝতো যে, তাদের অর্থ সাহায্য সন্তানকে এক সাগর পেরেশানী– যা তাদের চরিত্র ধ্বংস ও মানসিক উদ্বেগের কারণ তা থেকে নৌকার ভূমিকা পালন করবে, তাহলে তারা বিয়ের সাহায্যের ব্যাপারে সংকীর্ণতা প্রকাশ করতো না। ধনী পিতা কেন সন্তানের বিয়ের খরচের জন্য কার্পণ্য করে? তিনি কি চিরন্তন হায়াতের অধিকার লাভ করেছেন? তিনি কি নিজ অর্থ-সম্পদ সাথে করে পরকালে নিয়ে যাবেন? তিনি অবশ্যই মারা যাবেন এবং তাকে ছোট একটি গর্তে রাখা হবে, যেখানে কোন ফার্নিচার ও ডেকোরেশন নেই। তার অর্থ সম্পদ ওয়ারিশদের কাছে চলে যাবে। তাই ধনী পিতার উচিৎ, তিনি যে অর্থ-সম্পদের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন- সেখান থেকে খরচ করা, পরিবারের জন্য ব্যয় করা, সন্তানের বিয়ের খরচ দিয়ে বিয়েকে সহজতর করা। তাকে নবী (সা) এর এই হাদিসটি শোনা দরকার : 'যে দিনার আল্লাহর পথে ব্যয় করেছো, যে দিনার গোলাম আযাদ করার জন্য ব্যয় করেছো, যে দিনার মিসকিনের জন্য ব্যয় করেছো এবং যে দিনার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছো, তার মধ্যে পরিবারের জন্য ব্যয়কৃত দিনারই হচ্ছে সর্বোত্তম।'

আল্লাহ বলেন, 'তিনি কখনো কারো নেক আমল নষ্ট করেন না।' পিতার উচিৎ, সন্তানের জন্য নেক স্ত্রী বাছাই করা, যার দিকে তাকালে সে খুশি হবে, আদেশ করলে আনুগত্য করবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অর্থ-সম্পদ ও ইজ্জত-

সম্মানের হেফাজত করবে। আল্লাহ যেন তাকে নেক সন্তান দেয় সেজন্য সে এই দোয়া করবে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মোত্তাকীদের জন্য আদর্শ নেতা বানাও।' (সূরা ফোরকান–৭৫)

সন্তানের গঠন ও তৈরীর জন্য স্ত্রী সহযোগিতা করবে, যাতে করে সে উপকারী লোক হিসেবে গড়ে ওঠে।

এখন আমরা বিয়ের পর বাসর রাতে করণীয় কাজের পর্যায়গুলো আলোচনা করবো, যখন ছেলে নব বধূ নিয়ে নির্জনে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তুতি নেয়। সকলের জানা দরকার যে, ইসলাম তার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের আওতায় বাসর রাতের নিয়মাবলি ও দাম্পত্য জীবনের মূলনীতিসহ সকল কিছু শিক্ষা দেয়।

বাসর রাতের ১০টি করণীয় কাজ

বাসর রাতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার।

(১) হাত দিয়ে নব দম্পতির কপাল ধরে বিসমিল্লাহ বলা ও তার জন্যে বরকতের দোয়া করা মোস্তাহাব। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ 'তোমাদের কেউ কোন নারী বিয়ে করলে তার কপাল ধরে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করে বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি তার জন্য কল্যাণ ও তার মধ্যে আপনার সৃষ্টির যে কল্যাণ রেখেছেন তা কামনা করি। আমি আপনার কাছে তার অনিষ্ট এবং তার মধ্যে আপনার সৃষ্টির যে অকল্যাণ ও অনিষ্ট রেখেছেন, তা থেকে পানাহ চাই।' (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা)

(২) দম্পতি যুগলের দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা মোস্তহাব। শাকীক থেকে বর্ণিত। আবু হোরাইজ নামক এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি এক কুমারী মেয়ে বিয়ে করেছি। আমার আশংকা যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, ভালাবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অসন্তোষ শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান চায়, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে ঘৃণিত বানাতে। তোমার স্ত্রী আসলে তাকে তোমার পেছনে দু'রাকাত নামায পড়তে

বলবে এবং তুমি এই বলে তার জন্য দোয়া করবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ اَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَاجَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ 'হে আল্লাহ, আমার স্ত্রীর মধ্যে আমাকে বরকত এবং আমার মধ্যে তাদেরকে বরকত দিন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে সর্বোত্তম উপায়ে একত্রিত করুন এবং বিচ্ছিন্ন করতে চাইলে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন করুন।' (ইবনু আবি শায়বা)

(৩) নব দম্পতির প্রতি আদর-সোহাগ প্রদর্শন এবং তাকে কিছু খাদ্য বা পানীয় দেয়া মোস্তাহাব। আসমা বিনতে ইয়াজিদ বিন সাকান বলেন, 'আমি আয়েশা (রা) কে প্রকাশ্যে দেখার জন্য সাজিয়ে দিলাম। নবী (সা) এসে তাঁর পাশে বসেন। দুধের একটি বড় পাত্র এনে তা থেকে নিজে পান করেন। তারপর আয়েশা (রা)কে দেন। তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করেন।' (মোসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ 'উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং স্ত্রীদের সাথে কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার।' (তিরমিযী, নাসাঈ)

তিনি আরও বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ 'তোমাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম ব্যক্তিই উত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।' (তিরমিযী)

এই আদর-সোহাগের ফলে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি এবং পরিচয়হীনতার ভয় দূর হবে। প্রবাদ আছে, لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ وَلِكُلِّ غَرِيْبٍ وَحْشَةٌ 'প্রত্যেক প্রবেশকারীর মধ্যে রয়েছে আকস্মিকতা এবং প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে ভীতি।'

(৪) যৌন মিলনের নিয়ম হলো উভয়ে পরনের কাপড় খুলে ফেলবে। শরীরে কাপড় না থাকলে বেশী আরাম লাভ করবে, নড়াচড়া সহজ হবে, বেশী সুখ পাবে এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বাড়বে। উভয়ের শরীরের উপরে কাপড় থাকা চাই। একই কাপড় বা লেপের নীচে পূর্ণ উলঙ্গ থাকা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ 'আল্লাহ লজ্জাশীল ও গোপনীয়তা পালনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে ভালোবাসেন।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَايُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُم وَاَكْرِمُوْهُمْ 'তোমরা উলঙ্গ হওয়া

থেকে বিরত থাকবে। তোমাদের সাথের ফেরেশতারা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ ও স্ত্রী মিলনের সময় ছাড়া কখনো তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই তাদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ কর ও তাদেরকে সম্মান কর।' (তিরমিযী)

ইতোপূর্বে আয়েশা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমি তাঁর এবং তিনি আমার গুপ্তাঙ্গ দেখেননি।'

তবে সতর না খোলা এবং সতর ঢেকে রাখার মর্মে তিরমিযীর বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি দুর্বল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلاَيَتَجَرَّدَان تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ 'তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করলে যেন গাধার মতো উলঙ্গ না হয়।'

(৫) যৌন মিলনের আগে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, জড়িয়ে ধরা এবং চুমু দেয়া নিয়ম। এ মর্মে আবু মনসুর দাইলামী তাঁর মোসনাদ আল ফেরদাউসে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। لاَيَقَعَنَّ أَحَدُكُم عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيْمَةُ, لِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُوْلٌ, قِيْلَ:وَمَا الرَّسُوْلُ؟ قَالَ :الْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ 'তোমাদের কেউ যেন পশুর মতো নিজ স্ত্রীর সাথে না মেশে। বরং আগে দূত বিনিময় করবে। প্রশ্ন করা হলো দূত বিনিময় মানে কী? তিনি বলেন, চুমু খাওয়া ও কথা বলা।'

দাইলামী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিম্নোক্ত হাদিসটিও বর্ণনা করেন। 'তিনটি বিষয় ঘাটতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি এর মধ্যে উল্লেখ করেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী কিংবা দাসীর কাছে গিয়ে কথা বার্তা ও তার উত্তেজনা সৃষ্টি ছাড়া যৌন মিলন করে। ফলে সে নিজ প্রয়োজন পূরণ করে কিন্তু স্ত্রীর প্রয়োজন অপূরণকৃত থেকে যায়।'

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যৌন মিলনের সময় স্ত্রীকেও সমান আনন্দ অনুভব করার সুযোগ দিতে হবে।

ইমাম গাজালী 'এহইয়াউল উলুম' বইতে লিখেছেন, স্বামী নিজ প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে স্ত্রীর তৃপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। হয়তো তার আনন্দপূর্ণ হতে দেরী হতে পারে। তাই তার উত্তেজনা বাড়াতে হবে এবং একটু অপেক্ষায় থাকতে হবে। দু'জনের একই সময় এনজাল হলে বেশী আনন্দ পাওয়া যাবে। এর আগ পর হলে বিদ্বেষ দেখা দেবে।

(৬) স্ত্রী মিলনের সময় স্বামী নিম্নের দোয়া পড়া ভালো। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে গেলে এই দোয়াটি পড়বে : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ

مَا رَزَقْتَنَا 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।' যদি এর মাধ্যমে কোন সন্তানের ফায়সালা হয় শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।' (বোখারী)

(৭) স্ত্রীর যোনী পথে সঙ্গম করার জন্য যেভাবে এবং যেদিক থেকে ইচ্ছা করতে পারবে। আল্লাহ বলেন, نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের চাষের ক্ষেত্র, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাকে চাষ কর।' (সূরা বাকারা-২২৩)

অর্থাৎ সামনে, পেছনে এবং পাশ থেকে যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীর যোনীতে সঙ্গম করা যাবে।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা বলতো, কেউ পেছন দিক থেকে স্ত্রী যোনীতে সঙ্গম করলে সন্তান কানা হয়। তাদের এই দাবী মিথ্যা খণ্ডনের জন্য উপরের আয়াতটি নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, স্ত্রীর যোনীতে হলে তা সামনের দিক বা পেছনের দিক হোক, যে কোন দিক থেকে সঙ্গম করা যাবে।

সঙ্গমের উত্তম প্রকার হলো, স্বামী স্ত্রীর উপর আরোহণ করবে।

এ পদ্ধতির প্রতিই নবী (সা) থেকে আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। আবু মূসা আশআরী বলেন, গোসল কিসে ফরজ হয়– এ বিষয়ে একদল আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আনসারীরা বলেন, সবেগে স্খলিত পানি বা মণি বের হলেই কেবল গোসল ফরজ হয়। আর মোহাজিরদের মতে, কেবল যৌন মিলন হলেই গোসল ফরজ হয়। আবু মূসা বলেন, আমি এ বিষয়ে তোমাদেরকে সন্তোষজনক জবাব এনে দেবো। আবু মূসা আয়েশা (রা) কাছে যান এবং বলেন, হে আম্মা, আমি আপনাকে এমন একটা বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, যে ব্যাপারে আমি লজ্জাবোধ করি। আয়েশা বলেন, প্রশ্ন কর। তুমি কি তোমার জন্মদাত্রী মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ কর? আমিও তোমার মা। তিনি প্রশ্ন করেন কোন জিনিসের কারণে গোসল ফরজ হয়? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছে প্রশ্ন করেছো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ 'স্বামী যখন স্ত্রীর চার অঙ্গ অর্থাৎ দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝখানে বসে এবং দুই গুপ্তাঙ্গের স্পর্শ ঘটে, তখন গোসল ফরজ হয়।' (মুসলিম)

স্বামী উপরে উঠলেই কেবল এ পদ্ধতিতে যৌন মিলন সম্ভব।

(৮) পুনরায় যৌন মিলন করতে চাইলে অধিক কর্ম ক্ষমতার জন্য অজু করা মোস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের পর পুনরায় যেতে চাইলে অজু করে নাও। কেননা তা পুনরাবৃত্তির জন্য অধিক কার্যকরী।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

তবে গোসল করা উত্তম। এ মর্মে আবু দাউদ ও নাসাঈ নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'তিনি একদিন তাঁর স্ত্রীদের কাছে গমন করেন এবং প্রত্যেকের কাছে গোসল করেন। হাদীস বর্ণনাকারী আবু রাফে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেবল একবার গোসল করেননি কেন? নবী (সা) বলেন, এটাই পবিত্রতম, উত্তম ও পরিচ্ছন্নতম বিষয়।'

(৯) স্বামী-স্ত্রী দু'জনের দ্রুত গোসল করা উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস থেকে বর্ণিত। 'আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করি, নবী (সা) জানাবতের সময় ঘুমের আগে গোসল, নাকি গোসলের আগে ঘুমাতেন? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দু'রকমই করতেন। কোন সময় গোসল করে ঘুমাতেন এবং কোন সময় ওজু করে ঘুমাতেন। আমি বললাম, আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি এ বিষয়ে সুযোগের ব্যাপকতা রেখেছেন।' (মুসলিম)

তবে আগে গোসল করা উত্তম। কেননা ঘুম থেকে জেগে অলসতা, নামায হারানোর আংশকা কিংবা বিনা কষ্টে যেন উভয়ই ফজরের নামায পড়তে পারে, বিশেষ করে শীত মৌসুমে যখন ঠাণ্ডা ও সর্দি থাকে।

(১০) স্বামী স্ত্রী একই স্থানে একত্রে গোসল জায়েয। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি ও রাসূল (সা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম এবং পাত্রে আমাদের পরস্পরের হাত লেগে যেতো। নবী (সা) আগে আগে পানি ব্যবহার করতেন। এমনকি আমাকে বলতে হতো, আমার জন্যও পানি রাখুন, আমার জন্যও রাখুন। তাঁরা উভয়ই জানাবতের অবস্থায় এরূপ করতেন।' (বোখারী, মুসলিম)

উভয়ের এক সাথে উলঙ্গ গোসল জায়েয। তবে সতর ঢেকে গোসল করা উত্তম। নবী (সা) বলেন, اَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيَا مِنْهُ 'আল্লাহ অধিক লজ্জার অধিকারী' (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

স্বামী স্ত্রীকে যেসব হারাম কাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে :

১. স্বামী স্ত্রী প্রকাশ্য বা ইশারা-ইঙ্গিতেও কৃত যৌন আচরণ প্রকাশ করবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তির মর্যাদা নিকৃষ্ট, যে স্বামী স্ত্রী গমন করে কিংবা যে স্ত্রী স্বামী গমন করে এবং পরে লোকদের কাছে তা প্রকাশ করে দেয়।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী (সা) নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বলেন, তোমরা বসো। তোমাদের মধ্যে এমন কোন পুরুষ আছে কি, যে স্ত্রীর কাছে দরজা বন্ধ করে, সতর খুলে যৌন ক্রিয়া করার পর বেরিয়ে এসে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে এটা-ওটা করেছি? সকলেই চুপ করে রইলো। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এরূপ বলে? এক যুবতী নিজ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করে, যেন নবী (সা) তাকে দেখেন ও তার কথা শোনেন। যুবতীটি বললো, আল্লাহর শপথ, পুরুষ ও নারীরা এরূপ আলোচনা করে থাকে। নবী (সা) বলেন, যে এরূপ করে তার উদাহরণ কি তোমরা জানো? তার উদাহরণ হলো, এক পুরুষ শয়তান অপর এক মহিলা শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে যৌন ক্রিয়া করে এবং লোকেরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।' (আহমদ, আবু দাউদ)

২. স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি নজর করেন না, যে নিজ স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া করে।' (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাদীসের সনদ ভালো)

ইবনে আদী, আবু দাউদ ও আহমদে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌনক্রিয়াকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ঋতুবতীর সাথে যৌন মিলন কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া করে অথবা কোন গনকের কাছে যায় ও সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মোহাম্মদের (সা) উপর অবতীর্ণ বিষয়কেই অস্বীকার করে।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

তাউস থেকে বর্ণিত। 'ইবনে আব্বাসকে স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমাকে যেন কুফরী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো।' (নাসাঈ, সনদ সহীহ)

গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া করা শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মর্যাদা ও সচ্চরিত্রের পরিপন্থী এবং সমকামিতা ও যৌন বিকৃতির নামান্তর। আমরা এ বিষয়ে সন্তানের 'শারীরিক শিক্ষা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

৩. মাসিক ঋতু ও সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হারাম। আল্লাহ পবিত্র কোরআন মাজীদে মাসিক সম্পর্কে বলেন, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ 'তোমরা মাসিকের সময় স্ত্রী গমন থেকে দূরে থাকো।'

নেফাসের সময় স্ত্রী গমনকে মাসিকের উপর কেয়াস করে হারাম করা হয়েছে। এ দু'টো হারাম হওয়ার কারণ ও অবস্থা অভিন্ন যার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে মাসিক ও নেফাসের অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ইজারের উপর ভোগ করতে পারবে। ইজারের নীচে ভোগ করা হারাম। কুপ্রবৃত্তি যেন শরয়ী হারাম ও শারীরিক ক্ষতির মধ্যে না পড়ে। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ চারণ গাহের পাশে বিচরণ করে, সে তাতে পড়ে যেতে পারে। মুসলমানকে দ্বীন ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজ আবরণে পরহেজগার থাকতে হবে।

*** চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাসিক ও নেফাসের সময় যৌন মিলনের ক্ষতি :**

১. নারীর যৌনাঙ্গে ব্যথা দেখা দেয় : হতে পারে জরায়ু ডিম্বাশয় কিংবা স্ত্রী যোনীতে ইনফেকশন। এর ফলে তার স্বাস্থ্যের বিরাট ক্ষতি হবে। ফলে ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

২. মাসিকের উপাদান স্বামীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলে তাতে পুঁজ হতে পারে যা গনোরিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তা পরে অণ্ডকোষেও সম্প্রসারিত হতে পারে। এর ফলে স্বামীর বন্ধ্যাত্ব কিংবা সিফিলিস রোগ দেখা দিতে পারে, যদি স্ত্রীর রক্তে এর জীবাণু থাকে। মূল কথা, এ সময়ে স্ত্রীর কাছে গেলে নারী কিংবা পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে, যা যৌনাঙ্গে সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই পৃথিবীর সকল চিকিৎসক এ সময় স্ত্রী থেকে দূরে থাকার বিষয়ে একমত, যা পবিত্র কোরআনের কথা।

কেউ যদি হায়েয ও নেফাসের সময় যৌন মিলন করেই ফেলে, তাহলে তাকে গুনাহর জন্য তওবাহ ও এস্তেগফার করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হতে হবে। এটাই অধিকাংশ ফেকাহবিদের মাজহাব। তবে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ আওযাঈ, এসহাক, ইমাম আহমদের অন্য বর্ণনায় এবং ইমাম শাফেঈর প্রাচীন রায়ে বলা হয়েছে, এজন্য সামর্থ্য অনুসারে কিংবা রক্ত লাল ও হলুদ হওয়ার অবস্থাভেদে এক দিনার বা অর্ধ দিনার সদকা করতে হবে। এ মর্মে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে, সে যেন এক দিনার বা অর্ধ দিনার সদকাহ করে।' (নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, তাবারানী)

তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, 'রক্ত লাল বর্ণের হলে এক দিনার এবং হলুদ বর্ণের হলে অর্ধ দিনার দিতে হবে।'

চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের উপদেশ

১. যৌন চাহিদা পূরণ ও ভোগের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থী হওয়া। এই মধ্যমপন্থার সীমা হলো, সপ্তাহে দু'বার। তবে পূত পবিত্র ও সাধু থাকার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা কম-বেশী হতে পারে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, তা যেন অধিক মাত্রায় না হয়। এর ফলে শরীরের ক্ষতি, বিবেক-বুদ্ধির ধ্বস, কাজ থেকে দূরে থাকা এবং ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বিমুখতা দেখা দেবে।

২. আগে প্রাথমিক পর্যায়ের যৌন আচরণ এবং পরে যৌন মিলন করতে হবে।

৩. উপযুক্ত সময়ে যৌন ক্রিয়া করা উচিৎ। কেননা নারীদের মেজাজ নাজুক। তার মেজাজ বিরোধী সময়, যেমন-অসুখ ও ক্লান্তির সময়ে যৌন ক্রিয়া করলে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

৪. স্বামী সরে আসার আগে স্ত্রীর তৃপ্তি ও আনন্দ লাভের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

৫. সকল মাস, দিন ও সময়ে যৌন মিলন জায়েয। তা দিন ও রাতের যে কোন সময়ে হতে পারে। তবে রোজার দিন, স্ত্রীর মাসিক ও হায়েযের সময়ে জায়েয নেই। জুমার দিন ও রাতে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন সুন্নাত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন ভালো করে (জানাবতের) ফরজ গোসল সেরে মসজিদে প্রথমে যায় সে একটি উট, দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি গরু, তৃতীয় ব্যক্তি একটি ভেড়া চতুর্থ ব্যক্তি মুরগী এবং পঞ্চম ব্যক্তি একটি ডিম দানের সওয়াব পায়। ইমাম খোৎবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে আসলে ফেরেশতারা ওয়াজ-নসীহত ও জিকর শোনার জন্য হাজির হয়।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন যৌন মিলনের কারণে নিজের উপর গোসল ফরজ করে পরে গোসল করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগে-ভাগে মসজিদে যায়, সওয়ারীর উপর আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়, ভালো করে খোৎবা শোনে, বেহুদা কোন কথা ও কাজ না করে যার দ্বারা নামাজ বাতিল হয়, তাহলে তার প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছরের আমল অর্থাৎ রোজা নামাযের সওয়াব পায়।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

এ দুই হাদীসে জুমার দিন ও রাতে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের কথা উল্লেখ আছে।

৬. স্ত্রীর উচিৎ, স্বামীর ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে তার আগ্রহ অনুযায়ী সাজ-গোছ করা, আদর-সোহাগ করা ও বিশেষ সময়ে যৌন মিলন করা। স্বামীর আগ্রহের পথে তার বাধ সাধা উচিৎ নয়। তার বিনা অনুমতিতে নফল রোজা রাখবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'স্বামী স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকলে স্ত্রী আসতে অস্বীকার করলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সারারাত তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'স্বামীর খুশী হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা অভিশাপ বর্ষণ করে।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা রাখা জায়েয নেই।' (বোখারী)

এই হচ্ছে যৌন প্রবৃত্তির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ যেন আমাদের যুবকদেরকে নেক স্ত্রী দান করেন, যার দিকে তাকালে সে খুশী হবে এবং কিছু আদেশ করলে আনুগত্য করবে।

৬. বিয়ের সামর্থ্যহীনদের সংযমী হওয়া : অর্থ-সম্পদ জাগতিক সুখের মূল ও জীবনের চালিকা শক্তি। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অর্থ থাকলে সমস্যার সমাধান, বাধা অতিক্রম এবং লক্ষ্য অর্জন করা যায়। কবি যথার্থই বলেছেন, 'অর্থ সকল স্থানে ব্যক্তিকে সম্মান ও সৌন্দর্যের পোশাক পরায়, বিশুদ্ধ কথা বলতে ইচ্ছুকের জন্য এটা জিহবা এবং যোদ্ধার জন্য অস্ত্র।' যে সমাজে অর্থকে সকল কিছু মনে করা হয়- সে অহঙ্কারী সমাজে জ্ঞানী ও চরিত্রবান ব্যক্তির কোন মূল্য নেই, যদিও সে দুই হারাম শরীফের ইমাম এবং মানুষ ও জিনের আলেম হোকনা কেন। যে সমাজে অর্থ সব কিছু সে সমাজ সম্পর্কে কবি যথার্থ বলেছেন, وَذُوْ جَهْلٍ يَنَامُ عَلَى حَرِيْرٍ : وَذُوْ عِلْمٍ يَنَامُ عَلَى التُّرَابِ 'মূর্খ ব্যক্তি সিল্কের উপর ঘুমায় আর জ্ঞানী ব্যক্তি ঘুমায় মাটিতে।'

মূর্খ ও অহঙ্কারী সমাজে অর্থকেই সকল কিছু মনে করা হয়। কিন্তু যার অর্থ-বিত্ত নেই এবং যার প্রতি কেউ সহানুভূতি প্রকাশকারী নেই, সে কী করবে? সেতো বিয়ের মাধ্যমে নিজের সাধুতা রক্ষা করতে আগ্রহী। সেও যৌন চাহিদা পূরণে ইচ্ছুক। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা সে পথের অন্তরায়। এখন তার উপায় কী?

তার উপায় হলো তাকে কোরআনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্রতা, সাধুতা, মহত্ত্ব ও সংগ্রামের জীবন যাপন করতে হবে। আর এটাই তার আত্মার সংশোধন, লজ্জাস্থানের হেফাজত এবং কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনার উর্ধ্বে ওঠে বাস করার উপায়।

মহান প্রভু কোরআন মাজীদে বলেছেন, 'যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।' (সূরা নূর-৩৩)।

কোরআনের এই আহ্বান হচ্ছে পবিত্রতা ও সম্মানিত নফসের গঠন প্রক্রিয়া, যা যুবকের মনে সংকল্পকে শক্তিশালী করে, দৃঢ়তা আনে, ফেরেশতা স্বভাবের করে গড়ে তোলে এবং সর্বদা প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা দান করে। পবিত্রতা ও মহত্ত্বের শীর্ষে যুবকদেরকে তোলার কারিকুলাম কী, এ বিষয়ে আমরা এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে গোপন অভ্যাসের সমাধান' পর্বে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আগের বিষয়গুলোর সাথে আরও কিছু অতিরিক্ত বিষয় আলোচনা করে একে পূর্ণ করবো। আগের বিষয়গুলো হলো :

১. আগে-ভাগে বিয়ে করা ২. নফল রোজা অব্যাহত রাখা, ৩. যৌন উদ্দীপক জেলি থেকে দূরে থাকা ৪. উপকারী জিনিস দ্বারা অবসর সময় কাটানো ৫. ভালো সাথী নির্বাচন ৬. চিকিৎসা উপদেশ গ্রহণ ৭. আল্লাহ্র ভয় পোষণ করা।

এখন আমরা আরও দু'টো বিষয় যোগ করছি। তা হলো-

১. হারাম জিনিস থেকে চোখ অবনত রাখা। ২. দ্বীনি জ্ঞান ও উপলব্ধি জোরদার করা ।

১. হারাম জিনিস থেকে চোখ অবনত রাখার বিষয়ে আমরা 'দৃষ্টির আদব ও নিয়ম' এর মধ্যে আলোচনা করেছি।

২. দ্বীনি জ্ঞান ও অনুভূতি জোরদার করার ব্যাপারে আমরা এই বইয়ের বহু জায়গায় আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, শিশুর মনে আল্লাহ্-ঈমান-আকীদাকে পর্যায়ক্রমে মজবুত করতে হবে।

এখন আমরা পবিত্রতা ও সংযমের দু'টো মহান উপমা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করবো, যেন তার অনুকরণ করা হয়।

(১) নবী ইউসুফ (আ) যখন ভরা যৌবনে পদার্পণ করেন, পূর্ণ জ্ঞান ও পৌরুষত্ব যখন বিদ্যমান, তখন মর্যাদা ও সম্মানের রাণী তাকে দরজা বন্ধ করে নিজের দিকে আহ্বান জানায়। তখন সকল সুযোগ মওজুদ ছিলো। এ মর্মে কোরআন বলে, 'আর তিনি যে মহিলার ঘরে ছিলেন, সে মহিলা তাঁকে ফুসলাতে লাগলো, দরজাসমূহ বন্ধ করে দিলো এবং বললো, শোন, তোমাকে বলছি, এদিকে আস।' (সূরা ইফসুফ-২৩)

এ অবস্থায় অর্থাৎ উৎসাহ প্রদান এবং যে ফেৎনায় চোখে ধাঁধা লেগে যায়–তার ভূমিকা কী হতে পারে? তার মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম হয়ে আত্মসমর্পণ করার কথা এবং আমানতের খেয়ানত করার কথা। কিন্তু না, তিনি বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় চাই, তোমার স্বামী আমার মনিব। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীরা সফল হয় না।' (সূরা ইউসুফ–২৩)

মিসরের সম্রাট আযীযের স্ত্রী সকল প্রকার ফিকির-ফন্দি, ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা এবং উৎসাহ ও হুমকি দিয়ে তাঁর অনমনীয় মনোভাবে চিড় ধরাতে ব্যর্থ হয় এবং অত্যন্ত রাগ ও ক্ষোভের সাথে অন্যান্য মহিলাদেরকে বলে, 'আমি তারই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে বিরত রেখেছে। আমি যে আদেশ দেই সে যদি তা মান্য না করে, তাহলে সে শীঘ্রই কারাগারে প্রেরিত হবে ও লাঞ্ছিত হবে।' (সূরা ইউসুফ–৩২)

কিন্তু যুবক ইউসুফ (আ) সার্বিকভাবে আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করেন। তিনি বলেন, 'হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগার পছন্দ করি। যদি আপনি আমার উপর থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।' (সূরা ইউসুফ–৩৩)

এটা ছিলো একজন মোমেনের অন্তরে আল্লাহর ভয়ের নমুনা। এখানে লোভ–লালসার পরাজয় ও ঈমানের বিজয় হয়েছে।

(২) ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমার বিন খাত্তাবের আমলে এক মহিলার স্বামী জেহাদে যান এবং স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক দিন অনুপস্থিত থাকেন। ফলে স্ত্রীর মধ্যে একাকীত্বের দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি হয়। নারীত্বের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে, যৌন কামনা তীব্র হয়। একমাত্র ঈমান ও আল্লাহর পর্যবেক্ষণের ভয় ছাড়া তার সামনে আর কোন বাধা নেই। রাতের গভীর অন্ধকারে একদিন ওমার (রা) সে মহিলার আবেগ-আপ্লুত ভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিম্নোক্ত গানের কলিগুলো শোনেন :

> *'এ রাত সুদীর্ঘ, চতুর্দিক অন্ধকার, আমার প্রবল ইচ্ছা যে প্রিয় বন্ধুর সাথে আনন্দ স্ফূর্তি করি।*
>
> *আল্লাহর কসম, যদি এর পরিণাম ফলের আশংকা না থাকতো, তাহলে এ খাটের চারপাশ নড়াচড়া করতো।'*

ওমার (রা) পরের দিন নিজ কন্যা ও উম্মুল মোমেনীন হাফসা (রা) এর কাছে

গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, স্ত্রী কতদিন পর্যন্ত স্বামীর অনুপস্থিতির অপেক্ষা করবে? হাফসা বলেন, চার মাস। তখন ওমার (রা) রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর প্রতি এই নির্দেশ পাঠান যে, কোন সৈনিককে তার পরিবার থেকে চার মাসের বেশী আটকে রাখা যাবে না। এ ঘটনায় দেখা যায়, মোমেন নারীটি আল্লাহর ভয় এবং গুনাহ ও অশ্লীলতার মধ্যকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলো। এখানেও ঈমানের বিজয় এবং গুনাহ ও অশ্লীলতার ইচ্ছার পরাজয় হয়েছে।

পবিত্রতা, সাধুতা ও মহত্ত্বের শীর্ষে পৌঁছার লক্ষ্যে এগুলো হচ্ছে কারিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা। কোন যুবক তা অনুসরণ করলে, সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্মতা এবং ধৈর্যের সাথে তা মেনে চললে, সে জীবনের প্রতিটি বাঁকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি লাভ করবে। যে যৌন তাড়না তার মন-মানসিকতাকে সর্বত্রই দৌড়িয়ে হাঁপিয়ে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবে। বরং সে চরিত্রে নবীদের মতো, পবিত্রতায় ফেরেশতাদের মতো, সাধুতায় নেক পূর্বসূরীদের মতো হবে। এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ তাকে নিজ দয়া ও রহমত দান করবেন এবং রিযকের দরজা প্রশস্ত করবেন। আল্লাহ সর্বদা মোমিন বান্দাহর দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, সকল বিপদ-মুসীবত ও সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি কোরআনে বলেন, 'যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদের মুক্তির উপায় বের করেন এবং অভাবিত উপায়ে তাদেরকে রিযক দান করেন।' (সূরা তালাক-২, ৩)

তিনি আরও বলেন, 'যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম ধারণ করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহের দ্বারা ধনী করে দেন।' (সূরা নূর-৩৩)

এই ধরনের সংযমী সাধুতা কিছুতেই যৌন প্রবৃত্তিকে দলন করা নয়, যা ইসলাম বিরোধিরা বলে থাকে। শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্বদিবদের মতে, যৌন প্রবৃত্তি দলন বলতে বুঝায়, অসাধু উপায়ে যৌন ক্রিয়া করা এবং বিয়ের মাধ্যমে তা পূরণ করাকে অপরাধ মনে করা। এর অপর নাম হলো বৈরাগ্যবাদ। এ বিষয়ে আমরা 'বিয়ে ও যৌন সংযোগ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলাম বৈরাগ্যবাদ ও বিয়ে না করাকে নিন্দা করে। কেননা ইসলাম বিয়েকে মানব প্রকৃতি ও যৌন প্রবৃত্তির অনুকূল মনে করে। তাহলে ইসলামের মূলনীতিতে কোথায় যৌন প্রবৃত্তি দমনের স্থান? কোন যুবকের এই প্রাকৃতিক চাহিদা অনুভব করার পর তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার কিছু নেই। কেননা ইসলাম এটাকে স্বভাবসম্মত বিষয় মনে করে, ঘৃণা বা মতভেদের বিষয় নয়। তাই যৌন

আগ্রহের কারণে যৌন প্রবৃত্তিকে দমনের প্রশ্নই ওঠেনা কিংবা এজন্য তাকে অপরাধির অনুভূতিও পোষণ করতে হবে না। ফলে অপরাধের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট মানসিক ও স্নায়ুবিক অস্থিরতা অবশিষ্ট থাকবে না, যা শেষ পর্যন্ত সমকামিতার অপরাধে রূপান্তরিত করে। আমাদের জানা দরকার, ইসলাম যেকোনভাবে উভয় পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী এ প্রাকৃতিক অনুভূতির বাস্তবায়ন অনুমোদন করে না। এজন্য শরীয়ত সীমা নির্ধারণ করেছে, যার ভেতরে তা হালাল এবং বাইরে তা হারাম। তাহলে এটা এক বিষয়, আর যৌন প্রবৃত্তির দমন ভিন্ন বিষয়। বোঝা গেলো, বিয়ে ছাড়া তা হারাম হলেও মৌলিকভাবে তা হারাম নয়। সে যে কোন সময় ইচ্ছা করলে বিয়ের মাধ্যমে তা পূরণ করতে পারে। মোট কথা, ইসলামে যৌন প্রবৃত্তি দমনের কোন স্থান নেই।

অবিবাহিত কোন লোক যদি অবিবাহিত অবস্থায় কঠিন যৌন চাহিদা অনুভব করে এবং যৌন কামনা তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, সে যদি এ কারণে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ার অধিক আংশকা পোষণ করে, তাহলে শরীয়ত তাকে গোপন অভ্যাসের অনুমতি দেয়, যেন তীব্র যৌন তাড়নাকে শান্ত এবং যৌন কামনার তীব্রতা কমাতে পারে। এক্ষেত্রে শরীয়তের যে মূলনীতিটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তা হলো, 'অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর' কিংবা 'অপেক্ষাকৃত কম মন্দ' গ্রহণ করা। এ কারণে ফেকাহবিদগণ বলেন, শান্ত যৌন চাহিদা বাড়ানোর জন্য হস্ত মৈথুন করা হারাম। কিন্তু যদি যৌন কামনা তীব্র হয়, মন মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, অশ্লীলতার দরজায় নিয়ে দাঁড় করায় এবং হস্তমৈথুন তাকে শান্ত করার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন তা করা জায়েয। এজন্য তার কোন সওয়াব ও শাস্তি হবে না। সাবধান, যারা বলে ইসলাম যৌন কামনাকে দমন ও বৈরাগ্যবাদকে উৎসাহিত করে, তাদের জিহ্বা বন্ধ হওয়া দরকার।

পরিশিষ্ট : আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আলী তানতাওয়ীর বিজ্ঞ মন্তব্য আধুনিক মুসলিম যুবকদের জ্ঞানের একটি সুন্দর শাখা হিসেবে বিবেচিত যা বাহ্যিক ও শান্তভাবে আকৃষ্ট করার অপূর্ব উদাহরণ এবং যা হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে সত্যের দিকে আহবান জানায়। তিনি তাঁর, 'ইয়া ইবনি' পয়গামে বলেন, তোমরা কেন আমার কাছে লিখতে ইতস্তত ও লজ্জাবোধ কর? তোমার ধারণা যে, তুমি একাই ধরণীতে যৌন চাহিদার অনুভূতি নিজে অনুভব কর এবং তুমি ছাড়া আর কেউ এই সমস্যার সাথে জড়িত নও। না, হে সন্তান, তা নয়। এটাকে সহজভাবে নাও। এ সমস্যা তোমার একার নয় বরং সকল

যুবকের। সতেরো বছর বয়সে তোমার এই সমস্যার প্রতি আমার সহানুভূতি সীমিত নয়। তোমার মতো আরও বহু যুবকের প্রতিও আমার একই অনুভূতি। এর থেকে ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না।

একজন যুবক এ বয়সে কী করবে যখন তার যৌন তাড়না তীব্র, শরীর অস্থির ও কামনা বাসনার বিস্ফোরণ ঘটে? এটা কি সমস্যা! এটা হলো আল্লাহর পদ্ধতি ও মানব প্রকৃতি। আপনি তাকে বলবেন, বিয়ে কর। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি ও শিক্ষা পদ্ধতি তাকে বলে, তুমি তিনটা মন্দের যে কোন একটা গ্রহণ কর। কিন্তু চতুর্থ একটি বিষয় আছে সেটিতেই কেবল কল্যাণ রয়েছে। আর তা হলো বিয়ে। প্রথম তিনটি বিষয় হলো :

১. যৌন চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার মধ্যে ডুবে থাক, বেশ্যাদের কাহিনী দ্বারা পুষ্ট কর, পাপী ফিল্ম ও বেশ্যাদের ছবি দ্বারা মনকে ব্যস্ত রাখ, চোখ, কানকে এ কাজে লাগাও। ফলে যেদিকে তাকাবে সেদিকে কেবল ফেতনা দেখতে পাবে। বই খুললে, পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে, সন্ধ্যা রাতের লালিমা ও রাতের আঁধার, দিবা ও রাতের স্বপ্নে কেবল যৌন কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকবে। তখন অবস্থা হবে কবির ভাষায় :

'আমি এই স্মৃতি ভুলতে চাই, যা আমার সারা রাতকে ব্যস্ত রেখেছে।

তারপর অবস্থা দাঁড়াবে অস্থিরতা, পাগলামী ও স্নায়ুর ধ্বস।'

২. গোপন অভ্যাস বা হস্তমৈথুন : এ ব্যাপারে কবি ও ফেকাহবিদরা কথা বলেছেন। এটা যদিও তিনটার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। কিন্তু তা যদি সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তা মনকে কল্পনাপ্লুত, শরীরকে অসুস্থ, যুবককে বৃদ্ধ ও শান্ত, ক্লান্ত করবে। সে লোকদের থেকে ভাগবে, তাদের সাথে কথা বলতে হিম্মত পাবে না, জীবনকে ভয় এবং এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন সে জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত বলে মনে হবে।

৩. অথবা আপনি হারাম ও অশ্লীলতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তির নোংরা নর্দমায় ডুব দেবেন। নিজ স্বাস্থ্য, যৌবন, ভবিষ্যৎ ও দ্বীনকে ভোগ-বিলাসে ভাসিয়ে দেবেন। তাহলে, আপনি যে সত্যের সাক্ষ্যের চেষ্টা ও চাকুরীর আগ্রহ পোষণ করেন, তাসহ আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং আপনার যৌবন ও শক্তি-সামর্থ্যকে স্বাধীন কাজের মধ্যে লাগানোর অবকাশ আর রাখলেন না। আপনি একথা ভাববেন না যে, একজন থেকে চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ করেছেন, কখনো নয়।

অন্য আরেক জনের প্রতি আপনার লোলুপতা বাড়বে। যেমন, লোনা পানি পানকারীর তৃষ্ণা কোনো দিন নিবারিত হয় না বরং আরো বাড়ে। এর দৃষ্টান্ত হলো, আপনি তাদের হাজারটার সাথে পরিচয়ের পর যদি একটাকে অনাগ্রহী দেখেন, তাহলে সেটার প্রতি তীব্র আগ্রহ বাড়বে। মনে হবে যেন তাকে কোন দিন দেখেননি। তাই তা হারানোর বেদনা অনুভূত হবে। আপনি তাদের কাছে ক্ষমতা ও সম্পদের বদৌলতে যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। কিন্তু আপনার হারানো স্বাস্থ্য কি কোন কামনা-বাসনার দাবীগুলো পূরণ করতে সক্ষম? তা সম্ভব নয়। শক্তিশালী শরীরও ধ্বসে পড়ে। শক্তির বহু কিংবদন্তী, কুস্তি, তীর নিক্ষেপ ও প্রতিযোগিতায় বীরত্ব প্রদর্শনকারীরা অবৈধ যৌন কামনা পূরণে ব্যস্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

আল্লাহর হেকমতের কি রহস্য! তিনি মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য সওয়াব ও স্বাস্থ্য রেখেছেন। আর নিকৃষ্ট ও হীন কাজের জন্য রেখেছেন শাস্তি, পতন ও রোগ। ৩০ বছরের নিজের উপর অত্যাচারী অনেক ব্যক্তিকে ৬০ বছরের মতো মনে হয়। পক্ষান্তরে, পবিত্র, সাধু ও সংযমী ৬০ বছরের লোককে ৩০ বছরের মতো মনে হয়। একটি সত্য প্রবাদ আছে, 'যে নিজ যৌবনের হেফাজত করে, তাতে তার বার্ধক্যের হেফাজত হয়ে যায়।' আমাদের এক নেক পূর্বসূরী বলেছেন, 'আমরা আমাদের অঙ্গগুলোকে শৈশবে হেফাজত করায় আল্লাহ্ বার্ধক্যে সেগুলোর হেফাজত করেন।'

আমি যেন শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলছেন, এ রোগের ওষুধ কী? উত্তর : ঔষুধ হলো, আল্লাহর পদ্ধতি ও প্রকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্ কোন একটাকে হারাম করলে সেই স্থানে আরেকটা হালাল করেন। যেমন, সুদের স্থানে ব্যবসা, যেনার স্থানে বিয়ে ইত্যাদি। এখানে ঔষুধ হলো বিয়ে।

আপনার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না হলে, সংযমী হোন। আমি বিষয়টিকে জটিল না করে একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করছি :

আপনি কি আগুনের উপর টগবগ করা চায়ের কেটলি দেখেছেন? আপনি এর মুখ বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে তাপ দিতে থাকলে বদ্ধ বাষ্পের বিষ্ফোরণ ঘটবে। এটাকে ছিদ্র করে দিলে পানি গড়িয়ে পড়ে যাবে এবং খালি কেটলি পুড়ে যাবে। আর আপনি যদি আটক বাষ্পকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেন, তাহলে তা দ্বারা কারখানা ও ট্রেন চালনাসহ আরো আশ্চর্যজনক ফল পাবেন।

প্রথম অবস্থাটি হলো, যে ব্যক্তি যৌন কামনাকে আটকে রাখে।

দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো, যে ব্যক্তি হারাম যৌন কামনায় ব্যস্ত।

তৃতীয় অবস্থাটি হলো, যে ব্যক্তি সংযমী।

সংযমের মাধ্যমে আপনি আত্মিক ও শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং বিবেকের প্রতিযোগিতায় সঞ্চয়কৃত শক্তিটিকে কাজে লাগাচ্ছেন। আটক বাষ্পের শক্তি আল্লাহর আশ্রয়, সাহায্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যয় হচ্ছে, জ্ঞান-গবেষণায় ব্যস্ত হচ্ছে, আপনার যৌন শক্তির কল্পনাকে শিল্পকলা, কবিতা ও চিত্রকলায় প্রকাশের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি নিচ্ছে কিংবা শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম অথবা দ্বীনি শিক্ষা ও ব্যায়ামের প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।

হে প্রিয় সন্তান, প্রত্যেকে নিজ নফসকে ভালোবাসে এবং এর উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়না। যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, নিজের কাঁধ, প্রশস্ত বুক ও হাতের শক্তি দেখে,তখন তার ব্যায়ামের এ সমন্বিত শরীর সকল নারীর শরীর অপেক্ষা প্রিয়তর মনে হয়, যা কোন অবস্থায় সে উৎসর্গ করতে এবং নিজ শক্তি দূর করতে চাইবে না। বিয়েই হচ্ছে এর ঔষধ। বিয়ে না করতে পারলে সংযমী জীবন হলো সাময়িক প্রশান্তি, যা তার জন্য উপকারী, ক্ষতিকর নয়।

কিন্তু ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা অন্য কথা বলে। তাদের মতে, দুই লিঙ্গের অবাধ মিশ্রণই হলো ঔষধ। এতে করে যৌন কামনার তীব্রতা কমবে। তারা গোপন বেশ্যাবৃত্তির অবসানের লক্ষ্যে অবাধ মেলা মেশার জন্য বেশ্যাখানাকে সমাধান হিসেবে বিবেচনা করে। আসলে তাদের এই বক্তব্য অসার ও অর্থহীন। কেননা সকল অমুসলিম জাতি অবাধ মেলা মেশার অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখেছে, এর দ্বারা যৌন নোংরামী কমার পরিবর্তে বেড়েছে। অবাধ মেলা-মেশার লক্ষ্যে প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিকে প্রসারিত করতে হলে এক শহরে লাখ লাখ যুবকের জন্য হাজার হাজার পাবলিক হাউজ বা প্রকাশ্য বেশ্যালয় খুলতে হবে। আর যদি তাদের কথামতো প্রকাশ্য বেশ্যালয় খোলা হয় এবং যুবকেরা তাতে গমন করে, তাহলে তারা বিয়ে থেকে বিরত থাকবে। আমাদের সমাজের মেয়েদের কী উপায় হবে? তাহলে কি তাদের জন্যও প্রকাশ্য বেশ্যালয় খোলা হবে? এগুলোও অর্থহীন কথা।

আসলে বিবেক নয়, তাদের যৌন কামনাই কথা বলে। তারা চরিত্রের সংশোধন, নারীর অগ্রগতি কিংবা সভ্যতার বিস্তার এবং সংঘবদ্ধ জীবন যাপন কামনা করে না। এগুলো শুধু তাদের কথার ফুলঝুরি। তারা প্রতিদিন নূতন কথা বলে,

লোকদেরকে ভীত করে এবং তাদের সপক্ষে মাঠ তৈরী করে। তারা চায় তাদের কথা শোনে আমাদের মেয়েরা শরীরের ভেতর ও বাইর প্রদর্শন করুক, তাদের সাথে হারামভাবে মিশুক, বেপর্দা অবস্থায় একাকীত্বে অবস্থান করুক, অনুষ্ঠানে সেজে-গুজে নাচুক। এর ফলে কিছু পিতা ধোঁকা খাবে এবং বলবে, আমার মেয়ে আধুনিকা হয়েছে।

হে প্রিয় সন্তান, তোমাকে বিয়ে করতে হবে। তুমি যদি এখন পর্যন্ত ছাত্র হয়ে থাকো এবং বিয়ের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে আল্লাহকে ভয় করে সংযম ধারণ কর, ইবাদতে ডুবে থাকো, কোন শিল্পকলা ও ব্যায়ামে নিয়োজিত হও। আর এটিই হলো উত্তম চিকিৎসা। (আল্লামা আলী তানতাওয়ী)

হে যুবক- যুবতীরা, আপনাদের যৌন সমস্যার এটাই হলো একমাত্র সমাধান। আপনারা তাদের কথা শোনার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, যারা আপনাদের সামনে মন্দকে সুন্দর এবং পাপকে এই বলে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে, এই সমস্যার সমাধান হলো, ছোট থাকতেই অবাধ মেলা-মেশার মাধ্যমে যৌন প্রবৃত্তিকে সুস্থ-সুন্দর করা অথবা হারাম উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করা। তারা যা বলে তা বোঝেনা, আর না তাদের কোন বুদ্ধি বিবেক আছে। তারা জেনে, না জেনে ইহুদি, ক্রুসেডার ও ম্যাসনদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করছে, যেন মুসলিম সমাজে যুবক-যুবতীদেরকে পাপী ও বেশ্যা বানানো যায়। তারা কেন এগুলো করে?

–তাদের লক্ষ্য হলো, মুসলিম যুবকদেরকে জেহাদের ময়দান থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারী শাসকদের কাছে মাথা নত করানো।

– তারা যেন সকল কাফের মোশরেকদের শাসন গ্রহণ করে।

– তারা চায় এমন একটি পশুপাল সৃষ্টি করতে যাদেরকে ক্ষমতাধরদের লাঠি পরিচালনা করবে।

হে যুবকেরা, এ সকল মিথ্যা দাবী-দাওয়া থেকে সাবধান। আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহর সাথে নিজেদের অন্তরকে সম্পর্কিত করুন, ইসলামের সম্মানে মাথা উচুঁ করুন, সকল ফাসেক-ফাজেরের যৌন উন্মাদনার আহ্বান প্রত্যাখান করুন। আল্লাহর এই বাণীটি শুনুন, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 'যারা ইতোপূর্বে গোমারাহ হয়েছে, তোমরা তাদের কামনা-বাসনার মতো কামনা করবে না। তারা বহু লোককে গোমরাহ করেছে এবং নিজেরা সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।' (সূরা মায়েদা-৭৭)

৭. সন্তানের সাথে সরাসরি যৌন বিষয়ে আলোচনা কি জায়েয?

সন্তান গঠনকারী বহু সংখ্যক মাতা-পিতার প্রশ্ন, তারা কি সন্তানের সাথে কৈশোরে ও সাবালকত্বের সময় যৌন বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করবেন? তারা কি যৌনাঙ্গ ও এর কাজ, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন? বিয়ে করলে সে কি যৌন সংযোগ সম্পর্কে জানার অধিকার রাখে? অনেকে এ সকল বিষয় জায়েয-নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকায় উত্তর দানে বিরত থাকেন।

শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ছেলে-মেয়েকে যৌন বিষয় সম্পর্কে মাতা-পিতার জ্ঞান দান জায়েয। যদি শরীয়তের কোন হুকুম সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে সেগুলো বলা ফরজ। প্রমাণগুলো হলো :

(১) বহু সংখ্যক আয়াতে যৌন সম্পর্ক ও মানব সৃষ্টির বিষয়ে এবং অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ্ বলেন–

'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্ত্রী ও দাসী ব্যতিত; এদের ক্ষেত্রে হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে সীমালঙ্ঘনকারী হবে।' (সূরা আল মোমেনুন : ৫-৭)

'রমজানের রোজার রাত তোমাদের জন্য স্ত্রী গমনকে হালাল করা হয়েছে।' (সূরা বাকারা-১৮৭)

'তারা আপনাকে স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এটা অপবিত্রতা। তোমরা এ অবস্থায় স্ত্রী গমন করো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে সেভাবে গমন করো যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।' (সূরা বাকারা-২২২)

'তোমাদের স্ত্রী হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেভাবে ইচ্ছে তোমরা সেভাবে তাদের কাছে গমন কর।' (সূরা বাকারা-২২৩)

আল্লাহ আরো বলেন, 'আর যদি দেন-মোহর নির্দিষ্ট করার পর এবং স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে সাব্যস্তকৃত দেন মোহরের অর্ধেক দিতে হবে।' (সূরা বাকারা-২৩৭)

'আমি মানুষকে মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।' (সূরা আল মোমেনুন-১৩)

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্র বিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করবো। তারপর তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।' (সূরা দাহর–২)

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে।' (সূরা আল আহকাফ–৩২)

তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যাবে না, নিঃসন্দেহে এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট উপায়।' (সূরা বনি ইসরাইল–৩২)

'ব্যভিচারী পুরুষ বিয়ে করে কেবল ব্যভিচারিণী নারী কিংবা মোশরেক নারী। আর ব্যভিচারিণী নারীও বিয়ে করে কেবল ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক পুরুষ, মোমেনদের জন্য এদেরকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে।' (সূরা নূর–৩)

'এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছি নবীরূপে। তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরাতো কামবশতঃ নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রমকারী।' (সূরা আরাফ : ৮০–৮১)

এ সকল আয়াতে দেখা যায়, যারা গুপ্তাস্থানের হেফাজত করে বা করে না, রমজানের রাত যৌন মিলন, নারীদের মাসিক ঋতু এবং ঐ অবস্থায় তাদের থেকে দূরে থাকা, সন্তানের জন্মের আধার, স্পর্শ করার আগে স্ত্রীকে তালাক দেয়া, শুক্র ও নারীর জরায়ুতে তার গঠন, স্বামী-স্ত্রীর ধাতুর মিশ্রণে মানব সৃষ্টি, মায়ের পেটে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব, তাকে দুধ পান করানো, ব্যভিচার ও তার অশ্লীলতা, নারী বাদ দিয়ে পুরুষের সাথে যৌন ক্রিয়া করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যৌন প্রবৃত্তি ও কার্যক্রমের সাথে জড়িত। শিক্ষক কিংবা মাতা-পিতা এগুলো ব্যাখ্যা করে না বোঝালে বিবেক-বুদ্ধির বয়সে পৌঁছলে সন্তানের পক্ষে এগুলো কি করে বোঝা সম্ভব?

কোন বুদ্ধিমান লোক একথা বলতে পারবেনা যে, সন্তান গঠনকারীরা বিষয়গুলোর আসল ব্যাপার বাদ দিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবেন কিংবা ভদ্রলোকের মতো না শোনার ভান করবেন, কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না। কেননা এই পদ্ধতি সঠিক নয় এবং ইসলামের সন্তান গঠন প্রক্রিয়া ও শিক্ষা পদ্ধতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমনকি তা বোঝা ও চিন্তা করার বিষয়ে কোরআনের আহ্বানেরও পরিপন্থী। কোরআন মাজীদে এসেছে :

'এটা একটা বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা বুঝে উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা সোয়াদ-২৯)

শুধু তাই নয়, যারা কোরআন পড়ে কিন্তু এর আয়াত নিয়ে জ্ঞান গবেষণা করে না, কোরআন তাদেরকে প্রাণহীন, অন্তর তালাবদ্ধ এবং কঠোর হৃদয় আখ্যায়িত করে বলে, 'তারা কেন কোরআন নিয়ে জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে না? তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ?' (সূরা মোহাম্মদ-২৪)

এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম, কোরআন কারীম যৌন সংস্কৃতির উপর কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করায় এর কিছু দিগন্ত ও চিহ্ন উন্মোচিত হয়েছে। আর ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ এবং নারী-পুরুষের তা জানা ও বোঝা দরকার।

ফলে সকল মুসলিমকে যৌন কামনা পূরণের সময় কি হারাম আর কি হালাল এবং কি করণীয় ও কি বর্জনীয় তা জানতে হবে।

এর ফলে লাভ হলো মানুষ যখন তার সৃষ্টি ও গঠন এবং মায়ের শুক্র, রক্তপিণ্ড, মাংশপিণ্ড, গোশতের টুকরা ও গঠনপ্রণালী ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন আল্লাহর সৃষ্টি কদরত সম্পর্কে তার ঈমান ও প্রশান্তি আরও বাড়বে।

এই সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার ফলে মোমেনের ঈমান, দ্বীনের উপযুক্ততা এবং যুগে যুগে এর নীতিমালার স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস আরও পাকাপোক্ত হবে। এটাই কেবল এমন দ্বীন যা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণ এবং পৃথিবীর সভ্যতা ও তমুদ্দুনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।

(২) সন্তানকে পরিষ্কারভাবে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে মজবুত দলিল প্রমাণ রয়েছে। তাহলে তারা বালেগ হলে করণীয় ও বর্জনীয় এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে বুঝতে পারবে। আমরা ইতোপূর্বে 'কৈশোর ও যৌবনের হুকুম' অধ্যায়ে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(৩) সন্তানকে পরিষ্কারভাবে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যখন সে বালেগ হবে এবং বিয়ের বয়সে পৌঁছবে, তখন তাকে যৌন সংযোগ ও তার পূরণ করার নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতে হবে। আমরা ইতোপূর্বে 'বিয়ে ও যৌন সম্পর্ক' অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি।

এ বর্ণনার পর সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো, তাদেরকে যৌন শিক্ষা দেয়া। শরীয়ত এটাকে বাধ্যতামূলক করেছে যেন তারা অজ্ঞতা, ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন না হয়। এখানে দু'টো বিষয় স্মরণ রাখতে হবে।

১. বয়সের যে স্তরে যে বিধান প্রযোজ্য তাই শিক্ষা দিতে হবে। যেমন দশ বছর বয়সে যৌন সম্পর্কে শিক্ষা অযৌক্তিক এবং সাবালকত্ব ও কৈশোরের হুকুম শিক্ষা না দেয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়।

২. মা মেয়ে সন্তানকে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেবেন। মেয়েরা মা থেকেই তা ভালো করে শিখতে পারে। মা না থাকলে বিকল্প অন্য কোন মহিলা বা শিক্ষিকা তা শিক্ষা দেবে।

এ হচ্ছে, সন্তানের যৌন শিক্ষা বিষয়ক প্রধান বিষয়গুলো। সকল চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের উচিৎ, ইসলামের সন্তান গঠন পদ্ধতি ও যৌন শিক্ষার নিয়ম কানুনগুলোকে সামনে রাখা। তাহলেই কেবল উপযুক্ত ভবিষ্যৎ বংশধর তৈরী হবে, যারা মানবতাকে মানসিক ও সামাজিক বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সকল সমস্যার সমাধান পেশ করেছে। এ হচ্ছে মানবতার জন্য সহজ-সরল পথ। বিশ্বকে যৌন নোংরামী থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামের যৌন বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়ন করা। এতে করে সকল জিনিস তার যথাস্থানে বহাল থাকবে এবং মানুষের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হবে ও পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

সন্তান গঠনকারীর জানা উচিৎ যে, এসকল জিনিস কীভাবে অর্জিত হবে এবং কীভাবে উন্নত ও সন্তান গঠন প্রক্রিয়ায় পৌছা সম্ভব হবে? আমার দৃষ্টিতে এজন্য দু'টো মৌলিক কাজ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. পর্যবেক্ষণ ও তদারকি

২. অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার

১. তদারকি ও পর্যবেক্ষণের ফলে সন্তানের ঈমান ও চরিত্র তৈরী হবে। শারীরিক দিকে থেকে মজবুতি, বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্কতা এবং মানসিক ও সামাজিক পূর্ণতা অর্জন করবে। এর ফলে সে মন্দ সাথী, খারাপ বন্ধু ও অসৎ সঙ্গীদের ফেতনা ও বিকৃতি থেকে বাঁচতে পারবে। সে বিকৃতি ও মন্দের সকল উপাদান থেকে মুক্তি লাভ করবে, সিনেমা ও টেলিভিশনের যৌন উন্মাদনা, উলঙ্গপনার ফিল্ম, উত্তেজনাপূর্ণ ডিটেকটিভ, উশৃঙ্খল নাটক, যৌন উত্তেজক ম্যাগাজিন, উপন্যাস, চরিত্র বিধ্বংসী ও ইসলাম বিরোধী এবং মর্যাদা ও সম্মান হানিকর নাটক দেখা থেকে রক্ষা পাবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সে মহান ইসলামী শিক্ষার শীর্ষে পৌছতে এবং বিবেক–বুদ্ধি, চরিত্র ও জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। তখন সে

অন্যদেরকে নেক চরিত্র উপহার এবং লেন-দেনে অনুকরণীয় হবে। সে হবে আকাশের ঝুলন্ত তারা এবং যমীনে চলমান ফেরেশতা।

(২) অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার মানে, সন্তান গঠনকারী ঘরে ফিরে পরিবার ও সন্তানদের সাথে বসে তাদেরকে দিক নির্দেশ দেবেন। তিনি অবসর সময়ে অবশ্যই সন্তানদের জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস এবং চারিত্রিক শিক্ষার উপযোগী কর্মসূচি তৈরী করবেন।

সে মা-বাবা কতইনা উত্তম, যারা সন্তানের কাছে সন্ধ্যায় জেগে থাকে এবং তাদের কলিজার টুকরাকে গঠনমূলক কর্মসূচি শিক্ষা দেয়। বরং তারা বিরাট পুরস্কার লাভ করে, যখন সন্তানের পড়া শোনে, পড়া বোঝায়, শিক্ষনীয় কাহিনী বলে, কোন গুণ-মর্যাদা শিক্ষা দেয়, সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেয় কিংবা হাস্যকর সাহিত্যিক আলোচনা বা খোশগল্প বলে এবং হাসাহাসি করে।

এ পদ্ধতিতে সন্তানের সার্বিক কল্যাণ আসবে, ইজ্জত-সম্মান বাড়বে। ফলে সে একজন ভালো, বুদ্ধিমান, সম্মানিত ও মর্যাদাবান মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে। এটাই হলো সন্তান গঠনের আদর্শ পদ্ধতি। যার ফলে সে উন্নত সমাজ ও নেক মোমেন বংশধর তৈরীর মজবুত ইট তৈরী করলো।

যে মা-বাবা অবসর সময়ে নিজ বন্ধু-বান্ধবের সাথে বেহুদা রাত্রি জাগরণ করে, কোন পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রে সময় কাটায় অথবা গুনাহর রঙমঞ্চে বিভ্রান্ত লোকদের সাথে আড্ডা দেয়, তারা নিজ সন্তানের উপর কতইনা জুলুম করে, তাদের অধিকার নষ্ট করে, তাদের মানবতাকে হত্যা করে।

মা-বাবা ছাড়া সন্তানের ঈমান ও আকীদা কে গঠন করবে ও তাদের মহান চরিত্র ও উন্নত আদব শিষ্টাচার কে শিক্ষা দেবে এবং কে তাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি, শরীর ও মজবুত শক্তির উপায় শিক্ষা দেবে? কে তাদেরকে মানসিক ও জ্ঞানের নীতিমালা, ভারসাম্য, অন্যের অধিকার রক্ষা, সামাজিক নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবে, যদি মা-বাবা এ ব্যাপারে উদাসীন হয়। কবি যথার্থই বলেছেন :

'সে ইয়াতীম নয় যার মা-বাবা তাকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে,

বরং সেই ইয়াতীম, যাকে মা ত্যাগ করেছে বা বাবা উদাসীন থেকেছে।'

মোট কথা, মা-বাবাই প্রথমে ও শেষে সন্তানের দায়িত্বশীল। তারাই সন্তানের ঈমান, আকীদা, বিবেকের পরিপক্কতা ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করবেন এবং উপকারী জ্ঞান ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবেন।

নবী (সা) যথার্থ বলেছেন, 'ব্যক্তি তার পরিবার ও অধীনস্থ লোকদের জন্য দায়ী। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও অধীনস্থদের জন্য দায়ী।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'আল্লাহ সকল দায়িত্বশীলকে তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন যে, তারা তাদেরকে কি হেফাজত করেছে, না নষ্ট করেছে?' (ইবনে হিব্বান)

নবী (সা) আরো বলেন, 'সন্তানের জন্য বাবার পক্ষ থেকে ভালো আদব-শিষ্টাচার শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন উপহার নেই।' (তিরমিযী)

মা-বাবার উচিৎ, নিজেদের পূর্ণ দায়িত্ব অনুভব করা এবং তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য অবসর সময়কে কাজে লাগানো। তাদের জানা দরকার যে, উপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত দায়িত্বগুলো পালনে কোন ত্রুটি করলে আল্লাহর কাছে সেদিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, যেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন কাজে আসবে না। শুধু তারা মুক্তি পাবে যারা সুস্থ অন্তর নিয়ে হাজির হবে। মাতা-পিতার উচিৎ, আল্লাহর এই বাণীর মর্মের প্রতি নজর দেয়া :

'হে মোমেনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। দোজখের পাহারায় নিয়োজিত থাকবে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন ফেরেশতারা, যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয়, তাই তারা করে।' (সূরা তাহরীম-৬)

তারা যদি আল্লাহর এই বাণীর মর্মোদ্ধার করেন, নিজেদের অন্তরে আল্লাহর তদারকি অনুভব করেন, তাহলে সন্তান গঠনের জন্য তাদের আগ্রহ জোরদার হবে এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে। সকল সন্তান গঠনকারীর উচিৎ, নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝা এবং নিজ সন্তানদের গঠনের লক্ষ্যে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাদের আরো জানা দরকার, সময় হচ্ছে তলোয়ার। যদি মানুষ তা দিয়ে কিছু না কাটে, তাহলে তলোয়ারই তাকে কাটবে। সময় অপেক্ষা দায়িত্ব-কর্তব্য অধিক। হায়াত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। যদি তারা নিজেদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করে, তাহলে অজ্ঞাতসারে আকস্মিক মৃত্যু এসে যাবে। বরং আজাব আকস্মিকভাবে আসবে। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তোমাদের কাছে আজাব আসার আগে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। তা না হয়, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

তোমাদের কাছে অতর্কিত ও অজ্ঞাতসারে আজাব আসার আগে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর।' (সূরা যুমার : ৫৪-৫৫)

সবশেষে আমি সন্তান গঠনকারীদের মর্যাদা ও দায়িত্বের ব্যবধানের উর্ধ্বে ওঠে সবার, বিশেষ করে মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমি সন্তান গঠনের জন্য যে সিলেবাস তৈরী করেছি, বিশেষ করে 'সামাজিক গঠন' এটি ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ এবং নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য।

তাই হে গঠনকারীরা, সন্তান গঠনের আগে আপনারা নিজেদেরকে গঠন করুন, যাতে করে আপনারা তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন। কেননা, আপনাদের কাঁধে তাদের গঠনের আমানত অর্পিত হয়েছে। তাই কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে গঠন করুন, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দিন। তার মাধ্যমেই আপনারা তাদেরকে জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী এবং ঈমানদার মন, ধৈর্যশীল মানসিকতা, পবিত্র অন্তরাত্মা, ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপক্ক বিবেক এবং শক্তিশালী বংশধর তৈরী করতে পারবেন।

চেষ্টা চালিয়ে যান, সকল শক্তি একত্রিত করুন, আল্লাহর রহমত ও বরকতের উপর চলুন। আল্লাহ আপনাদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরকে হেফাজত করুন। আপনাদের চেষ্টা ও কাজ বরকতময় হোক। আল্লাহ আপনাদেরকে সওয়াব দিন এবং পরকালের পুঁজি দিন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কাজ কর। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মোমেনরা তোমাদের কাজ দেখবেন। তোমাদেরকে শীঘ্রই গায়েব ও প্রকাশ্য যিনি জানেন তাঁর কাছে ফেরত পাঠানো হবে। তখন তিনি তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করবেন।' (সূরা তাওবা-১০৫)

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সন্তান গঠনের কার্যকর উপায় উপকরণ

সন্তানের ঈমান, নৈতিক চরিত্র, বিবেক, শরীর, মানসিক ও সামাজিক গঠনের পর্যায়গুলো অতিক্রম করার পর কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, নাকি সন্তান গঠনকারীকে আরো বেশী উপায় উপকরণ খুঁজতে হবে এবং গঠন প্রক্রিয়ার পূর্ণতা বিধান করতে হবে? ইনসাফের দাবী হলো, সন্তান গঠনকারী যেন সন্তানের ঈমান-বিশ্বাস, জ্ঞান, চারিত্রিক, মানসিক ও সামাজিক গঠনের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে আরো উপকারী ও কার্যকর উপায় উপকরণ তালাশ করেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে সন্তানের পরিপক্কতা এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

আমার মতে, এরূপ পাঁচটি উপায় উপকরণ আছে, সেগুলো হলো : ১.আদর্শ চরিত্র ২. নেক অভ্যাস ৩. উপদেশ ও নসীহত ৪. তদারকি ও পর্যবেক্ষণ ৫. শাস্তি

১. আদর্শ চরিত্র : সন্তানকে চারিত্রিক, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে গঠনের জন্য আদর্শ চরিত্রের জুড়ি নেই। সে তার গঠনকারী অভিভাবক ও শিক্ষককে উত্তম নমুনা ও আদর্শ মনে করে আচরণ ও ব্যবহারে তারেদকে অনুকরণ করে। বুঝুক বা না বুঝুক, তার মনে মুরব্বীর কথা,কাজ ও নৈতিকতার ছাপ পড়ে। সন্তান গঠনের ক্ষেত্রে এটাই হলো আদর্শ চরিত্রের প্রতিফলন। গঠনকারী সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, সৎ ও সম্ভ্রান্ত হলে, সন্তানও সেরূপ হবে। আর গঠনকারী মিথ্যুক, বিশ্বাসঘাতক, কৃপণ ও ভীরু-কাপুরুষ হলে সন্তানও সেভাবে গড়ে উঠবে।

সন্তানের মধ্যে ভালো জিনিস গ্রহণ করার প্রস্তুতি এবং তার স্বভাব চরিত্র যতই নিখুঁত ও সুস্থ হোকনা কেন, সে তার গঠনকারীদের উন্নত চরিত্র ও আদর্শ আচরণ না দেখলে কল্যাণ ও ভালো জিনিসের মূলনীতি গ্রহণ করবে না। গঠনকারী শিশুকে সহজে শিক্ষা দিলেও শিশুর পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া সহজ হবে না। তাই আরব কবি বলেন,

'তুমি অন্যের জন্য ঔষুধ বাতলাও, অথচ তুমি নিজেই অসুস্থ।'

আর এ কারণেই, আল্লাহ মানুষের জন্য যে নবী পাঠিয়েছেন, তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন, যেন লোকেরা তাঁকে সর্বদা অনুসরণ করতে পারে। এ

মর্মে আল্লাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম চরিত্র-আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

আল্লাহ আরো বলেন, (45) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا 'হে নবী, আমি আপনাকে স্বাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পাঠিয়েছি।' (সূরা আহযাব : ৪৫-৪৬)

আল্লাহ মহান নবীর অনুপম চরিত্রে সকলের জন্য পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতি বা সিলেবাস নিহিত রেখেছেন। তাই উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রা) তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এক প্রশ্নোত্তরে বলেন, 'কোরআনই তাঁর চরিত্র।' অর্থাৎ তিনিতো কোরআনের বাস্তব প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি। কেননা মহান রাব্বুল আলামীনই তাঁর উত্তম শিক্ষক। নবী (সা) বলেন, 'আমার রব আমাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। (আসকারী, ইবনুস সাময়া'নী–হাদিসের সনদ দুর্বল হলেও অর্থ ঠিক)

এখন আমরা তাঁর কিছু চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করবো :

(১) তিনি জাহেলিয়াত যুগের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

(২) তিনি সকলের কাছে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাই তাঁকে আল-আমীন বলা হতো।

(৩) তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রখর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মক্কাবাসীকে রক্তাক্ত যুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছেন।

(৪) দাঈ' ইলাল্লাহ হিসেবে তিনি সকলকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করাতে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা যদি এ বিষয়ের উপর ঈমান না আনে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আফসোস করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে দেবেন।' (সূরা কাহাফ-৬)

আল্লাহ আরো বলেন, 'সুতরাং আপনি তাদের জন্য আফসোস করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।' (সূরা কাহাফ–৮)

(৫) ইবাদতের ক্ষেত্রে আদর্শ : মুগীরা বিন শো'বা থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) দীর্ঘ তাহাজ্জুদ পড়ায় দু' পা মোবারক ফুলে যায়। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ কি আপনার আগের ও পেছনের গুনাহ মাফ করে দেননি? তিনি জবাবে বলেন, আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দাহ হবো না?' (বোখারী, মুসলিম)

আলকামা বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) বর্ধিত ইবাদতের জন্য কি কোন দিবসকে নির্দিষ্ট করেছিলেন? তিনি বলেন, না; তাঁর আমল ছিলো স্থায়ী ও অব্যাহত। তিনি যা করতেন তোমাদের যে কেউ তা করতে সক্ষম।' (বোখারী, মুসলিম)

(৬) দানশীলতা : তিনি অভাবের ভয় করতেন না এবং উন্মুক্ত বাতাসের মতো মুক্ত হস্তে দান করতেন। বিশেষ করে রমজানে তা বেশী করতেন। এ মর্মে হাফেজ আবুশ শেখ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'ইসলামের নবী (সা) এর কাছে যখনই কিছু চাওয়া হয়েছে, তিনি দান করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাকে দু' পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা ভর্তি বকরী দান করেন। সে ব্যক্তি নিজ কওমের কাছে গিয়ে বলে, তোমরা মুসলমান হও, মোহাম্মদ (সা) অভাবের ভয় না করে প্রচুর দান করেন।'

(৭) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি : আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে প্রবেশ করে দেখি, তিনি একটি চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। শরীরের দু'পাশ চাটাইয়ের দাগ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার জন্য একটি নরম বিছানা জোগাড় করে দেবো যেন আপনি তাতে আরাম করে শুতে পারেন? তিন বলেন, আমার ও দুনিয়ার তুলনা হলো, একজন সওয়ারীর মতো, যে গাছের নীচে বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর তা ছেড়ে চলে গেছে।'

তিনি নিজ পরিবারের জন্য এই বলে দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ, মোহাম্মদের বংশধরকে প্রয়োজন পূরণের মতো রিযক দান কর।'

ইবনু জারীর আয়েশা (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। 'মদিনায় আগমনের পর আমৃত্যু নবী (সা) উপর্যুপরি তিন দিন পর্যন্ত আটার তৈরী রুটি খেতে পারেননি।

আহমদ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ফাতেমা (রা) নবী (সা) কে এক টুকরা যবের তৈরী রুটি দেন। তখন নবী (সা) তাকে বলেন, গত তিন দিনের মধ্যে এটাই তোমার পিতার প্রথম খাবার।

দুনিয়ার প্রতি এই অনাসক্তির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব উপকরণের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। আপনার প্রতিপালকের দেয়া রিযক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।' (সূরা তাহা-১৩১)

আমরা যেন একথা চিন্তা না করি যে, নবী (সা) এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, অভাব-অনটন, খাদ্যের স্বল্পতা কিংবা সামর্থ্যের অভাবের কারণে হয়েছে। তিনি চাইলে গোটা দুনিয়ার সম্পদ তাঁর পায়ে লুটোপুটি খেতো। বরং মহান রাব্বুল আ'লামীন তাঁর মধ্যে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে যে সকল বিষয় ইচ্ছা করেন, তা হলো :

- এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সহযোগিতা দান ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হবে।
- পরবর্তী মুসলিম জনসাধারণ যেন অল্পে তুষ্ট থাকার নীতি মনে চলে, দুনিয়ার সম্পদ ও ফেতনা যেন তাদেরকে ফরজ দাওয়াত ও দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা থেকে বিরত না রাখে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মতো তারাও যেন সম্পদের পেছনে পড়ে ধ্বংস না হয়।

মুনাফেক, কাফের ও ইসলাম বিরোধী শক্তি যেন বুঝে যে, তার এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য সম্পদ সংগ্রহ কিংবা দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগ-বিলাস নয়, বরং এর লক্ষ্য হলো, আল্লাহর পুরস্কার লাভ করা, যা তিনি সহ আগের নবীদেরও মূলমন্ত্র ছিলো। এ মর্মে কোরআন বলে, নূহ (আ) বলেন, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ 'হে আমার জাতি, আমিতো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাইনা, আমার পুরস্কারতো আল্লাহর কাছে।' (সূরা হূদ–২৯)

(৮) বিনয় : নবী (সা) এর যুগের সমসাময়িক লোকেরা সবাই একমত যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে সালাম দিতেন। আলোচনাকারী ছোট হোক বা বড় হোক তিনি তাদের প্রতি নজর করতেন, করমর্দন করলে তিনি সবশেষে হাত ছাড়িয়ে নিতেন, মজলিসে আগমন করলে সাহাবায়ে কেরামের পেছনের খালি স্থানে বসতেন, নিজের পণ্যদ্রব্য নিজেই বহন করে বাজারে যেতেন এবং বলতেন আমিই এটা বহনের অধিক হকদার। মসজিদ নির্মাণ কিংবা কূপ খননের কাজে নিয়োজিত হতে দ্বিধা করতেন না। তিনি স্বাধীন ও দাস-দাসীর দাওয়াত কবুল করতেন এবং ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির ওজর গ্রহণ করতেন। নিজে কাপড় ও জুতা সেলাই করতেন, ঘরের কাজে স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করতেন, নিজ উট বাঁধতেন, চাকরের সাথে খেতেন, দুর্বল ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং মাটির উপর বসতেন। এই বিনয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কোরআন বলে,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

'এবং আপনার অনুসারী মোমেনদের প্রতি সদয় হোন।' (সূরা শোআরা–২১৫)

(৯) ধৈর্য ও সহশীলতা : নবী (সা) গ্রামীণ বেদুইনদের দুর্ব্যবহার কিংবা দুশমনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মোকাবিলায় মক্কা বিজয়ের দিন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে নজীরবিহীন সহনশীলতার পরিচয় দেন।

বেদুঈনের ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা)-এর সাথে চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিলো নাজরানের তৈরী মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর। বেদুঈনটি চাদর ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, তাঁর ঘাড়ের মধ্যে দাগ পড়ে গেলো এবং বললো, হে মোহাম্মদ, আপনার কাছে আল্লাহর যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দানের আদেশ দিন। নবী (সা) তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে দান করার আদেশ দিলেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

বেদুইনের অভদ্র আচরণে রাগ না করে হেসে তিনি বিরাট ধৈর্যের পরিচয় দিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর নিকৃষ্টতম অত্যাচারী শত্রুদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবেন বলে তাদের মনোভাব জানতে চান। তারা জবাব দেয়, ভাই ও ভাতিজার মতো আচরণ করবেন। তিনি জবাবে বলেন, যাও তোমরা মুক্ত; তোমাদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। এটা মানব ইতিহাসের নজীরবিহীন ঘটনা।

(১০) শারীরিক শক্তি : নবী (সা) প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাছে বীর পাহলোয়ানরাও হেরে যেতো। প্রখ্যাত কুস্তিগীর রাকানাকে তিনি তিনবার কুস্তি প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেন। তৃতীয়বারের প্রতিযোগিতায় রাকানা বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।

খন্দকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম এক বিরাট পাথর ভাঙতে অক্ষম হয়ে নবী (সা) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তা ভেঙে দেন। তাঁর প্রচণ্ড শক্তির কথা জানা থাকায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আদর্শ শরীর ও শক্তি সামর্থ্যের প্রতীক। তিনি তো বলেছেন, 'শক্তিশালী মোমেন আল্লাহর কাছে দুর্বল মোমেন অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়তম।' (মুসলিম)

আর এ কারণেই কোরআন মাজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'তাদের মোকাবিলার জন্য শক্তি-সামর্থ্য অর্জন কর।' (সূরা আনফাল–৬০)

(১১) বীরত্ব : সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কারো তুলনা হয় না।

ক. এক রাতে মদিনাবাসীরা এক বিকট আওয়াজ শোনে ভয় পেয়ে গেলো। কিছু সংখ্যক লোক সেদিকে রওয়ানা হলো। এর আগেই নবী (সা) সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি তলোয়ার ঘাড়ে ঝুলিয়ে আবু তালহার ঘোড়ায় চড়ে শব্দের স্থানে পৌঁছান এবং বলেন, কোন ভয় নেই।

খ. হোনাইন যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পালাচ্ছিলো, তখন তিনি নিজ খচ্চরের উপর আরোহণরত অবস্থায় বলেন, 'আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মোত্তালিবের সন্তান।' সেদিন শত্রুর মোকাবিলায় তাঁর অপেক্ষা আর কাউকে এরকম দৃঢ়পদ দেখা যায়নি। কেননা তিনি আল্লাহর এই বাণীর উপর আমল করতেন : 'তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা যদি মোমেন হও তাহলে, কেবল আল্লাহকেই ভয় করবে।' (সূরা তাওবাহ–১৩)

(১২) উত্তম নীতি নির্ধারক : উত্তম নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি হোনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল আনসার ব্যতিত কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মধ্যে বন্টন করেন। ইসলামের বৃহত্তম স্বার্থ, ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্য, অন্যদের মন জয় এবং তাওহীদ ও ইসলামের ছায়ায় বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টিই ছিলো এর লক্ষ্য। কিন্তু এতে আনসার সাহাবীগণ মনোক্ষুন্ন হন এবং কেউ কেউ বলাবলি করতে থাকেন, নবী (সা) নিজ গোত্রকে গনিমতের মাল দিয়ে দিয়েছেন। নবী (সা)-এর কানে এ কথা আসার পর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা গোমরাহ ছিলে, আল্লাহ কি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেননি? তোমরা গরীব ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে ধনী করেননি? তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ কি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেননি? তারা উত্তরে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বোত্তম। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমরা কি জবাব দেবে? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই সকল অনুগ্রহ। তিনি বলেন, তোমরা চাইলে বলতে পার এবং বললে সেটা সত্য হবে যে, আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন, আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, আমরা আপনাকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করেছি, আপনাকে অপমান করা হয়েছে, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি, আপনি অভাবী ছিলেন, আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছি। হে আনসারগণ, তোমরা কি এজন্য মনোক্ষুণ্ন হয়েছো যে, আমি কিছু লোকের মন জয় এবং ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তোমাদের সাথে মেশার জন্য তাদেরকে সাহায্য করেছি? তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে,

লোকেরা ভেড়া-বকরী নিয়ে ঘরে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, হিজরত না হলে আমি আনসার হতাম, সকল লোক যে রাস্তায় চলে সেটা বাদ দিয়ে আনসাররা যে রাস্তায় চলে,আমি তাদের রাস্তায়ই চলবো। হে আল্লাহ আপনি আনসার, তাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের উপর রহম করুন। আনসারগণ কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলেন এবং বলেন, আমরা আমাদের ভাগে বণ্টিত আল্লাহর রাসূলের উপর সন্তুষ্ট।

(১৩) নীতির উপর অবিচল থাকা : নবী (সা) জানতে পারলেন, তাঁর সাহায্যকারী চাচা আবু তালেব তাঁকে আর সাহায্য করবেন না। তখন তিনি নিজ নীতি ও আদর্শের উপর অবিচলতার বজ্রকঠিন ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'হে চাচা, তারা (মোশরেকরা) যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তা সত্ত্বেও আমি আমার এ মিশন ত্যাগ করবো না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ একে বিজয়ী করেন কিংবা অন্যদেরকে ধ্বংস করেন।' একথা বলে নবী (সা) কাঁদতে থাকেন। তাঁর এই কঠোর নীতি ও মনোভাব দেখে আবু তালেব বলেন, ভাতিজা, তুমি যা ইচ্ছে বলো, আমি তোমাকে ত্যাগ করবো না।

নীতির উপর অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে আদেশ দিয়ে বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'আপনি উচ্চ ও মজবুত সাহসী রাসূলদের মতো সবর করুন।' (সূরা আহকাফ-৩৫)

মহান আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কলম-৪)

এ হচ্ছে নবী (সা) এর চরিত্রের সামান্য কিছু দিক।

নবীর চরিত্রিক মাধুর্য : এখন আমরা তাঁর চরিত্রের কিছু মাধুর্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইমাম বাগাওয়ী রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাস সাওবান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা)কে অত্যধিক ভালোবাসতেন এবং তাঁকে না দেখলে অস্থির হয়ে যেতেন। একদিন তিনি বিবর্ণ অবস্থায় নবীজির কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বিবর্ণের কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাবে বলেন, আমার কোন অসুখ-বিসুখ বা ব্যথা-বেদনা নেই। তবে আমি আপনাকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি, যে পর্যন্ত না আপনার সাথে মিলিত হই। তারপর আমার আখেরাতের কথা মনে পড়ে এবং

আশংকা হয় যে, আপনাকে আমি দেখবো না। কেননা আপনি অন্যান্য নবীদের সাথে উঁচু মর্যাদায় আসীন হবেন। আমি যদি জান্নাতে যাই তাহলে আপনার তুলনায় আমার মর্যাদা হবে অনেক নীচে। আর যদি জান্নাতে প্রবেশ না করি, তাহলে আপনাকে আর কখনো দেখতে পাবো না। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে।' (সূরা নিসা-৬৯)

বায়হাকী ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, মোশরেকগণ তাদের কাছে মুসলিম বন্দী যায়েদ বিন দাসেনাকে হত্যার জন্য মক্কার অদূরে তানঈ'মে নিয়ে যাচ্ছিলো। ভাগ্যক্রমে অপর মুসলিম বন্দী খোবাইব বিন আদী আনসারীর সাথে পথে তাঁর দেখা। তাঁকেও হত্যার প্রস্তুতি চলছে। উভয়ই উভয়কে ধৈর্য ও পরীক্ষায় অটল থাকার উপদেশ বিনিময় করেন। তখন পর্যন্ত আবু সুফিয়ান মোশরেক ছিলেন। তিনি যায়েদ বিন দাসেনাকে বলেন, হে যায়েদ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। তোমার জায়গায় মোহাম্মদকে এনে হত্যা করলে এবং তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি কী মনে কর? যায়েদ বলেন, আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ (সা) এখন যেখানে আছেন, সেখানে তাঁর গায়ে একটি কাঁটা বিধুক, আমি সেটাও পছন্দ করবো না। আবু সুফিয়ান বলে,'আমি মোহাম্মদের প্রতি তাঁর অনুসারীদের অপেক্ষা কাউকে অধিক ভালোবাসতে দেখিনি।' এ বর্ণনায় দেখা যায়, যায়েদ শহীদ হতে প্রস্তুত, কিন্তু নবী (সা) এর সামান্য কষ্টও সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

হাফেজ যারকানী বলেন, অপর এক বর্ণনায় এসেছে মোশরেকরা খোবাইবকেও অনুরূপ কসম দিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি মোহাম্মদ (সা) এর পায়ে একটি কাঁটা বিধুক তাও সহ্য করবো না।

বায়হাকী ও ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন। ওহোদ যুদ্ধে এক আনসারী মহিলার বাবা, ভাই ও স্বামী শহীদ হয়েছে। তাকে এসব জানানোর পর তিনি নবীর (সা) নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনি ভালো আছেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে তাঁকে একটু দেখাও। দেখার পর বলেন, 'হে রাসূল, আপনার নিরাপত্তার মোকাবিলায় আমার সকল দুঃখ-ব্যথা নগণ্য।

নবী (সা) এর মহান চারিত্রিক আদর্শে মুগ্ধ সাহাবায়ে কেরাম পরশ পাথরের সংস্পর্শে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল

মোহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা কাফেরদের জন্য বজ্র কঠিন, আর নিজেরা পরস্পর রহম দিল।' (সূরা আল ফাতহ-২৯)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন, 'তারা মনের দিক থেকে অধিকতর নেককার, জ্ঞানী, অকৃত্রিম, উন্নত চরিত্র ও উত্তম অবস্থার অধিকারী। আল্লাহ তাঁদেরকে নিজ নবীর সাহচর্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। তাই তাঁদের মর্যাদা জান এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কেননা, তারা সঠিক ও সরল পথের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন।'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবায়ে কেরাম আমাদের পথ প্রদর্শক ও দৃষ্টান্ত। তারা পরবর্তীতে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, তিব্বত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, মধ্য আফ্রিকা, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, তানজানিয়া, মাদাগাস্কার, জাঞ্জিবারসহ অন্যান্য দেশে বনিক হিসেবে যান এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দ্বীন প্রচার করেন। ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

শিক্ষা ও সন্তান গঠনের জন্য তাই আদর্শ চরিত্র বা দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। আর এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নবী (সা) এর বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশে বহু নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমরা এর কিছু উদাহরণ করবো :

আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা) বলেন, নবী (সা) আমাদের ঘরে বসা। সেদিন আমার মা আমাকে ডাকেন। আব্দুল্লাহ এসো, তোমাকে (কিছু একটা) দেবো। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, কি দেবে? তিনি বলেন, খেজুর দেবো। নবী (সা) বলেন, তুমি তাকে না দিলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হতো।' (আবু দাউদ, বায়হাকী)

মোসনাদে আহমদে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি শিশুকে ডেকে বলে, এই নাও, অথচ কিছু দিলো না, সেটা হবে একটা মিথ্যা।'

এ দু'টো হাদিস সন্তান গঠনকারীকে সত্যবাদিতার আদর্শে উজ্জীবিত হবার আহ্বান জানায়।

সন্তানের প্রতি আদর-স্নেহের বিষয়ে নবী (সা)-এর আরও কিছু দৃষ্টান্ত :

(ক) বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) শিশুদের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে সালাম দেন। তিনি সর্বদা এরূপই করতেন।

(খ) মুসলিম শরীফে বর্ণিত। লোকেরা গাছের ফল প্রথমে নবী (সা) এর জন্য

নিয়ে আসতো। তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং এরূপ দোয়া করতেন : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا 'হে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের ফল, শহর, মাপযন্ত্র ও ওজনে বরকত দান করুন।' এ বলে তিনি তাঁর কাছে অবস্থিত ছোট শিশুকে তা দান করেন।' সন্তানের প্রতি আদর যত্নের এগুলো হলো উত্তম উদাহরণ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিন ব্যক্তি গুহায় আটকে যায়। প্রত্যেকে নিজ আমলের ওসিলায় দোয়া করায় পাথর সরে গেলে মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির ক্ষুধা সত্ত্বেও মাতা-পিতা ঘুমিয়ে যাওয়ায় তাদের খাওয়ার আগে পরিবার ও সন্তানকে খাওয়াননি।

এ হাদীস মাতা-পিতার সেবাকে সন্তানের সদ্ব্যবহারের মধ্যে শামিল করেছে এবং সন্তান গঠনকারীর উপর অনুরূপ শিক্ষা দানের দায়িত্ব অর্পণের জন্য নবী (সা) এর আগ্রহের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মুসলিম শরীফে সহল বিন সায়েদী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য পানীয় আনা হলে তিনি তা থেকে পান করেন। তাঁর ডানে ছোট বালক ও বাঁয়ে ছিল বড়রা। তিনি বালকদের কাছে বড়দেরকে অবশিষ্ট পানীয় দানের অনুমতি চাইলে বালকটি এ বলে তা প্রত্যাখান করে যে, আপনার কাছ থেকে আমার প্রাপ্ত হিসসায় আমি কাউকে অগ্রাধিকার দেবো না।

এ হাদিস ছোটদের প্রতি আদর স্নেহ এবং ইসলামে পানাহার নীতির ব্যাপারে নবী চরিত্রের অনুপম দৃষ্টান্ত।

আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত সন্তান গঠনের অমোঘ হাতিয়ার। সন্তান মাতা-পিতাকে ভালো-মন্দ সকল কিছুতে অনুসরণ করে। তাই তাদের মধ্যে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, পবিত্রতা ও দয়া সৃষ্টি এবং মন্দ থেকে দুরে থাকার গুণ তৈরী করতে হলে মাতা-পিতার মধ্যেও সেগুলো থাকতে হবে এবং তাদেরকেও মন্দ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধু মাতা-পিতাকে আদর্শ হলে হবে না, সন্তানকে নবী (সা) এর চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়াও সন্তানকে ভালো স্কুল-মাদরাসা, ভালো সাথী ও দলের সাথেও সম্পৃক্ত করতে হবে। বড় ভাই-বোনকেও আদর্শ চরিত্রবান হতে হবে। কেননা ছোটরা সর্বদা বড়দেরকে অনুসরণ করে। বড় ভাই খারাপ হলে ছোট ভাইয়ের জন্য বিরাট বিপর্যয়।

নিজে কোন কাজ না করে অন্যকে বলা বিরাট গুনাহ। পরকালে এর মারাত্মক শাস্তি রয়েছে। এ মর্মে বোখারী ও মুসলিম শরীফে উসমা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এক প্রকার লোককে দোজখে নেয়া হবে এবং তার নাড়ি-ভুড়ি পেটের চারদিকে গাধার চাকা ঘোরানোর মতো ঘুরতে থাকবে। দোজখীরা একত্রিত হয়ে বলবে, তোমার এরূপ শাস্তি হলো কেন? তুমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে না? সে বলবে, আমি সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।'

উসামা বিন যায়েদ আরো বলেন, আমি নবী (সা)কে বলতে শুনেছি 'আমি মে'রাজের রাতে এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যারা কাঁচি দিয়ে নিজ নিজ ঠোঁট কাটছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আপনার উম্মতের সেই সকল বক্তা, যারা নিজেরা যা বলতো, তা আমল করতো না।

মোসনাদে আহমদ ও বায়হাকী মনসুর বিন যাযান থেকে বর্ণনা করেন। কিছু সংখ্যক দোজখীর দুর্গন্ধে স্বয়ং দোজখীরাই কষ্ট পাবে। তারা বলবে, তোর ধ্বংস, তুই কী করেছিলি? আমরা যে কষ্টে আছি, এটাই যথেষ্ট, তোর দুর্গন্ধে আমাদের বাড়তি কষ্ট হচ্ছে। সে বলবে, আমি আলেম ছিলাম, কিন্তু এলেম অনুযায়ী আমল করিনি।'

আদর্শ চরিত্র ও দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া শুধু উপদেশ ও নসীহত খয়রাত করলে সন্তান গঠন করা যাবে না। সন্তান গঠনকারীকেও অনুরূপ হতে হবে। কেবল তখনই তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণী প্রযোজ্য হবে :

'তারা এমন ছিলো, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।' (সূরা আল আনয়াম−৯০)

২. **নেক অভ্যাস** : ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে, সন্তান নির্ভেজাল একত্ববাদ, সঠিক দ্বীন ও আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করে। এ মর্মে, আল্লাহ বলেন, 'স্বভাব প্রকৃতির উপরই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা রূম−৩০)

বোখারী শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'সকল নবজাত শিশু স্বভাব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে......।'

অর্থাৎ তারা তাওহীদ ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই তাদের অভ্যাস সৃষ্টি, শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। যেন তারা তাওহীদ, চারিত্রিক গুণ, মানসিক গুণ ও ইসলামী শরীয়াহর আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা গ্রহণ করে। সন্তান যদি দু'টো উপকরণ এক সাথে পায় তাহলে নিঃসন্দেহে সে ভালোভাবে গড়ে উঠবে। (১) ইসলামী শিক্ষা (২) ভালো পরামর্শ।

১. **ইসলামী শিক্ষা** : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন ব্যক্তির নিজ সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া ১ সা' (প্রায় সোয়া দু' কেজি) পরিমাণ দ্রব্য দান করা অপেক্ষা উত্তম।' (তিরমিযী)

নবী (সা) আরো বলেন, 'বাবার পক্ষে সন্তানকে উত্তম আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দান অপেক্ষা উত্তম কোন উপহার নেই।' (তিরমিযী)

নবী (সা) আরো বলেন, 'তোমরা সন্তান ও পরিবারকে ভালো জিনিস ও আদব শিক্ষা দাও।' (আব্দুর রাজ্জাক, সাইদ বিন মনসুর)

নবী (সা) আরো বলেন, 'তোমরা সন্তানকে তিনটা বিষয় শিক্ষা দাও। ১. নবীর ভালোবাসা ২. নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও ৩. কোরআন তেলাওয়াত।' (তাবারানী)

২. **ভালো পরিবেশ** : বোখারী শরীফের হাদিসে এসেছে, 'সন্তান স্বভাব প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী বানায়।' এ হাদিস প্রমাণ করে, ঘরের পরিবেশ ঈমান ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে, মাতা-পিতা নেককার মুসলিম হলে এবং তাকে ঈমান-আকীদা শিক্ষা দিলে সে সন্তান দ্বীনদার হবে। ঘরের বাইরের সামাজিক পরিবেশ যেমন, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয় ও খেলার সাথী ভালো হলে সেও ভালো হবে। নবী (সা) বলেন, 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। তাই তোমাদের দেখা দরকার কাকে বন্ধু বানাচ্ছো।' (তিরমিযী)

কেউ যদি ধারণা করে, মানুষ জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দ হয়, তাহলে সে বিরাট ভুল করবে। কেননা কোরআন এর বিপরীত বলে। আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে দু'টো পথ প্রদর্শন করেছি।' (সূরা আল বালাদ–১০)

অর্থাৎ তাকে ভালো ও মন্দ উভয় পথ দেখিয়েছি। সে যেকোনটা গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ আরো বলেন, 'তারপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

যে নিজেকে বিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয়।' (সূরা আশ শামস : ৭-১০)

আল্লাহ আরো বলেন, 'আমরা তাকে পথ প্রদর্শন করেছি। হয়তো সে শোকরগুজার, না হয় না শোকরগুজার হবে।' (সূরা আদ দাহার–৩)

আর বোখারীর উল্লেখিত হাদিসে এসেছে যে, সন্তান তওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা তাকে ইহুদি, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী বানায়।'

- আর এটা যুক্তি-বুদ্ধিরও বিপরীত। তাহলে, আল্লাহ কেন নবী রাসূল পাঠিয়েছেন? সেটা কি মানুষের সংশোধনের জন্য নয়? তাহলে, সরকারগুলোকে কেন আইন-কানুন তৈরী করতে হয়? কেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়? কেনই বা শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়?

এ আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষ ভালো ও মন্দকে গ্রহণ করার যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভালো শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে সে ভালো হবে।

- আর এটা বাস্তবতা বিরোধীও বটে।

১. বহু লোক খারাপ পরিবেশে খারাপ জিন্দেগী যাপন করার পর কোন ভালো সঙ্গী, শিক্ষক কিংবা দাঈ'র সংস্পর্শে এসে শুধু ভালোই হয়নি বরং বড় মোত্তাকী-পরহেজগার এবং নামী-দামী লোকে পরিণত হয়েছে।

২. মানুষের প্রকৃতি প্রাণী জগতের মতো, যা ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে ভালোবাসা, নাফরমানী থেকে আনুগত্য এবং বক্রতা থেকে সহজ-সরল পথে ফিরে আসে। মানুষ ঘোড়াকে নাচায়, পাখি দিয়ে খেলে এবং শিকারী পশুকে শিকার শিক্ষা দেয়। তুলনামূলক আচরণ বিজ্ঞানের মতে, প্রাণীর প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের প্রকৃতি বিচিত্র ও সঠিক জিনিসকে বেশী গ্রহণ করে।

৩. মানুষকে উদ্ভিদ জগতের সাথে তুলনা করা যায়। মাটিতে বীজ বপন করে সার, পানি ও কীটনাশক ওষুধ না দিলে এবং উপযুক্ত যত্ন না করলে তা ফল-ফসল দেয় না। তেমনি মানুষের অজ্ঞতা, অসৎ সাহচর্য, খারাপ অভ্যাস ও নোংরা পরিবেশের কারণে তারা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভালো যত্ন ও গঠন প্রক্রিয়া দ্বারা তাদেরকে সুস্থভাবে গড়া যায়।

এ মর্মে ইমাম গাজালী এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখেছেন, সন্তান মাতা-পিতার কাছে আমানত। তার মন মূল্যবান মণি-মুক্তার মতো। তাকে ভালো জিনিস শিক্ষা

দিলে সে এর উপর গড়ে উঠবে এবং দুনিয়া-আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। আর খারাপ জিনিস শিক্ষা দিলে কিংবা অভ্যাস করালে সে হতভাগ্য হবে ও ধ্বংস হবে। তাকে আদব-কায়দা ও চারিত্রিক গুণ শিক্ষা দিয়ে হেফাজত করতে হবে।

- ইসলামে ছোট ও বড় শিশুদেরকে গঠন করার পৃথক পৃথক পদ্ধতি রয়েছে। এখন আমরা বড় শিশুর তথা তরুণদের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো।

তরুণের গঠন প্রক্রিয়া

সাবালকের সংশোধনের জন্য তিনটি মৌলিক বিষয়কে সামনে রাখতে হবে। ১. আকীদা-বিশ্বাস, ২. মন্দ ও খারাপ জিনিস ত্যাগ করা, ৩. পরিবেশের পরিবর্তন।

১. ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও সকল অবস্থায় তাঁর মহত্ত্ব ও ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত রাখে। ফলে মোমেন ব্যক্তি নিজের কামনা-বাসনার দাস হয় না। বরং আল্লাহর বিধানকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। এগুণের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ বলেন,' আপনার প্রতিপালকের কসম, তারা সে পর্যন্ত মোমেন হবে না, যে পর্যন্ত তারা াপনাকে নিজেদের বিরোধ-বিসম্বাদে বিচারক না মানে, আপনার কৃত ফায়সালায় তাদের মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।' (সূরা নিসা–৬৫)

সকল ইবাদত, জিক্‌র ও দোয়া, কোরআন তেলাওয়াত, দিন ও রাতে তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি, মৃত্যু ও এর পরবর্তী অবস্থার উপর বিশ্বাস, কবর আজাব এবং মনকির-নকীরের প্রশ্নোত্তর, পরকালের বিশ্বাস ও কিয়ামতের ভয়াবহতা মোমেনের মনে সর্বদা আল্লাহর পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এর ভিত্তিতে সে আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক আদায় করে, নিজ মনোভাবকে শক্তিশালী এবং কুপ্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এজন্যই দেখা যায়, মদ হারাম করার ঘোষণার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাস্তায় মদ ঢেলে দিয়ে বন্যার সৃষ্টি করেন। তাছাড়া আবু বকরের খেলাফতের সময় ওমার (রা) বিচার পরিষদে ছিলেন। দু'বছর অতিবাহিত হলো, কোন মামলা মোকদ্দমা না আসায় তিনি আবু বকর (রা)কে বলেন, তাঁকে এ পরিষদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সাহাবাদের মনে কী পরিমাণ আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও ভয় থাকলে দীর্ঘ দু'বছরব্যাপী কোন বিচার ফায়সালা কাজীর কাছে না এসে থাকতে পারে?

২. মন্দ ও খারাপ জিনিস ত্যাগ করা : প্রাপ্ত বয়স্ক তরুণদেরকে ধাপে ধাপে মন্দ ও খারাপ জিনিস ত্যাগ করার জন্য আকৃষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে কোরআনী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ। আল্লাহ্ যখন মদকে হারাম করেন, তখন তা প্রথমবারে করেননি। চতুর্থবারে করেছেন। আগের তিনবার মানুষকে মদের ক্ষতি সম্পর্কে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন,

প্রথম ধাপ : 'তোমরা খেজুর ও আঙুর থেকে মদ ও ভালো খাদ্য তৈরী করে থাক। এতে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা নাহল-৬৭) এ আয়াতে মদকে ভালো রিযকের পাশাপাশি উল্লেখ করে আল্লাহ্ বোঝাতে চেয়েছেন যে, মদ এক জিনিস, আর ভালো রিযিক আরেক জিনিস।

দ্বিতীয় ধাপ : আল্লাহ্ বলেন, 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।' (সূরা বাকারা-২১৯)

তৃতীয় ধাপ : আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছো।' (সূরা নিসা-৪৩)

চতুর্থ ধাপ : আল্লাহ্ বলেন, 'হে মোমেনগণ, এই যে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ- এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করবে।' (সূরা মায়েদা-৯০)

চারটি আয়াতে হালকা থেকে কঠিন পর্যায়ে চার ধাপে মদকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ জাহেলিয়াতের ধ্যান ধারণা ও সামাজিক অনাচারকে অনুরূপভাবে ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন, শিরক, যেনা, সুদ, জুয়া, হত্যা, জীবন্ত মেয়ে শিশুকে পুঁতে ফেলা এবং ইয়াতীমের মাল সম্পদ খাওয়া ইত্যাদি। প্রথমে এগুলোর অসারতা ও অনিষ্ট বর্ণনা করে পরে হারাম করা হয়েছে।

৩. পরিবেশের পরিবর্তন : সংশোধনের অন্যান্য ভিত্তিগুলো অপেক্ষা এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ মহানবীকে মদিনায় হিজরত এবং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের নির্দেশ দেন। মন্দ মজলিস বা জমায়েতে ভালো করে সন্তান গঠন করা যায় না। এজন্যই তো ভালো করে গঠনের জন্য ইসলামী সমাজ দরকার। এজন্যই তাঁর উপর কোরআন নাযিল হয়েছিলো।

একশ' ব্যক্তিকে হত্যাকারী তওবা কবুল সম্পর্কে আলেম ব্যক্তির সন্ধান করায় এক লোক জবাবে বলেন, তুমি অমুক জায়গায় যাও, সেখানে লোকেরা আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর, তোমার মন্দ ভূমিতে পুনরায় ফিরে এসো না।' (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসও ভালো হবার জন্য ভালো পরিবেশের নির্দেশ দেয়।

তাছাড়া ভালো সাথী সঙ্গী নির্বাচন করা জরুরী।

ছোট শিশুর গঠন প্রক্রিয়া :

এদেরকে গঠনের জন্য দু'টো প্রক্রিয়া আছে।

১. শিক্ষা দান ও ২, অভ্যাস সৃষ্টি। প্রথমটি গঠন ও সংশোধনের তাত্ত্বিক দিক, আর দ্বিতীয়টা হলো ব্যবহারিক দিক।

শিক্ষা ও অভ্যাস সৃষ্টির জন্য শৈশবকালই সর্বোত্তম। তাই এ বয়সেই তাদের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। এখন আমরা ছোট সন্তানদেরকে গঠন করার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা ও অভ্যাস সৃষ্টির জন্য পথ নির্দেশমূলক কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

- হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা সন্তানদেরকে সর্বপ্রথম কালেমা *লা ইলাহা ইলাল্লাল্লাহ* শিক্ষা দাও।'– এটা হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক। আর এর ব্যবহারিক দিক হলো, সন্তানের মনের গভীরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। এছাড়া সে বাস্তব ফুল-ফল, আসমান-যমীন, সাগর-মহাসাগর, মানুষ ও প্রাণী সহ বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে মনে মনে ভাববে ও বিবেক দ্বারা স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে এবং অনুভূত জিনিস দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারবে।
- রাসূলুল্লাহ (সা) সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামায শিক্ষা এবং দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে মার দেয়া এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন। এটা হলো তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিক হলো, তাকে নামাযের হুকুম-আহকাম, রাকাত সংখ্যা, নামায পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা ও মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের অভ্যাস করাতে হবে।
- ইবনু জারীর ও ইবনু মোনজের ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে আদিষ্ট কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখো। এটা দোজখ থেকে তাদের ও তোমাদের বাঁচার উপায়।'- এটা হলো তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিক হলো, সন্তানকে

ফরজ ওয়াজিব আদায়ের ট্রেনিং দেয়া এবং চুরি-ডাকাতি ও গালি-গালাজের মতো নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা।

- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সন্তান গঠনকারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন শিশুদেরকে নবী ও নবী পরিবারকে ভালোবাসা শিক্ষা দেয়। এটা হলো তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিক হলো, সন্তান গঠনকারী তাদের সামনে নবী চরিত্র ও তাঁর যুদ্ধের ইতিহাস, নবী পরিবারের সদস্যসহ সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের ইতিহাসের বীরপুরুষগণের জীবনী, জেহাদ ও কোরআন তেলাওয়াতের মর্যাদা তুলে ধরবেন। তবে এজন্য সন্তান গঠনকারীদেরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে তা হলো, ভালো কথা ও উপহার দানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনে কখনো ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা। কোন সময় শাস্তি দেয়ারও প্রয়োজন হতে পারে। এভাবেই সন্তানকে শিক্ষা দান করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ভালো অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। ফলে সন্তানের মধ্যে ইসলামী গুণ-বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সৃষ্টি হবে এবং সন্তান গঠনকারী নিজ দায়িত্ব পালনে সফল হবেন।

তবে ছোটদের অপেক্ষা বড়দেরকে গঠন করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। তারপরও উভয়কে সংশোধনের যুগপৎ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩. উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে শিক্ষাদান : সন্তান গঠন ও সংশোধনের জন্য উপদেশ ও নসীহত অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। কোরআন মাজীদও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এখন আমরা কোরআনের উপদেশের কিছু উদাহরণ পেশ করবো :

মহান আল্লাহ সূরা লোকমানে উল্লেখ করেন, 'যখন লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললো, হে বেটা,আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

পিতা-মাতা যদি তোমাকে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ

করবে। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করাবো। হে বেটা, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তারপর তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে, অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। হে বেটা, নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।' (লোকমান : ১৩-১৭)

আল্লাহ সূরা সাবা'র ৪৬-৪৯ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'বলুন, আমি তোমাদের একটা বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু'জন করে দাঁড়াও, তারপর চিন্তা-ভাবনা কর-তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনিতো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখো। আমার পুরস্কারতো আল্লাহর কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। বলুন, আমার প্রতিপালক সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলেমুল গায়েব।'

আল্লাহ সূরা নূহ'র ৩২-৩৪ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'তারা বললো, হে নূহ, আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদি হয়ে থাকেন। তিনি বলেন, সেটা তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না। আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

আল্লাহ তায়ালার কোরআনী উপদেশ দাওয়াতে দ্বীন, আল্লাহর বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও কল্যাণের পথ দেখানোর বিষয়ে বিভিন্ন রকম যা নবীদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের দলের লোক ও দাঈদের মুখে পুনরুচ্চারিত হয়েছে।

যদি উপদেশ গ্রহণকারী ইখলাস ও একনিষ্ঠ পবিত্র মন, উন্মুক্ত অন্তর ও বিজ্ঞোচিত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে তার কাছ থেকে নসীহতের সাড়া দ্রুত পাওয়া যাবে এবং তা ভালো প্রভাব বিস্তার করবে। কোরআন কারীম বহু আয়াতে এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে, উপদেশ দ্বারা উপকার হয় ও তা মনে

প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন, আল্লাহ বলেন, 'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার বোঝার মত মন রয়েছে, অথবা সে নিবিষ্ট মনে শুনে।' (সূরা ক্বাফ-৩৭)

তিনি আরও বলেন, 'আপনি স্মরণ করিয়ে দিন, কেননা, স্মরণ করিয়ে দেয়াটা মোমেনদের জন্য উপকারী।' (সূরা জারিয়াত-৫৫)

মহান আল্লাহ সূরা আবাসার ২-৩ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'আপনি কি জানেন,সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ দ্বারা তার উপকার হতো।'

আল্লাহ সূরা ক্বাফের ৮ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য।'

আল্লাহ সূরা হূদের ১১৪ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'যারা স্মরণ রাখে এটা তাদের জন্য এক মহাস্মারক।'

আল্লাহ সূরা তালাকের ২ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'এত দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে।' কোরআন কারীম উপদেশকে দাওয়াতে দ্বীনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বহু আয়াতে আমরা দেখতে পাই, কোন জায়গায় তাকওয়া, কোন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া, কোন জায়গায় শিক্ষা গ্রহণ, কোন সময় উপদেশের জন্য উৎসাহ দান, কোন কোন জায়গায় হেদায়াতের পথ অনুসরণ অথবা উৎসাহ দান কিংবা শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

উপদেশ ও নসীহততো বড়দের জন্য দাওয়াতী পদ্ধতি হতে পারে। প্রশ্ন হলো, তা কি ছোটদের জন্যও প্রযোজ্য? -এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হাঁ, তা ছোটদের জন্য আরো বেশী উপকারী। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন চরিত এবং বাস্তব উদাহরণ থেকে তা জানতে পারি।

কোরআন মাজীদের উপদেশ পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলো হলো :

১. অনুকম্পা কিংবা তিরস্কারের মাধ্যমে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী আহ্বান :

এ পদ্ধতির প্রভাব বিবেক ও মনের গভীরে দাগ কাটে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর পথের দাঈরা এ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যেমন,

সন্তানের প্রতি আহ্বান : 'লোকমান নিজ ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।' (সূরা লোকমান-১৩)

* নূহ (আ) বলেন, 'হে বেটা, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ করো। কাফেরদের সাথে থেকো না।' (সূরা হূদ-৪২)

* ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)কে বলেন, 'তুমি তোমার ভাইদের কাছে এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলবে না, যেন তারা ষড়যন্ত্র না করে।' (সূরা ইউসুফ-৫)

* ইবরাহিম ও ইয়াকুব (আ) বলেন, 'হে বৎস, আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে বাছাই করেছেন। তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।' (সূরা বাকারা-১৩২)

মহিলাদের প্রতি আহ্বান : ফেরেশতারা মরিয়মকে বললো, 'হে মরিয়ম, আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করেছেন এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করেছেন। আর আপনাকে বিশ্ব নারী সমাজের সেরা নির্বাচিত করেছেন।' (সূরা আল-ইমরান:৪২-৪৩)

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান :

* মূসা (আ) বলেন, 'হে কওম, তোমরা গোবাছুরকে গ্রহণ করে নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করেছো। তাই তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা কর এবং নিজেদেরকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করো। এটা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য ভালো। তিনি তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী ও অত্যন্ত দয়াবান।' (সূরা বাকারা-৫৪)

* মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের যে দাঈ ঈমান এনেছে তার কণ্ঠে, 'মোমেন লোকটি বললো, হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎ পথ দেখাবো। হে আমার কওম, এই পার্থিব জীবনতো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের স্থান।' (সূরা মোমেন-৩৮)

* দাঈ জিনের কণ্ঠে, 'হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার (আ) নাযিল হয়েছে। এ কিতাব আগের সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন।' (সূরা আহকাফ-৩০)

* মোমেনদের প্রতি আহ্বান : 'হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা-১৫৩)

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যথার্থ ভয় কর এবং মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করোনা।' (সূরা আলে ইমরান-১০২)

'হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।' (সূরা আনফাল-২৪)

* আহলে কিতাবের প্রতি আহ্বান : 'হে আহলে কিতাব একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে প্রতিপালক বানাবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো, আমরাতো মুসলিম।' (সূরা আলে ইমরান-৬৪)

'হে আহলে কিতাব, তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছে যিনি বর্ণনা করেন কিতাব থেকে তোমাদের লুকানো বহু বিষয় এবং ক্ষমাও করেন বহু। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও প্রকাশ্য বর্ণনাকারী কিতাব এসেছে।' (সূরা আল মায়েদা-১৫)

সকল মানুষের প্রতি আহ্বান :

* 'হে মানুষেরা, তোমরা ইবাদত কর সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর দ্বারা তোমাদের রিযক হিসেবে ফল উৎপাদন করেন। তোমরা জেনে শুনে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।' (সূরা বাকারা : ২১-২২)

কোরআনে এরূপ বহু আহবান আছে।

২. **উপদেশ ও শিক্ষামূলক কাহিনী** : উপদেশমূলক কাহিনীর রয়েছে মানসিক ও বিবেকজনিত বিরাট প্রভাব। কোরআন মাজীদ নবী ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনা প্রসঙ্গে বহু কাহিনী বর্ণনা করেছে, যেন মানুষ তা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

* আল্লাহ বলেন, '(হে নবী) আমি আপনার কাছে কোরআনের অহীর মাধ্যমে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।' (সূরা ইউসুফ–৩)

* 'এগুলো হলো সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি।' (সূরা আরাফ-১০১)

* 'আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যার দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি।' (সূরা হূদ-১২০)

* 'আপনার কাছে কি মুসার কাহিনী পৌঁছেছে?' (সূরা নাযেয়াত-১৫)

* 'আপনার কাছে কি ফেরআউন ও সামূদ জাতির কাহিনী পৌঁছেছে?' (সূরা বুরুজ-১৭-১৮)

কোরআন মাজীদে অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোন সময় কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং প্রত্যেক পুনরাবৃত্তিতে রয়েছে নূতন কলা-কৌশল এবং নূতন ফায়দা। কোরআনের অলঙ্কার শাস্ত্রবিদগণ তা ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

৩. **কোরআনের উপদেশমূলক নির্দেশনা** : এসকল উপদেশ ও নসীহতমূলক নির্দেশনা ব্যক্তির দ্বীন দুনিয়া ও পরকালের জন্য উপকারী। এর মাধ্যমে সে নিজের আত্মা বিবেক ও শরীর গঠন করে দাওয়াতে দ্বীন ও জেহাদের প্রস্তুতি নেবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

* 'দয়াবান আল্লাহর বান্দাগণ পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে মূর্খরা যখন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।' (সূরা আল ফোরকান–৬৩)

* 'সৎ কর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বড় সৎ কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।' (সূরা বাকারাহ-১৭৭)

* আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে আমার পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমনি তাঁরা শৈশবকালে আমাদের লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪)

এগুলোসহ আরো অনেক নির্দেশনা, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে যেগুলোকে এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

(ক) **তাকিদ ও নিশ্চয়তার শব্দ সম্বলিত নির্দেশনা** : আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন।' 'নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে চিন্তাবিদদের জন্য নিদর্শন।' 'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে শ্রবণকারী কওমের জন্য নিদর্শন।'

(খ) **প্রত্যাখ্যানমূলক প্রশ্নবোধক শব্দ সম্বলিত কোরআনী নির্দেশনা** :

আল্লাহ বলেন, 'তাদের জ্ঞান কি তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়, নাকি তারা অবাধ্য সম্প্রদায়?'

'তারা কি এটা কৃত্রিম জিনিস মনে করে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।'

'তারা কি কোন কিছু থেকেই সৃষ্টি হয়নি, নাকি তারাই স্রষ্টা?' (সূরা তূর-৩৬)

'তারা কি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেনা।'

'তাদের কাছে কি আপনার রবের ভাণ্ডার, নাকি তারা নিয়ন্ত্রণকারী?'

'আপনি কি তাদের কাছে বিনিময় চান যে, তারা ঋণভারে জর্জরিত?'

(গ) **যুক্তি প্রমাণভিত্তিক কোরআনী নির্দেশনা** :

আল্লাহ বলেন, 'যদি আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া একাধিক মাবুদ থাকতো, তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেতো। আরশের রব মহান আল্লাহর যে গুণাবলী তারা বর্ণনা করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।' (সূরা আম্বিয়া -২২)

'এবং যমীনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন এবং তোমাদের নিজ নিজ সত্তার মধ্যেও। তোমরা কি তা দেখো না?' (সূরা জারিয়াত : ২০-২১)

(ঘ) **ইসলামের ব্যাপকতা বিষয়ক নির্দেশনা** :

আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনার কাছে সকল কিছুর বর্ণনা সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে হেদায়াত, রহমত ও মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।' (সূরা নহল-৪৯)

'আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।' (সূরা আল আনয়া'ম-৩৮)

(ঙ) **শরীয়তের নীতিমালা সম্বলিত কোরআনী নির্দেশ** :

বিচার ইনসাফের নীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।' (সূরা নিসা-৫৮)

পরামর্শের নীতি সম্পর্কে বলেন, 'আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য গুনাহ্ মাফ চান এবং তাদের সাথে কাজে পরামর্শ করুন।' (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)

মানবিক সাম্যের নীতি সম্পর্কে বলেন, 'হে লোকেরা, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা একে অপরকে জানতে পারো। তবে আল্লাহ্র নিকট অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি হলো সে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।' (সূরা হুজুরাত-১৩)

যদি সন্তান গঠনকারীরা নিজেদের কলিজার টুকরাকে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে চান, তাহলে তারা যেন কোরআনের বর্ণিত উপদেশের বিভিন্নধর্মী পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নবী করিম (সা) নিজেও উপদেশ দিতেন এবং সংশোধন করতেন।

এখন আমরা নবী করিম (সা)-এর উপদেশ, ভাষণ ও দাওয়াতের কিছু নমুনা পেশ করবো।

ইমাম মুসলিম তামীম বিন আউস আদ্-দারী থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'দ্বীন হচ্ছে উপদেশ। আমরা প্রশ্ন করলাম কার জন্য? তিনি বলেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্য।'

বোখারী ও মুসলিম জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নামায কায়েম, যাকাত দান ও সকল মুসলমানকে উপদেশ দানের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছি।

ইমাম মুসলিম ও আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'কেউ কোন নেক কাজের পথ দেখালে সে নেক কাজকারীর মতো সমান সওয়াব পাবে।'

ইমাম মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেউ কাউকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করলে, সে হেদায়াত গ্রহণকারীর ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে এবং হেদায়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির সওয়াবের কোন ঘাটতি হবে না।

বোখারী ও মুসলিম সহল বিন সা'দ সায়ে'দী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে খায়বার বিজয়ের নির্দেশের আগে বলেন, 'তুমি তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং আল্লাহ্র আদেশ ও করণীয় কর্তব্য

সম্পর্কে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম, তোমার হাতে একজন লোকের হেদায়াত প্রাপ্তি মূল্যবান লাল উট অপেক্ষা উত্তম।'

আমাদের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। ওয়াজ নসীহতের ব্যাপারে তাঁর গৃহিত পদ্ধতি ও বৈচিত্র্য আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর গৃহিত পদ্ধতিগুলো হলো :

(ক) **কিস্‌সা-কাহিনী** :

১. বোখারী ও মুসলিম আবু হোরায়রার বরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হাদীসের সার সংক্ষেপ হলো, আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের শ্বেত রোগ, মাথার টাক ও অন্ধ-এই তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেন। একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাদেরকে রোগমুক্ত করেন এবং মাঠ ভর্তি উট, গরু ও ছাগল দান করেন। পরবর্তীতে একই ফেরেশতা আগের আকৃতিতে ওই তিন ব্যক্তির কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলে অন্ধ ব্যতিত আর কেউ সাহায্য দিতে রাজি হলো না। এছাড়া তারা যে রোগী ও গরীব ছিলো এবং আল্লাহ তাদেরকে আরোগ্য ও সম্পদ দান করেছেন, তা অস্বীকার করলো। ফেরেশতা তাদেরকে আগের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্বেত ও টাক রোগীর জন্য বদদোয়া করায় তারা আগের মতো হয়ে গেলো। অন্ধের জন্য নেক দোয়া করায় সে ভালো থাকলো। আল্লাহর নেয়ামতের নাফরমানীর শাস্তি ও কৃতজ্ঞতার পুরস্কার সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

২. বোখারী শরীফে আবু হোরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী (সা)-এর এক হাদিছ বর্ণনা হয়েছে। হাদিছের সার সংক্ষেপ হলো, বনি ইসরাইলের এক লোক আরেক লোকের কাছে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ধার চাইলে সে তাকে সাক্ষী ও জামিন আনতে বললো। লোকটি বললো, আল্লাহই উত্তম সাক্ষী ও জামিন। এর ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ অর্থ নিদিষ্ট সময়ের জন্য ধার নিয়ে সে সমুদ্র পাড়ি দিলো। নিদিষ্ট সময় এসে যাওয়ায় কোন নৌকা বা জাহাজ না পেয়ে একটি কাঠ ছিদ্র করে এর ভেতরে এক হাজার দিনার ও একটি চিঠি ভরে ছিদ্র বন্ধ করে মালিকের কাছে তা পৌছে দেয়ার জন্য দোয়া করলো। এদিকে মালিক অর্থ পরিশোধের আশায় সাগরের দিকে নৌকার অপেক্ষায় ছিলো। নৌকার পরিবর্তে একটি কাঠ পেয়ে তা জ্বালানীর জন্য এনে ফেঁড়ে ভেতরে চিঠি ও দিনার পেলো। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার কাছে এসে নিদিষ্ট সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ

প্রকাশ করলো এবং এক হাজার দিনার দিলো। ঋণদাতা বললো, তুমি কাঠের ভেতরে যে চিঠি ও দিনার পাঠিয়েছো, আমি তা পেয়েছি। ফলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত সফরে এক হাজার দিনার লাভ করে ঘরে ফিরে গেলো।

হালাল রোজগার, আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা ও আমানতদারীর সুফল এরূপই হয়ে থাকে।

৩. হাজার ও ইসমাইল (আ)-এর কাহিনী : ইবরাহিম (আ) নিজ স্ত্রী হাজেরা ও ছেলে ইসমাইলকে মক্কায় রেখে এক মশক পানি দিয়ে চলে যান। ইতোমধ্যে যমযমের কূপের আবির্ভাব ঘটে। জোরহোম গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। ইসমাইল (আ) বড় হয়ে তাদের কাছ থেকে আরবী ভাষা শেখেন ও সে গোত্রে বিয়ে করেন। ইবরাহীম (আ) এরপর দু' দুবার এসে পরিবারের খোঁজ খবর নেন। তৃতীয়বার এসে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে বিস্তারিত এক হাদিছ বর্ণিত হয়েছে।

সন্তান গঠনকারীর উচিৎ, শিশুদেরকে গঠন করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে এ সকল শিক্ষামূলক কিস্‌সা-কাহিনী প্রচার করা। এতে করে তাদের আত্মা ও স্মরণ শক্তিতে আবেগ সৃষ্টি হবে, মন ও অনুভূতির গভীরে এর শিক্ষা বদ্ধমূল হবে এবং তারা মনে আল্লাহর ভয় অনুভব করবে।

(খ) সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি :

সাথীদের মনোযোগ আকর্ষণ, স্মৃতিশক্তিকে নাড়া দেয়া এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করে উপদেশ দেয়া যায়। আমরা এর কয়েকটি উদাহরণ দেবো।

১. মোসনাদে আহমদে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান, মুসলিম কে? সাথীরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, মুসলিম সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, মোমেন কে? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি মোমেন যার কাছে অপর মোমেনের জান-মাল নিরাপদ। তারপর মোহাজের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, যে মন্দ জিনিস ত্যাগ করে সে মোহাজের। মন্দ জিনিস ত্যাগ কর।'

২. মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন

করেন, তোমাদের ঘরের সামনে নদী থাকলে কেউ তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে? তাঁরা বলেন, না। তিনি বলেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণও তাই। এর ফলে আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফ করে দেন।'

৩. বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রার বরাতে নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, নিঃস্ব ব্যক্তি কে? তাঁরা বলেন, যার নগদ অর্থ বা সম্পদ নেই। তিনি বলেন, আমার উম্মতের নিঃস্ব সে ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন নামায, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছে, মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে এবং কাউকে হত্যা করেছে বা মেরেছে। ফলে ওই সকল ব্যক্তিদেরকে তার নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে। এগুলো পরিশোধ করতে গিয়ে যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের পাপ তার উপর চাপানো হবে ও তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

(গ) আল্লাহর শপথ করে নসীহত করা : এর মাধ্যমে কসমকৃত বিষয়টি করা না করার ব্যাপারে শ্রোতাকে সতর্ক করা হয়।

বোখারী শরীফে আবু শোরাইহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহর কসম, সে ঈমান আনেনি; আল্লাহর কসম, সে ঈমান আনেনি, আল্লাহর কসম, সে ঈমান আনেনি। প্রশ্ন করা হলো হে আল্লাহর রাসূল, কে ঈমান আনেনি? তিনি বলেন, প্রতিবেশী যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কসম করে বলছি, তোমরা ঈমান আনা ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে না; ভালোবাসা ছাড়া ঈমান আনা হবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলবো, যা করলে ভালোবাসা বাড়বে? আর সেটি হলো তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।'

(ঘ) হাস্য-রসের মাধ্যমে নসীহত করা :

মনকে দোলা দেয়া, এক ঘেঁয়েমী দূর করা এবং আগ্রহ সৃষ্টির জন্য হাস্য-রসের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আবু দাউদ ও তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর কাছে সদকার মাল বহনের জন্য একটি উট চান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তোমার মাল পরিবহনের জন্য উষ্ট্রীর একটি বাচ্চা দেবো। লোকটি

বললো, আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কী করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, উটতো উষ্ট্রীরই প্রসবকৃত।

নবী করিম (সা) এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, মাল বহনকারী বড় উট কোন না কোন উষ্ট্রীর বাচ্চা ছিলো।

(ঙ) বিরক্তি এড়ানোর লক্ষ্যে পরিমিত নসীহত করা :

আবু দাউদ জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জুমার নামাজের খোৎবা দীর্ঘায়িত করতেন না। বরং বলতে গেলে তা ছিলো কিছু বাক্যের সমষ্টি।

নবী (সা) থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন, বিরক্তির আশংকায় তা দীর্ঘায়িত করতেন না।

(চ) উপস্থিত শ্রোতাদের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নসীহত করা :

তিরমিযী শরীফে এরবাদ বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এমন ওয়াজ নসীহত করলেন যেন শরীরের চামড়া জ্বলে গেছে, চোখ থেকে অশ্রুপাত হয়েছে এবং অন্তর কেঁপে উঠেছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এটা যেন বিদায়ী ভাষণ! আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দেন? তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো এবং আমার পরে আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত মেনে চলো, সেগুলো কামড়ে ধরো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহী।

মুসলিম ও মোসনাদে আহমদে ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের উপর কোরআনের একটি আয়াত পড়েন। যার অর্থ হলো, "তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।' (সূরা যোমার-৬৭) এর ব্যাখ্যায় নবী করিম (সা) সামনে ও পেছনের দিকে হাত নেড়ে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ বলেন, আমি প্রতাপশালী, অহংকারী, বাদশাহ, পরাক্রমশালী ও সম্মানিত। নড়াচড়ার ফলে মিম্বারও নড়ে ওঠে। আমরা ভাবলাম তিনি হয়তো পড়ে যেতে পারেন।"

বক্তার বক্তৃতার প্রভাব তখন সৃষ্টি হয়, যখন তিনি আন্তরিক ও একনিষ্ঠ, কোমল হৃদয়, বিনীত ভাব ও সমুজ্জল আত্মার অধিকারী।

ইবনু আবিদ্ দুনিয়া ও বায়হাকী ভালো মোরসাল সনদসহকারে মালেক বিন দীনার হাসান (রা)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اَرَادَ بِهَا 'এমন কোন বক্তা নেই যাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার বক্তৃতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না।' মালেক এই হাদিসটি বর্ণনার সময় কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, আপনারা ভাববেন, আমার চোখ আপনাদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে শীতল হয়েছে। অথচ আমি জানি, আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমাকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তর্যামী, আমি আপনার পছন্দনীয় বিষয় না হলে, কখনো ওটা পড়তাম না।

মোখলেস ও নিষ্ঠাবান বক্তা আর কৃত্রিম বক্তার মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। এতে প্রথমটার প্রভাবই বেশী।

ওমার বিন জার নিজ পিতাকে প্রশ্ন করেন, আপনি যখন বক্তৃতা করেন, লোকদেরকে কাঁদান, অন্যরা বক্তৃতা করলে লোকেরা কাঁদেনা কেন? তিনি জবাবে বলেন, ভাড়া করা আর ইসলামের ব্যাপারে সত্যিকার আহত ব্যক্তির কান্না এক রকম নয়।

(ছ) উদাহরণের মাধ্যমে বক্তৃতা করা :

রাসূলুল্লাহ (সা) বক্তৃতাকে মনে বদ্ধমূল করার জন্য উদাহরণ পেশ করতেন। নাসাঈ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোরআন পাঠকারী মোমেনের উদাহরণ হলো কমলা-লেবুর মতো, যার গন্ধ ও স্বাদ ভালো। আর যে মোমেন কোরআন পড়েনা তার উদাহরণ হলো, মিষ্টি খেজুর যার সুঘ্রাণ নেই। কোরআন পাঠকারী গুনাহগার ব্যক্তির উদাহরণ হলো, তুলশী গাছের মতো, যার সুঘ্রাণ আছে, অথচ তেতো। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কোরআন পড়েনা, তার উদাহরণ হলো, মাকাল ফলের মতো; যা তেতো এবং কোন সুঘ্রাণও নেই। আর মন্দ সাথী গ্রহণকারীর উদাহরণ হলো, কামারের হাঁপরের মতো। যদি তা সরাসরি ক্ষতি নাও করে, কিন্তু ধোঁয়ার দুর্গন্ধ পাবেই।' এভাবে উদাহরণ দিলে তা ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে।

(জ) হাতের মাধ্যমে বক্তৃতায় উদাহরণ দেয়া :

নবী করিম (সা) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বোঝানোর জন্য দু' হাতে উদাহরণ পেশ করতেন, যেন লোকেরা তা মেনে চলে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মূসা

আশয়া'রী থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'এক মোমেন আরেক মোমেনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার ইট একটি অপরটিকে শক্ত করে ও শক্তি যোগায়। এ বলে তিনি নিজ আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের ভেতরে ঢুকান।'

তিরমিযী সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ বাজালী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন জিনিস বলুন, যা আঁকড়ে ধরতে পারি। তিনি বলেন, তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ, এরপর দৃঢ়ভাবে সহজ-সরল পথ আঁকড়ে থাকো।' আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার জন্য কোন জিনিসকে সর্বাধিক ভয় করেন? তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বলেন, 'এটা'।

হাদিসে এ জাতীয় আরো বহু উদাহরণ আছে।

(ঝ) রেখা চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করা : নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা এবং তাদের মানসপটে কিছু উপকারী জিনিসের চিন্তা ভাবনাকে বদ্ধমূল করার জন্য রেখাচিত্র অঙ্কন করতেন।

বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে একটি চতুর্ভুজ আঁকেন এবং বাইরে আরেকটা রেখা অঙ্কন করেন। চতুর্ভুজের ভেতর তিনি কিছু ছোট রেখা অঙ্কন করেন এবং বলেন, এই হচ্ছে মানুষ যা চারদিক থেকে হায়াত দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর চতুর্ভুজের বাইরের রেখাটি হচ্ছে মানুষের আশা। ছোট ছোট রেখাগুলো হচ্ছে আকস্মিক বিপদ-মুসীবত, যা একটা আরেকটাকে অতিক্রম করে অন্যটাকে পাকড়াও করে । যখন সবগুলো অতিক্রান্ত হয়, তখন অচল বার্ধক্য হাজির হয়। নবী (সা) এর রেখাচিত্রটি নিম্নরূপ :

	বিপদ-মুসীবত	
হায়াত	মানুষ	আশা
	বিপদ-মুসীবত	
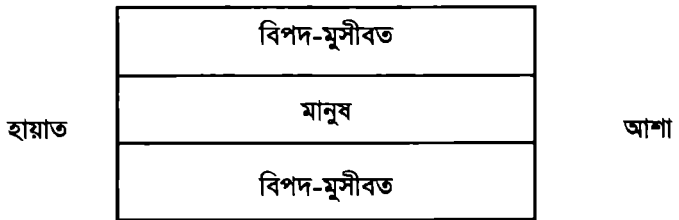
এই রেখাচিত্রে নবী করিম (সা) বাস্তবে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে মানুষ ও তার বিশাল আশার মাঝে আকস্মিক মৃত্যু কিংবা বিপদ-মুসীবত এসে হাজির হয় অথবা অচল বার্ধক্য তাকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। ইসলামের প্রথম শিক্ষক মহানবী (সা) থেকে এটা কতইনা উত্তম ব্যাখ্যা!

মোসনাদে আহমদে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা) এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি মাটিতে একটি রেখা অংকন করে বলেন, এটা আল্লাহর রাস্তা । আর এর ডানে ও বামে আরো দু'টি রেখা টেনে বলেন, এগুলো শয়তানের রাস্তা। তিনি মাঝের রাস্তার উপর হাত রেখে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়েন। وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ। অর্থ : 'নিশ্চয়ই এটা আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর,অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। তাহলে, তোমরা শতধা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।'

রেখাচিত্রটির নমুনা হলো :
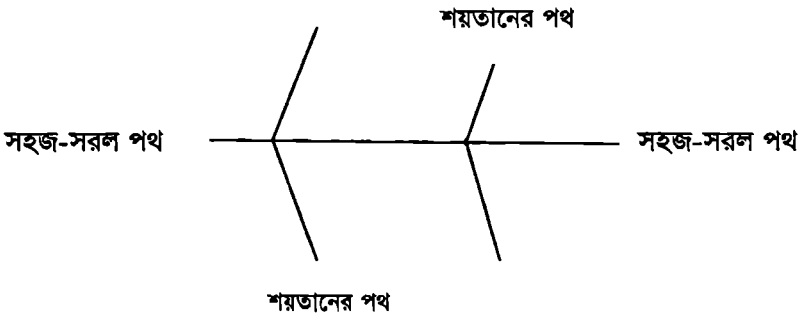
নবী (সা) এই চিত্রে ইসলামী পদ্ধতি যে সহজ-সরল পথ বা সিরাতুল মোস্তাকিম-তা স্পষ্ট করেছেন। এর অনুসরণ ইজ্জত-সম্মান ও জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। এছাড়া অন্যান্য ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা শয়তানের পথ-যার অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হলো, ধ্বংস ও দোজখ।

(ঞ) বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া :

নবী করিম (সা) শিক্ষা ও গঠন কর্মসূচির জীবন্ত নমুনা ছিলেন। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ আমর বিন শোয়া'ইব থেকে এবং তিনি নিজ দাদা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে অজু করতে করতে হয়? নবী (সা) এক পাত্রে পানি আনার জন্য বললেন। তিনি তিনবার হাতের কবজি ধুইলেন এবং বললেন, যে এর চাইতে কম বেশী করবে, সে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করবে।' তিনি অজু করে তাকে দেখান।

বোখারী শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদল লোকের সামনে অজু করেন

এবং বলেন, যে আমার মতো অজু করে মনে দুনিয়াবী কোন কথা না বলে দু'রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহ্ তার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত। একবার নবী (সা) মিম্বারের উপর নামাযের ইমামতি করেন যেন সকলে তাঁর নামায দেখতে পায় এবং তাঁর কর্ম দেখে প্রত্যক্ষভাবে শিখতে পারে। নামায শেষ করে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি এরূপ করেছি যেন তোমরা আমার নামায দেখে শিখতে পারো।'

(ট) উপলক্ষকে কেন্দ্র করে নসীহত করা :

মুসলিম শরীফে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আওয়ালীর কোন এলাকা থেকে বাজারে প্রবেশ করেন। বাজারের দু' পাশে লোক জমজমাট। তিনি ছোট কান বিশিষ্ট আমার মৃত দাদার লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কান ধরে বলেন, কেউ কি তা এক দিরহামের বিনিময়ে কিনবে? লোকেরা বললো, এটা কোন উপকারী জিনিস নয়, আমরা তা দিয়ে কি করবো? লোকেরা আরো বললো, সে জীবিত থাকা অবস্থায় ছোট কান এমনিতেই ক্রটিপূর্ণ বিবেচিত হতো, এখনতো আরও মৃত। নবী (সা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই দুনিয়া তা অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট।

বোখারী ও মুসলিম ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধবন্দীদের কাছে এসে একজন দুগ্ধবতী মহিলাকে দেখতে পান। সে যুদ্ধবন্দী কোন শিশু পেলে তাকে বুকে জড়িয়ে দুধ পান করায়। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, মহিলাটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে, অথচ আগুনে নিক্ষেপ করার শক্তিও তার আছে? আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ, না। নবী (সা) বলেন, আল্লাহও ঠিক তেমনি নিজ বান্দাদের ব্যাপারে এই মহিলা অপেক্ষা আরো দয়ালু।

(ঠ) ছোট বিষয়ে এড়িয়ে বড় বিষয়ে নসীহত করা :

বোখারী ও মুসলিম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এক গ্রামীণ বেদুঈন নবী (সা)কে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল কেয়ামত কবে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, তুমি এজন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? বেদুঈন বললো, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা।' নবী (সা) বলেন, 'তুমি যাদেরকে ভালোবাসো তাদের সাথেই থাকবে।'

এখানে কেয়ামত কবে জানতে চাওয়া হয়েছে। এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তিনি এটার পরিবর্তে তার জন্য যেটা বেশী দরকার, অর্থাৎ নেক আমল

সম্পর্কে প্রশ্ন করেন; যা নিয়ে মানুষ হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

(ড) নিষিদ্ধ জিনিস দেখিয়ে উপদেশ দেয়া : আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ আলী বিন আবু তালেব থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বাম হাতে সিল্ক ডান হাতে সোনা নিয়ে উর্পরে তুলে নিয়ে বলেন, এ দু'টো আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল।

উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মানবতার প্রধান শিক্ষক মহানবী (সা) ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশের পদ্ধতি বিভিন্ন ও বিচিত্র। কোন একটা মাত্র পদ্ধতিকে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

উপদেশ নসীহতের বিচিত্র পদ্ধতিগুলো জানার পর সন্তান গঠনকারীর দায়িত্ব হলো, সেগুলোর সফল ও উত্তম ব্যবহার করা। যেমন, পিতা-মাতা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কিংবা রাত জাগার সময়গুলোতে চুটকি, জ্ঞান ও উপদেশ উপহার দিতে পারে। এভাবে পদ্ধতি ও কর্মসূচির বৈচিত্র আনা যায় এবং তাদেরকে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে গড়ে তোলা যায়। তবে, কোন অবস্থায়ই যেন তাদের লেখা পড়ার ক্ষতি না হয়। এভাবে সন্তান গঠনকারী প্রয়োজনীয় কাজের সাথে আনন্দ-ফুর্তি যোগ করে উপদেশ ও নসীহতকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলতে পারে এবং সন্তান অধিকাংশ সময় ভালো কাজে ব্যয় করছে দেখে নিজেও তৃপ্তি লাভ করবে। এছাড়াও সন্তানকে আদর-সোহাগের সূরে, যেমন, হে বেটা, বাবা, আব্বু ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাদের মনে আবেগের ফোয়ারা সৃষ্টি হবে এবং ভালো উপদেশ গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী হবে। কোরআন মাজীদে এই জাতীয় আহ্বানের অনেক নজীর আছে। এছাড়া কিস্‌সা-কাহিনী, তাগিদ ও নিশ্চয়তা অর্থবোধক শব্দ, প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে বর্ণনারও অনেক নজীর রয়েছে। এ সকল পদ্ধতি ব্যবহার করলে উপদেশের ইতিবাচক ফলাফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

৪. তদারকি ও পর্যবেক্ষণ : এর অর্থ হলো সন্তানের আকীদা ও নৈতিক চরিত্র, শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক গঠনের জন্য তার সাথে লেগে থাকা, সাহচর্য দেয়া এবং শরীর ও শিক্ষার্জনের বিষয়ে অব্যাহত জানার চেষ্টা করা। ভারসাম্যপূর্ণ

মানুষ গঠনের জন্য এই পদ্ধতি শক্তিশালী ভিত্তি। এর ফলে সে নিজ জীবনের দাবী পূরণ, দায়িত্ব পালন ও সত্যিকার মুসলিম তথা মজবুত ঘাঁটির ভিত্তি প্রস্তর হতে সক্ষম হবে এবং তার দ্বারা ইসলামের ইজ্জত-সম্মান বাড়বে ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে। ইসলাম মাতা-পিতাসহ সন্তান গঠনকারীদেরকে সন্তানের সাথে লেগে থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ মর্মে আল্লাহ কোরআন মাজীদে যা বলেন এর অর্থ হলো, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ নিজ পরিবারকে দোজখের আগুন তেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হলো মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়,তাই করে।' (সূরা তাহরীম-৬)

সন্তান গঠনকারী সন্তানদেরকে কিভাবে দোজখ থেকে বাঁচাবেন যদি তিনি পর্যবেক্ষণ ও তদারকি না করেন এবং তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত না রাখেন?

ওমার (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখুন এবং আল্লাহর আদিষ্ট কাজের আদেশ করুন। এটাই তাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচানোর উপায় হবে।

আল্লাহ কোরআনে সূরা তাহা'র ১৩২ নাম্বার আয়াতে বলেন, 'তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকো।'

হাদিসেও সন্তানের তদারকি ও পর্যবেক্ষণের অনেক উদাহরণ আছে। বোখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

'গৃহস্বামী নিজ ঘরের তদারকি এবং অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের তদারককারিণী এবং অধীনস্থদের জবাবদিহি করবে।'

হাদিসে গৃহস্বামী ও স্ত্রীকে তদারককারিণী বলা হয়েছে। সন্তানকে আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং নামায না পড়লে মার দেয়ার কথাও উল্লেখ আছে। এ সকল কাজ কি পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ইঙ্গিত দেয় না? তা না হলে কীভাবে এ কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া হবে? তারা ভালো করলে ধন্যবাদ জানাবে এবং খারাপ করলে তা থেকে বিরত রাখবে।

আসলে সন্তানকে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা এবং তার সকল কাজ-কর্ম দেখা সন্তান গঠনের সর্বোত্তম ভিত্তি।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম শিক্ষক মহানবী (সা) ছিলেন উম্মতের জন্য সর্বোত্তম নমুনা। তিনি তাদের খোঁজ-খবর রাখতেন, জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করতেন। ত্রুটি দেখলে সতর্ক করতেন, আর ভালো দেখলে উৎসাহ দিতেন, ফকির-গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন, ছোটদেরকে আদব এবং মূর্খদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

* হারাম কাজ থেকে সতর্ক করেছেন : ইবনু আব্বাস বলেন, নবী (সা) ব্যক্তির হাতের আঙ্গুলে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দেন এবং বলেন, কেউ যদি নিজ হাতে আগুনের কয়লা পরতে চায় সে যেন এটা পরে। নবী (সা) চলে যাবার পর লোকেরা বললো, ওই আংটিটা তুলে নিয়ে এর দ্বারা উপকৃত হও। লোকটি বললো, রাসূলুল্লাহ (সা) যা ফেলে দিয়েছেন, আমি কখনো তা তুলে নেবো না।'(রিয়াদুস সালেহীন)

* নৈতিক চারিত্রিক গুণ শিক্ষা দিয়েছেন : বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলে অপর এক ব্যক্তি তার ভালো প্রশংসা করলো। নবী (সা) বলেন, তোমার জন্য আফসোস, তুমি তোমার বন্ধুকে কেটে ফেলেছো। তিনি একথা কয়েকবার বললেন। তারপর বলেন, কেউ যদি কারো প্রশংসা অবশ্যাম্ভাবীরূপে করতেই চায় তাহলে যেন বলে, اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا .. إِنْ كَانَ يَرَى اَنَّهُ كَذَلِكَ, وَحَسِيْبُهُ اللهُ وَلَا يُزَكِّىْ عَلَى اللهِ اَحَدٌ 'যদি সে তার মধ্যে অনুরূপ গুণ দেখে তাহলে বলবে, তার সম্পর্কে আমার ধারণা এই, তার সঠিক হিসাব রক্ষাকারীতো আল্লাহ, কেউ যেন আল্লাহর উপর কারো সুপারিশ না করে।'

এছাড়া তিনি শিশুদেরকে আদব, বড়দেরকে সম্মান এবং দাওয়াতী কাজে নমনীয়তা শিক্ষা দিয়েছেন।

* তিনি নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাদের অধিকার আদায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। এমন কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. নাসাঈ ও ইবনু মাজায় বর্ণিত আছে। এক যুবতী নবী (সা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, আমার আব্বা নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমার অপছন্দ সত্ত্বেও তার ভাতিজার কাছে আমাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী (সা) তার পিতাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তার বিয়ের এখতিয়ার তার হাতেই সোপর্দ কর। তখন যুবতীটি বললো, এখন আমার বাবার কাজটিকে আমি বৈধতা দিলাম, তবে আমার ইচ্ছে ছিলো নারী সমাজ জানুক যে, এ বিষয়ে বাবার কোন করণীয় নেই।'

২. বোখারী শরীফে বর্ণিত। ছাবেত বিন কায়েস ছিলেন কৃষ্ণ, খাটো ও নেক মুসলিম। তার স্ত্রী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমি তার চরিত্র ও দ্বীনদারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না, আমি তাকে সাংঘাতিক ঘৃণা করার কারণে তার অধিকার পূরণ করি না। মুসলমান হবার পর ইসলামে অকৃতজ্ঞতা অপছন্দনীয় জিনিস। নবী (সা) প্রশ্ন করেন, তুমি কি দেনমোহর হিসেবে প্রদত্ত বাগানটি ফেরত দিতে প্রস্তুত? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী (সা) ছাবেতকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এক তালাক দিতে বলেন। ছাবেত তালাক দিলেন।' এটা হলো তালাকে খোলা' যা সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী আপোষ করে থাকে।

৩. বাজ্জার ও তাবারানী বর্ণনা করেন। যয়নব নামক এক মেয়েলোক (মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে খ্যাত) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমি একদল মহিলা, মুখপাত্র হিসেবে আপনার কাছে প্রশ্ন করছি। আল্লাহ জেহাদকে পুরুষের জন্য ফরজ করেছেন। তারা আহত হলে সওয়াব এবং নিহত হলে আল্লাহর কাছে চিরঞ্জীব ও রিযকপ্রাপ্ত হয়। আমরা নারী সমাজ তাদের সংসার দেখি। আমাদের জন্য কি এর কোন বিনিময় আছে? নবী (সা) বলেন, তুমি যে সকল মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাদেরকে বল, স্বামীর আনুগত্য ও তার অধিকারের স্বীকৃতি দিলে জেহাদের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। তবে তোমাদের খুব কম সংখ্যকই তা করে।'

নবী করিম (সা)-এর অনুসরণে আমাদেরও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা দারকার। পর্যবেক্ষণ যদি বড়দের ব্যাপারে উপকারী হয়, তাহলে ছোটদের ব্যাপারে অধিকতর উপকারী হবে। নবী (সা) ব্যক্তিকে সমাজে, নারীকে উম্মাহর মধ্যে এবং সন্তানকে পরিবারের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই মাতা-পিতা ও শিক্ষকদেরকেও মুসলিম বংশধর তৈরীর জন্য এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে।

যে সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে :

(ক) **সন্তানের ঈমানী দিক** : সন্তান গঠনকারীকে দেখতে হবে, সন্তান কোন ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস শিখেছে। স্কুল মাদরাসায় পড়ার সময় তাওহীদসহ ভালো কিছু শিখে থাকলে ভালো, আর যদি মন্দ কিছু শিখে থাকে, যেমন কুফরী মতবাদ, তাহলে বুঝতে হবে যে,এটি তার বিশুদ্ধ ঈমান-বিশ্বাসের বিপরীত জিনিস।

আরো দেখতে হবে সন্তানের কোন খারাপ বন্ধু-বান্ধব ও সাথী আছে কী না। তাহলে তাদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

আরো দেখতে হবে, সন্তান কোন অনৈসলামি দল বা গ্রুপের সাথে জড়িত আছে কী না। হলে, তা থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে এবং সহজ-সরল পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(খ) চারিত্রিক দিক : সত্যবাদিতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি তার মধ্যে মিথ্যা কথা ও ওয়াদা দেখা যায়, সমাজে যদি মুনাফেকের মতো দ্বিমুখী আচরণ করে, তাহলে প্রথমেই তাকে সোজা করতে হবে।

আমানতদারীও দেখতে হবে। সে কোন কিছু চুরি করে কী না, হোক না সেটা ক্ষুদ্র জিনিস। চুরি করলে তাকে বোঝাতে হবে, এটা হারাম, আল্লাহ দেখছেন, তিনি শাস্তি দেবেন। এভাবে প্রথম থেকেই সংশোধন করতে হবে।

সে জিহ্বার হোফাজত করে কীনা, তাও দেখতে হবে। যদি সে গালি-গালাজ কিংবা মন্দ বাক্য শিখে থাকে, তাহলে কৌশলে তাকে সংশোধন করতে হবে। এগুলো শেখার কারণ বের করতে হবে এবং তা দূর করতে হবে।

আরো দেখতে হবে, তার আত্মিক নীতি-নৈতিকতার অবস্থা কেমন। সে কি অন্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে? প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থাকে? অশ্লীল গান-বাজনা শোনে? আপত্তিকর চাল-চলনে অভ্যস্থ? অমোহরম মহিলার সাথে মেশে? রাতভর টেলিভিশন দেখে? সিনেমা হলে যায়? অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়ে? যৌন ছবি ধারণ করে ও প্রেম কাহিনী পড়ে? এগুলোর কোনটা পাওয়া গেলে উত্তম উপদেশ, হুমকি-ধামকি, শাস্তি কিংবা ভালো কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এর সংশোধন করা যেতে পারে। এতে করে সন্তান একদিন নেককার মানুষের কাতারে শামিল হবে।

বুদ্ধিমান পিতা সন্তানের টেবিলে আকস্মিক উপস্থিত হয়ে দেখতে পারে সে কি পড়ছে বা লিখছে। হতে পারে সে তখন উলঙ্গ ছবি দেখছে, মোবাইলে ছবি সম্বলিত ম্যাসেজ বিনিময় ও মেয়েদের সাথে গল্প করছে, অশালীন ম্যাগাজিন উল্টাচ্ছে, প্রেম-কাহিনী পড়ছে অথবা প্রেমিকার ছবি দেখছে। বুদ্ধিমান পিতা সন্তানের বিদ্যালয়ে যাওয়া ও ফেরত আসার সময় দেখতে পারে, সে সন্দেহজনক কোন জায়গায় যায় কিনা। অবস্থা বুঝতে পারলে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই সন্তানের বিকৃতি সংশোধন করা সম্ভব।

(গ) সন্তানের বিবেক-বুদ্ধি ও শিক্ষাগত দিক : সন্তানের শিক্ষার মান ও সাংস্কৃতিক গঠন জানা দরকার। চাই সেটা ফরজে আইন বা ফরজে কেফায়াহ্-যাই হোকনা কেন। সন্তান কি ফরজে আইনের আওতায় কোরআন পাঠ, ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম, হালাল-হারাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধ-জেহাদ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ইসলামী আদব ও নিয়ম কানুনগুলো শিখেছে কিনা, তা জানতে হবে। অপরদিকে, সে ফরজে কেফায়ার আওতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখেছে কিনা?

কেননা এগুলো শিখলে সে উম্মাহ্কে কিছু দিতে পারবে। তবে তাদেরকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন ও মেধার উচ্চ শিখরে পৌঁছার সুযোগ করে দিতে হবে। সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো, প্রথমে ফরজে আইন ও পরে ফরজে কেফায়ার উপর গুরুত্ব দেয়া। দু'টো একযোগেও শিখতে পারে।

সন্তানের চিন্তার গঠন ও সচেতনতার বিষয়টিও দেখতে হবে যে, ইসলাম দ্বীন ও রাষ্ট্র, কোরআন মাজীদ দ্বীন ও আইন, রাসূলুল্লাহ (সা) নেতা ও আদর্শ, ইসলামের ইতিহাস ইজ্জত ও গর্ব, ইসলামী সংস্কৃতি আত্মা ও চেতনা এবং দাওয়াতী কার্যক্রমে আগ্রহী কিনা। এগুলো কখনো অর্জিত হবে না, যদিনা সন্তানকে চিন্তামূলক বই ও দাওয়াতী ম্যাগাজিন পড়ানো, ইসলামী সংবাদ ও আলোচনা শোনানো না হয়। সন্তানের জন্য ঘরে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিরক্ষামূলক বইয়ের লাইব্রেরী করে দেয়া ভালো। এর ফলে সন্তান কুফরী ও নাস্তিকতার হাত থেকে দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিতে এবং সাহসিকতার সাথে ঈমান-ইসলামের কাজ করতে পারবে।

সে পিতার অন্তর দুঃখে জর্জরিত, যার সন্তান স্কুলে পশ্চিমা দার্শনিক চিন্তাবিদ ও প্রাচ্যবিদদের চরিত্র ও মতবাদ শিখছে। অথচ ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম মনীষী ও বীর পুরুষ কিংবা বিজ্ঞানীদের জীবনী ও আলেমদের জীবনী কিছুই জানেনা কিংবা সামান্য জানে।

সে অভিভাবকের অন্তরও দুঃখে বিদীর্ণ, যার সন্তান পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা এবং নাস্তিক্যবাদী মতবাদ শিখে পাশ করে বেরিয়েছে। আর নিজ দ্বীন-ধর্ম, ইতিহাস ও জাতির শৌর্যবীর্যের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

সন্তানের জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থতা ও বিবেচ্য বিষয়। যা সন্তানের মেধা ও চিন্তা-চেতনার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলো থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে এবং সেগুলোর বিপদ সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে

দেখতে হবে, সন্তান মদ ও মাদকতার শিকার কিনা। কেননা তা শরীরকে ধ্বংস করে দেয় এবং হিস্টিরিয়া ও পাগল বানায়।

তাদের মধ্যে ধূমপান, গোপন অভ্যাস, অশ্লীল ফিল্ম ও নগ্ন ছবি দেখার প্রবণতা আছে কিনা। থাকলে সংশোধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) **শারীরিক দিক :** সন্তান গঠনকারীর কর্তব্য হলো তাদেরকে উপযুক্ত খাবার, বাসস্থান ও পোশাক দিতে হবে যেন তারা অসুস্থ না হয়ে পড়ে এবং শরীরে মহামারী ও সংক্রামক দেখা না দেয়। তাই তাদের জন্য ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নকল্পে খাদ্য, পানীয় ও ঘুমের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাবার সময় দেখতে হবে যেন অতিরিক্ত না খায় ও খুব বেশী মোটাসোটা না হয়ে যায়। পানীয় যেন একবারে নয়, দু' তিন বারে পান করে, পানপাত্রে শ্বাস না ছাড়ে এবং দাঁড়িয়ে পান না করে। ডান কাতে যেন শোয় এবং খাবার পর পরই সাথে সাথে যেন না ঘুমায়।

মায়ের বিশেষ কর্তব্য হলো, সংক্রামক রোগী থেকে সন্তানকে দূরে রাখা, যেন তাদের মধ্যে ওই রোগের প্রাদুর্ভাব না ঘটে।

সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফল-ফলাদি ও সবুজ তরকারী খাওয়াতে হবে। খাওয়ার আগে হাত ধুতে হবে। গরম পাত্রে ফুঁ দেয়া যাবে না। খাদ্য ঠাণ্ডা হলে খাবে। তাদেরকে ব্যায়াম, ঘোড়দৌড়, বীরত্ব ও পুরুষত্বের প্রকাশ ঘটাতে দিতে হবে। তবে কিছুতেই যেন প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে না থাকে।

এর ফলে সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, শরীরে বল ও ইচ্ছা শক্তি হবে এবং প্রস্তুতিতেও শক্তি লাভ করবে।

তাদের শরীরে রোগ দেখা দিলে এবং চোখে মুখে তার প্রকাশ ঘটলে সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। এ মর্মে মোসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ, চিকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার চিকিৎসা নেই।'

এ হাদিসের আলোকে, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ-এই দু'ধরনের চিকিৎসাই গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) **মানসিক দিক :** সন্তানের মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক দেখতে হবে। তার মধ্যে লজ্জা-শরম ও সংকোচ আছে কিনা এবং সে লোকের সামনা সামনি হতে

অনিচ্ছুক কিনা, যদি এরূপ হয় তাহলে তার মধ্যে হিম্মত ও লোকদের সাথে মেলা-মেশার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

আরো দেখতে হবে, তার মধ্যে ভয়-ভীতি ও ভীরুতা-কাপুরুষতা আছে কিনা। সে বিপদ-মুসীবত ও কঠিন পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে বেড়ায় কিনা।

মায়ের বিশেষ দায়িত্ব হলো, সন্তানকে জীন, ভূত, অন্ধকার ও অপরিচিত সৃষ্টির ভয় না দেখানো। তাদের মধ্যে যেন অপ্রয়োজনীয় ভয়-ভীতি না জন্মে।

আরো দেখা দরকার, তাদের মধ্যে ঘাটতির অনুভূতি আছে কিনা। থাকলে তাকে হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা সংশোধন করতে হবে। যদি এর কারণ হয় তাদেরকে হেয় বা অপমান করা, তাহলে অভিভাবকের উচিৎ তাদেরকে সুন্দর নামে ডাকা। যদি ইয়াতিম হবার কারণে ওই অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাহলে, তাদের মনে ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্যান্য মনীষীদের উদাহরণ পেশ করতে হবে।

আর যদি ওই জাতীয় অনুভূতির পেছনে হিংসা-বিদ্বেষ কাজ করে, তাহলে অভিভাবককে সকল সন্তানের মধ্যে সমানভাবে ভালবাসা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে।

যদি রাগ দেখা যায় তাহলে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। ক্ষুধার কারণে হলে খাবার দান, অসুখের কারণে হলে চিকিৎসা করানো, অপমানের কারণে হলে সম্মান করা, প্রাচুর্যের কারণে হলে অভাববোধ সৃষ্টি করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে হলে তা বন্ধ করতে হবে।

চ) **সামাজিক দিক :**

সন্তান ঠিকমত অন্যের অধিকার আদায় করে কিনা তা দেখতে হবে। সে যদি মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ঠিকমত আদায় না করে তাহলে তাকে এর খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।

সন্তান অন্যদের সাথে সামাজিক আদব রক্ষা করে কি না তা দেখতে হবে। বিশেষ করে খাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, কথা-বার্তা, হাইতোলা ও শোকপ্রকাশসহ অন্যান্য সামাজিক আদব ও নিয়ম-কানুন মেলে চলে কিনা তা ও দেখতে হবে। না করলে তাকে ইসলামের নিয়ম কানুনগুলো শিক্ষা দিতে হবে। এভাবে তাকে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভাল জিনিসের অভ্যাস করালে সে অবশ্যই ভালভাবে গড়ে উঠবে।

সন্তান যেন স্বার্থপর না হয় এবং তার মধ্যে যেন ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয়, তা দেখতে হবে। তার মধ্যে বিদ্বেষের ভাব দেখলে ভালবাসার বীজ বপন করতে

হবে। হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম না জানলে তাকে তাকওয়া অবলম্বনের হুকুম দিতে হবে। আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারলে এ সমস্যা থাকবে না।

ছ) আত্মিক দিক :

আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন, সন্তানের মধ্যে এ অনুভূতি সদা জাগ্রত কিনা তা দেখতে হবে। আল্লাহ তার প্রকাশ্যে ও গোপনে সব কিছু দেখছেন– এ অনুভূতি তখনই জাগ্রত হবে যখন সে আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর কুদরতে বিশ্বাস এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তার মধ্যে তাকওয়া আল্লাহর ভয় ও দাসত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে। এ জন্য সন্তানের কাছে আল্লাহর মহত্ব তুলে ধরতে হবে এবং ছোট বড়, জীবিত মৃত, গাছ গাছড়া, ফল ফুল ও অগণিত সৃষ্টি জগতের বিস্ময় তুলে ধরতে হবে। কোরআনের আয়াত শুনলে কিংবা অর্থ বুঝলে কান্নার ভাব সৃষ্টি করতে হবে।

সাত বছর বয়সে নামাযের অভ্যাস করাতে হবে এবং কিছু কিছু রোজার অনুশীলনও করাতে হবে। সম্ভব হলে হজ্জ-ওমরাহও করাতে হবে। দান সদকাহ কিংবা যাকাত তার হাত দিয়ে আদায় করালে দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে। সন্ত ানকে কোরআনের তাফসীর ও ওয়াজের মাহফিলে নিতে হবে। এর ফলে তার অন্তর পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হবে।

সন্তানের মধ্যে কষ্ট-পরিশ্রম ও ধৈর্য-সবরের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। ফলে সে দাওয়াতে দ্বীন, একামতে দ্বীন ও দ্বীনের সংগ্রামের জন্য তৈরী হবে। নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে সাথে জুলুম, অন্যায় ও কুফরীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

সন্তান গঠনকারীকে সর্বশেষ যে জিনিসটি করতে হবে, সেসি হলো তাকে হাদীসে বর্ণিত দোয়াগুলো শিক্ষা দিতে হবে। সকাল সন্ধ্যায় ঘুম ও জাগা, পানাহার, ঘরে ঢুকা ও বের হওয়ার দোয়া, সফর, এস্তেখারার বৃষ্টি, নূতন চাঁদ, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট দোয়াগুলো শিক্ষা দিতে হবে।

৫। শাস্তি :

ইসলামী শরীয়ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর হেফাজতের চেষ্টা করে। ইজতেহাদকারী ইমাম ও ফেকাহ মূলনীতি শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিতে এরূপ ৫ টি মৌলিক প্রয়োজন আছে। সেগুলো হলো ঃ ১। দ্বীন ২। জান ৩। মাল ৪। ইজ্জত-

সম্মান ৫। বিবেক বুদ্ধির হেফাজত। তাঁরা বলেছেন, ইসলামী জীবন বিধানের সকল হুকুম, বিধান ও নীতিমালার লক্ষ্য হলো, ঐগুলোর সংরক্ষণ ও হেফাজত করা। পক্ষান্তরে, এগুলোর উপর আগ্রাসন কিংবা লংঘন হলে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। শরীয়তে শাস্তিগুলো দু'প্রকার : ১. দণ্ডবিধি ২. অনির্ধারিত শাস্তি।

১। **দণ্ডবিধি ঃ** এটা হচ্ছে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি ও আল্লাহর হক। এটা আবার সাত প্রকার ঃ

১। মোরতাদ বা ইসলাম ত্যাগীর দণ্ড ঃ দ্বীন ইসলাম ত্যাগ কিংবা তওবার পর কুফরী করলে অর্থাৎ মোরতাদ হলে, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডের পর তার গোসল, কাফন ও জানাজার নামায পড়া যাবে না এবং মুসলিম কবরস্থানেও দাফন করা যাবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো, ছয়টা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ এবং মোসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীস। রাসূলুলাহ (সা) বলেন, তিন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়। ১) বিবাহিত ব্যভিচারকারী ২) হত্যাকারী ৩) ইসলাম ত্যাগকারী এবং আল-জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যে নিজ দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।

২। হত্যার দণ্ড : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি হলো হত্যা। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, দাস দাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে।' (সূরা বাকারা-১৭৮)

৩। চুরির দণ্ড : চুরির শাস্তি হলো, হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে দেয়া। চাই চুরি প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে করা হোক। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন : 'পুরুষ ও নারী চোরের দু'হাত কেটে দাও-যা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় ও আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। নিশ্চয়ই আল্লাহ জবরদস্ত ও বিজ্ঞ।' (সূরা মায়েদাহ-৩৮)

৪। মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড : এর শাস্তি হলো ৮০ বেত্রাঘাত এবং তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন : যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, এরপর স্বপক্ষে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০ টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই ফাসেক-গুনাহগার।' (সুরা নূর-৪)

৫। যেনা-ব্যভিচারের দণ্ড : ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে তাকে ১০০ বেত্রাঘাত

করতে হবে। আর বিবাহিত হলে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী নারী-পুরুষ উভয়কে ১০০ বেত্রাঘাত কর।' (সূরা নূর-২)

ইমাম শাফেঈ বলেন কোন পার্থক্য ছাড়াই ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। এটা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব নয়। তবে শাসক প্রয়োজনবোধ করলে তা করতে পারে।

পাথর মেরে হত্যার ব্যাপারে মায়েজ বিন মালেক এবং গামেদিয়া বংশের মহিলাটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ দিয়েছিলেন। কেননা তারা উভয়ে বিবাহিত ছিলেন।

৬. যমীনে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য দণ্ড : অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে এর শাস্তি হলো, হয় হত্যা, না হয় ফাঁসি, না হয় বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটা কিংবা বহিষ্কার করা। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদেরও এই মত।

তবে ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করে এবং অর্থ সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যায়, তাহলে তার শাস্তি হলো হত্যা, ফাঁসি। আর ডাকাত যদি হত্যা না করে মাল-সম্পদ লুট করে নেয়, তাহলে তার শাস্তি হবে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটা। আর যদি ডাকাত রাস্তায় ভয়-ভীতির সৃষ্টি করে, কিন্তু মাল সম্পদ লুট না করে, তাহলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানিফার মতের কাছাকাছি।

কেউ বলেছেন, উল্লেখিত শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি সরকারের কাজ। সরকার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক শাস্তি কার্যকর করবেন। এর স্বপক্ষে কোরআনের সূরা মায়েদার ৩৩ নাম্বার আয়াতটি হলো প্রমাণ। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসি দেয়া হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' (সূরা মায়েদা-৩৩)

৭। মদের দণ্ড : মদ পান করলে এর শাস্তি হলো ৪০-৮০ বেত্রাঘাত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এর আমলে এর শাস্তি ছিল ৪০ বেত। ইমাম শাওকানী বর্ণনা করেন নবী করিম (সা) শরাব পানকারীকে দু'টো খেজুর শাখা বা

বেজোড় শাখা দ্বারা ৪০ বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু ওমার (রা) ৮০ বেত্রাঘাতের প্রস্তাব করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে শলা-পরামর্শ করেন এবং সকলে ৮০ বেত্রাঘাত করার পক্ষে মত দেন। কেননা লোকেরা অধিক মদপানে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ৮০ বেতের পক্ষে এটা ছিল তাদের প্রমাণ। তাঁরা এটাকে মিথ্যা অভিযোগের সাথে অনুমান করে একই ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, মদের শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত। কিন্তু শাসক প্রয়োজন বোধ করলে তা ৮০ পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

২। **অনির্ধারিত শাস্তি :** এ হচ্ছে অনির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহ কিংবা মানুষের হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এটা এমন সব গুনাহ বা অপরাধের শাস্তি যার বিপরীতে দণ্ড কিংবা কাফফারা নির্দিষ্ট নেই। যেমন, ভয়, তিরস্কার ও সংশোধনমূলক শাস্তি। যেহেতু এটা অনির্দিষ্ট শাস্তি, তাই শাসক যা উপযুক্ত মনে করে সে ধরনের শাস্তি দিতে পারে। তা তিরস্কার, মার, জেল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি যে কোনটা হতে পারে। দণ্ড ও শাস্তির লক্ষ্য হলো, নিরাপদ ও স্থিতিশীল জীবন নিশ্চিত করা। এর ফলে জালেম কিংবা শক্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করবে না। সত্যের চোখে সবাই সমান। অনারবের উপর আরবের কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার উপর। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।' (সূরা হুজুরাত-১৩)

শাস্তি কেসাস হোক বা শাসকের এখতেয়ারাধীন সাজা হোক, তা হলো, সমাজ সংশোধনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এর ফলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। যে জাতি অপরাধীদের শাস্তি দেয় না, সে জাতি ভঙ্গুর, দুর্বল ও অরাজক। এর উত্তম উদাহরণ হলো আমেরিকা। সেখানকার শিক্ষাবিদরা শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক। তারা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে তাদের সমাজে দায়িত্বহীন এক বিশাল ভবিষ্যৎ বংশধর অপরাধী চক্র হিসেবে গড়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অপরাধী চক্র। তারা জান-মাল, ইজ্জত আবরু এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য বিপদ। শাস্তি না দেয়া কিংবা শিথিলতাই এর প্রধান কারণ।

আল্লাহ বান্দাহদের জন্য যখন শাস্তির বিধান কার্যকর করেন, তিনি ভাল করেই জানেন, তাদের প্রয়োজন কি ? তিনি জানেন যে, শাস্তি দ্বারাই ব্যক্তি ও সমাজের

নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যাবে। শাস্তি হলো মূলতঃ সফল চিকিৎসা।

মুসলিম খলিফাদের আমলে ইসলামের শাস্তির বিধান কার্যকর করায় সমাজ থেকে অপরাধ ব্যাপকহারে কমে গেছে এবং খুব কমই হত্যা, চুরি, ইজ্জতহানী, মদপান ও বাতিল মতাদর্শের আহ্বান শুনা যেত। রাষ্ট্রের চোখ খোলা এবং ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর অন্যায় কাজের প্রতিরোধ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে পাকড়াও করা হত।

খলিফা আবু বকরের আমলে প্রধান বিচারপতির কাছে দুই বছর পর্যন্ত কোন মোকদ্দমা আসেনি। কেননা অপরাধী অপরাধ সংঘটনের আগে হাজার বার হিসাব করত এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকত। তারা কেসাসের ভয়ে হত্যা, হাতকাটার ভয়ে চুরি, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু কিংবা বেত্রাঘাতের ভয়ে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকত। এভাবে অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত থাকত।

শাস্তি দণ্ডবিধির আওতায় হলে শাসক সে ব্যাপারে অবহেলো বা উদাসীনতা দেখাতে এবং কোন সুপারিশ গ্রহণ করে শাস্তি বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রমাণ হলো, উসামা বিন যায়েদ মাখযুমিয়া বংশের এক সম্ভ্রান্ত নারীর চুরির শাস্তি মওকুফের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে সুপারিশ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর এক ভাষণে বলেন, জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণ হল জুলুম করা ও ইনসাফ না করা। তারা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে চুরি করলে ছেড়ে দেয়া হত এবং দুর্বলেরা চুরি করলে শাস্তি দেয়া হত। আল্লাহর কসম, মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। তারপর তিনি মাখযুমি বংশের মহিলার হাত কাটার হুকুম দিলেন।

দণ্ডবিধি ছাড়া অন্যান্য শাস্তিগুলো শাসক যা ভাল মনে করেন, তা করবেন। এটা হুঁশিয়ারী, ভর্ৎসনা, জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। মূলত এটা ব্যক্তির বয়স, সংস্কৃতি ও মর্যাদার উপর নির্ভরশীল। কাউকে ভদ্র উপদেশ ও সামান্য ভর্ৎসনাতেই কাজ হয়। কারো জন্য দরকার হয় বেত্রাঘাত কিংবা জেল ইত্যাদি।

সন্তান গঠনকারীরা ঘরে ও বিদ্যালয়ে যে শাস্তি প্রয়োগ করেন তা সাধারণ লোকদের জন্য প্রযোজ্য শাস্তি থেকে ভিন্নধর্মী।

ইসলাম সন্তানের ব্যাপারে নিম্নোক্ত শাস্তি অনুমোদন করে।

১। নম্র ও দয়ালু ব্যবহারই আসল নীতি : এ মর্মে ইমাম বোখারী আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। 'নমনীয়তা গ্রহণ কর এবং কঠোরতা ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক।'

মুসলিম শরিফে আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাকে ও মোয়াজকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, তোমরা উভয়ে সহজতর পদ্ধতি অবলম্বন কর। কঠোরতা নয়; উভয়ে শিক্ষা দাও, ভাগিয়ে দিও না।'

হারেছ, তায়ালেসী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হাদীসে আছে; 'শিক্ষা দাও, কঠোরতা করো না, শিক্ষক কঠোরতাকারী থেকে উত্তম। এসকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সন্তান স্নেহ ও যত্নের আধার। নবী (সা) নিজেও শিশুদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেছেন।

২। শাস্তিদানের সময় ক্রটিকারী শিশুর স্বভাব বিবেচনায় রাখতে হবে; বুদ্ধিমত্তা, নমনীয়তা ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাদের মন-মেজাজ ও ভিন্ন ধরণের হয়। কেউ শান্ত, কেউ মধ্যম, আবার কেউ কড়া মেজাজের হয়। এগুলো অনেক সময় উত্তরাধিকার,পরিবেশ ও গঠন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের কারো কারো সংশোধনের জন্য চোখ রাঙ্গানী, ভর্ৎসনা, বকাঝকা এবং মারের দরকার আছে। ইবনে সিনা, আবদারী ও ইবনু খালদুন প্রমুখের মতে, খুব বেশী প্রয়োজন না হলে মার দেয়া উচিত নয়। সংশোধনের জন্য হুমকি ধামকি ও মধ্যস্থতাকারীদের সুপারিশের ফলাফল দেখার আগে মার দেয়া যাবে না।

ইবনে খালদুন তাঁর 'আল মোকদ্দমা' বইতে লিখেছেন অতিমাত্রায় কঠোরতা সন্তানকে ভীরু ও কাপুরুষ বানায় এবং জীবনে দায়-দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় বরং তা অলসতা, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজীর দিকেও ঠেলে দেয়।

কঠোরতার পদ্ধতি নবী করিম (সা) এবং নেক পূর্বসূরীদের গৃহীত পদ্ধতির বিপরীত। তাই অত্যন্ত হেকমতের সাথে সন্তানকে শাস্তি দিতে হবে এবং সর্বশেষ পর্যায়েই কেবল শাস্তি দেয়া যাবে।

৩। ক্রমান্বয়ে হালকা থেকে কঠোর পর্যায় গমন ঃ আমরা ইতোপূর্বে সর্বশেষ পর্যায়ে শাস্তির কথা উল্লেখ করেছি। এর অর্থ হলো সমস্যা সমাধানের আরো কিছু ধাপ আছে। সেগুলো আগে অতিক্রম করা দরকার। আশা করা যায়, এর ফলে সন্তানের বিকৃতি ও বক্রতা ঠিক হবে এবং সে সংশোধিত হবে। ইমাম গাজালীর

মতে, ক্ষতির আশংকায় ডাক্তার যেন রোগীর চিকিৎসা একবারেই না করে। এটা ঠিক নয়। অনুরূপ, সন্তান গঠনকারীও যেন প্রথমেই হুমকি-ধামকি কিংবা শাস্তির মাধ্যমে তাদের বিকৃতি দূর করার চেষ্টা না করে। এর অর্থ হলো, তাদের উপযোগী সংশোধনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং ক্রটিগুলোর পেছনে সন্তানের বয়স, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে বিবেচনায় রাখে। এর ফলে তাদের বিকৃতির কারণ জানতে সহায়ক হবে সমাধান ত্বরান্বিত হবে।

মারের শর্তাবলী :

১. সংশোধনের উল্লেখিত সকল উপায় প্রয়োগের আগে মার দেয়া যাবে না।

২. কঠোর রাগের মাথায় মার দেয়া যাবে না। এতে করে সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

৩. মাথা, মুখ, বুক ও পেটে মারা যাবে না। নবী করিম (সা) মুখে মারতে নিষেধ করেছেন। কেননা মুখ ও মাথা অনুভূতির স্থান। সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুক ও পেটে মারলে বেশী ক্ষতি কিংবা মৃত্যুও হতে পারে।

নবী (সা) বলেন, 'ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হওয়া যাবে না।'

৪. প্রথমবার হালকা মার দিতে হবে যেন বেশী কষ্ট না পায়। হাত-পায়ে হালকা মার দিতে হবে। সন্তান ছোট হলে ১-৩ টি বেত দেয়া যথেষ্ট আর বড় হলে এবং তিনটি বেত্রাঘাত যথেষ্ট মনে না হলে ১০-এর বেশী বেত্রাঘাত করা যাবে না। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহর দণ্ডবিধি ছাড়া কাউকে ১০টির বেশী বেত্রাঘাত করা যাবে না ।' (ইবনুল তাইমিয়া, আল মুগনী কিতাবেও তা উল্লেখ করা হয়েছে।)

৫. ১০ বছর বয়সের আগে সন্তানকে মার দেয়া যাবে না। নবী (সা) বলেছেন, 'সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং ১০ বছর বয়সে মার।

৬. প্রথমবার অন্যায় কাজ করলে সন্তানকে তওবা করার সুযোগ দেয়া উচিৎ এবং মধ্যস্থতাকারীদের সুপারিশ গ্রহণ করে দ্বিতীয়বার যেন ঐরূপ অন্যায় না করে সে প্রতিশ্রুতি নেয়া উচিত। এটা মার কিংবা লোকদের সামনে অপমান অপেক্ষা উত্তম।

৭. সন্তান বালেগ হলে তাকে এক-দু'বার মার দিলে যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই অন্যায় থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাকে মার দিতে হবে।

৮. সন্তান গঠনকারী নিজেই মার দেবে। এটা তার ভাই কিংবা বন্ধু দ্বারা দেবে না। এতে করে তাদের প্রতি তার হিংসা-বিদ্বেষ জাগতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সন্তান গঠনের মৌলিক নিয়ম-নীতি

সন্তান গঠনকারীর গুণাবলী

১. এখলাস : সন্তান গঠনমূলক সকল কাজে অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের প্রতিরোধ, উপদেশ, পর্যবেক্ষণ ও শাস্তির ব্যাপারে এখলাস ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। এর ফলে সওয়াব ও আল্লাহর সন্তোষ এবং জান্নাত লাভ করা যাবে, ইনশাআল্লাহ। কথা ও কাজে এখলাস ঈমান ও ইসলামের দাবী। আল্লাহ কোরআনে বলেন, তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।' (সূরা বাইয়্যেনাহ-৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি যা নিয়ত করে, তাই পাবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ খালেস ও একনিষ্ঠ আমল ছাড়া– যার দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়-অন্য কিছু অবশ্যই কবুল করেন না।' (আবু দাউদ, নাসাঈ)

২. তাকওয়া : এর অর্থ হলো, 'আদিষ্ট কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা।' এর আরেক সংজ্ঞা হলো, নেক আমল দ্বারা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচা এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁকে ভয় করা।

উভয় সংজ্ঞার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ওমার ও উবাই বিন কাবের (রা) মধ্যকার সংলাপও এই অর্থের সহায়ক। ওমার তাকওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করায় উবাই বলেন, আপনি কি কাঁটাযুক্ত রাস্তায় চলেছেন ? ওমার বলেন, হ্যাঁ। উবাই, কিভাবে চলেছেন ? ওমার বলেন, অত্যন্ত সাবধানের সাথে। উবাই বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ কোরআনের বহু আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা যথার্থভাবে তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা আলে ইমরান -১০২)

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' (সূরা আহযাব-৭০)

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন এবং অভাবিত উপায়ে রিযক দান করেন।' (সূরা তালাক : ২-৩)

বোখারী ও মুসলিম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করা হলো কে সর্বাধিক সম্মানিত ? তিনি বলেন, অধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি।

মুসলিম শরীফে নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল। আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান, তোমরা কিভাবে কাজ কর। তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে দূরে থাক। কেননা বনি ইসরাইলের প্রথম পরীক্ষা ছিল নারীর মাধ্যমে।

ইমাম তিরমিযী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহর প্রতি তাকওয়া এবং সচ্চরিত্র।'

মোসনাদে আহমদ, হাকেম ও তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর, গুনাহর কাজ করার পর নেক কাজ কর। তাহলে গুনাহটি মিটে যাবে এবং লোকজনের সাথে সদ্ব্যবহার কর।'

সন্তান গঠনকারীর মধ্যে উত্তম চরিত্র ও তাকওয়া থাকলে সন্তানরা তাকে আদর্শ মনে করে অনুকরণ করবে।

৩. এলেম : সন্তান গঠনকারীকে ইসলামের শিক্ষানীতি, হালাল-হারাম, চারিত্রিক নীতিমালা, ইসলামের নিয়ম-নীতি ও শরীয়তের নীতিমালা সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলে তিনি এগুলোর আলোকে ও সঠিক পদ্ধতিতে সন্তানকে সংশোধন করতে কোরআন, নবী (সা)-এর চরিত্র এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে গঠন করতে সক্ষম হবেন। তিনি এগুলো না জানলে নিজেই বিকৃত ও অবাঞ্ছিত হবেন। খালি কূপ কাউকে পানি এবং তেলবিহীন বাতি অন্যকে আলো দান করতে পারে না। কত অজ্ঞ পিতা সন্তানের উপর জুলুম ও আগ্রাসন চালায় এবং কত সন্তান অজ্ঞ মাতা-পিতার দরুন দুর্ভাগা হয়। কেয়ামতের দিন তাদেরকে সন্তানের জন্য ও নিজের অজ্ঞতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, যে দিন সন্তান ও সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

এলেম অর্জনের জন্য নির্দেশদানকারী কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা আছে। আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' (সূরা যোমার-৯)

তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে- আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' (সূরা মোজাদালাহ-১০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি এলেম অর্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' (মুসলিম)

তিনি বলেন, 'দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকর, তাঁর আনুগত্যকারী এবং আলেম ও ছাত্র ছাড়া।' (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি এলেম অর্জনের জন্য বের হয়, ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় বিদ্যমান বলে গন্য হয়।' (তিরমিযী)

তিনি বলেন, 'এলেম অর্জন করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ।' (ইবনু মাজাহ)

৪. সহনশীলতা : সন্তান গঠনকারীর এই গুণ সন্তানকে তার প্রতি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীছে অনেক বক্তব্য আছে।

আল্লাহ বলেন, 'তারা মোত্তাকী যারা রাগ সংবরণ করে ও লোকদেরকে ক্ষমা করে। আল্লাহ নেক্কারদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আল ইমরান-১৩৪)

তিনি আরো বলেন, 'ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।' (সূরা আরাফ-১৯৯)

তিনি বলেন : 'জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সূরা হা মীম সাজদাহ-৩৪)

আবু হোরায়রা (রা) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বলেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, রাগ করো না। তিনি এটা কয়েকবার বলেন।' (বোখারী)

নবী (সা) বলেন 'কুস্তিতে জয়ী ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, বরং সে ব্যক্তি শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

সহ্য শক্তি তথা সহনশীলতার অপরিহার্য দাবী হলো নম্রতা। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, 'আল্লাহ নম্র, তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে

ভালবাসেন। তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন কঠোরতার জন্য কিংবা নম্রতা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য তা দান করেন না।' (মুসলিম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কোনো জিনিসের মধ্যে নম্রতা থাকলে তা সৌন্দর্যবর্ধক হয় এবং তা ছিনিয়ে নেয়া হলে জিনিসটি মন্দ হয়। (মুসলিম)

এর অর্থ এ নয় যে, সন্তানের সংশোধনের জন্য সর্বদা সহনশীলতাও নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। বরং আবেগ বা রাগের সময় নিজেকে সংযত করে ধীর স্থিরভাবে সংশোধন করতে হবে এবং প্রয়োজনে শাস্তি দিতে হবে।

৫. দায়িত্বের অনুভূতি : সন্তানকে ঈমানী, আচরণগত, শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্বের উপলব্ধি থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, সন্তান গঠনকারী এ বিষয়ে উদাসীনতা বা অবহেলা করলে সে ধাপে ধাপে বিপর্যয়ের দিকে এগুতে থাকবে। দায়িত্বের অনুভূতির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও।' (সূরা তাহরীম-৬)

আল্লাহ বলেন, তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।' (সূরা সাফফাত-২৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, গৃহস্বামী দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী দায়িত্বশীলা, তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী)

তিনি আরো বলেন, 'সন্তানকে উত্তম আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দান অপেক্ষা বাবার পক্ষ থেকে উত্তম কোন উপহার নেই। (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তাদেরকে হেফাজত করেছে না ধ্বংস করেছে।' (ইবনে হিববান)

৬. শত্রুর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা : মুসলিম ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধবংস করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষবাদ, পুঁজিবাদ, যায়নবাদ, ম্যাসনবাদ, ক্রুসেডবাদ ও কম্যুনিজম বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। তারা মুসলমানোর ঈমান-আকীদা নষ্ট এবং নাস্তিকতার বীজ বপনের মাধ্যমে মৌলিক চরিত্র ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য মদ ও মাদকদ্রব্য, যৌন কামনা-বাসনার সয়লাব ও অন্ধ অনুকরণের উপায়কে বেছে নিয়েছে। এজন্য নারী তাদের প্রধান হাতিয়ার।

ক) কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র : 'কম্যুনিষ্ট কালচার বিশ্বকোষ' লিখেছে, ইসলাম সর্বাধিক বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম যা শোষক, সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদীদের সেবা করে। এটা সভ্যতা ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। রাশিয়া থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' ম্যাগাজিন ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারী লিখেছে, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে মুসলিম অঞ্চলগুলোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। মনে হয়, মুসলিম রক্ত লেলিনের নীতিমালা পান করেনি। আমরা ইসলামকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করবো এবং আরব দেশগুলোকে সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবো। মুসলিম আলেমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, নাস্তিক লেখকদেরকে ধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরা, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজতন্ত্র শিক্ষা দেয়াসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

খ) ক্রুসেডীয় ষড়যন্ত্র :

১. ইসলামী খেলাফতের অবসান : ইসলামের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে দীর্ঘ দু'শ বছরব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যর্থতার পর তারা তুরস্কে ওসমানী শাসকদের ইসলামী খেলাফত উচ্ছেদের পরিকল্পনা নেয়। ইংরেজ, গ্রীক, ইটালী ও ফরাসীরা ওসমানী খেলাফতের রাজধানী ইস্তামবুল দখল করে এবং ১৯২৮ খৃঃ লুজানে অনুষ্ঠিত সন্ধি সম্মেলনে তুরস্কের বিশ্বাসঘাতক ও মুসলিম মিল্লাতের কলঙ্ক কামাল আতাতুর্কের সাথে ইসলামী খেলাফত অবসানের শর্তে সৈন্য প্রত্যাহার ও সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে তুরস্ককে ইসলামের সাথে সম্পর্ক এবং ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে সেক্যুলার শাসনতন্ত্র তৈরীর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। এছাড়াও ইসলামী আদালত, মাদ্রাসা, ওয়াকফ, উত্তরাধিকার নীতি উৎখাত, তুর্কী ভাষায় আযানের প্রচলন ইত্যাদি ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়।

কামাল আতাতুর্ক এ সকল শর্ত বাস্তবায়ন করায় তুরস্ককে স্বাধীনতা দেয়। ইংরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্জন বৃটেনের কমন্স সভায় বলেন, আমরা তুরস্কের ইসলাম ও খেলাফত-এ দু'টো বিষয়কে খতম করে দিয়েছি।

২। কোরআনকে মুছে দেয়া ঃ ফ্রান্স আলজেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের পর আলজেরিয়ান মুসলিম যুবকদের মন থেকে কোরআনকে মুছে ফেলার জন্য চেষ্টা চালায়। তারা ১০ জন আলজেরিয়ান মুসলিম যুবতীকে বাছাই করে ফ্রান্সে লেখা-পড়া করায় ও ফরাসী পোশাক পরায়। তারা ফরাসিদের সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাদের মতো হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে সার্টিফিকেট দেয়ার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে তারা ইসলামী পোশাকে হাজির হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে তাক

লাগিয়ে দেয়। ফরাসী পত্রিকাগুলো প্রশ্ন করে, আলজেরিয়ায় ১২৮ বছর শাসনের পরও একি দেখা গেল? ফরাসী উপনিবেশ মন্ত্রী লাকোষ্ট জবাবে বলেন, 'কোরআন যদি ফ্রান্স থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহলে আমরা কি করব ?'

৩। ইসলামী ধ্যান ধারণা খতম করা : খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্যামুয়েল জুইমার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেমে মিশনারী সম্মেলনে বলেন, মুসলিম দেশের লোকদেরকে খৃষ্টান বানানোর দরকার নেই বরং তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাও।

৪। মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করা : মুসলমানরা যেন পুনরায় ঐক্যবদ্ধ না হয়। হলে তারা আবার ইসলামী শাসন কায়েম করবে। এ মর্মে তাদের চিন্তাবিদদের বহু উদ্ধৃতি আছে।

৫। মুসলিম রমণীদেরকে নষ্ট করা : নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, পুরুষের সমান অধিকার, বহু বিবাহ প্রথা বাতিল ও তালাক উচ্ছেদের অভিযান চালানো হবে যেন তাদেরকে সস্তা ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গ) **ইহুদী ও ম্যাসনবাদী ষড়যন্ত্র** : তারা দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন প্রতারণা ও ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নেয়। তাদের লক্ষ্য দু'টো।

১। কোন দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করা, একের বিরুদ্ধে অপরকে উস্কে দেয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

২। জাতিসমূহের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট করা এবং তাদের চরিত্র ও নিয়ম-পদ্ধতি ধ্বংস করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা।

এ সবের উদ্দেশ্য হলো, জাতিগুলোর শক্তি ও মর্যাদা খর্ব করা এবং তাদেরকে ইহুদীদের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা। এজন্য তারা ফ্রিম্যাসন নামক গোপন আন্দোলন গড়ে তোলে। এ উদ্দেশ্যে তাদের প্রটোকল রয়েছে। তারা ফ্রয়েডের যৌনবাদী মতবাদকে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে মানব আচরণকে ব্যাখ্যা করে। তারা কার্ল মার্ক্সের নাস্তিকতাবাদকেও গ্রহণ করেছে। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, আল্লাহর ধারণা থেকে সরানোর জন্য লোকদেরকে রঙ্গমঞ্চে ব্যস্ত করে দাও। তারা ক্লাব ও বেশ্যাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বাসঘাতক লোক তৈরী করে কোন কোন জাতিকে নষ্ট করে। তারা ইউরোপ ও আমেরিকায় মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের চেয়ারগুলো দখল করে এগুলোর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে।

ঘ) **উপনিবেশিক ষড়যন্ত্র** : এই ষড়যন্ত্র ক্রুশবাদ ও প্রাচ্যবাদের সাথে জড়িত। তাদের লক্ষ্য হলো, মুসলমানদেরকে জেহাদ থেকে বিরত রাখা। এক উপনিবেশিকের মতে, মদ ও গায়িকা উম্মতে মোহাম্মদিকে ধ্বংস করার জন্য এক হাজার কামান অপেক্ষা বেশী কার্যকর। তাই তাদেরকে বস্তু ও কামনা বাসনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। পাদ্রী যোয়াইমার মিশনারীদের সম্মেলনে বলেন, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের দেশে এমনভাবে তৈরী করেছো যে, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক নেই।

তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে এনেছ, কিন্তু খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করাওনি।

যাই হোক, তারা এভাবে একটি মুসলিম বংশধর গড়ে তুলল। যারা দুনিয়া ও কামনা-বাসনায় ডুবে থাকে। জেরুযালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ইহুদিদের মতো খৃষ্টানরাও খুশী।

ঙ) **ধর্মনিরেপেক্ষবাদীদের ষড়যন্ত্র** : তারা ইসলামকে আংশিক ধর্ম-কিংবা অন্যান্য ধর্মের মতো আধ্যাত্মিক কিছু বিষয়কে ধর্ম হিসেবে চালিয়ে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে এ মর্মে বিভ্রান্ত করেছে যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। তাই শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর কোন বক্তব্য নেই। এজন্য জেহাদেরও প্রয়োজন নেই। ইসলামকে বিকল ও অকার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের চক্রান্ত সফল। মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশের কর্ণধারদের তারা যুক্তির ভিত্তিতেই ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং বলছে, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। সামষ্টিক ব্যাপারে একে টেনে আনা যাবে না। এর স্থান মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা, এটা অন্য ধর্মের জন্য প্রযোজ্য হলেও ইসলামের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং তা কুফরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু **অংশের উপর ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে? এরূপ করলে দুনিয়ায় অপমান এবং পরকালে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।'** (সূরা বাকারা-৮৫)

খ. সন্তান গঠনের দু'টো মৌলিক নীতি ঃ

১। সংযোগ ও সেতু বন্ধন, ২। হুঁশিয়ারী

১। সংযোগ ও সেতুবন্ধন : সন্তান যখন ভাল মন্দ পার্থক্যের বয়সে পৌঁছে, তখন আত্মিক, চিন্তামূলক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও শারীরিক ব্যায়ামের সাথে তাদের সংযোগ ঘটিয়ে দিলে বড় হলে ঈমানের প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৃঢ় ইয়াকিন-বিশ্বাস এবং তাকওয়ার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়বে। তখন কেউ তাদের সামনে

জাহেলিয়াতের শ্লোগান দিতে পারবে না। তারা ইসলামের দুশমদের মোকাবিলায় বজ্রকঠোর হবে। এজন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমুহের সাথে তাদের সংযোগ ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে হবে।

ক) ঈমান-বিশ্বাসের সেতুবন্ধন তৈরী করা : সন্তানকে ঈমানের রোকন বা মূল বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া এবং অদৃশ্য বিষয়সমূহের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য জ্ঞান দান করা জরুরী। আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, তাকদীর দু'ফেরেশতার প্রশ্ন, কবর আজাব, আখেরাত পুনরুত্থান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। এগুলো মনে বদ্ধমূল হলে সে হেদায়ত, দ্বীনে হক ও সহজ সরল রাস্তায় চলতে পারবে। (২য় খণ্ডে ঈমানী শিক্ষা অধ্যায়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য)

খ) আত্মিক সংযোগের সেতু বন্ধন তৈরি করা : আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত করতে হবে এবং অন্তর থেকে ঈমান ও এখলাসের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। এজন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে;

১। সন্তানকে ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। এ মর্মে হাকেম আবু দাউদ, আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সাত বছর বয়স হলে সন্তানকে নামাযের হুকুম দাও (নামায না পড়লে) ১০ বছর বয়সে মার এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।

নামাযের উপর সন্তানের রোযা, হজ্জ, ও যাকাতের তুলনা করা যায়। ইসলামের ইবাদত কেবল এই চারটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সকল নেক কাজে আল্লাহর পদ্ধতি অনুসরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার নাম ইবাদত। এর উদাহরণ হলো, ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায় হালাল-হারাম মেনে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে তাহলে সে ব্যবসায়ী হবে ইবাদতকারী মোমেন। তাই বাল্যকাল থেকেই সন্তানকে ভাল-মন্দের নীতিমালা, সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। এ মর্মে ইবনে জরীর ও ইবনুল মোনজের নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর। তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক, তোমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দাও। এটা তোমাদের ও তাদের জন্য দোজখ থেকে বাঁচার উপায়।' ভালভাবে ইবাদত করলে সন্তান সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

২। সন্তানকে কোরআনের সাথে সম্পর্কিত করা : তাবারানী আলী (রা) এর বরাত দিয়ে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে তিনটি জিনিস

শিক্ষা দাও : ১। নবীর ভালবাসা ২। নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা ৩। কোরআন তেলাওয়াত। কোরআনের বাহকরা নবী ও খলীলদের সাথে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবেন। যে দিন আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না।' ইবনে খালদুন সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দান, ইবনে সিনাও সন্তানদেরকে বাল্যকালে কোরআন শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। ইমাম গাজালী (র) শিশুদের কোরআন শিক্ষা, সংবাদ জানানো, নেক লোকদের কাহিনী এবং কিছু দ্বীনি মাসলা শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন। আমাদের নেক পূর্বসূরীরাও শিক্ষকের কাছে সন্তানদেরকে পাঠিয়ে কোরআন শিক্ষার অনুরোধ জানাতেন।

শিক্ষক ও মাতাপিতার জানা দরকার যে, আমাদের পূর্বসূরীদের পথই উত্তরসূরীদের জন্য কল্যাণকর। ঘরে, মসজিদে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে-যেখানেই হোক না কেন, সন্তানকে সুন্দর ও শুদ্ধ কোরআন পড়া ও অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে হবে।

৩। মসজিদের সাথে সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরী করা : তিরমিযী শরীফে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, 'কোন লোককে মসজিদে যেতে দেখলে তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।'

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআন মজিদে বলেন, 'যে আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে এবং নামায কায়েম করে সে-ই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করে।' (সূরা তওবা-১৮)

মসজিদ অতীতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতেও করবে। মসজিদ ছাড়া সন্তানের আত্মিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক গঠন সম্ভব নয়। মসজিদে দ্বীনি মাসলা শেখা যায়, হালাল-হারাম বুঝা যায়। মসজিদ ছাড়া কোরআন ও তাফসির শেখা যায় না। মসজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করে। মসজিদে আল্লাহর জিক্‌র ও দ্বীনি আলোচনা হয়। রাসূল (সা) বলেন, 'তোমরা বেহেশতের বাগিচার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে একটু বিচরণ করবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, বেহেশতের বাগান কি ? তিনি বলেন, 'জিক্‌রের মজলিস' (তিরমিযী) অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনি আলোচনার সার্কেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিছু লোক বা কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কোরআন পড়ে ও পড়ায় তাহলে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ্ নিজের কাছে অবস্থানরত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা স্মরণ করেন।' (মুসলিম)

মসজিদের মূল কাজ হলো, জামায়াতে নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবো যা করলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? সাহাবীরা বলেন, জ্বি হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, ঠাণ্ডার কষ্ট সহ্য করে ভালভাবে অজু করা, মসজিদের উদ্দেশ্যে বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়ার মতো বিরাট সওয়াব।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ঘরে অজু করে পাক-পবিত্র হয়ে ফরজ নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তার এক পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ ও অন্য পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।' (মুসলিম)

নবী (সা) বলেন, 'অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদেরকে কেয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর বা আলোর সুসংবাদ দাও।' (তিরমিযী) ।

৪। সন্তানকে আল্লাহর জিকরের সাথে সম্পৃক্ত করা ঃ

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। (বাকারা-১৫২) তিনি আরো বলেন : 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।' (সূরা আহযাব-৪১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো, জীবিত ও মৃতের।' (বোখারী)

তিনি আরো বলেন, 'আমি বান্দাহর সাথে আমার ব্যাপারে তার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করি। সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে আমাকে কোন দলে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হলে আমি তার দিকে একহাত, সে একহাত এগুলে আমি দু'হাত এগিয়ে আসি এবং সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।' (বোখারী, মুসলিম)

জিকর অর্থ, মোমেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্মরণ করবে। এই স্মরণ করার কাজটি মন, জিহ্বা কিংবা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। আর তা দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, যমীনে হাঁটা, আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন সম্পর্কে

চিন্তা-গবেষণা করা, উপদেশ ও ওয়াজ শোনা, শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করা কিংবা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার মাধ্যমে হতে পারে।

কোরআন মজীদে জিকরকে এসকল অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মানসিক ও আত্মিকভাবে স্মরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, 'তারা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা আল্লাহর জিক্র থেকে বিরত রাখে না। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যে দিন অন্তর ও চোখ উল্টে যাবে, সেদিনকে ভয় করে।' (সূরা নূর-৩৭)

অন্তরের জিক্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর জিকর দ্বারা তাদের মন প্রশান্তি লাভ করে। শুনে রাখ, জিকর দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।' (সূরা রাদ-৩৮)

মুখের জিকর : কোরআনে বর্ণিত যে কোন জিকর প্রথমে মৌখিক জিক্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা প্রথমে শব্দ ও পরে অর্থ শামিল থাকে। এ অর্থটিই আবু হোরায়রা (রা) এর বর্ণিত হাদীছে পাওয়া যায়। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে আছি যখন সে আমাকে স্মরণ করে এবং তার দু'ঠোঁট নড়ে।' (ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান)

আব্দুল্লাহ বিন বোচর থেকে বর্ণিত, এক ব্যাক্তি এসে নবী (সা) কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে শরীয়তের অনেক হুকুম পৌছেছে। আমাকে এমন একটি জিনিস বলুন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো। তিনি বলেন, সর্বদা তোমার মুখ আল্লাহর জিক্র দ্বারা তরতাজা রাখ।' (তিরমিযী)

মুখের জিক্রের মধ্যে নবী (সা) থেকে বর্ণিত সহীহ দোয়া : সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের নেক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে বর্ণিত দোয়াগুলোও শামিল। যেমন, সকাল-সন্ধ্যা, পানাহার, সফর, ঘরে প্রবেশ ও প্রস্থান, ঘুম ও ঘুম থেকে জাগা, তাহাজ্জুদ নামায ও সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কিত দোয়া ইত্যাদি। এছাড়া আল্লাহর কাছে সাহায্য ও গুনাহ মাফের দোয়াও জিক্রের মধ্যে শামিল।

কাজ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে জিক্রের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন :

'(জুমার) নামায শেষে যমীনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং বেশী বেশী করে আল্লাহর জিক্র (স্মরণ) কর, তাহলে সাফল্য লাভ করবে।' (সূরা জুমআ-১১)

পূর্ণাঙ্গ জিক্র সম্পর্কে কোরআন বলে :

'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং রাত দিনের আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, তারা বলেন, হে আমার রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯১-১৯২)

কোরআন তেলাওয়াতও জিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত : আল্লাহ বলেন, 'আমরা জিক্‌র (কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাজতকারী।' (সূরা আল হিজর-৯)

এলেম অর্জনের জন্য প্রশ্ন করা ও ওলামা কেরামের আসরে বসাও জিকির।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা না জানলে আহলে জিকরকে জিজ্ঞেস কর।' (সূরা আম্বিয়া-৭) এখানে 'আহলে জিক্‌র' বলতে আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবাদতকেও জিক্‌র বলা হয়।

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা আল্লাহর (জিক্‌র) ইবাদতের দিকে ছুটে আস।' (সূরা জুমআ-৯)

জিক্‌র বিশেষ কোন অজীফার নাম নয় বা বিশেষ কোন অবস্থার নাম নয়। জিক্‌র হচ্ছে সার্বিক কাজ ও মনোভাব যা মনে সর্বদা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে জাগরিত রাখে। শোয়া-বসা, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, আসা-যাওয়া, হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, যুদ্ধ-শান্তি, ঘুম-জাগ্রত অবস্থায় তা করতে হয়। আল্লাহ বলেন, 'মোমেনদের কাছে আল্লাহর জিক্‌র করা হলে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, তাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বাড়ে এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে।' (সূরা আনফাল-২)

৫। সন্তানকে সুন্নাত ও নফল ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত করা :

আল্লাহ বলেন, 'তুমি রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়, যা তোমার জন্য অতিরিক্ত। আল্লাহ হয়তো তোমাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।' (সূরা বনি ইসরাইল-৭৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাহ সব সময় নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালবেসে ফেলি তখন সে যে কানে শুনে আমি তার সে কান হয়ে যাই, সে যে চোখে দেখে, আমি সে চোখ হয়ে যাই,

সে যে হাতে ধরে আমিই সে হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হেঁটে যায়, আমিই সে পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দান করি। আর যদি সে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দান করি।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন মুসলমান দিনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ১২ রাকাত সুন্নাত নামায পড়লে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।' (মুসলিম)

সন্তানদেরকে নফল ও সুন্নাত ইবাদতে অভ্যস্থ করার জন্য এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও নফল নামায-রোজার কথা উল্লেখ করব।

ক) **নফল ও সুন্নত নামায** :

১) এশরাকের নামায : নবী (সা) বলেন, ফজরের নামাযের পর কেউ যদি সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসে থাকে ও (২০ মিনিট) পরে দু'রাকাত নামায পড়ে সে একটা পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার ছোয়াব পাবে। (মুসলিম)

২) চাশতের নামায : আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, তোমদের শরীরের প্রত্যেক জোড়ার উপর একটি করে সদকাহ প্রযোজ্য। এর বদলে চাশতের দ'রাকাত নামাজ পড়লে তা আদায় হয়ে যায়। (মুসলিম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) চাশতের চার রাকাত নামায পড়তেন। কোন সময় আরো বেশী আদায় করতেন। (মুসলিম)

'উম্মে হানি থেকে বর্ণিত। নবী (সা) চাশতের ৮ রাকাত নামায পড়েছেন।' (মুসলিম)

তিন বর্ণনা থেকে দেখা যায়, এই নামায সর্বনিম্ন দু'রাকাত, মধ্যম চার রাকাত এবং অধিক আট রাকাত। এর ওয়াক্ত হলো, সকাল সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা পর থেকে বেলা ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত।

৩। আউয়াবিনের নামায ঃ

মাগরিবের নামাযের পর ৬ রাকাত আউয়াবিনের নামায পড়তে হয়। আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়ে এবং এর মধ্যে কোন খারাপ কথা না বলে, সে ১২ বছরের ইবাদতের সওয়াব পাবে।' (ইবনু মাজাহ)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ ঃ আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত নামায পড়ার আগে যেন, সে না বসে।' (মুসলিম)

৫। অজুর দু'রাকাত সুন্নাত নামায : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বেলাল (রা) কে বলেন, তুমি ইসলামের এমন কোন্ উত্তম আমল কর যার ফলে আমি জান্নাতে তোমার পায়ের জুতার শব্দ শুনেছি ? বেলাল বলেন, আমি দিন ও রাতে যখনই অজু করি তখনই সাধ্যমত (কমপক্ষে দু'রাকাত) নামায পড়ি।' (বোখারী)

৬। তাহাজ্জুদের নামায : আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'ফরজ নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায।' (তিরমিযী)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি, 'প্রতি রাতে এমন একটা সময় আছে, তখন বান্দাহ আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তা দেন।' (মুসলিম)

আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমারা রাতের নামায পড়। এটা নেককারদের চরিত্র ও অভ্যাস, তোমাদের রবের নৈকট্য, গুনাহর কাফফারা ও পাপ থেকে বিরতকারী।' (তিরমিযী)

রাতের নামায তথা কেয়ামুল লাইল কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশীর কোন সীমা নেই। তবে নবী (সা) অধিকাংশ সময় ৮ রাকাত + ৩ রাকাত বিতরসহ মোট ১১ রাকাত নামায দীর্ঘ কেরাতসহ পড়তেন। এটা উত্তম নামায হওয়ার কারণ হলো, তা এখলাসের অধিক নিকটবর্তী।

৭। তারাবীহর নামায : রমজানের প্রতি রাতে এশার নামাযের পর দুই রাকাত করে ১০ সালামে ২০ রাকাত নামায পড়তে হয়। কেউ কেউ বলেন, এটাও কেয়ামুললাইলের মতো আট রাকাত। বিতরের নামায এর অতিরিক্ত।

সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, তাঁরা ওমার (রা) এর সময় ২০ রাকাত নামায পড়তেন। আর ওসমান (রা) এর আমলে দীর্ঘ কেয়ামের কষ্টের কারণে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন।' (বায়হাকী)

৮। এস্তেখারার নামায : দু'রাকাত নামায পড়ে তারপর নিম্নোক্ত দোআ পড়ে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করতে হবে। জাবের (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ , وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ,فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ , وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ,اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ,فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ , وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ

شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ 'হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ চাই, আপনার শক্তি দ্বারা শক্তি চাই, আপনার মহান অনুগ্রহ চাই, আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জানেন, আমি জানি না, আপনি গায়েবের জ্ঞানী। হে আল্লাহর আপনি যদি জানেন যে, 'এই বিষয়টি আমার দ্বীন, জীবন যাপন ও পরিণতির দিক থেকে কল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার জন্য বাস্তবায়ন করুন, তা সহজ করে দিন ও তাতে বরকত দিন। আর আপনি যদি জানেন যে, এই বিষয়টা আমার দ্বীনদারী, জীবন যাপন ও পরিণতির দিক থেকে অকল্যাণকর, তাহলে, তাকে আমার থেকে বিরত রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখুন। যেখানে কল্যাণ আছে তা আমার জন্য বাস্তবায়ন করুন এবং তাতে আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।' (বোখারী)

'এই বিষয়টির স্থলে নিজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতে হবে। তারপর বিষয়টি করা বা না করার বিষয়ে মন যা বলে তা করবে।

৯। সালাতুল হাজাহ : (প্রয়োজন পূরণের নামায) : দু'রাকাত নামায পড়ে নিম্নোক্ত দোআটি পড়তে হবে :

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি সহনশীল ও সম্মানিত। মহান আরশের মালিকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং বিশ্ব জাহানের প্রভুর জন্য সকল প্রশংসা নিবেদন করছি। হে আল্লাহ, আপনার কাছে রহমত পাওয়ার উপায় উপকরণ ও ক্ষমার দৃঢ় ইচ্ছা প্রার্থনা করছি। আরও প্রার্থনা করছি সকল নেক কাজের তওফিক ও সকল পাপ থেকে নিরাপত্তা। আমার কোন গুনাহ মাফ ও কোন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর না করে অবশিষ্ট রাখবেন না। আর এমন কোন প্রয়োজন অপূরণকৃত রাখবেন না যাতে আপনি রাজী, হে মহান দয়ালু ও মেহেরবান।' (তিরমিযী)

খ) নফল রোযা :

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'কোন বান্দাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে এক দিন রোযা রাখলে আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে দোজখ থেকে ৭০ শরতকালের সমান দূরত্বে রাখবেন।' (মুসলিম)

১। আরাফার দিনে রোযা : আবু কাতাদাহ নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'আরাফা দিবসের রোযা দ্বারা আল্লাহ্ এক বছর আগের ও পরের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।' (মুসলিম)

২। আশুরার রোযা : আবু কাতাদাহ নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'আশুরার রোযা দ্বারা আল্লাহ্ এক বছর আগের ও পরের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ ও ১০ মুহররম রোযা রাখবো।' ইহুদিদের বিরোধিতার জন্য ১০ই মুহররমের সাথে ৯ কিংবা ১১ই মুহররম রোযা রাখা যায়। এ মর্মে মোসনাদে আহমদে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। 'তোমরা আশুরা দিবসে রোযা রাখ, ইহুদীদের বিরোধিতা কর এবং এক দিন আগে বা পরে রোযা রাখ।'

৩। শাওয়ালের ৬ রোযা : আবু আইউব আনসারী থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ৬ রোযা রাখে, সে যেন গোটা বছর রোযা রাখল।' (মুসলিম)

৪। আইয়ামে বীজের রোযা : আবু জার (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'তুমি যদি মাসে ৩ টি রোযা রাখ, তাহলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখ।' (তিরমিযী) মাসে ৩ টি রোযা রাখলে ৩ঃ১০ = ৩০ দিন অর্থাৎ গোটা মাস রোযা রাখার সওয়াব পায়।

৫। সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা : তিরমিযীতে উল্লেখ আছে, নবী (সা) সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন। তাঁকে এই দু' দিবসে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। আমার আমল পেশ করার সময় আমি রোযা অবস্থায় থাকা পছন্দ করি।'

৬। একদিন পরপর রোযা রাখা : এটা দাউদ (আ) এর রোযার পদ্ধতি। আব্দুল্লাহ্ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, ১ দিন রোযা রাখ ও ১ দিন রোযা রেখো না। এটা দাউদ (আ) এর রোযা এবং তা উত্তম।' (বোখারী)

তবে নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে কেউ কেউ কাজা ওয়াজিব বলেন। সন্তানকে নফল ইবাদতের অভ্যাস করালে একদিকে যেমন ফরজ ইবাদতের প্রতি মজবুতি বাড়বে, অন্যদিকে তার মনে এখলাস, স্বতঃস্ফুর্ততা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখা দেবে।

৬। সন্তানকে আল্লাহর দেখা ও পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত করা :

আল্লাহ বলেন, 'তিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দাঁড়ান ও নামাযীদের সাথে উঠা বসা করেন।' (সূরা শোআরা-২১৯)

তিনি বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদেরকে দেখেন।' (সূরা হাদীদ-৪)

যমীন ও আসমানে কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন নেই।' (সূরা আলে ইমরান-৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এহসান হচ্ছে ইবাদতের সময় মনে করবে যে তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি না দেখ নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।' (মুসলিম)

এ বিষয়ে আমরা **ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে গঠন** অধ্যায়ে সহল বিন আবদুল্লাহ তাসাত্তুরীকে তার মামা মোহাম্মদ বিন সেওয়ারের উপদেশ এর উপর আমল ও সবশেষে আল্লাহর নজরদারীর উপলব্ধির কারণে ঈমানের স্বাদ গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছি। তা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

গ) **চিন্তার সেতু বন্ধন** : কোন মুসলিমের কাণ্ডজ্ঞান ও ভালমন্দ পার্থক্য করার বয়স থেকে শুরু করে কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন ও পূর্ণ বয়সে পৌঁছার পর ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও রাষ্ট্র, কোরআনকে শাসনতন্ত্র ও আইন, ইসলামী আইনকে পদ্ধতি ও হুকুম, ইসলামের ইতিহাসকে আত্মা ও অনুকরণ, ইসলামী সংস্কৃতিকে সভ্যতা ও তমুদ্দুন এবং ইসলামী দাওয়াতকে আগ্রহ ও হিম্মত হিসেবে গ্রহণ করার নাম হচ্ছে চিন্তার সেতু বন্ধন।

চিন্তার এই খোরাকের সাথে যোগ হবে, ইসলাম সকল স্থান ও যুগের উপযোগী, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ইসলাম ও কোরআনের কারণেই মর্যাদার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল এবং দুশমনদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। আজও ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে। ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেন, 'আমরা এমন জাতি যারা ইসলামের কারণে মর্যাদা লাভ করেছি, আল্লাহ যে বিষয়ে ইজ্জত দেন তার বাইরের কিছু দিয়ে ইজ্জত চাইলে আল্লাহ অপমান করবেন।'

বর্তমান মুসলিম সমাজ ও দেশগুলোর দুর্বলতা ও পশ্চাদপসরণ এবং দ্বিধাবিভক্তি উপনিবেশবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ষড়যন্ত্রের ফসল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন 'শাসকরা যদি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত শাসন করে তাহলে আল্লাহ তাদের উপর শত্রুদেরকে বিজয়ী করবেন এবং তারা তাদের

হাতে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও শেষ করে দেবে। আর যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতকে কার্যকর না করে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে বিপদ ও দুর্যোগ সৃষ্টি করবেন।' (বায়হাকী)

তাই মুসলিম সরকার ও শাসকদের সজাগ হওয়া দরকার।

মোসনাদে আহমদ, বাজ্জার ও তায়ালেসী নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তোমাদের প্রথমাংশ নবুওয়্যত ও রহমত। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তা রাখবেন ও পরে তুলে নেবেন। তারপর নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত। তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন রাখবেন। পরে তুলে নিবেন। তারপর রাজতন্ত্র। তিনি যতদিন চাইবেন রাখবেন ও পরে তুলে নেবেন। এরপর আসবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন রাখবেন ও পরে তুলে নেবেন। তারপর আবার নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত আসবে। লোকেরা নবীর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে। ইসলামের ইনসাফ যমীনে ভরে যাবে। আসমান ও যমীনের সকল বাসিন্দা তাতে খুশী হবে। আসমান এক বিন্দু পানিও আটকে রাখবে না এবং যমীন কোন উদ্ভিদও বরকত প্রকাশ না করে ছাড়বে না।'

এ হাদীছের আলোকে দেখা যায়, এখন স্বৈরাচারী শাসনকাল চলছে। সামরিক বিপ্লব ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের তোয়াক্কা করে না। তুরস্কের স্বৈরাচারী কামাল আতাতুর্কসহ মুসলিম বিশ্ব ও বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসকেরা ফেনার বুদবুদের মতো বিলীন হয়ে গেছে। সর্বত্র ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেদীপ্যমান। যারা হতাশ তাদের বিরুদ্ধে কোরআন আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ খুব জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে আস। আসলে তারা খুব কমই যুদ্ধে যায়। তারা তোমাদের প্রতি কার্পণ্য করে। যখন ভয় ও বিপদ আসে, তখন (হে নবী) আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। তারপর যখন বিপদ চলে যায়, তখন তারা ধন সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মোমেন নয়। আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।' (সূরা আহযাব : ১৮-১৯)

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে বলে যে মুসলমানরা ধ্বংস হয়েছে, সে ব্যক্তিই তাদেরকে ধ্বংস করেছে।'

কেউ কি ধারণা করেছে যে সালাহউদ্দিন আইউবী খৃষ্টান ক্রুসেডারদের হাত থেকে হিত্তিন যুদ্ধে জেরুযালেমকে উদ্ধার করবেন এবং অত্যাচারী হালাকু খাঁকে আইনে জালুত নামক স্থানে মুসলিম বীর কোত্‌জ পরাজিত করবেন ? কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান মুসলিম সেনানীরা তা করেছেন। আজও মুসলিম নওজোয়ানরা সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম।

ঘ) **সামাজিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন :** ইতোপূর্বে সামাজিক শিক্ষা অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরের নেক সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করবো। তিনটি সম্পর্কের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

১। আধ্যাত্মিক মোরশেদ বা শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক ২. নেক সাথী ৩. দাওয়াতে দ্বীন ও দাঈর সাথে সম্পর্ক।

১) আধ্যাত্মিক মোরশেদ বা শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক :

সন্তান যদি নেক ও মোখলেস আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক রাখে, যিনি ইসলামের হাকীকত বুঝেন, আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করেন, ইসলামী আইন ও হুকুম মেনে চলেন এবং এজন্য কারো ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের তোয়াক্কা করেন না। তাহলে সে সন্তান ঈমান, চরিত্র, বুদ্ধি, এলেম, জেহাদ ও মজবুত আমল-আকীদার অনুসারী হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো এরকম শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক কম বরং উল্টোই পাওয়া যায়। তারা বিকৃত ইসলাম পেশ করে এবং বলে, ইসলামে শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি নেই। শাগরিদ অন্ধভাবে পীর-মুর্শিদের আনুগত্য করে তাকে গুনাহর উর্ধ্বে ভাবে। নিজেকে গুনাহগার মনে করে শেখের কাছে নিজের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করে এবং এগুলোকে বাইয়াতের অংশ মনে করে। শেখ তাকে আত্মশুদ্ধির কথা বলে, কিন্তু তার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধকে এড়িয়ে যায়। জুলুম-অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব উপেক্ষা করে। কোন কোন শেখ দাওয়াতে দ্বীনের কথা বলে, কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে না। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে ? তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করবে, দুনিয়াতে তার জন্য রয়েছে অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ করা হবে।' (সূরা বাকারা-৮৫)

অনুকরণযোগ্য আলেম বা শেখ কখনও সত্যকে গোপন করে না। অন্যায় দেখে চুপ থাকে না। কাউকে ভয় পায় না। কেননা তাহলে তিনি সত্য গোপনকারী হবেন। সত্য গোপনকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ বলেন, 'আমি মানুষের জন্য যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি এবং কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করা সত্ত্বেও যারা তা গোপন করে, নিশ্চয় সে সকল লোকের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও, কিন্তু যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদি সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।' (সূরা বাকারা : ১৫৯-১৬০)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের উপকারী জ্ঞান গোপন করে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।' (ইবনু মাজাহ্)

সুফী-মোরশেদদের বক্তব্য : শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা এবং কোরআন-হাদীস মেনে চলার ব্যাপারে আমরা এখন সঠিক ও হককানী মোরশেদ ও শিক্ষকদের মন্তব্য তুলে ধরবো।

আবদুল কাদের জিলানী (র) 'আল-ফতহুর রাব্বানী' গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, শরীয়ত যে সত্যকে স্বীকার করে না, তা কুফরী। আল্লাহর পথে কোরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে আসো। তাতে হাত ঢুকাও, দেখবে তোমার হাত রাসূলের হাতের সাথে।

তিনি আরো লিখেছেন, ইবাদত না করা কুফরী, নিষিদ্ধ কাজ করা গুনাহ, কোন অবস্থাতেই ফরজ বাদ যেতে পারবে না।

ইমাম সহল তাসাত্তুরী (র) বলেন, আমাদের তরীকার ৭টি মূলনীতি আছে। সেগুলো হলো : কোরআন আঁকড়ে ধরা, হাদীছের অনুসরণ, হালাল খাওয়া, কষ্ট না দেয়া, গুনাহ এড়িয়ে যাওয়া, তওবা করা ও অধিকার আদায় করা।

ইমাম আবুল হাসান শাজলী (র) বলেন, কোরআনও সুন্নাহর সাথে তোমরা কাশফের জ্ঞানের বিরোধ হলে কাশফ ছাড় কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধর। নফসকে বল, আল্লাহ কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আমার নিরাপত্তা রেখেছেন, কাশফের মধ্যে বা এলহাম ও মোশাহাদার মধ্যে নয়। ইমাম আবু সাঈদ খাররাজ (র) বলেন, প্রকাশ্য বিষয়ের বিপরীত সকল গোপনীয় জিনিস বাতিল। এ সকল

হককানী ও রব্বানী মোরশেদদের বক্তব্যে বাতেনী পন্থী বাতিল পীর-মুরশিদদের প্রতি হুঁশিয়ারী, শরীয়তকে বাতিল করে তরীকত ও মারেফতকে প্রাধান্য দেয়া কোরআন-হাদীসের উল্টা ব্যাখ্যা করা, তাদের সাথে উঠা বসা না করা এবং তাদের গোমরাহী থেকে দূরে থাকার আহ্বান সুস্পষ্ট।

আবু যায়েদ (র) বলেন, তোমরা যদি কাউকে বাতাসে চড়তে দেখ, তবুও তার কারামতে প্রতারিত হবে না। দেখবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ, শরীয়ত আদায় ও এর সীমানার হেফাজত করে কিনা।

ইমাম শারানী তাঁর 'ইয়াওয়াকিত ও জাওয়াহের' কিতাবে লিখেছেন, কেউ যদি শরীয়তের মানদণ্ড হাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিক্ষেপ করে, সে ধ্বংস হবে।

ইমাম ও মোরশেদ সানুসী মুসলমানদের সংশোধনের জন্য পরে মক্কায় একটি আস্তানা গড়েন পাহাড়ের পাদদেশে। তারপর মরুভুমিতে আস্তানা গড়েন। সেখানে কৃষি ও ফল-ফলাদির চাষ করে তাকে মরুদ্যানে পরিণত করেন। তারপর তাদেরকে যুদ্ধ ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দেন। ওসমানী খেলাফত যখন লিবিয়াকে ইটালির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে অপরাগ, তখন তিনি তার বাহিনী দিয়ে দীর্ঘ ২০ বছরে ইটালীর সৈন্যদের তাড়িয়ে দেন। এ জাতীয় জেহাদী সুফী বাহিনীর প্রয়োজন আছে।

আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর 'ইসলামের দাঈ'ও চিন্তাবিদ' বইতে লিখেছেন, আব্দুল কাদের জিলানীর (র) মজলিসে ৭০ হাজারের অধিক ছাত্র অংশ নিত, তাঁর হাতে ৫ হাজার ইহুদী-খৃষ্টান মুসলিম এবং ১ লাখের বেশী পাপী লোক তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে। তারা সংশোধিত হয়েছে এবং শেখ তাদের তদারকী ও পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি অনেককে দেশ বিদেশে দ্বীনের দাওয়াত, শিরক ও বিদয়াত এবং জাহেলিয়াত থেকে দূরে রাখার কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি তথাকথিত পীর ছিলেন না।

তুরস্কের বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী তার ব্যক্তিত্বের প্রতি ছাত্রদের অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেন যে, আমি মরে যাবো, তাই তোমরা কোরআন ও হাদীছকেই বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, আমি নিষ্পাপ নই। যে কোন সময় আমার কোন পদস্খলন বা গুনাহকে হক মনে করে বসে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ফোদাইল বিন আয়াদ মক্কার হারামে ইবাদতে মগ্ন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। আবদুল্লাহ বিন মোবারক তাকে তিরস্কার করে লেখেন, আমরা জেহাদে ব্যস্ত আর

তুমি ইবাদতের নামে খেল-তামাশা করছ। ইবনে মোবারক তখন সিরিয়ায় জেহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফোদাইল চিঠি পেয়ে কাঁদলেন এবং বললেন, আমার ভাই যথার্থই বলেছে।

এ জাতীয় আল্লাহ ভক্ত আলেম ও মোরশেদের সাহচর্য চাই ।

২) সন্তানের নেক সাথী : ভাল মোরশেদ ও নেক বন্ধু প্রাপ্তি যেন যুগপৎ হয়। তা না হয় ভালো মোরশেদের শিক্ষা খারাপ বন্ধুদের সংমিশ্রণে স্থায়ী হবে না। সন্তান খারাপ হতে থাকবে। তাই দু'টোর পূর্ণতা বিধান করতে হবে।

সন্তানের জন্য চার ধরনের সাহচর্য দরকার :

১। ঘর ২। পাড়া বা মহল্লা ৩। মসজিদ ৪। বিদ্যালয় বা কর্মস্থল

১। ঘর : ঘরের সাহচর্য বলতে বুঝায় ভাই বেরাদর ও নিকটাত্মীয়। সন্তানের প্রথম সাক্ষাৎ এদের সাথেই হয়। আর এদের কাছ থেকেই তার অনেক কিছু শেখার আছে। বড় ভাই-বোন ছোটদের জন্য অনুকরণীয়। তারা খারাপ হলে ছোটরা খারাপ কিছুই শিখবে এবং তাদের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। খারাপ ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়ের সাহচর্য থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে হবে। আর ভাল ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয় থাকলে তাদের সাথে সন্তানকে চলতে দেয়া উচিত।

পাড়া ও মহল্লার সাথী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এখানেও ভাল এবং মন্দেরও সাথী আছে। মন্দের থেকে দূরে ভালদের সাথে চলতে দেয়া জরুরী।

মসজিদে জামায়াতে নামায, জুমার নামায এবং বিভিন্ন দ্বীনি আলোচনায় সন্তানদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হবে। কোন সন্তান মসজিদে গেলে তার ঈমান-আমল আল্লাহর আনুগত্য ও দ্বীনের প্রতি ভালবাসা আছে বলে বুঝা যাবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে। মহল্লার ভাল সাথী ও মসজিদের সাথী অভিন্ন। যে সাথীটি মসজিদে যাবে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

বিদ্যালয় ও কর্মস্থলের সাথীর বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভ্রান্ত ও কুফরী মতবাদ এবং চিন্তাধারা বিরাজ করছে। বিভ্রান্ত শিক্ষকরাই সেগুলো আমদানী করছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বাতিল রাজনৈতিক মতাদর্শের পতাকাবাহী রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে। কিছু ভ্রান্ত মহিলা সংগঠনও নারী স্বাধীনতার নামে পবিত্রতা সূচিতার প্রতীক পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। তারা পুরুষের সাথে নারীর সম-অধিকারের নামে শ্লোগান দিয়ে মুসলিম

তরুণীদের বিভ্রান্ত করছ। তারা তরুণদের লালসার শিকার। যুবতীদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

এ সকল ভ্রান্ত মত ও পথ এবং সংস্থা ও সংগঠন থেকে সন্তানদের দূরে রাখতে হবে। বরং এর বিপরীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামপন্থী ছাত্র ও ছাত্রী সংগঠন রয়েছে, সেগুলোর সাথে সন্তানদেরকে জড়িত করতে হবে। তা না হলে তারা বাতিল মতাদর্শের স্রোতে ভেসে যাবে।

কল-কারখানা অফিস আদালত ও কর্মস্থলেও চরিত্রহীন সাথীর অভাব নেই। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠন। যেগুলোর কোন নীতি নৈতিকতা এবং আদর্শ নেই। তারা মদ, জুয়া, মাদকতা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ভাল সাথী খুঁজে বের করতে হবে।

৩) দাওয়াতে দ্বীন ও দাঈর সাথে সম্পর্ক : সন্তানের মনে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার সাহস ও ধৈর্য সবর সৃষ্টি করতে হবে যেন সে এ পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করে। ভাল-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে পৌঁছলে তার মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ, মানুষের হেদায়াত ও জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে যেন সে আল্লাহর পথের একজন অকুতোভয় সৈনিক হতে পারে। সন্তানকে আল্লাহর দ্বীনের দাঈ বানাতে হলে ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে হবে।

ক) মানসিক প্রস্তুতি : সন্তানকে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি, বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাঙ্গন, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা, যায়নবাদী, ক্রুসেডীয়, ধর্মনিরপেক্ষ ও কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের হতাশা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে যেন সে দ্বীনের দাওয়াত ও জেহাদের জন্য তৈরী হতে পারে।

খ) উদাহরণ পেশ : সন্তান গঠনকারী ও আধ্যাত্মিক মোরশেদের কাজ হলো, সন্তানকে দাওয়াতে দ্বীন ও জেহাদের জন্য আকৃষ্ট করা যেন আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করতে পারে। এজন্য দু'ধরনের উদাহরণ পেশ করতে পারেন; ১। যে উদাহরণ দ্বারা হতাশা দূর হয় ও আশাবাদ সৃষ্টি হয়। যেমন রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর এবং আবু বকরের খেলাফতের সূচনালগ্নে লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, কিছু লোক মোরতাদ হলো, জাহেলিয়াতের মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে

উঠল, কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করল, নামায থেকে বিরত রইল, আয়েশার (রা) ভাষায়, মুসলমানরা বৃষ্টিমুখর রাতে ভেজা বকরীর মতো অসহায় অবস্থায় পৌঁছল। কেউ কেউ খলিফা আবু বকরকে বলল, আপনার পক্ষে গোটা আরবের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। ঘরে বসে থাকুন এবং আমৃত্যু আল্লাহর ইবাদত করুন।

কিন্তু নির্ভীক আবু বকর হতাশ নন। তিনি আল্লাহর সাহায্যের উপর বিশ্বাসী। তিনি ওমারের মুখে সাগরের মতো ফুঁসে এবং সিংহের মতো গর্জন করে উঠেন। তিনি বলেন, জাহেলিয়াত যুগের বীর কি ইসলামে দুর্বল উটের ভূমিকা পালন করবে ? রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালে অহী বন্ধ হয়েছে ঠিক। আল্লাহর কসম, আমার হাতে যতক্ষণ তলোয়ার আছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়বো। যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো। অহী পরিপূর্ণ হয়েছে। আমি জীবিত থাকতে দ্বীন কি সংকুচিত হবে? আল্লাহর শপথ, কেউ যদি উট কিংবা উটের রশি দিতেও নিষেধ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো। ওমার (রা) মন্তব্য করেন, আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের বক্ষ বিস্তীর্ণ করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হক।

এভাবে আবু বকর (রা) নিজ ঈমানের বলিষ্ঠতা ও জেহাদী মনোভাব দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন।

২) যে উদাহরণ বাধার পাহাড়কে ডিঙিয়ে ত্যাগ-কোরবানীর উৎসাহ যোগায়; যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন। এতে তাঁরা দুর্বল হননি। বরং তাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। পরবর্তীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুবসহ আরো বহু মনীষী অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন।

'আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। তাদের হেদায়েতের অনুসরণ কর।' (সূরা আল-আনায়াম-৯০)

গ) সন্তানের কাছে দাওয়াতে দ্বীনের ফজিলত বর্ণনা করা :

আল্লাহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করার জন্য এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।' (সূরা আলে ইমরান-১১০)

দা'ঈগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সফল। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন হবে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে। আর তারাই হবে সফল।' (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

দাওয়াতে দ্বীনের কাজ হচ্ছে সম্মান, মর্যাদা ও নেক আমল। আল্লাহ্ বলেন, 'তাদের চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।' (সূরা হা-মীম-সাজদাহ্-৩৩)

নবী (সা) বলেন, দাঈ' ব্যক্তি তার অনুসারীদের আমলেরও সমান সওয়াব পাবে। তবে অনুসারীদের সওয়াবের কোন ঘাটতি করা হবে না।' (মুসলিম)

সমাজে দাঈ ব্যক্তির হেদায়েত ও নেক কাজের প্রভাব সুদূর প্রসারী। রাসূল (সা) বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ, তোমার হাতে একজন ব্যক্তির হেদায়েত লাভ মূল্যবান লাল উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।' (বোখারী)

ঘ) দাওয়াতের অনুসৃত মূলনীতি :

১। যে বিষয়ে দাওয়াত দেয় বা নিষেধ করে, সে বিষয়ে হুকুম জানতে হবে, যেন তা শরীয়তের হুকুম মোতাবেক হয়। আল্লাহ্ বলেন, 'যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি সমান?' (সূরা যোমার-৯)

২। কথা ও কাজ এক রকম হতে হবে, তাহলে লোকেরা তার দাওয়াত কবুল করবে। যারা দুর্ভাগা তারাই কেবল কথার বিপরীত কাজ করে। তারা বোকা যারা মানুষকে উপদেশ দেয় আর নিজেদেরকে ভুলে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা যা বল, সেরূপ কেন করো না ? তোমরা যা করো না তা অন্যকে বলা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।' (সূরা সফ : ২-৩)

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা লোকদেরকে নেক কাজের আদেশ কর, অথচ নিজেদেরকে ভুলে গেছ এবং তোমরা আল্লাহ্র কিতাবও পাঠ কর। তোমাদের কি বিবেক নেই ?' (সূরা বাকারা-৪৪)

৩। মন্দকাজটি সর্বসম্মতভাবে মন্দ হতে হবে। যেন এর মাধ্যমে লোকেরা বিবাদ-বিসম্বাদের মুখোমুখি না হয়। যদি ইজতেহাদী কোন বিষয় হয় এবং যাতে মতভেদের সম্ভাবনা রয়েছে-সেটাকে মন্দ বলা যাবে না।

৪। পর্যায়ক্রমে মন্দের প্রতিকার করতে হবে। প্রথমে উপদেশ, পরে আল্লাহ্র ভয়

প্রদর্শন, তারপর হুমকি, এরপর কড়া কথা এবং শেষ পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৫। বিনম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে লোকদেরও মন জয় কতে পারবে।

৬। কষ্টের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা; অজ্ঞ-মূর্খ ও বোকা লোকের কথা শুনে যেন হতাশা দেখা না দেয় সেজন্য ধৈর্য দরকার। লোকমান নিজ সন্তানকে উপদেশ দেন, 'হে সন্তান, নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ কর, বিপদ-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ কর। এটা দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্ভুক্ত।' (লোকমান-১৭)

ঙ) নির্দেশনা থেকে বাস্তবায়ন : সন্তানকে সামাজিক ও দাওয়াতী কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাকে একজন মোখলেস দাঈর সংস্পর্শে রেখে দাওয়াতের মূলনীতি ও বাস্তব দিকগুলো শিক্ষা দিতে হবে।

এরপর তাকে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে সংশোধন ও হেদায়েতের ট্রেনিং দিতে হবে। এ সময় মোরশেদ বা পর্যবেক্ষক ছাড়াই তাকে অন্যদেরকে দাওয়াত দিতে হবে।

চ) ব্যায়ামের সাথে সম্পর্কিত করা :

ইসলাম সন্তানের স্বাস্থ্যের হেফাজতের লক্ষ্যে তাদের অবসর সময়কে সময়-সুযোগ মত জেহাদী তৎপরতা সামরিক কাযক্রম ও শারীরিক ব্যায়ামের দিকে পরিচালনার নির্দেশ দেয়। ইসলাম একই সময় জরুরী বিষয় ও নির্দোষ খেলা–ধুলা এবং শরীর ও আত্মার প্রয়োজন পূরণ করে। সন্তানের দেহ ও আত্মার বিকাশ সাধন এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করা জরুরী। এর মাধ্যমে তার অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার, রোগ শোক থেকে মুক্ত এবং শৈশব থেকেই ব্যায়াম ও জেহাদী কার্যক্রমের অভ্যাস তৈরী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'শক্তিশালী মোমেন আল্লাহর কাছে দুর্বল মোমেন অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়তর।' (মুসলিম)

কোরআন মজীদে শত্রুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার শক্তি অর্জনের নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া হাদীসে তীর নিক্ষেপ, সাঁতার কাটা, টার্গেট নির্ধারণ করে চলা ও ঘোড়া সওয়ারের নির্দেশ রয়েছে। তাই বলে সন্তান সীমাহীন ব্যায়ামে জড়িয়ে থাকবে না। বরং সেগুলো সীমিত হতে হবে। এর সীমারেখাগুলো এরূপ ঃ

১। ভারসাম্য ঃ অন্য কাজ বা দায়িত্ব বাদ দিয়ে ব্যায়াম বা খেলাধুলায় বেশী জড়িয়ে পড়বে না। যেমন নামায হচ্ছে আল্লাহর অধিকার। এটা বাদ দিয়ে সে ফুটবল খেলা, কুস্তি প্রতিযোগিতা, সাঁতার কিংবা তীর নিক্ষেপ করবে না। অনুরূপ লেখাপড়া মাতা পিতার অধিকার এবং দাওয়াত ও তাবলীগ বাদ দিয়েও সে সারাক্ষণ ব্যায়াম ও খেলাধুলায় মশগুল থাকবে না।

২। আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলা : ব্যায়াম, জেহাদী তৎপরতা ও সামরিক প্রস্তুতির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে-

ক) পোশাক নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকতে হবে। কোন অবস্থায় সতর খোলা রাখা যাবে না। আবু আইউব আনসারী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'হাঁটুর উপরের অংশ সতর। নাভী ও হাঁটুর উপরের মধ্যবর্তী অংশ সতর।' (দারু কুতনী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আলীকে (রা) বলেন, 'তোমার হাঁটুর উপরের অংশ খোলা রাখবে না এবং জীবিত ও মৃত ব্যক্তির উরুর দিকে তাকাবে না।' (আবু দাউদ, হাকেম, বাজ্জার)

খ) ব্যায়াম যেন সন্দেহজনক স্থানে না হয়। নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিশ্চয়ই হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট, তবে এ'দুয়ের মাঝে অনেক সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেকেই জানে না। যে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, সে নিজ দ্বীন ও ইজ্জত বাঁচাল। আর যে তাতে পতিত হলো সে হারামের মধ্যে নিমজ্জিত হলো।' (বোখারী ও মুসলিম)

একই অর্থে আয়েশা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন অভিযুক্ত হওয়ার মতো কাজ না করে।"

আজকাল তথাকথিত সুইমিংপুলে নারী-পুরুষের অর্ধোলঙ্গ গোসল কিংবা ফুটবল ও কুস্তিতে সতর খোলা, বিভিন্ন ব্যায়ামের ক্লাবে মদের আড্ডা অবশ্যই নিন্দনীয়।

(গ) হালাল জিনিস দ্বারা ব্যায়ামের পুরস্কার দেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'উট, ঘোড়া ও তীর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।' (নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

এই হাদিসে পুরস্কারের জন্য দু'টো শর্ত বুঝা যায়।

(ক) ঘোড়া, উট, তীর নিক্ষেপসহ আধুনিক যোদ্ধাস্ত্রের প্রতিযোগিতা হতে হবে যা জেহাদের জন্য জরুরী।

(খ) পুরস্কারের অর্থ প্রতিযোগীদের বাইরের কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দেবে কিংবা দু'জনের একজন প্রতিযোগী দেবে। উভয় প্রতিযোগী দেয়ার পর যদি কেবলমাত্র বিজয়ী প্রতিযোগী তা নিয়ে নেয়, সেটা হবে জুয়া। নবী (সা) এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে রাষ্ট্র, মন্ত্রণালয়, স্কুল বা সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কার দেয়া হলে তা নিষিদ্ধ হবে না। আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ঘোড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দেন।" (আহমাদ)

৩. সন্তানের নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। তাকে বুঝাতে হবে যে, ব্যায়াম, শরীর গঠন ও সামরিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাক আসলে যেন সাড়া দিতে পারে এবং কোন দুর্বলতা প্রদর্শন না করে। এটা বুঝাতে পারলে সন্তান দৈনন্দিনের ট্রেনিং ও ব্যায়ামকে লক্ষ্যহীন খেলা-তামাশা মনে করবে না। ওলামায়ে কেরামের মতে, 'নেক নিয়ত সাধারণ অভ্যাসের কাজকে ইবাদতে রূপান্তরিত করে।'

২. সন্তান গঠনের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো– হুঁশিয়ারী :

খারাপ জিনিসের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। এর ফলে, সন্তানের মন-মগজে খারাপ চেতনা ও বাতিল মতাদর্শ প্রবেশ করবে না। ফলে তার মধ্যে এখলাস ও বিশুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হবে। বরং ঈমান তার মস্তিষ্ককে বাতিল থেকে হেফাযত করবে এবং ভ্রান্ত লোকদের থেকে বিরত রাখবে।

সর্বদা হুঁশিয়ার করতে থাকলে সন্তানের অন্তরে মন্দ ও ফ্যাসাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং বাতিল ও গোমরাহী থেকে তাকে দূরে রাখবে। বাতিল জিনিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে।

আমরা কোরআন হাদীস অধ্যয়ন করলে মন্দের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী নীতি দেখতে পাই।

আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, "আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিওনা, তাহলে নিন্দিত ও লজ্জিত হবে।" (সূরা বনি ইসরাইল-২২)

"তোমরা খাদ্যাভাবের কারণে সন্তান হত্যা করো না। আমরাই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযক দেই। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা বিরাট অন্যায় ও গুনাহ।" (বনি ইসরাইল-৩২)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমরা বেচা-কেনায় অধিক হারে কসম করো না। তা নেফাক ও ধ্বংসশীল।" (মুসলিম, আহমাদ)

হুঁশিয়ারীর এই নীতি কোরআন সুন্নাহসম্মত। যেসব বিষয় থেকে হুঁশিয়ার করতে হবে তা হলো :

১) মোরতাদ হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

(ক) মোরতাদের কতগুলো লক্ষণ আছে। সাম্প্রদায়িকতার স্লোগানকে চূড়ান্ত মনে করা, সেটাকে চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো এবং সেজন্য লড়াই করা। এটাই জাহেলী গোত্র ও বর্ণবাদ, ইসলাম যাকে নিষিদ্ধ করেছে। নবী (সা) বলেন, যে গোত্র ও বর্ণবাদের আহ্বান জানায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; যে গোত্র ও বর্ণবাদের উপর মৃত্যুবরণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(খ) জাতীয়তাবাদ : যে ভৌগলিক জাতীয়তাকে একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করে এবং সেজন্য লড়ে। আল্লাহ নিজ ভূখণ্ডের প্রতি অতি মাত্রায় প্রেমিকদের বলেন, "আমরা যদি তাদের উপর আত্মহত্যাকে ফরয করতাম কিংবা নিজ নিজ ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতাম, তাহলে তাদের কম সংখ্যকই তা করত। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যদি তা করত, তাহলে তা তাদের জন্য অনেক ভাল ও মজবুত হত।" (সূরা নিসা-৬৬)

(গ) মানবতার স্লোগান : এটা ইহুদী খৃস্টানদের তৎপরতা। আল্লাহতো সকল মানুষের সাথে পরিচিতি ও সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আলাদা করে শুধু মানবতার স্লোগানের কোন অর্থ হতে পারে না। যেকোন স্লোগানের লক্ষ্য যদি আল্লাহর সন্তোষ লাভ এবং ঝাণ্ডা দ্বীনের বুলন্দ করা না হয় তাহলে সেটাই জাহেলিয়াত। আর সেজন্য লড়াই করলে সে মুসলিম থাকে না।

(ঘ) গায়রুল্লাহর জন্য শাসন ক্ষমতা, আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করা : আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন ও ফয়সালা করে না তারা কাফের।" (মায়েদাহ-৪৪)

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ, ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানিও না, তারা এক অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা মায়েদাহ-৫১) আদী বিন হাতেম মুসলমান হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে প্রবেশ করেন। তার কাঁধে ছিল রূপার ক্রুশ। তখন নবী (সা) কোরআনের এই আয়াতটি পড়েন। 'তারা তাদের পাদ্রী ও বৈরাগী ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহ ব্যতীত রব বানিয়েছে।" (সূরা তওবাহ-৩১) আদী বলেন, খ্রিস্টানরাতো তাদের ইবাদত করে না। নবী (সা) বলেন, "তারা হালাল কে

হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে। আর তারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে। এটাই তাদের ইবাদত।" (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)

(ঙ) ইসলামের কোন বিধানকে অপছন্দ করা। যেমন এরূপ বলা, আমি রোযা অপছন্দ করি, কেননা, তা জাতির অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেয়। অথবা আমি পর্দা কিংবা ইসলামের অর্থনীতিকে অপছন্দ করি ইত্যাদি। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করে দেবেন।" (সূরা মোহাম্মদ-৮-৯)

(চ) দ্বীনের কোন অংশ বা নির্দেশকে অস্বীকার করাঃ আল্লাহ বলেন, "মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহতো অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো হাসি–ঠাট্টা করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুমের সাথে এবং রাসূলের সাথে ঠাট্টা করেছিলে? ছলনা করো না, তোমরা কাফের হয়ে গেছো ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ তারা ছিল গুনাহগার।' (সূরা তওবা : ৬৩-৬৫)

(ছ) আল্লাহর হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করা : আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বেরিয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের কল্যাণ হবে না।" (সূরা নাহল-১১৬)

(জ) ইসলামের কিছু অংশকে বিশ্বাস এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করা : ইসলাম হচ্ছে একটি জীবন ব্যবস্থা ও আইন। এতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার দিক রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করবে? যে এরূপ করবে, তার শাস্তি হলো, দুনিয়াবী জিন্দেগীতে অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা বাকারাহ-৮৫)

(ঝ) শুধু কোরআনের উপর ঈমান আনা এবং হাদীসকে অস্বীকার করা : আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেন, "আল্লাহর শপথ, তারা মোমেন নয়, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদে আপনাকে বিচারক না মানে, এবং আপনার ফয়সালায় অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ না করে ও তা পূর্ণ মেনে নেয়।" (সূরা নিসা-৬৫)

রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহ বলেন, "যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (সূরা নিসা-৮০)

মেকদাদ বিন মাদীকারাব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কোন লোকের কাছে আমার হাদীস পৌঁছাবে- সে তখন খাটের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থেকে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব আছে। আমরা তাতে যা হালাল পাই তাকে হালাল এবং যা হারাম পাই তা হারাম মানবো। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল যা হারাম করবেন তা আল্লাহর হারামের মতোই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমাকে কিতাব ও এর মতো আরেকটি বিষয় দেয়া হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর-৪৭)

(ঞ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোন কাজের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা : যেমন তার বহু বিবাহের সমালোচনা করা। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কাছে তার স্বর অপেক্ষা জোরে কথা বলো না এবং নিজেদের মতো তার সামনে জোরে কথা বলো না। এতে করে তোমাদের আমল বাতিল হয়ে যাবে, তোমরা টেরও পাবে না।" (সূরা হুজুরাত-২) যেখানে জোরে কথা বলা ধর্ম ত্যাগের মধ্যে পড়ে, তাহলে সমালোচনা কিসের মধ্যে পড়ে?

(ট) কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী সংঘর্ষমুখর দু'টো দিক আছে। এলহামের মাধ্যমে অল্প কিছু লোক মাত্র তা জানে, অন্যরা জানে না। এর দ্বারা শরীয়তকে বাতিল করাই উদ্দেশ্য। কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, যার অর্থ বুঝা যায়। তাই জাহেরী এক অর্থ এবং বাতেনী আরেক অর্থ বলতে কিছু নেই।

(ঠ) আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা। যেমন, আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেন। কিংবা তার অনুপযোগী কোন গুণের ধারণা পোষণ করা। এরকম চিন্তা-ভাবনা কুফরী। আল্লাহ বলেন, "তার মত কোন কিছু নেই। তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও দ্রষ্টা।" (সূরা শূরা-১১)

আল্লাহ বলেন, "যারা বলে ঈসা (আ) আল্লাহ, তারা কুফরী করে।" (সূরা মায়েদাহ-১৭)

"তারা কুফরী করে যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক।" (সূরা মায়েদাহ-৭৩)

"আল্লাহ তাদের কথা শুনেন যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফকীর এবং আমরা ধনী।" (সূরা আলে ইমরান-১৮১)

আল্লাহ আমাদেরকে এই দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন :

"হে আমাদের রব, হেদায়াত দানের পর আমাদেরকে গোমরাহ করবেন না। আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি দাতা।" (সূরা আলে ইমরান-৮)

২) কুফরী ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

নাস্তিকতা, আল্লাহর অবতীর্ণ আইন-বিধান ও শরীয়তকে অস্বীকার করা এবং যে কোন আসমানী মূল্যবোধ ও মর্যাদাকে না মানা। বড় বড় দেশগুলো নাস্তিকতাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং অন্যদের উপর জোরপূর্বক তা চাপিয়ে দিচ্ছে। কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র নাস্তিক্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন সময় তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে, ইসলামই প্রথম সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে। আবার বলে, ধর্ম এক জিনিস আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্য জিনিস। আবার বলে, ধর্ম আফিম সদৃশ। ফ্রয়েডের মতবাদে সকল আচরণকে যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম-দর্শন ও মতবাদ গ্রহণ করা কুফরী ও নাস্তিকতা। আল্লাহ বলেন, "তাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বধির ও অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন।..... কেননা, তারা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী বিষয়ের অনুসরণ এবং তার সন্তোষকে অস্বীকার করেছে। ফলে, আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।" (সূরা মোহাম্মদ-২৩-২৮)

ইসলামে কোন মুসলমানের ধর্ম ত্যাগ ও নাস্তিকতার কঠোর শাস্তি ও বিধান রয়েছে। ইসলাম তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।" (বোখারী, আহমাদ)

"তিন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা যায় না। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী, ২. ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ও ৩. দ্বীন ও মুসলিম জামায়াত ত্যাগকারী।" (বোখারী, মুসলিম)

কোন মুসলমান মোরতাদ ও নাস্তিক হলে, তাকে তিন দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হবে এবং বিষেজ্ঞরা ধর্ম ত্যাগ বা নাস্তিকতার কারণ জেনে তার বিভ্রান্তি দূর করার ও বুঝাবার চেষ্টা করবেন। এরপরও সংশোধন না হলে তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হবে।

নাস্তিকরা কোন দল বা সংগঠন গড়ে তুললে, মুসলিম শাসকের কর্তব্য হলো, সত্যের দিকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যেমন, আবু বকর সিদ্দিক (রা) মোরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা মাহদী করেছিলেন খোরাসানে ঈশ্বরের দাবীদার মোকান্নার বিরুদ্ধে। সে ১৬৯ হিজরীতে অনুসারীদের জন্য নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ বাতিল করে দিয়েছিল এবং লোকদের জন্য অর্থ-সম্পদ ও নারীকে হালাল করে দিয়েছিল।

ইসলাম মোরতাদের বিরুদ্ধে তিন কারণে কঠোর শাস্তির আরোপ করেছে। ১. দুর্বল মনের লোকেরা যেন কোন লোভ-লালসার স্বীকার না হয়, ২. কোন মুনাফেক যেন মুসলিম হয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে না যায় ও ৩. কাফেরদের শক্তি যেন বৃদ্ধি না পায় ও মুসলিম উচ্ছেদে উৎসাহ না পায়।

৩) হারাম খেলাধুলা ও গানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

ইসলামী শরীআত মুসলমানদের জন্য চারিত্রিক, সামাজিক ও মর্যাদা হানিকর কিছু খেলাধুলা হারাম করেছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. চওশর বা নরদ (টেবিল) এর খেলা : এটা বাজি ধরে কিংবা নির্দোষ বিনোদনের জন্য হোক, সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। বোরায়দার বর্ণনায় নবী (সা) বলেন, যে দু'ব্যক্তি বড় টেবিলে গুটি ও গুটি সদৃশ উপকরণ দিয়ে খেলায় মশগুল হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্ত-মাংসে রঞ্জিত করে। (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ)

আবু মূসা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি নরদ ও চওশর খেলে, সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করে। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মোয়াত্তা) (এটা সম্ভবত দাবা বা এ জাতীয় কোন খেলা হবে।)

এটা হারাম হওয়ার কারণ হলো, বাজি ছাড়া হলেও খেলোয়াড়দের বহু সময় নষ্ট হয় যা তাদেরকে বহু দ্বীনি, শিক্ষাধর্মী ও দুনিয়াবী কর্তব্য থেকে বিরত রাখে। আর যদি বাজি বা অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তা হবে জুয়া এবং তা হারাম। মুসলমানকে দুনিয়ায় বিশেষ আমানত ও মিশনসহকারে পাঠানো হয়েছে। তার কি

এরকম হারাম খেল-তামাশায় সময় নষ্ট করার মতো সময় আছে? সময়ের চাইতে কর্তব্য বেশি। সময় হচ্ছে তলোয়ারের মতো। তুমি তাকে দিয়ে না কাটলে সে তোমাকে কাটবে। নবী (সা) সকল মুসলমানকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'পাঁচটা বিষয়ের আগে ৫ টা বিষয়ের মূল্য বুঝ। ১. মৃত্যুর আগে জীবন, ২. অসুখের আগে স্বাস্থ্য, ৩. ব্যস্ততার আগে অবসর সময়, ৪. বার্ধক্যের আগে যৌবন এবং ৫. অভাবের আগে প্রাচুর্য।" (সনদ সহীহ, হাকেম)

এর আওতায় অন্যান্য অনেক খেলা-ধুলা হারাম হয়ে যায় যেগুলোর সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

২. গান-বাজনা শুনা : বাজনাযুক্ত গান হারাম। চাই গানটি মোবাহ বা ভাল হোক না কেন। যে গান যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে, তাও হারাম। যে গানে কোন নারীর রূপ-লাবণ্য কিংবা কুফরী শ্লোগান ও ভ্রান্ত নীতির বর্ণনা থাকে তাও হারাম। মালেক বিন আনাস বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গায়িকার গান শুনার জন্য বসে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার কানে গলানো সিসা ঢেলে দিবেন।" (ইবনে আসকেরের তারীখ গ্রন্থ এবং ইবনে সারসারির আমালী গ্রন্থ)

তিরমিযী আলী (রা) এর বরাত দিয়ে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। যখন আমার উম্মতের মধ্যে ১৫টি দোষ দেখা যাবে, তখন তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। "যখন গনীমতের মালকে লোভনীয় সম্পদ, আমানতকে গনীমতের মাল ও যাকাতকে জরিমানা মনে করবে, যখন ব্যক্তি স্ত্রীর আনুগত্য করবে ও মায়ের নাফরমানী করবে, বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার ও পিতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, মসজিদে জোরে কথা বলবে, গুনাহগার ও ফাসেক লোক কওমের নেতৃত্ব দিবে, কওমের নেতা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে, অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ফাসেক ব্যক্তির সম্মান করবে, মদ পান করবে, রেশমী কাপড় পরবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করবে, উত্তরসূরী উম্মত পূর্বসূরীদেরকে অভিশাপ দিবে, তখন লাল বায়ু কিংবা ভূমি ধ্বস অথবা চেহারা বিকৃতির অপেক্ষা করবে।

মোসাদ্দাদ ও ইবনে হিববান আবু হোরায়রার বরাতে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। শেষ যামানায় আমার উম্মতের একটি দলকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হবে। সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কি মুসলমান? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারা আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই ও আমি আল্লাহর রাসূল

একথার সাক্ষ্য দেবে এবং রোযাও রাখবে। তারা প্রশ্ন করেন, তাহলে ব্যাপার কি? তিনি বলেন, তারা বাজনা, গায়িকা, ঢোল ও মদ উপভোগ করেছে। রাত্রে মদ পান ও তামাশায় ব্যস্ত, সকাল বেলায় বিকৃত হয়ে গেছে।"

জায়েয গান : ফেকাহবিদদের মতে, সে সকল গান জায়েয, যা কঠিন কাজ করার জন্য উৎসাহ জোগায়, নির্মাণ ও খনন কাজে আনন্দ দান করে, উট চালানোর জন্য বেদুইনদের গান ও অশ্লীলতা মুক্ত গান। মদ, প্রেম-ভালবাসা, কারো নিন্দামূলক গান নাজায়েয। কোন সুনির্দিষ্ট নারীর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা না করলে ওই জাতীয় কবিতা-গান জায়েয। নবী (সা) আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন, মসজিদে নববী নির্মাণ, হোনাইন যুদ্ধে গানের দুই একটি কলি গেয়েছেন। অপরদিকে, কা'ব বিন যোহাইর নিজ কবিতায় নবী (সা) এর প্রশংসায় রূপকভাবে এক নারীর গুণ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও শিশুদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মহিলাদের গান, পুরুষরা যেন নারী কণ্ঠ না শুনে বিয়েতে সে জাতীয় নির্দোষ গান, ফল-ফুল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাকারী গান জায়েয।

নির্দোষ ও ভাল গান বাদ্যযন্ত্রের সাথে গাইলে তা নাজায়েয। বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার প্রমাণ হলো :

১. একটু আগে তিরমিযীতে বর্ণিত গযবের ১৫টি কারণের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র ১টি উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ইবনে হিববানে বর্ণিত। শেষ যামানায় একদল মুসলিমের বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার এক কারণ বাদ্যযন্ত্র বলা হয়েছে।

৩. আহমদ বিন হাম্বল, আহমদ বিন মোনাই ও হারেছ বিন উসামা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। "আল্লাহ্ আমাকে রহমত ও জগতের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বাদ্যযন্ত্র ও জাহেলিয়াত যুগে পূজিত দেবতা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।"

৪. বোখারী, আহমদ ও ইবনু মাজাহ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। "আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব সম্প্রদায় হবে যারা যেনা-ব্যভিচার, সিল্ক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।

গান-বাজনা হারাম হওয়ার কারণ :

গান-বাজনা ও রঙ্গমঞ্চের আনন্দ-অনুষ্ঠানে যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো বেশ্যাদের অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা, মদ পান, মদ পানকারীদের মুখ থেকে

চিৎকার, লজ্জা-শরমহীন শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার, বেআদবী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও পর্দাহীনতা, অর্ধনগ্ন ও উলঙ্গ প্রায় নাচ ও নর্তন কুর্দন। এগুলো হচ্ছে বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার কেন্দ্র। উপনিবেশবাদীরা আমাদের মধ্যে এ সকল জিনিস চালু করে গেছে। যেন মুসলিম উম্মাহ ভাল কোন কাজের আহ্বান জানাতে না পারে।

৩. সিনেমা, নাইটক্লাব ও টেলিভিশন : এগুলো ভাল ও চরিত্র গঠন কাজে ব্যবহার হলে ভাল। আর খারাপ ও চরিত্র বিধ্বংসী কাজে ব্যবহৃত হলে খুবই খারাপ। তখন সেগুলো হবে হারাম। আজ কাল এগুলোও ব্যবহার খারাপ কাজেই হচ্ছে। মাত্র ২/১টা ব্যতিক্রম। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো, গান-বাজনা, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার বিস্তার। ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের এ সকল কাজে ব্যস্ত দেখতে চায়।

৪. জুয়া খেলা : জুয়া হারাম। আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, বেদী ও ভাগ্য তীর শয়তানের অপবিত্র কাজ, ওগুলো থেকে দূরে থাক। তাহলে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। নিশ্চয় শয়তান জুয়া ও মদের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি তা থেকে বিরত হবে না?' (সূরা আল মায়েদাহ : ৯০-৯১)

জুয়া হারাম হওয়ার কারণ হলো, এটা মানুষকে আকর্ষিকতা, ভাগ্য ও শূন্য আশার উপর নির্ভরশীল বানায়, কাজের উপর নয়। এজন্য তাকে শরীরের ঘাম ঝরাতে হয় না। জুয়া আবাদ সংসার ধ্বংস করে, ভরা পকেট শূন্য করে, ধনী পরিবার গরীব হয় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেইজ্জত হয়। জুয়া শত্রুতা সৃষ্টি, হারাম উপায়ে অন্যের অর্থ খাওয়া, নামায ও যিকর থেকে বিরত রাখা এবং খেলোয়াড়কে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী বানায়।

বায়হাকী বর্ণনা করেন। নবী (সা) চওসর খেলায় মত্ত একদল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, "গাফেল মন, ব্যস্ত হাত এবং বেহুদা ও বাতিল কথা উচ্চারণকারী জিহ্বা।

জুয়া সময় নষ্টকারী ও গুনাহগার হবি, অলসতা ও অবসাদ সৃষ্টিকারী এবং উম্মাহকে কাজ ও উৎপাদন থেকে বিরতকারী জিনিস যা মানুষকে যে কোন উপায়ে অর্থ লাভের জন্য অপরাধী বানায়। সে চুরি, ডাকাতি, ঘুষ ও অর্থ আত্মসাৎ করে। জুয়া উদ্বেগ ও রোগ সৃষ্টি করে, স্নায়ুকে বিধ্বস্ত করে এবং

ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে আত্মহত্যা, পাগলামী ও মানসিক রোগ দেখা দেয়।

অনেক সময় লটারীর কুপন বিক্রয় করে সে অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। এটাও হারাম। কেননা, ইসলামে লক্ষ্য ও তাতে পৌঁছার উপকরণ হালাল হওয়া জরুরী। হালাল লক্ষ্যের জন্য হারাম উপায়ও হারাম। দু'পক্ষের কেউ যদি কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বাজি রাখে অর্থাৎ জয়ী হলে ঐ অর্থ পাবে এ মর্মে শর্ত করে, তাও জুয়া। তবে তৃতীয় পক্ষ পুরস্কারের অর্থ দিলে তা জায়েয। নবী (সা) বলেন, "উট, ঘোড়দৌড় ও তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা ছাড়া পুরস্কার দেয়া যাবে না।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

বৈধ খেলা-ধুলা :

ইসলাম বৈধ ও নির্দোষ খেলাধুলাকে হালাল করেছে। এর মাধ্যমে বিনোদন ও আনন্দ লাভ করে কর্তব্য কাজে আরো বেশী তৎপর হবে। এ মর্মে আলী (রা) বলেন, "শরীরের মতো মনও ক্লান্ত হয়। মনের খোরাকের জন্য কৌতুক ও বিজ্ঞ কথাবার্তা খোঁজ কর।"

তিনি আরা বলেন, "মনকে মাঝে মাঝে আনন্দ দান কর। মন ক্লান্ত হলে অন্ধ হয়ে যায়।"

বোখারী আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা খরবুজা নিক্ষেপ করে খেলতেন'। তবে খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য বেশী সময় ব্যয় করা যাবে না। প্রবাদ আছে, 'বিনোদনে সে পরিমাণ সময় ব্যয় কর, তরকারীতে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহার হয়।'

হালাল খেলা-ধুলা হচ্ছে :

(ক) দৌড় প্রতিযোগতা : সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন এবং নবী (সা) তা অনুমোদন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগতা করেছেন। আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, "আমি দৌড় প্রতিযোগিতায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগে পৌঁছেছি। পরে যখন আমি একটু মোটা হই, তখন দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি আমার আগে পৌঁছান এবং বলেন, এটা ওটার বদলা।

(খ) কুস্তি : আবু দাউদে বর্ণিত আছে। নবী (সা) তিনবার কুস্তিতে রাকানাকে পরাজিত করেন।

(গ) তীর দিয়ে খেলা : রাসূলুল্লাহ (সা) তীর দিয়ে খেলাকে উৎসাহিত করেছেন। কোন জীবন্ত প্রাণী ও পশু পাখিকে টার্গেট বানানা যাবে না। একবার আবদুল্লাহ বিন উমার একদল লোককে পশু টার্গেট করে তীর নিক্ষেপ করতে দেখে বলেন, "নবী (সা) প্রাণীকে টার্গেট বানানোকারীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন। নবী (সা) পশুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আজকাল ষাঁড় প্রতিযোগিতা হয়, তাও হারাম।

(ঘ) যুদ্ধাস্ত্রের মহড়া : নবী (সা) নিগ্রোদেরকে মসজিদে নবুওয়ীতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা যুদ্ধাস্ত্রের প্রস্তুতি জায়েয।

(ঙ) ঘৌড় দৌড় জায়েয। নবী (সা) এর অনুমতি দিয়েছেন।

(চ) শিকার করা : ইসলাম স্থল ও জলভাগে শিকার জায়েয করেছে। কেননা, এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন : "হে মোমেনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছাতে পারে। যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে।" (সূরা মায়েদাহ-৯৪)

(ছ) পাশা খেলা : এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেঈ ও ফিকাহবিদগণের দু'টো মত আছে।

১. এটা হারাম : এটা হলো, আলী, ইবনে ওমার, ইবনে আববাস, ঈমাম মালেক, আবু হানিফা ও আহমদ বিন হাম্বলের মত।

২. এটা হালাল : এটা হলো, আবু হোরায়রা, সাঈদ বিন মোসাইয়েব, সাঈদ বিন জোবায়ের, ইবনে সিরীন ও ইমাম শাফেঈর মত।

যারা এটাকে জায়েয বলেন তাদের যুক্তি হলো, কোন ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মূলত তা জায়েয থাকে। নারদ বা চওসর খেলার সাথে এর দুইভাবে পার্থক্য আছে। ১. নারদের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা হয়, যা ভাগ্য তীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২. পাশা খেলায় যুদ্ধ বিদ্যার প্রশিক্ষণ হয়। পক্ষান্তরে, নারদে

বেহুদা খেলা-তামাশায় সময়ের অপচয় হয়। তবে পাশা খেলা জায়েয হওয়ার আরো ৩টি শর্ত আছে। ক. তা যেন নামাযে বিলম্ব না ঘটায়, খ. এতে কোন বাজি ধরা যাবে না ও গ. খারাপ ও মন্দ কথা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করতে হবে।

৪) অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

অন্ধ অনুসরণ পরাজিত মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে হয় যা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হেরে যাওয়ার পেছনে অন্যের অন্ধ অনুসরণ প্রধানত দায়ী ছিল। ফরাসী লেখক আন্দ্রে মরো 'ফ্রান্সের পতনের কারণ' বইতে লিখেছেন, ফরাসী জাতির মধ্যে নোংরামী ও অশ্লীলতার বিস্তার তার পরাজয়ের কারণ। তাই প্রেসি দ্যা গল ক্ষমতা গ্রহণের সময় প্যারিসের পুলিশ প্রধানকে বলেন, "আমার এই রাজধানীতে বেশ্যালয়গুলো বন্ধ করে দাও।

অন্য জাতির অন্ধ অনুসরণের প্রতিযোগিতা বহু কর্তব্য পালনে বিরত রাখে। এছাড়াও ব্যক্তিত্ব ও পুরুষত্বকে ধ্বংস করে, সম্মান ও মর্যাদাকে লুণ্ঠিত করে এবং যৌন কামনা ও বাসনার পেছনে দৌড়াতে বাধ্য করে।

ইসলাম অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণকে নিষিদ্ধ করে। আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে অন্যদের অনুসরণ করে। তোমরা ইহুদী ও নাসারার অনুসরণ করো না।" (তিরমিযী)

ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন কওমের সাদৃশ্যপূর্ণ আচরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (আহমদ, আবু দাউদ)

ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আল্লাহ নারীর বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারিণী নারীর উপর অভিশাপ দেন।" (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "তোমাদের কেউ যেন অন্যায়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেয় এবং এরকম না বলে, লোকেরা ভাল কাজ করলে আমিও ভাল কাজ করবো, তারা খারাপ কাজ করলে আমিও খারাপ কাজ করবো। বরং তোমরা এরূপ হও, লোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও ভাল কাজ করবে এবং তারা খারাপ কাজ করলে তুমি তা থেকে দূরে থাকবে।"

এ হাদীসগুলোতে অন্ধ অনুসরণের বিরোধিতা করা হয়েছে। তবে যে সকল জিনিসের অনুসরণের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির

উপকার হবে, কেবল সেগুলোর অনুসরণ করা যাবে। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থ বিদ্যা, পরমাণু বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা দুশমনের মোকাবিলায় শক্তি অর্জন কর।" (সূরা আনফাল-৬০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "হেকমত হচ্ছে সকল বিজ্ঞ লোকের হারানো সম্পদ। যেখানে পাবে, সেটাকে গ্রহণ করার অধিকার আছে।" (তিরমিযী)

নারী সমাজের মধ্যে বিজাতীয় আদর্শের বেশী অনুসরণ দেখা যায়। তারা বিজাতীয় উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী। খৃষ্টানদের অনুসরণে বিপদ-মুসীবতের সময় কালো পোশাক পরে, বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নাচ-গান করে, অমহরম পুরুষ যেমন, ভগ্নিপতি ও চাচাত-জেঠাত ভাইদের সামনে বেপর্দা চলাফেরা করে, ছেলেরা নারীদের মতো বিনা পাগড়ীতে লম্বা চুল রাখে ইত্যাদি।

৫) হারামের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী :

সন্তানকে শৈশব থেকেই হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে সতর্ক করতে হবে। ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। সন্তানদেরকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের হুকুম দাও। এটা আগুন থেকে তাদের বাঁচার উপায়। (ইবনে জারীর, ইবনুল মোনজের)

আল্লাহ্ যা হালাল করেছন তাকে কেউ হারাম এবং তিনি যা হারাম করেছেন তাকে কেউ হলাল করতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা দ্বীনের মধ্যে নূতন কিছু আবিষ্কার করেছে যার হুকুম আল্লাহ দেননি?" (সূরা শূরা-২১)

আল্লাহ বলেন, "বল এবং নিজেরা লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযক নাযিল করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টাকে হারাম আর কোন্‌টাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? (সূরা ইউনুস-৫৯)

(ক) হারাম খাদ্য ও পানীয় : মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহকৃত প্রাণী, গলা টিপে মারা প্রাণী, উপর থেকে নীচে পড়ে মরা প্রাণী, লাঠি বা শিংয়ের আঘাতে নিহত প্রাণী, হিংস্র পশুর আংশিক খাওয়া প্রাণী এবং বেদীতে জবেহকৃত প্রাণী ইত্যাদি হারাম। এগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়াও শরীয়তের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে জবেহ করা প্রাণীর গোশত

খাওয়া নিষিদ্ধ। যেমন, বিদ্যুতের স্পর্শ কিংবা অমুসলিমের জবেহ এবং মদ ও মাদক দ্রব্য ইত্যাদি।

(খ) হারাম পোশাক ও সৌন্দর্য :

অপরিষ্কার পোশাক না পরার জন্য জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। এছাড়াও পুরুষের জন্য সিল্কের কাপড় এবং সোনা-রূপার ব্যবহার হারাম। পুরুষ নারীর পোশাক এবং নারী পুরুষের পোশাক পরতে পারবে না। গর্ব-অহংকার প্রকাশের পোশাক পরা যাবে না। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা যাবে না। সেজন্য হাতে ও শরীরে উল্কি আঁকা নিষেধ। সৌন্দর্যের জন্য দাঁত চিকন করা এবং ভ্রু তোলা হারাম। সকল মাজহাবে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম। কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর আযাব দেয়া হবে। তবে গাছসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি জায়েয, যেগুলোতে প্রাণ নেই।

(গ) জাহেলিয়াতের বিশ্বাস : আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েব সম্পর্কে জানে না। তবে তিনি যে পছন্দনীয় বান্দাহকে গায়েব সম্পর্কে জানান, সেই তা জানতে পারে। তিনি বলেন, "তিনিই হলেন গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি তার পছন্দনীয় রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে তা জানান না।" (সূরা জিন-২৭)

যে গায়েব সম্পর্কে জানার দাবি করে সে মিথ্যুক। আল্লাহ্ সোলায়মান (আ) এর কাছে কর্মরত জ্বিনদের সম্পর্কে বলেন, "যদি তারা গায়েব জানত, তাহলে তারা অপমানজনক কাজে অবস্থান করত না।" (সূরা সাবা-১৪)

এখন আমরা জাহেলিয়াতের বিশ্বাসগুলো আলোচনা করবো।

১. গণকদের বিশ্বাস করা : মুসলিম শরীফে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করে এবং তা বিশ্বাস করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।"

বাজ্জার ভাল সনদসহকারে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, "যে গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মোহাম্মদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ বিষয়ের সাথে কুফরী করে।

২. ভাগ্য তীর বিশ্বাস করা : আল্লাহ্ সূরা মায়েদার ৯০নং আয়াতে তা হারাম করেছেন। জাহেলিয়াত যুগে তীরের মধ্যে লেখা থাকত, 'আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন' অন্যটাতে লেখা থাকত, 'আমার রব আমাকে নিষেধ করেছেন'

এবং তৃতীয়টা ছিল লেখা শূন্য। লড়াই কিংবা বিয়ের উদ্দেশ্যে মন্দিরে রাখা তীর বের করে ভাগ্য পরীক্ষা করা করত। আদেশমূলক তীর বের হলে সেকাজটি করত। আর নিষেধমূলক হলে তা থেকে বিরত থাকতো। আর লেখাহীন তীর বের হলে বার বার পরীক্ষা করত, যে পর্যন্ত না আদেশ বা নিষেধমূলক তীর বের হয়। ইসলাম এগুলোকে হারাম করে কল্যাণ কামনার নামায তথা এস্তেখারার নামাযের বিধান জারী করেছে।

৩. যাদু : এটা হারাম। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে বেঁচে থাকো। তারা প্রশ্ন করেন, সেগুলো কী? তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু, ইসলামের ন্যায় বিচারের অধিকার ছাড়া কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাধ্বী অবলা নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেয়া।"

কোন কোন ফেকাহবিদ যাদুকে শিরক এবং যাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ফরয বলে মত দিয়েছেন।

অপরদিকে, কোরআন মাজীদ আমাদেরকে গিটের মধ্যে ফুঁ দিলে যাদু করলে তা থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস-ফালাক পড়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে বলেছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর সময় দু'হাতের অঞ্জলী একত্রিত করে তাতে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে শরীরের সামনের অংশে মুছতেন।

৪. তাবীজ ঝুলানো : আহমদ ও হাকেম ওকবা বিন আমের থেকে বর্ণনা করেন। দশ সদস্যের একটি কাফেলা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসল। তিনি নয়জনের বাইয়াত নিলেন। একজনের হাতে তাবিজ থাকায় তার বাইয়াত নিলেন না। লোকটি তাবিজটি ছিঁড়ে ফেলে দিল। নবী (সা) তার বাইয়াত নেন এবং বলেন, 'যে তাবিজ বাঁধে, সে শিরক করে।'

আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে। নবী (সা) বলেন, 'যে তাবিজ বাঁধে, আল্লাহ যেন তার ইচ্ছা পূরণ না করেন। আর যে ব্যক্তি ঝিনুক-শামুক বাঁধে, আল্লাহ যেন তার মকছুদ পূরণ না করেন।'

তাগা-দাগা, পুঁতি, দানা বা তাবিজ রোগ আরোগ্য, চোখ লাগা কিংবা ক্ষতি ও

অনিষ্ট দূর করার নিয়তে ব্যবহার করা নাজায়েয। অনেক ভ্রান্ত পীর-ফকির, কবিরাজ সাধারণ মানুষকে দাগা, মন্ত্র-তন্ত্র ও রেখা অংকিত কাগজ মুড়িয়ে দেয় যেন তা জিন, চোখ লাগাসহ বিভিন্ন অনিষ্ট থেকে হেফাজত করে।

তবে পরিষ্কার অর্থবোধক শব্দ, হাদীসে বর্ণিত দোয়া এবং সূরা নাস-ফালাকের মতো সূরা কেরাত দিয়ে তাবিজ দিলে কোন দোষ নেই বলে কোন কোন ফেকাহবিদ মত প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে দোয়া ও কেরাত পড়ে রোগী, সাপে কাটা লোক কিংবা ভূতে ধরা লোককে ঝাড়-ফুঁক করা ও হাত দিয়ে মুছে দেয়া জায়েয।

তবে ঝাড়-ফুঁক জায়েয হওয়ার তিনটি শর্ত আছে।

১. আল্লাহর কালাম, নাম ও গুণাবলী হতে হবে।

২. আরবী কিংবা অন্য ভাষায় পরিষ্কার অর্থবোধক হতে হবে।

৩. ঝাড়-ফুঁকের কোন শক্তি নেই বরং আল্লাহ সুস্থ করেন– এই বিশ্বাস পোষণ করত হবে।

৪. শুভ-অশুভ মনে করা : নবী (সা) বলেন, "যে শুভ-অশুভ মনে করে বা যার জন্য করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বাজ্জার, তাবারানী) আরবরা কাকের আওয়াজ, পেঁচার ডানে বাঁয়ে পাখির চলাচলকে অশুভ মনে করত। নবী (সা) কোন জিনিসকে শুভ-অশুভ মনে করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, ভালো-মন্দ নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ।

৫.হারাম আয়-রোজগার :

(ক) হারাম জিনিস বিক্রি : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ কোন জিনিসকে হারাম করলে এর মূল্যকেও হারাম করেন।' (আহমদ, আবু দাউদ) তাই মদ, প্রাণীর ছবি, শূকর, বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ, লটারীর কুপন ইত্যাদি বেচা হারাম। হারাম জিনিস বেচা-কেনা না করলে তার অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং দুষ্প্রাপ্য হবে। মুসলিম সমাজের জন্য তা উপকারী।

(খ) ধোঁকা খাওয়ার বেচা-কেনা : আবু হোরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। যে পরিমাণ দ্রব্যের উপর কংকর পড়ে এবং ধোঁকা খেতে পারে, নবী (সা) এমন বেচা-বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন।' (বোখারী ছাড়া পাঁচটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ)

নবী (সা) বলেন, 'পানির মধ্যে মাছ কিনবে না। তা ধোঁকাবাজী।' (আহমদ, তাবারানী) বিক্রেতা ক্রেতার হাতে তা তুলে দিতে সক্ষম নয়। কি পরিমাণ মাছ আছে, তাও জানা নেই।

(গ) ধূর্ততা ও দাম নিয়ে তামাশা করা : নবী (সা) বলেন, 'ঠকা যাবে না এবং ঠকানোও যাবে না।' (আহমদ, ইবনে মাজাহ) মওজুদদারী কর্তৃক কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি হলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় বাজার শক্তিই বাজার দাম নির্ধারণ করবে।। একবার মূল্য বৃদ্ধি হলে নবী (সা) কারো উপর জুলুমের ভয়ে মূল্য নির্ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আল্লাহই দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনিই রিযকদাতা।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

তবে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি প্রতিরোধ অগ্রাধিকার রাখে। এটা ফেকাহবিদদের মত।

(ঘ) মওজুদদারী করা : নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মওজুদদারী করে, সে আল্লাহ বিমুখ এবং আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হন।' (আহমদ, হাকেম, মুসলিম)

নবী (সা) বলেন, 'অপরাধীই কেবল মজুদধারী করে।'

(ঙ) পণ্যের দোষ গোপন করে বিক্রি করা : মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) গম বিক্রয়কারী এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গমগুলো ভালো মনে করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ভেজা দেখতে পান। তিনি প্রশ্ন করেন, এরূপ কেন? বিক্রেতা বললো, বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি বলেন, ভেজা গমগুলোকে কেন উপরে রাখলে না যেন লোকেরা দেখতে পায়? এরপর বলেন, যে প্রতারণা করে সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়।'

মিথ্যা কসম খেয়ে জিনিস বিক্রিও প্রতারণার মধ্যে শামিল। পক্ষান্তরে, ওজনে কম দেয়াও প্রতারণা। এছাড়াও ভেজাল মেশানো, খারাপকে ভালো বলে দাবী করা ইত্যাদিও হারাম।

(চ) সুদ ও জুয়া হারাম। নবী (সা) সুদদাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (বোখারী ছাড়া পাঁচটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ, আহমদ)

৬. জাহেলিয়াতের হারাম রীতি-নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী : মুসলমানদের মধ্যে আজ বেশ কিছু জাহেলী রীতি প্রথা ঢুকেছে। সেগুলো দূর করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে :

(ক) গোত্র ও সাম্প্রদায়িকতার বিজয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পিছিয়ে থাকা সমাজগুলোতে নিজ সম্প্রদায় কিংবা গোত্র ও বংশের বিজয় কামনা করা হয়। এজন্য ন্যায়-অন্যায় দেখা হয় না। নবী (সা)কে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি এর উত্তরে বলেন, 'অন্যায়ের উপর নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।' এরপর তিনি বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, সাম্প্রদায়িকতার জন্য লড়ে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করে।' (আবু দাউদ)

বোখারী নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর জালেম বা মজলুম অবস্থায়। তাঁরা প্রশ্ন করেন, মজলুমকেতো সাহায্য কার যায়, কিন্তু জালেমকে কীভাবে? তিনি বলেন, জালেমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা হলো তাকে সাহায্য করা।'

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফ কায়েম করো, যদিও তা নিজের উপর, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের উপরও হোক না কেন।' (সূরা নিসা-১৩৫)

(খ) বংশের গর্ব করা : গোমারাহ পথে চলা সত্ত্বেও বংশের গর্ব করা অন্যায়। আল্লাহ কি প্রশ্ন করেননি?

'যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তাদের কোন বংশ কাজে আসবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।' (সূরা মোমেনুন-১০১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বংশের গর্ব অহংকারের বিরুদ্ধে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা মৃত বাপ-দাদার গর্ব অহংকার করে, তারা যেন তা থেকে বিরত হয়। তা না হয়, তারা জাহান্নামের কয়লা হবে। আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার ও পিতার গর্ব দূর করেছেন। মানুষ হয় তাকওয়া অর্জন করবে, না হয় হতভাগ্য গুনাহগার হবে। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরী।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

(গ) মৃত ব্যক্তির জন্য হায়-হুতাশ করা : ইসলাম কারো মৃত্যুতে অতিরিক্ত দুঃখ-কষ্ট পেরেশানী প্রকাশের উদ্দেশ্যে গালে-পিঠে থাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া ও নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ানোকে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ড আখ্যায়িত করে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে মুখে থাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলিয়াতের

আহ্বান জানায়।' (বোখারী) তবে বিনা শব্দে চোখের পানি গড়ালে কিংবা হায়-হুতাশ করা ছাড়া মনের দুঃখ প্রকাশ করলে ক্ষতি নেই।

সাদ বিন ওবাদাহ অসুস্থ হলে নবী (সা) আব্দুর বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। সাদ বিন ওবাদাহ তখন জ্ঞানশূন্য। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি মারা গেছেন? লোকেরা বললো, না। তখন নবী (সা) কাঁদেন এবং লোকেরাও তাঁর দেখাদেখি কাঁদলো।

নবী (সা) বলেন, 'তোমরা কি শুনে রাখবে যে, আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তিকে চোখের পানি কিংবা মনের পেরেশানীর কারণে আজাব দেন না, জিহ্বার কারণে দেন অথবা তার উপর রহম করেন। তবে পরিবার পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির আজাব দেয়া হয়।' (বোখারী)

মৃত ব্যক্তি এরূপ কান্নার জন্য ওসিয়ত করলে কিংবা তাতে সন্তুষ্ট থাকলে ওই আজাব হবে।

মৃতের জন্য বিলাপের বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্য :

১. শোকের চিহ্ন বহন করা। যেমন, কালো কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি এবং নতুন পোশাক ও সাজ-সজ্জা ত্যাগ করা নাজায়েয। এটা অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি খৃষ্টানের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করো না।'

আহমদ ও আবু দাউদে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে অন্য কওমের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

২. লাশের উপর কিংবা কবরে ফুল দেয়া : এটা অমুসলিমদের রীতি এবং সম্পদের অপচয়। তবে কবরে কোন গাছ বা ফুল লাগানো জায়েয আছে। মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সা) দু'টো কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেন, তাদের কবর আজাব হচ্ছে এবং সেটা বড় কোন কারণ নয়। তাদের একজন চোগলখুরী করতো এবং অন্যজন পেশাব থেকে পাক হতো না। এরপর তিনি খেজুরের কাঁচা ডালকে দুইভাগে ভাগ করে দু' কবরে দু'টো রোপন করে বলেন, সম্ভবত এগুলো শুকানোর আগ পর্যন্ত তাদের কবর আজাব লাঘব হতে পারে।

৩. লাশের কফিনে মৃত ব্যক্তির ছবি কিংবা শোক প্রকাশে ঘরে ছবি ঝুলানো নাজায়েয। এগুলোও বিধর্মীদের অন্ধ অনুকরণ।

৪. মৃত ব্যক্তির লাশের সামনে কিংবা শোক প্রকাশে ঘরে বাজনা বাজানো নাজায়েয। এটাও অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ।

৫. মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবর পাকা করা কিংবা ঘর বানানো নাজায়েয। মুসলিম জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'নবী (সা) কবর পাকা করা, সেখানে বসা ও তাতে ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।'

তবে জেয়ারতের সময় চেনার জন্য কবরের চিহ্ন রাখা যায়। যেমন, নবী (সা) ওসমান বিন মাজউনের কবরে মাথার পাশে একটি পাথর দিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে তোমরা আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবে।

কবরে অর্থ নাজায়েযভাবে খরচ না করে সে অর্থ দিয়ে মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল নির্মাণ করলে মুর্দা তার সওয়াব পাবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আদম সন্তান মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটি আমল জারী থাকে। ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারী এলেমের সেবা ৩. যে নেক সন্তান দোয়া করে।

(ঘ) অন্যান্য হারাম রীতি-নীতি : বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীর নাচ-গান জাহেলিয়াতের রীতি-নীতি। এছাড়াও পিস্তলের ফাঁকা গুলি ও মদ পরিবেশনও নাজায়েয। এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি।

এ জাতীয় আরেকটি হারাম রীতি হলো, সন্তানকে নিজ পিতা ছাড়া অন্য বাবার নামে সম্বোধন করা। এরূপ করলে আল্লাহর অভিশাপ আসবে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতিত অন্য পিতা কিংবা মনিবের দিকে নিজেকে সম্বোধন করে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার তাওবাহ ও ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না।'

বোখারী ও মুসলিম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য পিতার দিকে সম্বোধন করে, তার উপর জান্নাত হারাম।'

নিষিদ্ধ রীতি প্রথার মধ্যে রয়েছে বর্তমানে অমুসলিম সমাজে সন্তান উৎপাদনের জন্য পুরুষের শুক্র নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়। এটা

হারাম। নিজ স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্ত্রীর জরায়ুতে স্বামীর শুক্র প্রবেশ করালে জায়েয আছে।

তবে পালক বা দত্তক সন্তান লালন-পালন করলে অসুবিধা নেই। কিন্তু তারা পালক ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না।

মেয়ের দেন-মোহরের টাকা খাওয়া পিতা বা অভিভাবকের জন্য জায়েয নেই। এটা মেয়ের অধিকার। আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্য সম্পদের হিস্‌সা ঠিক করে দিয়েছেন। তা লজ্ঘন করা যাবে না। যারা আল্লাহর সম্পদ বণ্টন আইন মানবে না, তাদের উপর আল্লাহর আযাব-গজব নেমে আসবে।

সকল অভিভাবকের জানা উচিৎ, সম্পর্কের সেতু বন্ধন ও হুঁশিয়ারীর নীতি হলো সন্তান গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা বিষয়ক জরুরী পরামর্শ

এখন আমরা সার্বিক ও ব্যাপকধর্মী শিক্ষা উপকরণ সংক্রান্ত পরামর্শ পেশ করবো যা ইতোপূর্বে আলোচিত 'সন্তান গঠনকারীর দায়িত্ব-কর্তব্য', 'সন্তান গঠনের মৌলিক নীতিমালা' এবং 'কার্যকর শিক্ষা উপকরণ' অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলতে গেলে, সন্তান গঠনের জন্য এগুলো হলো নূতন দিগন্ত। এরূপ ১০টি শিক্ষা পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করছি।

১. সম্মানজনক কামাই রোজগারের জন্য সন্তানকে উৎসাহিত করা :

কৃষি, ব্যবসা, শিল্প, চাকুরী-বাকুরীসহ যে কোন স্বাধীন ও সম্মানজনক পেশা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে আগ্রহী করতে হবে। নূহ (আ) নৌকা, দাউদ (আ) কর্মকার ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরী, মূসা (আ) বকরী চরানো এবং মহানবী (সা)-এর বকরী চরানো ও ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন।

ইবনুল জুজী বর্ণনা করেন। ওমার (রা) একদল লোককে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আল্লাহর উপর ভরসাকারী। তিনি বলেন, তোমরা অসত্য বলেছো। বরং সেই ব্যক্তিই আল্লাহর উপর ভরসাকারী, যে যমীনে বীজ বপন করে, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করে। তোমাদের কেউ যেন রিযকের অন্বেষণ না করে অলস বসে না থাকে এবং বলে, হে আল্লাহ, আমাকে রিযক দিন। অথচ সে জানে, আসমান থেকে সোনা-রূপা বর্ষিত হয় না।

ওমার (রা) ফকীর-গরীবদেরকে কাজ না করে দান সদকার অপেক্ষা করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, হে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, তোমরা কল্যাণ কামনায় প্রতিযোগিতা কর, মুসলমানদের উপর বোঝা হয়ো না।

তিনি আরও বলেন, আমি কোন লোককে দেখে ভালো লাগলে জিজ্ঞেস করি, তার পেশা কী? যদি বলে যে, কিছু না, তাহলে সে আমার চোখ থেকে ছিটকে যায়।

মূল কথা, নিজ হাতের কামাই হলো উত্তম। কোন ছাত্র ভালো হলে লেখা-পড়া শেষ পর্যন্ত করা ভালো। আর খারাপ হলে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনের পর যে কোন একটা কাজে ঢুকে আয় রোজগার করবে।

২. সন্তানের জন্মগত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তুতি বিবেচনা করা :

সন্তানের যে কাজের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা সে কাজের দিকে তাকে ধাবিত করা ভালো। মুসলিম ও আবু দাউদ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আমাদেরকে লোকদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেয়া প্রাপ্য মর্যাদার শামিল। কেউ সাহিত্য চর্চা, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেউ ডাক্তারী বা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় পড়তে চায়, তাদেরকে সেদিকেই অগ্রসর হতে দেয়া ভালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কাজ কর, যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার জন্য সহজ।' (তাবারানী)

সন্তান ও তার আগ্রহের মধ্যে যেন কোন বাধা না পড়ে।

৩. সন্তানকে খেলা-ধুলা ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ দেয়া :

মনে আনন্দ-ফুর্তি না থাকলে তা অন্ধ ও ক্লান্ত হয়ে যায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত। হানজালা ও আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে পরিবারের সন্তান ও স্ত্রীর সাথে সময় ব্যয় করাকে আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থী তথা নিফাক বিবেচনা করেন। নবী (সা) বলেন, তোমরা আমার কাছে যে অবস্থায় থাক, এভাবে থাকলে রাস্তা-ঘাটে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে হাত মেলাত। কিন্তু হে হানজালা, কিছুক্ষণ ইবাদত, কিছুক্ষণ পরিবারের সাথে কাটিয়ে তাদেরকে আনন্দ খুশী দান কর। কেননা এটা মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যা হোক, নির্দোষ খেলা-ধুলা অবশ্যই জায়েয। স্বয়ং নবী (সা)ও নিজ স্ত্রী আয়েশা, নাতিদ্বয় হাসান-হোসেনের সাথে খেলা-ধুলা করেন ও তাদেরকে আনন্দ দেন।

৪. ঘর, মসজিদ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা থাকতে হবে :

ঘর বা পরিবারের দায়িত্ব হলো, সন্তানের শারীরিক গঠন, মসজিদের দায়িত্ব হলো আধ্যাত্মিক গঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো ঈমান-বিশ্বাস, জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক গঠন। সমন্বিতভাবে এ কাজগুলো হলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যাবে।

৫. সন্তান গঠনকারীর সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক থাকতে হবে :

এ সম্পর্ককে জোরদার করা খুবই জরুরী। হাসি মুখে সন্তানের সাথে আচরণ করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। নিজেকে সন্তানের কাছে প্রিয় করতে হবে। খিটখিটে মেজাজ হলে ভালোবাসা সুদূর পরাহত হবে। তাদের সাথে সদাচরণ

করতে হবে। আবু দারদা বলেন, আমি কখনো নবী (সা)কে কথা বলার সময় মুচকি হাসি ছাড়া কথা বলতে দেখিনি বা শুনিনি।' (আহমদ)

তিনি শিশুদেরকে চুমু খেতেন এবং গাছের প্রথম ফল তাঁর কাছে আসলে আগে শিশুদেরকে দিতেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (সা)-এর খেদমত করেছি। কোন কাজ না করলে কোন দিন জিজ্ঞেস করেননি, কেন তা করিনি। আবু নাঈমের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'তিনি কখনো আমাকে মন্দ বলেননি, মারেননি, তিরস্কার করেননি কিংবা মুখ কালো করেননি। তাঁর পরিবারের কেউ কিছু বললে, তিনি বলতেন, সে পারলে তো করতো, তাই একথা ছাড়।'

ইবনু সা'দ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, নবী (সা) ঘরে কেমন ছিলেন? তিনি বলেন, নম্র ও হাসি-খুশী ছিলেন। নিজ সাথীদের সামনে দু' পা লম্বা করে বসতেন না।' এটা তার চূড়ান্ত আদব ও মর্যাদার লক্ষণ।

মুসলিম শরীফে সাম্মাক বিন হারব থেকে বর্ণিত। 'তিনি জাবের বিন সামুরাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ওঠা-বসা করেছেন? জাবের বলেন, হাঁ, বহুবার। নবী (সা) ফজরের নামাজ পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে উঠতেন (ও নামায পড়তেন।) তারা এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়থ– বিশেষ করে জাহেলিয়াতের বিষয়ে হাসাহাসি করতেন। নবী (সা)ও মুচকি হাসতেন।'

তাবারানী বর্ণনা করেন। নবী (সা) এর উপর নবুওয়্যত আসার পর জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য যান। তখন নবী (সা) নিজ চাদরটি তাকে উপহার দেন এবং বলেন, 'তোমাদের কাছে কওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসলে তাকে ইজ্জত করবে।'

নবীর (সা) প্রতি ভালোবাসার ধরণ সম্পর্কে আলী (রা)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের কাছে নিজেদের সন্তান, সম্পদ ও মাতা-পিতা এবং পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিলেন।

বায়হাকী ও ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন। ওহোদ যুদ্ধে নিজ পিতা, ভাই ও স্বামী হারা এক আনসার মহিলা নবী করিম (সা)কে নিরাপদ দেখে নিজ ভালোবাসা

উজাড় করে দিয়ে বলেন, 'আপনার তরে সকল বিপদ-মুসীবত আমার কাছে তুচ্ছ।'

নবী (সা) এর চরিত্র অনুসরণ করলে সন্তানের সাথে অভিভাবকের ভালোবাসার সম্পর্ক অবশ্যই বাড়বে। আর ভালোবাসার সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে গঠন করা সহজ হবে।

৬. সন্তানকে দিন-রাত শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করা :

সকাল বেলার কর্মসূচি :

ঘুম থেকে ওঠার সময় নবী (সা) থেকে বর্ণিত দোয়া পড়া। টয়লেটে গেলে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং দোয়া পড়বে। সাথে আল্লাহর যিকর বা কোরআন জাতীয় কিছু যেন না থাকে। নবী (সা)-এর আংটির মধ্যে 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা ছিলো। তিনি টয়লেটে যাবার আগে তা খুলে রাখতেন। (হাকেম) মাঠে ময়দানে পেশাব-পায়খানা করলে দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে যেতে হবে। কেবলামুখী হয়ে কিংবা কেবলাকে পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না। নবী (সা) তা নিষেধ করেছেন। ছায়াদার গাছের নীচে, রাস্তা ও বসার স্থানে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহর লানত আনয়নকারী দু'টো জিনিস থেকে দূরে থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, লানত উদ্রেককারী বিষয় দু'টো কী? তিনি বলেন, রাস্তা ও জনগণের বসার ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা।' (মুসলিম, আহমদ)

পেশাব-পায়খানার সময় কথা-বার্তা না বলা। ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) পেশাব করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিলো। তিনি উত্তর দেননি।' (মুসলিম)

পেশাব যেন শরীর কিংবা কাপড়ে না লাগে। কবর আজাব সাধারণত পেশাব থেকে অপবিত্রতার জন্য হয়।

ডান হাতে শৌচ কর্ম করা যাবে না। আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ পেশাব করলে ডান হাতে যেন লজ্জাস্থান না ধরে, ডান হাতে শৌচ কার্য না করে এবং পেয়ালায় শ্বাস না নেয়।' (বোখারী, মুসলিম)

পানি ও ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহার উত্তম। আল্লাহ এজন্য কুবাবাসীদের প্রশংসা করেছেন।

সন্তানকে টয়লেট থেকে বের হবার সময় ডান পা আগে এবং বের হবার দোয়া

শিক্ষা দিতে হবে। বের হয়ে হাত মাটিতে ঘঁষে কিংবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম। নবী (সা) মাটিতে হাত ঘঁষে পরিষ্কার করতেন।

এরপর তাকে ওজু শিক্ষা দিতে হবে। প্রথমে ওজুর ফজিলত শিক্ষা দিতে হবে। মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'বান্দা অজুর সময় মুখ ধোয়ার সাথে সাথে তার চোখের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। পা ধোয়ার সাথে সাথে দু' পায়ে হেঁটে যত গুনাহ করেছে, তা মাফ হয়ে যায়। সবশেষে সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যায়।'

অজু শেষে হাদিসে বর্ণিত দোয়া পড়তে হবে। এরপর তাকে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়া শিক্ষা দিতে হবে। ওকবাহ বিন আমের জোহানী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন মুসলমান ভালো করে অজু করে মনোযোগ সহকারে দু'রাকাত নামায পড়লে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' (মুসলিম)

সন্তানকে কিয়ামুললাইল তথা তাহাজ্জুদের নামাজ শিক্ষা দিতে হবে। এ নামাযের রাকাত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নেই। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পড়তে হবে। রাতের নামায দু'রাকাত করে পড়তে হয়। প্রথমে হাল্‌কা দু'রাকাত পড়া উত্তম। এ নামায বেহেশতে প্রবেশের উপায়। তিরমিযী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন সালাম থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'হে লোকেরা, সালামের প্রসার ঘটাও, খানা খাওয়াও, লোকেরা যখন ঘুমায় তখন নামায পড়ো; তাহলে শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।'

তাহাজ্জুদের নামায পড়লে আল্লাহর জিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আবু দাউদ আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, 'কোন লোক রাতে নিজ স্ত্রীকে জাগিয়ে সে নিজে বা তারা উভয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লে জিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে আহ্বান করেন, কেউ কি কিছু প্রার্থনা, গুনাহ মাফ ও তওবা করতে চায়? আমি তাদের এগুলো কবুল করবো। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়লেই আল্লাহর নৈকট্য, গনাহ মাফ, তওবা ও দোয়া কবুলের সুযোগ লাভ করবে।

এরপর ভোরে মসজিদে জামায়াতসহকারে নামাজ পড়বে। প্রথমে নামাযের

আজানের দোয়া শিক্ষা দিতে হবে। আজানের জওয়াব দিয়ে দোয়া করলে হাশরের দিন নবীর সুপারিশ নসীব হবে। (বোখারী)

এরপর মসজিদে জামায়াতে নামাজের ফজিলত শিক্ষা দিতে হবে। আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঘরে অজু করে ফরজ নামায পড়ার জন্য মসজিদে যায়, তার প্রতি কদমে একটি করে গুনাহ মাফ হয় ও একটি মর্যাদা বাড়ে।' (মুসলিম) ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'একাকী নামায পড়ার চাইতে জামায়াতে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশী সওয়াব।' (বোখারী, মুসলিম)

নামায শেষে তাসবীহ ও দোয়া শিক্ষা দিতে হবে। ৩৩ বার করে তাসবীহ, হামদ ও তাকবীর বলতে হবে এবং শ'এর মাথায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলক্ ওয়ালাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' বললে তার গুনাহ সাগরের ফেনা রাশির মতো হলেও তা মাফ করে দেয়া হবে।' (মুসলিম)

ফজর ও মাগরিবের নামাজের পরে অনেক দোয়া ও তাসবীহ আছে। এছাড়া প্রত্যেক নামায শেষেও দোয়া আছে।

সেগুলো শিক্ষা দিতে হবে। তারপর সকাল বেলার জন্য নির্দিষ্ট দোয়াগুলো পড়তে হবে। এরপর সাধ্য মতো কোরআন তেলাওয়াত করবে। আবু উমামা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা কোরআন পড়ো। কোরআন কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে কোরআন শিখে ও শিক্ষা দেয়।' (বোখারী)

এরপর শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহর কাছে দুর্বল মোমেন অপেক্ষা শক্তিশালী মোমেন উত্তম। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। আদর্শিক জ্ঞানের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে। জ্ঞান সংগ্রহ করলে জান্নাতের পথ সহজ হয়। (মুসলিম) এরপর চাশতের নামায পড়তে হবে। আবু হোরায়রা (রা) বলেন, 'আমার বন্ধু আমাকে তিনটি কাজের উপদেশ দিয়েছেন। প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা, চাশতের দু'রাকাত নামায পড়া এবং শোয়ার আগে বিতরের নামায পড়া।' (বোখারী, মুসলিম) অধিকাংশ ফেকাহবিদের কাছে চাশতের নামায দু' রাকাত। সর্বোচ্চ আট রাকাত। এর সময় হলো সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা পর সূর্য হেলার

পৌনে এক ঘন্টা আগ পর্যন্ত। এরপর নাশতা সারতে কবে। নাশতা শেষে ঘর থেকে বের হবার আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে হবে। প্রথমে ডান পায়ে জুতো পরা এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা খুলবে। (মুসলিম) ঘর থেকে বের হবার দোয়া পড়বে। তারপর রাস্তার আদব-কায়দা শিখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'দয়ালু আল্লাহর বান্দাগণ নরমভাবে জমীনে চলবে এবং অজ্ঞ লোকদের কথার জবাবে সালাম বলবে।' (সূরা ফোরকান-৬৩) লোকদেরকে দেখলে সালাম দেবে। লোকদের কষ্ট হয় এমন কোন জিনিস রাস্তায় ফেলবে না। সর্বদা আল্লাহ তাকে দেখছেন– এ মনোভাব পোষণ করতে হবে।

(খ) সন্ধ্যা বেলার কারিকুলাম : মাগরিব ও এশার নামায মহল্লার মসজিদে জামায়াতসহকারে পড়বে। কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাবে না। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাঁচা পেয়াজ, রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।' (বোখারী, মুসলিম) পরিষ্কার ও সুন্দর পোশাক পরতে হবে। নারীরা মসজিদে গেলে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। নামাজের জন্য বের হবার দোয়া পড়তে হবে। আহমদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনু খোযায়মা আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঘর থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে যেন এই দোয়াটি পড়ে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ خُرُوْجِيْ اِلَيْكَ ، اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنِيْ شَرٌّ وَلَا بَطَرٌ وَلَا سُمْعَةٌ وَلَا رِيَاءٌ ، خَرَجْتُ هَرَبًا وَّفِرَارًا مِّنْ ذُنُوْبِيْ اِلَيْكَ ، خَرَجْتُ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَشَفَقَةً مِّنْ عَذَابِكَ ، خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ تُنْقِذَنِيْ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীর দোহাই এবং আপনার প্রতি বের হবার ওসিলায় আরাধনা করছি। আপনি ভালো করেই জানেন, আমাকে কোন মন্দ, গর্ব, সুনাম ও অহংকার বের করেনি। আমি আপনার কাছে আমার গুনাহ থেকে পালিয়ে এসেছি, আপনার রহমতের আশায় এবং আজাবের ভয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি আপনার অসন্তোষ থেকে বাঁচা ও সন্তোষ লাভের জন্য বের হয়ে এসেছি। আপনার রহমত দিয়ে আমাকে দোজখ থেকে রক্ষা করুন।'

মসজিদে পৌঁছে আগে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং প্রবেশের দোয়া পড়তে হবে। মসজিদে ঢুকে বসার আগে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তে হবে। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে আসলে দু'রাকাত নামায না পড়ে বসো না।' (বোখারী, মুসলিম)

মসজিদ থেকে বের হবার সময় বাম পা দিয়ে বের হবে এবং বের হবার দোয়া পড়বে। এরপর ক্লাসের লেখা-পড়াসহ করণীয় কাজগুলো করবে। সন্তানকে সর্ব এলম অর্জনের উপকারিতা স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো। এছাড়াও জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা যে বেশী তা বুঝাতে হবে।

বিশেষ কোন উপলক্ষ আসলে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। যেমন, মেরাজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে। মেরাজের সাথে ফিলিস্তিন সমস্যার সম্পর্ক ও এ ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কি তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। খেলা-ধুলা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিবারে আনন্দ খুশী ঢুকাতে হবে। সবাই যেন তাড়াতাড়ি ঘুমায় সেটা দেখতে হবে। ঘুম থেকেও তাড়াতাড়ি জাগতে হবে। ঘুমানোর আগে মা-বাবার হাতে সন্তানের চুমু খাওয়ার অভ্যাস করা ভালো। রাতে শোয়ার সময় ঘুমের দোয়া পড়তে হবে।

৭. সন্তানকে উপকারী সাংস্কৃতিক উপকরণ সরবরাহ :

এজন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

(ক) ঘরে একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (খ) গঠনমূলক সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন ঘরে রাখা। (গ) টিলিভিশনের কার্টুন ও ভালো ফিল্ম দেখানো। (ঘ) যাদুঘর পরিদর্শন। (ঙ) পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়ে যাওয়া।

৮. সন্তানকে ব্যায়ামের জন্য উৎসাহিত করা।

৯. সন্তানকে তার উপর আরোপিত ইসলামী দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া।

১০. সন্তানের মনে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা : জেহাদ ছাড়া ইসলামের শৌর্য-বীর্য ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জেহাদ কয়েক প্রকার। রাজনৈতিক জেহাদ, অর্থনৈতিক জেহাদ, দাওয়াতী জেহাদ, শিক্ষামূলক জেহাদ, ময়দানী লড়াই-এর জেহাদ।

তাদেরকে জেহাদ সম্পর্কে সূরা আনফাল ও তাওবা শিক্ষা দিতে হবে এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। তাহলেই কেবল ইসলামী সিলেবাস ও কারিকুলামের সার্থকতা আসবে। আমীন ■